আধুনিক ইওরোপ

দ্বিবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ

(১৭৮৯—১৯৩৯ খ্রীঃ)

ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী
এম্. এ., এল্. এল্. বি., পি. এইচ. ডি.
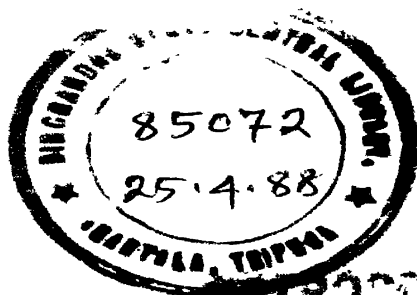
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত নূতন দ্বিবার্ষিক স্নাতক স্তরের ইতিহাসের তৃতীয় পত্রে ইওরোপের ইতিহাস ১৭৮৯ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত রাখা হইয়াছে। সেই অনুসারে এই বইখানি রচিত হইল।

আমার অপরাপর বইয়ের মত এই বইখানিও যদি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

বইয়ের উৎকর্ষ-সাধনে অধ্যাপক-অধ্যাপিকার অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশ-নির্দেশ যথাযোগ্য শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হইবে।

গ্রন্থকার

॥ চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা ॥

অল্পকালের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় এই সংস্করণে বইখানির পরিমার্জন করা হইয়াছে। ইহাতে বইয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, আশা করি।

যে-সব ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সস্নেহ আনুকূল্যে বইখানির দ্রুত চতুর্থ সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থকার

॥ পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা ॥

আধুনিক ইওরোপ (১৭৮৯—১৯৩৯)-এর পঞ্চম সংস্করণে বইখানির আগাগোড়া পরিমার্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নূতন তথ্যের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন বিষয়বস্তু যেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ইওরোপের ইতিহাস জানিবার পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছি সেইগুলিও যোগ করিয়া দিয়াছি। বইখানি ইহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করি।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকা যাহাদের সহৃদয়তায় এই বইখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া ছাত্র-ছাত্রী-সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ-নির্দেশ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করিব। ইতি

গ্রন্থকার

॥ সূচীপত্র ॥

অধ্যায় ৫

অধ্যায় ৯

অধ্যায় ১০

অধ্যায় ১১

অধ্যায় ১২

অধ্যায় ১৯

অধ্যায় ২০

অধ্যায় ২১

আধুনিক ইওরোপ

(১৭৮৯—১৯৩৯ খ্রীঃ)

সূচনা

(Introduction)

ফরাসী জাতির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ, শোষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির জাগরণ ও বিদ্রোহ, রাষ্ট্র ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা পরিবর্তন করিয়া শাসনব্যবস্থায় জনমত ও জনসাধারণের প্রাধান্য ও অধিকার স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সম্পর্কের ধারণার পরিবর্তন

মানব-ইতিহাসের শুরু হইতে বিভিন্ন যুগে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রাধান্য অর্জন করিয়া সাধারণ মানুষকে মূক, আজ্ঞাবহমাত্রে পরিণত করিয়াছিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির সময় হইতেই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ছিল এইরূপ। প্রাচীনকালের প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, মধ্যযুগের প্রথমভাগে সামন্ত-প্রথাভিত্তিক সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি, মধ্যযুগের শেষ দিকে সামন্তগণের দুর্বলতাহেতু রাজতন্ত্রের শক্তিসঞ্চয় ও ক্রমপদক্ষেপে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণতি, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বাত্মক প্রাধান্যের বলে এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি ও পররাজ্য অপহরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মর্যাদাবৃদ্ধির অজুহাতে সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জনসাধারণকে স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নকে পরিণত করিয়াছিল। কথাটি হয়ত আপাতদৃষ্টিতে স্বয়ং বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে ইহা সত্য যে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সের জনসাধারণ বা রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যাহাদের গুরুত্ব ছিল বেশি তাহারা কেহই বিপ্লব সংঘটিত হউক তাহা চাহে নাই। পৃথিবীর অপরাপর বৃহদাকারের যুদ্ধ-বিগ্রহের মতই ফরাসী-বিপ্লব ছিল একটা ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতি। যুদ্ধই হউক আর বিপ্লবই হউক, বস্তুত মানুষ যাহা চাহে তাহা যুদ্ধ বা বিপ্লব নহে, অথচ পরিস্থিতি এমনই অগ্রসর হইতে থাকে যে, মানুষ অবাঞ্ছিত যুদ্ধ বা বিপ্লবের আবর্তে জড়াইয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একথার সত্যতার অন্যথা ঘটে নাই।* অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, চমকপ্রদ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের বা বিজয়-গৌরবে জাতিকে মাতাইয়া রাখিবার ক্ষমতার অভাব, পক্ষান্তরে জনসাধারণের রাজনৈতিক, সামাজিক,

মানব-ইতিহাসের ধারা

বিপ্লবের পটভূমিকা

* "It is a paradox that no important people or forces in France of 1789 wanted revolution. Revolution may begin, as wars often begin, not because people positively want them. They happen because people want other things that in a certain set of circumstances implicate them in revolution." *Europe Since Napoleon*, p. 4. David Thomson.

অর্থনৈতিক সচেতনতা, যুক্তিবাদী সমালোচনায় মনোবৃত্তি, এবং অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের দাবি এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পরিস্থিতির পশ্চাতে যে মানসিকতা সক্রিয় ছিল তাহাকে ডেভিড্ টম্সন "বিপ্লবের মানসিকতা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।* গতানুগতিক সংস্কারের দ্বারা জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ যখন ফ্রান্সে অসম্ভব হইয়া উঠিল তখনই প্রয়োজন হইল বিপ্লবের। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা মোটামুটি একই ছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ও জনসাধারণের অবিচার-অত্যাচার ও শোষণমুক্ত হইবার ইচ্ছা ফরাসী জাতিকে এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সংগঠক, ধারক ও বাহকে পরিণত করিল।

ফ্রান্সের পরিস্থিতি—বিপ্লবের পথ-প্রস্তুতি

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ—দুইটি পৃথক সত্তা হিসাবে বিবেচিত হইত। রাষ্ট্রের নিকট হইতে জনসাধারণের যথেষ্ট দাবি আছে একথা সেই সময়ে স্বীকৃত ছিল না। তখন সমগ্র জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন ছিল। রাষ্ট্রের স্বার্থেই জনগণ—এই ছিল তখনকার প্রচলিত ধারণা। কিন্তু যুক্তিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সম্পর্কের মাপকাঠি যে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন এবং রাষ্ট্র সেই কর্তব্য-সাধনে অক্ষম হইলে জনসাধারণ যে উহার পরিবর্তন ঘটাইবার অধিকার প্রাপ্ত, এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সম্পর্কের নূতন ধারণা

ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বিভিন্নাংশের জনসাধারণ, সাহিত্যিক, রাজনীতিক সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক নূতন আশার আলোক-সম্পাত করিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী বিপ্লবের প্রতি পৃথিবী, বিশেষভাবে ইওরোপীয় জনসাধারণকে সাময়িকভাবে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিলেও ফরাসী বিপ্লবের দান—দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, সাম্য ও স্বাধীনতার সার্থক ইঙ্গিত হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অধিকারের স্বীকৃতি ফরাসী বিপ্লবের দান ইহা অনস্বীকার্য। এক বিশাল স্রোতস্বতীর ন্যায়ই ফরাসী বিপ্লব মানবজাতির মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্বক্ষেত্রে এক প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া আধুনিক ইওরোপ তথা পৃথিবীর ভিত্তি নূতনভাবে রচনা করিয়াছিল।

নূতন আশার আলোক

ফরাসী বিপ্লবের দান—আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণের অধিকারের স্বীকৃতি

---

* *Idem.*

অধ্যায় ১

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ইওরোপ : জ্ঞানদীপ্তি

(Europe on the Eve of the French Revolution : Enlightenment)

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition) : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইওরোপে চালু ছিল তাহা Old Regime বা 'পূর্বতন শাসন' নামে পরিচিত। সমগ্র ইওরোপ তখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সংখ্যক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত অপরাপর শক্তিশালী দেশ-মাত্রেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। রাষ্ট্র তখন জাতীয়তাবাদী-রাষ্ট্র ছিল না। রাজতন্ত্র ও রাজবংশ-ই ছিল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র ও জাতির পার্থক্য তখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বস্তুত, ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপীয় রাজতন্ত্রে মধ্যযুগীয় ঈশ্বর-প্রদত্ত রাজক্ষমতা এবং রাষ্ট্রতান্ত্রিক স্বৈরাচার এই দুইয়ের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।* ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ বোঁদা (Bodin) রাজাকে ভগবানের প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস (Parlement of Paris) রাজা চতুর্দশ লুইকে মূর্ত-ভগবান (Living God) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজতন্ত্রের ক্ষমতার তারতম্য সত্ত্বেও রাজক্ষমতা ঈশ্বর-প্রদত্ত এবং রাজা জনসাধারণ বা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট নিজ কার্যকলাপের জন্য দায়ী নহেন, এই ধারণার মৌলিক সামঞ্জস্য সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইত।†

পূর্বতন শাসন (Old Regime)

রাজনীতিক্ষেত্রে রাজার সর্বাত্মক প্রাধান্যের মধ্যে জাতি নিজ শক্তি, মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিফলিত দেখিত। এই সকল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত ছিল যে, রাজ-শক্তি জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরেই অনুভূত হইত। এই সর্বাত্মক রাজশক্তির বিরোধিতা করিলে রাজার পুলিশ বা সৈন্যের হস্তে লাঞ্ছিত, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত হারাইতে হইত। রাজশক্তি ছিল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনবোধে রাজা যে-কোন প্রজার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে, যে-কোন আইন প্রবর্তন করিতে পারিতেন। রাজার সার্বভৌমত্বের এগুলিই ছিল মূল শর্ত।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

এইরূপ শাসনব্যবস্থার দক্ষতা স্বভাবতই রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত।

* *New Camb. History*, vol. vii, p. 214.

† *Ibid*, p. 141.

চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজার শাসনব্যবস্থা একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরেই চলিত। জনসাধারণ এইরূপ রাজার আদেশ পালন করিতে বা আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মানবোধ করিত। চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় মর্যাদাশালী রাজার সেবায়ও জনসাধারণ আনন্দবোধ করিত। পোল্যান্ড ও সুইডেন ভিন্ন অপরাপর দেশের রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। পোল্যান্ডের রাজপদ ছিল নির্বাচনমূলক আর সুইডেনের রাজবংশানুক্রম তথাকার জাতীয় সভা (Diet) নির্ধারণ করিত। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র দুর্বল, অকর্মণ্য প্রমাণিত হইয়াছিল। শক্তিশালী রাজগণ সকলেই বংশানুক্রমে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজার ব্যক্তিত্বের উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল

সংস্কার-নীতি যে দেশেই গৃহীত হউক না কেন, প্রাক্তন শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করাই ছিল সেই সংস্কারের উদ্দেশ্য, উহার আমূল পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কায়েমী স্বার্থের উপর কোনপ্রকার আঘাত না করিয়া অনুগত আমলাশ্রেণীর মাধ্যমে দেশের সর্বত্র নিজ শক্তি কার্যকরী করিতে পারিলেই তখনকার রাজগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন।

প্রাক্তন ব্যবস্থা দৃঢ় করা, কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা—সংস্কার নীতির উদ্দেশ্য

সামন্ততন্ত্রের কাঠামো তখন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সামন্ত-প্রথাজনিত এবং রাজনৈতিক সমস্যা ও দোষ-ত্রুটির কতক কতক তখনও বিদ্যমান ছিল। এই সকল সমস্যা ও দোষ-ত্রুটি তখনও রাজশক্তি বা শাসনব্যবস্থার অসুবিধার সৃষ্টি যে একেবারে না করিতে পারিত, এমন নহে।

সামন্ত-প্রথা বিধ্বস্ত কিন্তু উহার দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান

প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা ইত্যাদি কোন কোন দেশে ছিল বটে, কিন্তু এগুলির স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক এই সকল সভার কার্যাবলী পরিচালিত হইত। ফ্রান্সের স্টেট্স্-জেনারেল নামক কেন্দ্রীয় সভা (Estates or States-General) ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লোপ পাইয়াছিল। একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজশক্তিকে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন দেশের রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতারও তারতম্য ছিল। যেমন, স্পেনে রাজক্ষমতা আইনত ফ্রান্সের রাজক্ষমতা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি স্বৈরাচারী ও সীমাহীন ছিল।

প্রতিনিধি সভার ক্ষমতাহীনতা

বিচার-ব্যবস্থার উপরও স্বৈরাচারী রাজগণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। বিচারালয়গুলির বিচার-ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিচারালয় পরস্পর-বিরোধী বিচার-

বিচার-ব্যবস্থায় রাজার প্রাধান্য স্বীকৃত

ক্ষমতা দাবি করিত। রাজশক্তির বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়া কল্পনাতীত ছিল, অথচ ফ্রান্স প্রভৃতি স্বৈরাচারী দেশেও সাধারণ লোকের বিবাদ-বিসম্বাদে ন্যায্য বিচার পাওয়া যাইত। সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য কোন আইনবিধি অবশ্য তখনও গৃহীত হয় নাই।

আইনের চক্ষে সমতার অভাব

পররাষ্ট্র-নীতিতে তখনকার রাজগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতেন না, অপরের অধিকার স্বীকার অথবা অপরের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার তখন একপ্রকার অবিদিত ছিল। "অপরের সম্পত্তি যে দখল করিতে জানে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না"*—রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি-গ্রেট বলিয়াছিলেন—"যাহা পার দখল কর, যদি তাহা ফিরাইয়া দিতে না হয়।"† এই সকল উক্তি হইতেই তখনকার পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র কি ছিল, সেই সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রাজ্য-বিস্তার ও ইওরোপে প্রাধান্য-স্থাপন করাই ছিল সেই সময়কার পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। জনমানসে রাজার সম্মান ও প্রতিপত্তি রাজার যুদ্ধ-জয়ের তথা রাজ্য-বিস্তার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল। দুর্বল প্রতিবেশীর রাজ্য গ্রাস করা তদানীন্তন রাজনীতিতে স্বভাবতই গর্হিত কার্য বলিয়া গণ্য হইত না। রাজবংশ ও জাতির সমর্থন এইরূপ কার্যকলাপে সর্বদাই পাওয়া যাইত।

রাজ্যবিস্তার ও নিজ স্বার্থসিদ্ধি—পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য

সামাজিক অবস্থা (Social Condition): ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার ইওরোপীয় সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামোর অনুরূপ ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইওরোপের সমাজ সম্পর্কে সেন্ট সাইমন (Saint Simon), লর্ড হার্ভে (Lord Harvey) প্রভৃতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা ছিল অভিজাততান্ত্রিক এবং মূলত ফরাসী সমাজের প্রতিচ্ছবি।§ অধিকাংশ দেশেই সমাজ প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যথা—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণ। যাজক শ্রেণী ছিল সমাজের প্রথম সম্প্রদায় (First Estate), অভিজাতগণ ছিল দ্বিতীয় সম্প্রদায় (Second Estate) এবং অন্যান্য সকলে ছিল তৃতীয় সম্প্রদায় (Third Estate)। এখানে উল্লেখ্য যে, ইওরোপীয় অভিজাততান্ত্রিক (Aristocratic) সমাজের উপর যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। স্বার্থ ও মর্যাদার দিক দিয়া

সমাজ : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত

কৃষকগণ ভূমিদাসে পরিণত

* "He who gains, loses nothing."—Catherine II.

† "Take whatever you can, if you are not obliged to give back—" Frederick the Great.

New Camb. History, vol. vii, p. 50.

প্রথম দুই সম্প্রদায় সমপর্যায়ভুক্ত ছিল; তৃতীয় সম্প্রদায় প্রধানত মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের লইয়া গঠিত ছিল এবং মর্যাদায় তাহারা প্রথম দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু নিম্নে ছিল। বেভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষকগণ ছিল ভূমিদাস। ফ্রান্স, ইংলন্ড ও সুইডেন ভিন্ন অপরাপর কোন দেশে মধ্যবিত্ত সমাজ বলিয়া তখনও কিছু গড়িয়া উঠে নাই। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিত। বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা প্রথম দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু উচ্চে ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায় ও প্রথম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

ফ্রান্স, ইংলন্ড ও সুইডেনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition): প্রত্যেক দেশের অর্থনীতি মার্কেন্টাইলবাদ (Mercantilism)কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক স্থাপন করিয়া আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি উৎসাহিত করা হইত। রাজকর্মচারিপদ বিক্রয়, ভূ-সম্পত্তি ও আয়ের উপর কর, জবরদস্তিমূলক শ্রম-গ্রহণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল। ইহা ভিন্ন, দেশের অভ্যন্তরেও বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের অধিকাংশের আয়ের একমাত্র পন্থা ছিল কৃষি। শ্রমজীবীর সংখ্যাও তখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের পন্থা ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকগণ ভূ-সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত আয়, রাজানুগ্রহ, রাজকর্মচারিপদ ক্রয় হইতে আয়, ধর্মকর ইত্যাদি নানাভাবে অর্থ উপার্জন করিত। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক বিস্তার ছিল অষ্টাদশ শতকের ইওরোপীয় দেশসমূহের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। এই একই কারণে মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছিল।

মার্কেন্টাইলবাদ: শুল্কনীতি

সরকারের আয় ও প্রজাদের আয়ের পন্থা

জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment): অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে যে ব্যাপক জ্ঞানদীপ্তি বা মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার ক্ষেত্র সপ্তদশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। চারিটি মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। জ্ঞানদীপ্তির অনুসরণকারী মাত্রেই এই চারিটি বৈশিষ্ট্য বা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রথমত, প্রকৃতিবাদের প্রাধান্য অর্থাৎ প্রাকৃতিক (Natural) সবকিছুকেই অ-প্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃতের উপর স্থান দেওয়া। অর্থাৎ Naturalism-কে Supernaturalism-এর উপরে ও বিজ্ঞানকে ধর্মের উপর স্থান দেওয়া। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়মেই সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রকৃতিবাদের উপর বিশ্বাস জন্মিবার ফলে মানুষ ক্রমেই তুক্‌ তাক্‌, মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবশক্তি প্রভৃতির উপর আস্থা হারাইয়া বাস্তববাদী হইয়া উঠিল। তাহাদের ধর্মান্ধতাও দূরীভূত হইতে লাগিল।

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রাধান্য (Naturalism)

দ্বিতীয়ত, সর্ববিষয়ে যুক্তিবাদকে (Rationalism) প্রাধান্য দান করা। জ্ঞানদীপ্তির প্রধান কারণ ছিল যুক্তিবাদের উপর বিশ্বাস। ফরাসী দার্শনিকদের, যথা—মণ্টেস্কু, ভল্টেয়ার, রুশো, লক, ডেনিস ডিডেরো, কুয়েসনে, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতির রচনা ফ্রান্সে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ, রাজনীতি সর্বত্র যুক্তিবাদের প্রয়োগ, এমন কি, মানুষের জীবনযাত্রাকে যুক্তিসম্মতভাবে পরিচালিত করিবার এক গভীর আগ্রহ ছিল যুক্তিবাদের প্রসারের ফল। কোন কিছুই যুক্তিগ্রাহ্য না হইলে গ্রহণীয় নহে, এই ছিল যুক্তিবাদের শিক্ষা।

যুক্তিবাদ (Rationalism)

তৃতীয়ত, জ্ঞানদীপ্তির অনুসরণকারিগণ মানবজাতি যুক্তিবাদের মাধ্যমে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, এই কথায় বিশ্বাস করিতেন। এই আশাবাদ (optimism) ছিল জ্ঞানদীপ্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞানদীপ্তির মাধ্যমে অগ্রগতিতে বিশ্বাস (optimism)

চতুর্থত, জ্ঞানদীপ্তি মানুষমাত্রকেই প্রাকৃতিক অধিকারে পুনঃস্থাপিত করিতে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানব-সমাজে মানুষের অধিকারের যে তারতম্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া প্রকৃত মানবতা ও সমতার ভিত্তিতে মানুষমাত্রকেই সমান সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী করিবে।

মানবতা (Humanitareanism)

উপরি-উক্ত চারিটি দার্শনিক ধারণার বশবর্তী হইয়া সে-যুগে (অষ্টাদশ শতাব্দী) মানুষের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের– রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক—বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু হয়। এই সমালোচনা ছিল ধ্বংসাত্মক এবং গঠনমূলক—উভয় প্রকারের। যাহা কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বা যুক্তিবাদের বিরোধী তাহারই ধ্বংস সাধন করিয়া এক যুক্তিভিত্তিক নূতন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব-সমাজকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়াই ছিল যুক্তিবাদ তথা জ্ঞানদীপ্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির মূল কথা ছিল ধর্মের নামে যে অত্যাচার-অবিচার চলিত তাহা বন্ধ করা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতার মনোভাব জাগাইয়া তোলা, অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদের প্রয়োগ করা।

সমালোচনার মনোবৃত্তি

এই যুক্তিবাদ (rationalism)-এর বিকাশ-সাধনে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিকদের অবদান ছিল অপরিসীম। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গবেষণা শুরু হইয়াছিল তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার আবিষ্কারের মাধ্যমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা সকল প্রকার বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই উৎকর্ষের পশ্চাতে স্যার আইজাক্ নিউটন (Sir Isaac Newton), এডমাণ্ড্ হেইলি (Edmand Halley), টোরিসেলি (Toricelli), অটো ফন্ গেরিক (Otto Von Guericke), রবার্ট বোয়েল (Robert Boyle), যোসেফ্ ব্ল্যাক (Joseph Black),

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণ

হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ (Henry Cavendish), জেমস্ হাটন (James Hutton), ম্যালপিঘি (Malpighi) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মৌলিক আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

দার্শনিকগণ

বৈজ্ঞানিকদের যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসা সমসাময়িক দার্শনিকদের মধ্যে যুক্তিবাদের ব্যাপকতর প্রয়োগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। রেণে ডেকার্টে (Rene Descartes), হবস্ (Hobbes), লক্ (Locke), বারুচ্ স্পিনোজা (Baruch Spinoza), হিউম (Hume), কাণ্ট (Kant) প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদীপ্তির প্রসার

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণই যে কেবল জ্ঞানদীপ্ত হইয়াছিলেন, এ-কথা মনে করা ভুল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাতগণ, কৃষি-আশ্রয়ী বর্ধিষ্ণু ভদ্রসমাজ, অধ্যাপক, যাজক সম্প্রদায়, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী—প্রত্যেকেই জ্ঞানদীপ্ত হইয়া উঠিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এমন কি, স্বৈরাচারী রাজগণও জ্ঞানদীপ্ত হওয়া শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। ফলে সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, জাতীয়তাবাদ—সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির গভীর প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির ফল পরিলক্ষিত হইল সেই যুগের ব্যঙ্গাত্মক ও রোমাণ্টিক রচনার মধ্যে। ধর্মের ক্ষেত্রে উহা পরধর্মসহিষ্ণুতা, মানবতা ও প্রাকৃতিক ধর্ম বা Deism প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইল। যোহান সিবাস্টিয়ান ব্যাচ্ (Johan Sebastian Bach), মোজার্ট (Mozart) সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করিলেন। ভল্‌টেয়ার নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বহুমুখী রচনার দ্বারা ইওরোপে জ্ঞানদীপ্তির প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইরাসমাস।* অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের চরম বিকাশ ও জয়লাভ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।† বিভিন্ন সমাজবিদ্যার মধ্যে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও ঐতিহাসিক দলিল-ভিত্তিক আলোচনার নীতি সেই সময়ে ঐতিহাসিকদের রচনায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইতালীয় অধ্যাপক ভিকোর (Vico) নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক হার্ডার (Harder) অবশ্য ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন এড্‌ওয়ার্ড গিবন্ (Edward Gibbon)। তাঁহার 'Decline and Fall of the Roman Empire' ইতিহাস-সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি। আইনশাস্ত্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে মণ্টেস্কুর (Montesquieu) 'The Spirit

সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি—সর্বত্র জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

সিবাস্টিয়ান, মোজার্ট, ভল্‌টেয়ার, ভিকো, হার্ডার, গিবন্, মণ্টেস্কু, লক্, রুশো

*"——was much as the literary arbiter of Europe in the age of enlightenment as Erasmus had been in the age of Humanism." Hayes, p. 397.

† "This century (18th) begins to see the triumph of reason.:" Voltaire to Helvetius, *New Camb. History*, vol. vii, p. 112.

of the Laws' ও বেক্কারিয়ার (Beccaria) 'On Crimes and Punishment' উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি সম্পর্কে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি মিল্‌টনের প্রচারপত্র, হব্‌স্‌-এর রচনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্‌, রুশো প্রভৃতির রচনা জ্ঞানদীপ্তির প্রসার-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। অর্থনীতিতে অ্যাডাম্‌ স্মিথের 'Wealth of Nations' চিরাচরিত অর্থনৈতিক ধারণার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দান করিয়াছিল। যুক্তিবাদের ও জ্ঞানদীপ্তির প্রসার ইওরোপে জনমতের (Public Opinion) সূচনা করিতে লাগিল।

জনমতের সূচনা

শাসনব্যবস্থাকে আধুনিক রূপ দিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ কতকগুলি প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পূর্বে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না, স্বৈরাচারী জ্ঞানদীপ্ত রাজগণ মহাফেজখানা স্থাপন করিয়া সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্রাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। পূর্বে রাজকর্মচারীরা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনের পারিশ্রমিক জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। জ্ঞানদীপ্ত রাজগণ রাজকর্মচারীদের মাসিক মাহিনা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাজ না করিয়া যে-সকল লোক সরকার হইতে পেনশন পাইত, সেই সকল লোককে অপসারণ করিয়া, সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং বাৎসরিক বাজেট তৈয়ার করিয়া সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এই সকল রাজা প্রশাসন ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা করিয়াছিলেন। আদমশুমারি, ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের জন্য জমি জরিপ করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, দেশী ও বৈদেশিক সংবাদপত্র হইতে কারিগরি, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক খবরাখবর সংগ্রহ এবং সেগুলি কাজে লাগান প্রভৃতি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের আমলে চালু হইয়াছিল।

শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

জ্ঞানদীপ্তির প্রসার (Spread of Enlightenment): অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপে এক অভূতপূর্ব জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটে। রক্ষণশীল চিন্তাধারায় ধর্মই ছিল সব কিছুর মূল আধার। কিন্তু জ্ঞানদীপ্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্র যুক্তিবাদ দখল করিয়া বসিল। রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী ও সমালোচনার মনোবৃত্তি তখনও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে নূতন নূতন বিষয়ে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই সমালোচনার মনোবৃত্তির সহিত দার্শনিক ধারণার সংমিশ্রণে এক নূতন মানসিক উৎকর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিক্ষেত্রেই চিন্তাজগতের এই নূতন প্রভাব জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণকেও প্রভাবিত করিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাদের জনকল্যাণের চেষ্টায়। এ-বিষয়ে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক (The Great), রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ, স্পেনের তৃতীয় চার্লস, পোর্তুগালের যোসেফ, টাস্কেনির লিওপোল্ড ও সুইডেনের তৃতীয় গাস্টাভাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই প্রজাহিতৈষী

নূতন চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদ

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ

রাজগণ ছিলেন স্বৈরাচারে বিশ্বাসী। তাঁহাদের সংস্কারমূলক কার্যাদিতে জনমতের বা জনসাধারণের কোন অংশ ছিল না। স্বৈরাচারী রাজগণ উপর হইতে সংস্কার জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। স্বভাবতই তাঁহাদের সংস্কারের প্রতি জনসাধারণের কোন সহানুভূতি ছিল না। তাঁহাদেরই বিফলতাকে ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজনের স্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইওরোপের এইরূপ পরিস্থিতিতেই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল।

অধ্যায় ২

প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার
(Benevolent or Enlightened Despotism)

প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার (Benevolent or Enlightened Despotism) : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপে যে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মনীষীদের উপরই প্রভাব বিস্তার করে নাই, অভিজাত শ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় এমন কি, স্বৈরাচারী শাসকবর্গের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের রাজনৈতিক ধারণা : "রাষ্ট্রই সব কিছু, জাতি কিছুই নহে'

ফলে, ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইওরোপে এক নূতন রাজনৈতিক ধারণার সৃষ্টি হয় ; এই নূতন রাজনৈতিক ধারা বা মতবাদ অনুসারে "রাষ্ট্রই হইল রাজনৈতিক জীবনের সব কিছু, জাতি অর্থাৎ দেশের জনসমাজ কিছু নহে।"* রাষ্ট্ররক্ষা এবং রাষ্ট্রের জন্যই জাতি, জাতির জন্য রাষ্ট্র নহে। এইরূপ রাষ্ট্রে রাজা হইলেন সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষমতা জনগণের উপকারার্থে ব্যবহার করিবেন। জনগণের উপকার সাধনই হইল তাঁহার সর্বাত্মক ক্ষমতার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজা বংশপরম্পরায় রাজ্যশাসন করিবেন ; আইনত এবং কার্যত তাঁহার ক্ষমতা হইবে অসীম ও অপ্রতিহত, কিন্তু তিনি জাতির সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।† প্রজাবর্গের হিতসাধন হইল তাঁহার রাজকার্যের চরম উদ্দেশ্য। এই

বংশানুক্রমিক রাজত্ব : জনকল্যাণ একমাত্র লক্ষ্য

মতবাদে বিশ্বাসী রাজগণ সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই তখনকার যুক্তিবাদে বিশ্বাস করিতেন। প্রজাহিতৈষী রাজগণের পূর্বে রাজতন্ত্রের শক্তি ছিল ধর্মের উপর নির্ভরশীল। রাজগণের ক্ষমতা তখন ছিল ভগবান-প্রদত্ত। কিন্তু এখন রাজগণের মধ্যে শাসনকার্য, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যুক্তিদ্বারা পরিচালনার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম, শিক্ষা, সাধারণ জীবন—

যুক্তির দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র

সর্বত্রই নূতন যুক্তিসম্মত সংস্কারের প্রয়োজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজগণ উপলব্ধি করিলেন। জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করিবার অর্থাৎ শাসনকার্যে জনসাধারণকে অংশ

* "The State was everything, the nation nothing." Morse stephens : *Revolutionary Europe*, p. 4.

† "Their Government would be for the people, but not by the people." Hayes, p. 419.

দিবার যুক্তি উপলব্ধি করিলেন না। প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই তাহাদের উপর রাজত্ব করিবার নৈতিক দাবি করা যাইতে পারিবে, এই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। প্রজার মঙ্গল কিভাবে সাধিত হইবে তাহা একমাত্র স্বৈরাচারী রাজগণই স্থির করিবেন, জনসাধারণের এ-বিষয়ে কোন মতামত থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা মনে করিতেন না। জনসাধারণকে শাসনকার্যের অংশ দিবার মধ্যে কোন যুক্তি আছে, এই কথাও তাঁহারা স্বীকার বা বিশ্বাস করিতেন না। প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজগণের মধ্যে অনেকে সমসাময়িক দার্শনিকদের সহিত পত্রালাপ করিতেন এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিও পাঠ করিতেন।

জনসাধারণ কল্যাণকর শাসনাধীন, কিন্তু শাসনকার্যে অংশগ্রহণে বঞ্চিত

সমসাময়িক দার্শনিকদের সহিত যোগাযোগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মধ্যে প্রাশিয়ার রাজা মহান ফ্রেডারিক (Frederick the Great) ছিলেন অন্যতম প্রধান। ফ্রেডারিক অল্প বয়স হইতেই বিজ্ঞান, দর্শন, ফরাসী সাহিত্য, চারুশিল্প, সমালোচনা গ্রন্থ ইত্যাদির প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রাজার কর্তব্য সম্পর্কে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি করিয়া প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের ধারণার সম্প্রসারণ সাধন করেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক'* বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার জনকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়াছিল।

ফ্রেডারিকের প্রজাহিতৈষণা : রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক'

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্ (Joseph II) ভল্‌টেয়ার ও রুশোর রচনার অনুরাগী ছিলেন। যুক্তিবাদ ও সংস্কার—এই দুই ছিল তাঁহার কর্মজীবনের মূল সূত্র। সমসাময়িক দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একই সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি মানুষের ক্ষমতার যে একটি সীমা আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সংস্কার বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে-সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্

স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস্ ছিলেন অপর একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। স্পেন ও স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশসমূহের শাসনব্যবস্থাকে তিনি খুবই কার্যকরী করিয়া তোলেন।

স্পেনের তৃতীয় চার্লস্

* "The monarch is not the absolute master, but only the first servant of the state"—quoted by Hayes, p. 419.

পোর্তুগালের রাজা প্রথম যোসেফ্ নিজে কেবলমাত্র একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারীই ছিলেন না, তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তিনি অর্থ আদায় করিয়া মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পোর্তুগালের রাজা প্রথম যোসেফ্

রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। 'বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia) প্রণেতা ডেনিস ডিডেরো (Denis Diderot) ও অন্যান্য বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার সভায় সাদরে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির দ্বারা তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ

রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, স্পেনের তৃতীয় চার্লস্, পোর্তুগালের প্রথম যোসেফ্, অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় যোসেফ্ ও প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট ভিন্ন সুইডেনের রাজা তৃতীয় গাস্টাভাস ও টাস্কেনির লিওপোল্ড প্রভৃতিও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই জনস্বার্থবৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কাজ করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশদানের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। এই রাজগণ নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ হেতু এবং এতকালযাবৎ প্রজাদের উপকারার্থে কোন কিছুই করা হয় নাই বলিয়া অনুশোচনার ফলে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ প্রজাদের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকার্য সম্পাদন করেন। এজন্য তাঁহাদের শাসন 'অনুতপ্ত রাজতন্ত্র' (Repentant monarchy) নামে পরিচিত।

রাশিয়া : ক্যাথারিণ, স্পেনঃ তৃতীয় চার্লস্, পোর্তুগাল : প্রথম যোসেফ্, অস্ট্রিয়া : দ্বিতীয় যোসেফ্, প্রাশিয়া : ফ্রেডারিক দি গ্রেট, টাস্কেনিঃ লিওপোল্ড, সুইডেন : গাস্টাভাস

অনুতপ্ত রাজতন্ত্র (Repentant monarchy)

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সমালোচনা (Criticism of Enlightened Despotism) : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারকে কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা হিসাবে অনেকেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের মন্ত্রী ও পদস্থ কর্মচারীদের জ্ঞানদীপ্ত ধ্যান-ধারণাকে গোপনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। এইসব ধ্যান-ধারণাপ্রসূত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন।

আন্তরিকতার অভাব

একথাও সত্য যে, শিক্ষিত সমাজের সমর্থন লাভের জন্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁহাদের কার্যকলাপের প্রচার করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

তাঁহাদের প্রচার ও প্রকৃত কাজে অনেক পার্থক্য ছিল। কারণ তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা ছিল পূর্ণমাত্রায় দমনমূলক। গোপন পুলিশী-ব্যবস্থা, বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করা আগের মতই চলিতেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) বলিতে যাহা বোঝায় তাহা তাঁহাদের নীতিতে স্বীকৃত ছিল না। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁহারা মূলত নিজেদের বাস্তব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকটিই দেখিয়াছিলেন এবং আংশিকভাবে প্রজাহিতৈষণা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। অবশ্য রাজস্ব, কর-ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাঁহারা সমসাময়িক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

দমনমূলক শাসন

প্রজাহিতৈষণা অপেক্ষা নিজেদের সুযোগ বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ

কেহ কেহ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণকে 'দার্শনিক-রাজা' (Philosopher-King) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। কারণ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ, যেমন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, দ্বিতীয় ক্যাথারিণ প্রভৃতি সমসাময়িক সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ এই সামন্তদের সাহায্য-সহায়তার উপরই তাঁহাদের ক্ষমতা নির্ভরশীল, একথা তাঁহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফের যুক্তিবাদী সংস্কারের বিফলতাও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে।

সামন্ততন্ত্রকে আঘাত না করিবার ইচ্ছা

জ্ঞানদীপ্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্কে মতান্তরের সূচনা। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনবিধি রচনার দাবি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ত শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরোধিতা এবং স্বৈরাচারী শাসনের কঠোরতা হ্রাস প্রভৃতি ছিল জ্ঞানদীপ্তি প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ফল।

রাষ্ট্র ও চার্চের মতান্তর

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, মধ্য-জার্মানিতে জ্ঞানদীপ্তির ফল হিসাবে সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। দ্বিতীয় যোসেফ যে-সকল যুক্তিবাদী সংস্কার চালু করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিলেন সেই সকল সংস্কার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আন্দোলন এবং অস্ট্রিয়ার গোপন-পুলিশের দমন-নীতির বিরোধিতা জ্ঞান-দীপ্তির ফল হিসাবেই শুরু হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কৃষক, ছাত্রসমাজ ও শহরের মজুর শ্রেণীর জাগরণ জ্ঞানদীপ্তির প্রসারের পরোক্ষ ফল হিসাবে বিবেচ্য। এই সকল অধিকারহীন সমাজ দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কারে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সামাজিক ও রাজ-নৈতিক মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুক্তির ইচ্ছাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র।*

জ্ঞানদীপ্তি প্রসারের ফলাফল

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের ত্রুটি (Defects of Enlightened Despotism): (১) প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক

---

* Vide, *The New Camb. Modern History*, vol. viii, pp. 17-21.

অনুষ্ঠিত সংস্কার জনগণ সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ তাঁহাদের প্রজাবর্গের মতামতের ধার ধারিতেন না। নিজেদের ইচ্ছামত সংস্কার সাধন করিলেই প্রজাবর্গের উপকার হইবে, এই ছিল তাঁহাদের ধারণা।

জনসাধারণের সন্দেহ

জনসাধারণকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দানে তাঁহারা রাজী ছিলেন না। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্থান ছিল না, যে-শাসনাধীনে এতকাল যাবৎ তাহারা অত্যাচারিত হইয়া আসিয়াছে, সেই শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতই তাহাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইত।

স্থায়ী সংস্কারের অভাব

এই সকল সংস্কারের পশ্চাতে কোনপ্রকার দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে, এইরূপ ধারণাও জনসাধারণের মনে যে জাগিত না, এমন নহে। এই কারণে প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার কোন স্থায়ী সংস্কারসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই। (২) ইহা সামন্ত-প্রথার্জনিত নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা ও অভিযোগ দূর করিয়া পুরাতন কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। (৩) জ্ঞানদীপ্ত

বৈদেশিক যুদ্ধনীতি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিকূল

স্বৈরাচারী রাজা মাত্রেই তদানীন্তন রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ছিল রাজবংশের মর্যাদা-বৃদ্ধির প্রধান উপায়। স্বভাবতই তাঁহারা তাঁহাদের সংস্কারনীতিকে সম্পূর্ণ কার্যকরী বা ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। (৪) ব্যাপক সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য মানসিক প্রস্তুতির যে প্রয়োজন আছে, সেকথা স্বৈরাচারী রাজগণ উপলব্ধি করেন নাই। ফলে তাঁহাদের সংস্কারাদি জনসাধারণ সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

(৫) সর্বশেষে জ্ঞানদীপ্ত, স্বৈরাচারী রাজগণ যে-সকল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতভাবে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে দীর্ঘকালের চেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু

উত্তরাধিকারিগণের ত্রুটি

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণের উত্তরাধিকারিগণ সেই ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি করিয়াছিলেন। স্বভাবতই জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার এক সাময়িক রাজনৈতিক ধারণা হিসাবে প্রচলিত ছিল এবং আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। জ্ঞানদীপ্ত

সামন্ত-প্রথার্জনিত দোষত্রুটি দূর করিতে অসমর্থ : ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন

স্বৈরাচারের বিফলতার মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিলে ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ত দূর হইত।

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী (The Best Enlightened Despot) : অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী, তাঁহার প্রজাহিতৈষণা, জনকল্যাণার্থে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার সংস্কারকার্যাদির

মধ্যে (১) বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেজন্য নিম্নস্তরের আদালতগুলি হইতে ছয়টি বিভিন্ন আঞ্চলিক আপিল আদালতে আপিল করিবার এবং সর্বোপরি ভিয়েনা শহরে সুপ্রীমকোর্টে চূড়ান্ত আপিল করিবার অধিকার তিনি প্রজাবর্গকে দিয়াছিলেন, (২) বাধ্যতামূলক সামরিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, (৩) জার্মান ভাষাকে সর্বত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীকে ভাষার দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ করা, (৪) ধর্ম ব্যাপারে সহিষ্ণুতার আইন পাস এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দান করা, (৫) চার্চের উপর পোপের প্রাধান্যের স্থলে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করা, (৬) সার্ফ অর্থাৎ ভূমিদাস প্রথার অবসান করা, (৭) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার সাধন, (৮) বেগার খাটাইবার নিয়ম নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি সংস্কার চালু করিয়া যোসেফ্ তাঁহার জ্ঞানদীপ্তির পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার অভাব ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা তাঁহার বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি আদর্শ, কর্ম-প্রচেষ্টা, জনকল্যাণের প্রকৃত ইচ্ছা—ইত্যাদির দিক দিয়া বিচার করিলে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় যোসেফ্‌কেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কার জনসাধারণের মনে কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা জাগাইতে পারে নাই। কোনপ্রকার সংস্কার কার্যকরী করিতে জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এজন্য জনসাধারণের মধ্যে সংস্কার গ্রহণ করিবার মত মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার জন্য মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় যোসেফ্ তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে সেই মানসিক প্রস্তুতিরও ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে, তাঁহার সংস্কারের মূল্য কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার সংস্কারের অনেক কিছুই পরবর্তী কালে আধুনিক দেশমাত্রেই গৃহীত হইয়াছে।

অস্ট্রিয়ার যোসেফ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজা

অধ্যায় ৩

ফরাসী বিপ্লব

(The French Revolution)

ইওরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯—১৮১৫) এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির বর্তমান ধারণা এবং বর্তমান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে রূপলাভ করিয়াছে। সর্বাত্মক রাজশক্তির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থের পার্থক্য, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা—সব কিছুই ফরাসী বিপ্লব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের মূল্যবান অবদান।

ফরাসী বিপ্লবের যুগ: গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution): এই যুগান্তকারী বিপ্লব কোন একটি বিশেষ কারণে, অথবা কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে সংঘটিত হয় নাই। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নানাবিধ অভিযোগ ফরাসী বিপ্লবে রূপলাভ করিয়াছিল। ইহার গতি কোন একটি ধারায় সীমাবদ্ধ ছিল না, প্লাবনের ন্যায়ই ইহা এক দুর্জয় শক্তি লইয়া গতানুগতিকতার সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি স্বভাবতই যেমন ছিল বিভিন্ন ধরনের তেমনি ব্যাপক।

ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন ও ব্যাপক কারণ

রাজনৈতিক: বিপ্লবের জন্য ফরাসী রাজতন্ত্রের দায়িত্ব (Political Responsibility of the French Monarchy for the Revolution): রাজশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল রিশলুা, ম্যাজারিণ, কলবেয়ার ও চতুর্দশ লুই-এর চেষ্টায় গঠিত এক সমৃদ্ধশালী, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। সমসাময়িক কালের অপরাপর দেশের তুলনায় চতুর্দশ লুইয়ের আমলের ফরাসী রাজ্য ছিল আয়তনের দিক দিয়া বিশাল, জনবহুল, বিত্তশালী ও সামরিক দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে ছিল সর্ববৃহৎ, শিল্পে, বিশেষভাবে ক্ষুদ্র শিল্পেও ফ্রান্স ছিল অগ্রণী, এবং অপরাপর দেশের কৃষকদের তুলনায় ফরাসী কৃষক ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ।* ফরাসী মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক সমৃদ্ধি তাহাদিগকে প্রচলিত সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধনে উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে বিপ্লবী মনোবৃত্তি তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা চাহিয়াছিল সংস্কার, পরিবর্তন,

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স—সমৃদ্ধশালী স্বৈরাচারী অষ্টাদশ শতাব্দীতে—পতনোন্মুখ রাষ্ট্র

* *The New Cambridge Modern History*, vol. viii, p. 59

অগ্রসরতা। অথচ চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে স্বৈরতন্ত্র চরমে পৌঁছিলেও উহা ছিল এক অতি সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা যাহা গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির স্বাভাবিক আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল অকর্মণ্য রাজা পঞ্চদশ লুই, রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব্ অর্লিয়েন্স, ম্যাডাম ডি পম্পাডোর, দুর্বলচেতা ষোড়শ লুই প্রভৃতির দ্বারা শাসিত ও প্রভাবিত এক পতনোন্মুখ রাষ্ট্র।

প্রাথমিক স্তরে রক্ষণশীল ও বিপ্লববাদী উভয় দল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী

তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে রক্ষণশীল অংশ এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী অংশ উভয়ই ফ্রান্সে রাজতন্ত্র কায়েম থাকুক এই ইচ্ছা পোষণ করিত। রক্ষণশীলরা যেমন উদারনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না তেমনি বিপ্লববাদীরাও ব্যাপক উদারনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না। কোন পক্ষই ফ্রান্স হইতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হউক তাহা চাহে নাই।* এমন কি, বিপ্লববাদীরাও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে-ই বিশ্বাসী ছিল। তাহারা চাহিয়াছিল সেই রাজতন্ত্র জ্ঞানদীপ্ত (Enlightened) আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করুক, জনসাধারণের স্বার্থে, মধ্য-যুগীয় কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান, নীতি বা প্রভাব-মুক্তভাবে এবং কায়েমী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিয়া শাসন পরিচালনা করুক। সেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হইবে না, এবং আইনের শাসন চালু রাখা, শোষণ বা অত্যাচার না করিয়া ন্যায্য রাজস্ব আদায় করা, সেনা, নৌ ও পুলিশ বাহিনী পরিচালন করা এবং বিচার কার্য নির্বাহ করা—এই কয়টি কর্তব্যের মধ্যে নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখিবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের মূল লক্ষ্য-ই হইয়া পড়িল ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান। কারণ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সব কিছুর অধঃপতনের জন্য ফরাসীরাজের স্বৈরাচারী শাসনকেই দায়ী মনে করা হইয়াছিল।†

ঘটনাপ্রবাহে ফরাসী-রাজকে অপসারণ ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্য

রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী ও ভগবান-প্রদত্ত রাজশক্তিতে বিশ্বাসী

ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী, জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা বা জনমতের স্থান উহাতে স্বভাবতই ছিল না। রাজা ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার উপর নিজের স্বৈরাচারী শাসন নির্ভরশীল মনে করিতেন, স্বভাবতই মরণশীল মানবসমাজের নিকট তাঁহার জবাবদিহির কোন প্রশ্নই ছিল না। রাজার ব্যক্তিত্ব ও শাসন-দক্ষতার সহিত এইরূপ উচ্চ ধারণা যতদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিল ততদিন পর্যন্ত রাজা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাজগণের স্বৈরাচার-প্রীতি থাকিলেও শাসন দক্ষতা মোটেই ছিল না। চতুর্দশ লুই-এর পরবর্তী রাজগণের শাসনকার্যের অক্ষমতা তাঁহাদের স্বৈরাচারী নীতিকে নিছক অত্যাচারে পরিণত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। ফরাসী রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন

চতুর্দশ লুই-এর পরবর্তী রাজগণের স্বৈরাচার-নীতি অত্যাচারে পরিণত

---

* *Ibid*, p. 592.

† *Europe Since Napoleon*. p. 5 . David Thomson.

অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ত্রুটি ছিল ফরাসী প্রশাসন ব্যবস্থায় এক শ্রেণী কায়েমী স্বার্থভোগী আমলার স্বৈরাচারী ও যথেচ্ছাচারী কার্যকলাপ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা প্রজাহিতৈষী, জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন তাঁহারা ফরাসী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এবং যে-সকল বাধা-নিষেধ ফ্রান্সের কৃষি ও বাণিজ্যের অগ্রসরতার পরিপন্থী ছিল সেগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমলাতন্ত্রও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দক্ষ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কর্মকুশলতা সত্ত্বেও যেটুকু সংস্কার সাধন করা সম্ভব হইয়াছিল প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থাৎ তখনকার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহা ছিল অকিঞ্চিৎকর। রাজা পঞ্চদশ লুই ছিলেন তখনকার ফরাসী সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন, স্বভাবতই কায়েমী স্বার্থের সহিত যখনই সুদক্ষ আমলা বা মন্ত্রীর সংস্কার নীতির সংঘাত বাধিত তখনই তিনি সংস্কার কার্যকরী করিবার সাহস প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। ফলে পুনঃ পুনঃ সংস্কার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং মন্ত্রিগণ পর পর পদচ্যুত হইয়াছিলেন। কোন মন্ত্রীই পরের দিন স্বপদে বহাল থাকিবেন কিনা সে-বিষয়ে নিঃসন্দিহান ছিলেন না।* ইংলণ্ডে যে-সময় নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আইনের প্রতি প্রশাসকদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, ফ্রান্সে সেই সময়ে রাজা এবং প্রশাসকগণ আইন কানুনের ধার না ধারিয়া নিজেদের ইচ্ছামত চলিতেছিলেন।† ইহা ভিন্ন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফরাসী পরাজয় এবং ইউট্রেক্ট্-এর সন্ধি দ্বারা সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ফরাসী রাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তদুপরি সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য যেমন বিলুপ্ত হইয়াছিল তেমনি ফরাসী রাজতন্ত্রের মর্যাদাও ফরাসী জাতির নিকট হ্রাস পাইয়াছিল এবং ফ্রান্সের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। আন্তর্জাতিক এবং সামরিক প্রাধান্যের মাধ্যমে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ফরাসী রাজতন্ত্র যে-প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামরিক পরাজয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়া ফ্রান্স সমুদ্রযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা আরও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণী পুনরায় রাজসভায় প্রাধান্যলাভ

রাজা ও প্রশাসকদের আইন-কানুন লঙ্ঘন

প্রজাহিতৈষী কতিপয় সংখ্যক আমলার সংস্কার চেষ্টা

রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন

সামরিক মর্যাদা ও প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত

কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল, অমিতব্যয়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত

* "Time and time again reforms were attempted, only to be dropped ; ministers were dismissed at frequent intervals and no one was sure of office from one day to the next." *Ibid*, p. 593.

† Vide, *Camb. Modern History*, vol, viii, p. 45.

এবং শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলে ভার্সাই-এর রাজসভা প্ৰবর্ব গৌরব হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। দ্ববর্বল রাজশক্তি রাজকর্ম-চারীদের স্ববশে রাখিতে সমর্থ হইল না। রাজকর্মচারিবর্গের শাসন-ক্ষমতা ও সরকারী বিভাগগ্বলির ক্ষমতার কোন স্বস্পষ্ট বিভাজন ছিল না, ফলে একই কাজ একাধিক বিভাগ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারিবৃন্দ করিত বলিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দেশের সর্বত্র কার্যকরী হইত না। বিচার-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবনতি ঘটিয়াছিল। বিচার যেমন ছিল ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি ছিল দ্বর্নীতিগ্রস্ত। বংশান্বক্রমে যাঁহারা বিচারকের পদ লাভ করিতেন তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ন্যায়-অন্যায়ের ধার না ধারিয়া জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি দিয়া বিচারকগণ নিজেদের আয়ের পথ প্রশস্ত করিতেন। একাধিক বিচারালয় একই মামলার বিচার অধিকার দাবি করিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে নিছক স্বার্থ-দ্বন্দ্বে পরিণত করিয়াছিল। আইনের চক্ষে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সমমর্যাদা পাইত না। শাস্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধের গ্বর্বত্বের অন্বপাতে বহ্বগ্বণে কঠোর হইত। রিশ্লব্য, ম্যাজারিণ প্রভৃতি স্বদক্ষ শাসকদের আমলে অভিজাত সম্প্রদায় রাজশক্তির পদানত হইয়াছিল, কিন্তু রাজশক্তির দ্ববর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজ ক্ষমতা প্বনর্দ্ধার করিয়া লইলে রাজা তাহাদের ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন।

বিচার-ব্যবস্থা পঙ্গু: বিচারের নামে অবিচার

রাজা অভিজাতগণের ক্রীড়নকে পরিণত

রাজসভার যে-কোন সদস্য ব্যক্তিগত শত্রুকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে 'লেত্রি দ্য কেশে' (Lettres de Cachet) নামক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রাজার স্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লইত। বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করা, হিংসা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহাকে খ্বশি আটক রাখা তখন-কার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। বাস্তিল দ্বর্গ (Bastille) এইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তিদের কারাগারে পরিণত হইল। রিশ্লব্য কর্তৃক নিযুক্ত 'ইনটেন্ডেন্ট' (Intendant) নামক কর্মচারী শ্রেণী এখন রাজস্ব-অপহারী 'স্বার্থলোল্বপ নেকড়ে বাঘ' (Ravening wolves)-এ পরিণত হইল। স্বভাবতই বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ল্বপ্ত Lettres de Cachet

ইনটেন্ডেন্টগণ 'স্বার্থলোল্বপ নেকড়ে বাঘ'-এ পরিণত

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই ব্বঝিতে পারা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী রাজতন্ত্র ফরাসী জাতিকে শাসন করিবার নৈতিক অধিকার (moral competence) সম্পূর্ণভাবে হারাইয়াছিল। সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই—কেহই সক্ষম ছিলেন না। ফলে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি রাজশক্তির দ্ববর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হইয়া উঠিল। চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধনীতি, পঞ্চদশ লুই-এর অমিতব্যয়িতা, ষোড়শ লুই-এর অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যকরী করিবার অক্ষমতা এবং সর্বশেষে আমেরিকার স্বাধীনতা-

ফরাসী রাজতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার নৈতিক অধিকার লোপ
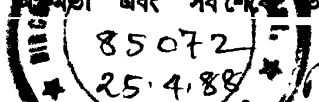
যুদ্ধে যোগদান ও অর্থ-সাহায্যদানের ফলে ফরাসী রাজকোষ কপর্দকশূন্য এবং ফরাসী সরকার দারুণ ঋণভারে ন্যুব্জ হইয়া পড়িল। ফরাসী রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী ক্ষমতার মূল ভিত্তি—পরিপূর্ণ রাজকোষ হারাইয়া এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া জাতির শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহা কোন সচেতন রাজনৈতিক মতবাদের ফলে ঘটে নাই। উহা ফরাসী রাজতন্ত্রের উপর নানাবিধ কারণের সমষ্টিগত প্রভাবের ফলেই ঘটিয়াছিল।

ফরাসী রাজকোষ কপর্দকশূন্য

যেমন, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিপ্লব ইংরেজ জাতির মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিল তেমনি ইংলণ্ডের হস্তে চতুর্দশ লুই-এর পরাজয় ফরাসী রাজতন্ত্রের মর্যাদা হ্রাস করিয়াছিল। ইংলণ্ডে যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাতে স্বভাবতই ফরাসী জাতির দৃষ্টি ইংলণ্ডের উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজ রাজতন্ত্রের তুলনায় ফরাসী রাজতন্ত্র দুর্বলতর, পশ্চাৎপদ এবং মর্যাদাহীন বলিয়া ফরাসী জাতির নিকট স্বভাবতই প্রতীত হইয়াছিল।*

ইংলণ্ডের তুলনায় ফরাসী রাজতন্ত্রের অপকর্ষতা

সামাজিক (Social) : ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং প্যারিস ছিল ইওরোপের সর্ববৃহৎ নগর এবং সর্বাধিক সুশিক্ষিত ও জনবহুল। অপরাপর ইওরোপীয় দেশের ন্যায় ফ্রান্সের সমাজও প্রধানত 'বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত' (Privileged) এবং 'অধিকারহীন' (Non-privileged)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায়। যাজকগণকে প্রথম সম্প্রদায় (First Estate) ও অভিজাতগণকে দ্বিতীয় সম্প্রদায় (Second Estate) বলা হইত। (২) অধিকারহীন শ্রেণী ছিল সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত (Third Estate)। এই তৃতীয় শ্রেণী বুর্জোয়া (Bourgeoisie) বা মধ্যবিত্ত এবং menu peuple (little people) অর্থাৎ সাধারণ লোকদের লইয়া গঠিত ছিল। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত অংশে ছিল ব্যাংকের মালিক, দালাল, শিল্পোৎপাদক, বণিক, ম্যানেজার, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, গ্রন্থকার, বার্তাজীবী, সংবাদপত্র পরিচালক ও মালিক প্রভৃতি ; আর সাধারণ লোকেদের মধ্যে ছিল প্রলিটেরিয়েট্ অর্থাৎ শ্রমজীবী, কৃষক, পরিবহনে কর্মরত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি।†

সমাজের দুই শ্রেণী—(১) অধিকারপ্রাপ্ত ও (২) অধিকারহীন
প্রথম শ্রেণী—যাজকগণ ও অভিজাতগণ, দ্বিতীয় শ্রেণী—সাধারণ লোক

* *The New Cambridge Modern History,* vol.vii p. 102.

† "The Third Estate (*Tier Etat*) included the bourgeoisie or middle class, with its 100,000 families and its many layers—bankers, brokers, manufacturers, merchants, managers, lawyers, physicians, scientists, teachers, artists, authors, journalists, the press…and the *menu peuple,*—the little people, sometimes called 'the people' consisting of the proletariat and tradesmen of the towns and transport workers on land or Sea and the peasantry". *The Age of Napoleon,* p. 5. Will and Ariel Durant.

ফরাসী অভিজাত শ্রেণী নানাপ্রকার অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। তাহারা কোন প্রত্যক্ষ কর দিত না, সামাজিক মর্যাদা, শিকার-করা ও অন্যান্য অভিজাতসুলভ আমোদ-প্রমোদে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল সত্য, কিন্তু ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের অধিবেশন স্থগিত হইবার সময় হইতে তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার আর ছিল না। আইন প্রবর্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে অভিজাত শ্রেণী অবদমিত ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের আমলে তাহারা নিজেদের অধিকার পুনরায় সদম্ভে ভোগ করিতে শুরু করে। রাজসভায় তাহারা নিজেদের উপস্থিতি দ্বারা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে অপহৃত প্রভাব ও মর্যাদা পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু তাহাদের চিরাচরিত দম্ভ ও উন্নাসিকতা সাধারণ লোকেদের যেমন ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল, তেমনি তাহাদিগকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, তাহাদের বিশাল ভূ-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের মঙ্গল দেখা অপেক্ষা নিজেদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়োজনে যথাসম্ভব অর্থ প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করা তাহাদের চিরাচরিত রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং আত্মম্ভরিতা, বিচ্ছিন্নতা, রূঢ় ব্যবহার অভিজাতবর্গকে জনসমাজের কাছে ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

অভিজাত শ্রেণীর অবৈধ অধিকার ভোগ

যাজক সম্প্রদায়ও উর্ধ্বতন যাজক ও অধস্তন যাজক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উর্ধ্বতন যাজকগণ ছিল যেমন বিত্তশালী তেমনি রাজানুগ্রহ-ভোগী। অধস্তন যাজক ছিল দরিদ্র এবং উর্ধ্বতন যাজকসমাজে অপাংক্তেয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছিল।

যাজকগণের দুই ভাগ: উর্ধ্বতন—ধনী ও অধস্তন—দরিদ্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর উপরের অংশ ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যাহারা 'বুর্জোজি' (Bourgeoisie) নামে পরিচিত ছিল। বুদ্ধি, বিদ্যা ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা ইহারা ছিল বহু উর্ধ্বে। এই সম্প্রদায়ের অনেকেরই অর্থবল অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অপেক্ষা বেশি ছিল। স্বভাবতই তাহারা অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাভোগ সহজ মনে গ্রহণ করিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায় সরকারী যাবতীয় কাজকর্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত বটে, কিন্তু রাজস্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতিশীল অথচ রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত এই তৃতীয় শ্রেণীর উপরাংশ অর্থাৎ বুর্জোজি বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক মর্যাদা নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার চেষ্টা শুরু করিলে বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠে। তাহারা দেখিল ফরাসী ধর্মাধিষ্ঠানের যাজকগণ বিশাল পরিমাণ সম্পদের মালিক, ফ্রান্সের মোট ভূ-সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ তাহাদের অধিকারে অথচ

তৃতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধে শ্রেষ্ঠ

রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব একমাত্র তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত

তাহারা সরকারকে কোন প্রকার কর দেয় না। স্বভাবতই তাহারা প্রশ্ন তুলিল যাজক সম্প্রদায় কেন কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। ইহা ভিন্ন, দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে অভিজাত বা যাজকদের কোন অবদান নাই। তাহা একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীই সৃষ্টি করিয়া থাকে, অথচ সরকারী উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা, রাজসভায় সম্মান, করদান হইতে অব্যাহতি প্রভৃতি সকল সুযোগ-সুবিধা তাহারাই ভোগ করে। ইহার বিরোধিতা তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে স্বভাবিক কারণেই জাগিয়া উঠিল। এই বৈষম্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধী করিয়া তুলিল।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা-লাভের স্পৃহা

তাহারা রাজনৈতিক অধিকার, সম্মান—এক কথায়, উপরিস্থিত দুই সম্প্রদায়ের সহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত হইতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা অভিজাত সম্প্রদায়-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না, ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে তাহারা চাহিয়াছিল রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অবসান। সামাজিক মর্যাদা বংশগত না হইয়া প্রকৃত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হউক, এই ছিল তাহাদের ইচ্ছা। তৃতীয় শ্রেণীর নিচের অংশ ছিল কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি লইয়া গঠিত।

ফরাসী বিপ্লবের কালে people বা জনগণ বলিতে কৃষক এবং শহরের শ্রমিক-দিগকেই বুঝাইত। শহরের শ্রমজীবী বলিতে কেবল শহরের কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদেরই বুঝাইত না, আর তাহাদের সংখ্যাও তেমন বেশি ছিল না। শহরের শ্রমজীবী (town workers) বলিতে কারখানার শ্রমিক, রুটি প্রস্তুতকারক, কসাই, মদ প্রস্তুতকারক, মুদিখানার মালিক, রাজমিস্ত্রী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, সরাইখানার

ফরাসী শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মালিক, মুচি, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, ছুতারমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, বই বিক্রেতা প্রভৃতি অনেককেই বুঝাইত।* শহরের শ্রমিকরা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পেন্টালুন পরিত। উর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের লোক চোগা (breeches) এবং মোজা পোশাক হিসাবে ব্যবহার করিত। যেহেতু শহরের শ্রমিকরা চোগা ব্যবহার করিত না এজন্য তাহারা সাঁকুলোৎ—Sansculottes—নামে অভিহিত হইত।† (Sans=without+culottes=breeches)। আমেরিকা হইতে সোনা ও রুপা ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আসিতে লাগিলে ইওরোপীয় দেশসমূহে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ১৭৪১ হইতে ১৭৮৯ অর্থাৎ বিপ্লবের বৎসর পর্যন্ত শতকরা ৬৫ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ধর্মঘট, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি ফ্রান্সে নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি

---

* *The Age of Napoleon*, p. 7, Will and Ariel Durant.

† "The 'people' in the terminology of the Revolution, meant the peasants and the town workers,...a humming medley of butchers, bakers, brewers, grocers, cooks, peddlers, barbers, shopkeepers, innkeepers, vintners, carpenters, masons, house painters, glass workers, plasterers, tilers, shoemakers, dyers, cleaners, tailors, black-smiths, servants, cabinet-makers, saddlers, prostitutes and thieves. These workers wore ankle length pantaloons rather than knee breeches (*culottes*) and stockings of the upper classes, they were named *Sansculottes* and as such they played a dramatic part in Revolution". *Ibid*.

ধর্মঘট রোধ করা সম্ভব হয় নাই। প্যারিস শহরেই হাজার হাজার পরিবার চরম দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। ফরাসী বিপ্লব যতই নিকটবর্তী হইতেছিল প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী ততই ধৈর্যহীন হইয়া উঠিতেছিল।

ফ্রান্সের কৃষকরা অবশ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া সপ্তদশ শতকের কৃষকদের এবং সমসাময়িক ইওরোপের অপরাপর দেশের কৃষকদের তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি-জমি কৃষকদের মালিকানাধীন ছিল, অপর এক-তৃতীয়াংশ ছিল যাজক ও অভিজাতদের মালিকানাধীন। যাজক ও অভিজাতগণ তাহাদের জমি কৃষকদের নিকট ভাগচাষের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিয়া দিত। অবশিষ্ট জমি যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে শ্রমিক নিয়োগ করিয়া চাষ করাইত। কিন্তু মূল্য-বৃদ্ধি ও করের চাপে কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে সরকারী রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য বেগার খাটিতে হইত। ইহা ভিন্ন, নানা প্রকার সামন্ত কর তাহাদিগকে দিতে হইত (বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে যখন তাহারা করভারে জর্জরিত সেই সময়ে (১৭৮৮) অনাবৃষ্টির ফলে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৭৮৯ (মার্চ) কৃষকগণ স্বভাবতই কর দিতে অস্বীকার করিল। এইভাবে সরকারের অর্থভাণ্ডার যখন প্রায় শূন্য তখন বিপ্লব সংঘটনে আর বিলম্ব ঘটিল না।*

কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

সামাজিক বৈষম্য-প্রসূত বিদ্বেষ ফরাসী বিপ্লবের একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন, (সামাজিক) "অহমিকাই-ই ছিল বিপ্লবের মূল কারণ, স্বাধীনতা ছিল অজুহাত মাত্র।"† ঐতিহাসিক রাইকারের মতে ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সমতা লাভের আন্দোলনের ফলেই সৃষ্টি হইয়াছিল।

সামাজিক বৈষম্য বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, এই কথা বলিলে ভুল হইবে। এই বিপ্লবে সাধারণ লোক অর্থাৎ সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের বিশেষভাবে কৃষক শ্রেণীর লোকেরাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তাহাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিল।†† ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষকদের

কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের অংশ গ্রহণ

* *Idem.*

† "What made Revolution ?" exclaimed Napoleon. "Vanity, Liberty was only excuse" Quoted by Riker.

"The Revolution was an outcome of a struggle between classes, of a movement for social equality by the bourgeoisie." *Ibid* p. 251.

†† "The mass of the people in its majority, its lowest and most profound strata, marked by the yoke and by exploitation, rose spontaneously and stamped on the course of the revolution the seal of their demands, their attempts to construct in their own manner a new society in place of the old one they were destroying." (Lenin) Essay : *The working class in the Revolution of 1789 by Etienne Fajon.*

সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। কৃষক শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণগুলির অন্যতম ছিল।* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুরবোঁ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ স্বৈরাচারী রাজা চতুর্দশ লুই-এর শাসনকালের শেষ দিকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার সূচনা হইয়াছিল। ফিনেলন, সেণ্ট্ সাইমার, বুলেনভিলিয়ার্স এই স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সহিত জড়িত ছিলেন।†

অভিজাত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের অকর্মণ্য শাসনে ফরাসী জনসাধারণের মনে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনা ক্রমেই কঠোর এবং তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সমাজের এক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর বিদ্বেষী, পূর্বেকার যাবতীয় ব্যবস্থা ও বিশ্বাসের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস ও ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মতবাদে সকল প্রকার অবিচার-অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া এক উন্নততর জীবনের আদর্শের প্রচার, যে-কোন ব্যক্তির কাছেই আপাত শান্তির মধ্য দিয়াই যে বিপ্লব আগাইয়া আসিতেছিল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

উপসংহার

অর্থনৈতিক (Economic): রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে অসঙ্গতি (contradiction) পরিলক্ষিত হয় অনুরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অসঙ্গতির অভাব ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স "বিশেষ অধিকারের দেশ" (country of privileges)-এ পরিণত হইয়াছিল। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি ইত্যাদি নানাপ্রকার বিশেষ অধিকার যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায় ভোগ করিত। তাহারা যে-পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত জনসাধারণ ও সরকারের স্বার্থ ঠিক সেই পরিমাণে ক্ষুন্ন হইত। বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীর দৌরাত্ম্যে রাজকর্মচারীরা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনে সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হইত। সমাজের উপরন্তু দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় কর দিত না; উপরন্তু, তাহারা দেশের যাবতীয় সামরিক ও বেসামরিক চাকরি পাওয়ার একচেটিয়া অধিকারী ছিল। রাষ্ট্রের সমগ্র করভার স্বভাবতই তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের—বিশেষত কৃষকদের বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন, কৃষকদিগকে রাজপথ প্রস্তুত ও মেরামত করিবার জন্য বেগার খাটিতে হইত।

যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি

উপরন্তু দুই সম্প্রদায়ের করভার বহন না করিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ: তৃতীয় সম্প্রদায়ের সমগ্র করভার বহন কিন্তু সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত

ঐ সময় ফ্রান্সে তিনটি প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হইত; যথা 'টেইলি' (Taille),

* *The New Cambridge Modern History*, vol. vii, p. 101.

† "The peasantry usually outnumbered all the other classes of French society put together. The condition of the peasants was undoubtedly prime cause of the Revolution. *Camb. Mod. History.* vol, viii, p. 61.

'ক্যাপিটেশন' (Capitation) এবং 'ভিংটিয়েমে' (Vingtiemes)। টেইলি ছিল সম্পত্তির উপর ধার্য কর। যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায়কে ইহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। সুতরাং তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate) উপরই এই করভার ন্যস্ত ছিল। আয়কর 'ক্যাপিটেশন' নামে পরিচিত ছিল। এই কর সকল সম্প্রদায়ের দেয় ছিল, কিন্তু যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়া এই কর এড়াইয়া যাইত। আয়করের মতই অপর একটি কর স্থাপন করা হইত, ইহার নাম ছিল ভিংটিয়েমে। জমি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির আয়ের উপর এই কর স্থাপন করা হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই করটি কেবলমাত্র জমির আয়ের উপরই ধার্য করা হইতে থাকে। তদুপরি রাজার আর্থিক অনটনে দান (Don gratuit or free gift) হিসাবেও অর্থ দিতে হইত। প্রত্যক্ষ করের প্রত্যেকটি তৃতীয় সম্প্রদায় বিশেষত কৃষকদেরই দিতে হইত। মোট আদায়িকৃত করের শতকরা ৯৬ ভাগ সাধারণ বা তৃতীয় সম্প্রদায়কে (non-privileged Third Estate) বহন করিতে হইত।* রাজতন্ত্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের জনসমাজেরও আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয়তার চরমে পেঁীছিয়াছিল।

প্রত্যক্ষ কর : টেইলি, ক্যাপিটেশন ও ভিংটিয়েমে

মোট আদায়িকৃত কর-এর ৯৬ ভাগ তৃতীয় সম্প্রদায় কর্তৃক বহন

পরোক্ষ কর নানাভাবে আদায় করা হইত। দলিলপত্রের উপর কর, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি ভিন্ন গেবেলা (Gabella) নামে লবণ কর এবং এইডস্ (Aides) নামে নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী—বিশেষত মাদক দ্রব্যাদির উপর এই কর স্থাপন করা হইত। এই সকল কর আদায়ের ভার সরকার একশ্রেণীর মধ্যস্বত্ব-ভোগী কর-আদায়কারীর হাতে দিয়াছিলেন। তাহারা সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে এক-একটি স্থানের কর আদায়ের অধিকার পাইত। স্বভাবতই কর আদায়ে শোষণ, অবিচার-অত্যাচার লাগিয়াই থাকিত। সর্বোপরি ছিল বেগার শ্রম (corvee)। শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতিকে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য সরকারী কাজ বিনা-পারিশ্রমিকে করিতে হইত।

পরোক্ষ কর : গেবেলা, এইডস্, আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক, কর আদায়ের অত্যাচার

উপরি-উক্ত কর ভিন্ন ধর্মাধিষ্ঠান বা চার্চ ব্যক্তি মাত্রেরই মোট আয়ের এক দশমাংশ (Tithes) 'ধর্মকর' হিসাবে আদায় করিত। সামন্ত-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি সামন্ত-প্রথাজনিত কর আদায়ের রীতি তখনও চালু ছিল।

ধর্মকর—আয়ের এক-দশমাংশ

---

* In 1784, the following was the proportion of payments :

	Livres
Clergy:	7,628
Nobility:	396
Third Estate :	180,615

Essays on the French Revolution : *The Finances of the Revolution*—by James Solomon, p. 63.

চতুর্দশ লুয়ের রাজত্বকালে দীর্ঘমেয়াদী চারিটি বৃহদাকারের ইওরোপীয় যুদ্ধ রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। পঞ্চদশ লুই এই দেউলিয়া অবস্থা হইতে রাজ্যকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ওরি (Orry), ম্যাশল্ট্ দ্য আরনো-ভাইল (Machault d' Arnovilie), বার্টিন (Bertin) এবং দ্য ইনভো (d' Invau) কে পরপর কম্প্ট্রোলার জেনারেল অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ইঁহারা সকলেই অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর সামান্য করভার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের তীব্র বাধাদানের ফলে সেই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই। আবে টেরে (Abbe Terray) যখন অর্থমন্ত্রী হইলেন তখন তিনি ভিংটিয়েমে, ক্যাপিটেশন প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রচলিত কর কঠোরভাবে আদায় করিয়া সর্বোপরি সরকারি কাগজ (Treasury bond) কিনিয়া যে-সকল লোক তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা লগ্নি করিয়াছিল তাহা ফেরত দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার কতক 'উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু পোল্যান্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার ফলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। পঞ্চদশ লুই ভার্সাইয়ের রাজসভায় আমোদ-প্রমোদে প্রচুর পরিমাণ অর্থ অপচয় করিবার ফলে রাজকোষের প্রতিদিনের আয় দ্বারা প্রতিদিনের ব্যয় সংকুলান সম্ভব হইত না। এমতাবস্থায় পঞ্চদশ লুই রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি তাহা অনুমান করিয়া বলিয়াছিলেন: After me the deluge, অর্থাৎ আমার শাসনকাল শেষ হইলে রাজ্যের ভরাডুবি নিশ্চিত।

পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা

ষোড়শ লুইয়ের আমলে তুর্গো, নেকার যে-সকল অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করিয়াছিলেন, তাহাতে তখনকার সমস্যার মূলে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের অর্থনীতি সর্বদিক দিয়াই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্থনীতি—পঙ্গু

ষোড়শ লুই সিংহাসন আরোহণের (১৭৭৪) পরই আর্থিক সংকট হইতে রাজ্যকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন। কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিশাল পরিমাণ অর্থ ঋণ দিবার ফলে এই আর্থিক সংকট চরমে পৌঁছে। ষোড়শ লুই একাদিক্রমে ম্যালশারে, তুর্গো, নেকার প্রভৃতির উপর ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু কোন অর্থনীতিবিদের পক্ষেই ফ্রান্সের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে বিত্তশালী যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর করভার ন্যস্ত না করিয়া কোন আর্থিক সংস্কার সফল করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা প্রত্যেকেই যখন এ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলেন অভিজাতবর্গের প্রভাবে প্রভাবিত রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত অর্থ-মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে ষোড়শ লুইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করিলেন। দুর্বলচেতা

ষোড়শ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সের আর্থিক সঙ্কট

ষোড়শ লুই রাণীর কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, একে একে অর্থমন্ত্রীদের পদচ্যুত করিলেন। নেকারকে পরিস্থিতির চাপে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিলেও তখন বিপ্লব আর ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না।

সমসাময়িক দার্শনিকদের প্রভাব (Influence of the Contemporary Philosophers): রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য—প্রতি ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি লইয়া কার্যের ফলে 'যুক্তিবাদ' (Rationalism)-এর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বভাবতই ভগবান-প্রদত্ত রাজ-ক্ষমতার মতবাদ, সমাজের প্রথম শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ভোগ—ইত্যাদি সবকিছু সমালোচিত হইতে লাগিল। (১) মন্টেস্কু (Montesquieu) 'দি পার্সিয়ান লেটার্স' (The Persian Letters) নামক গ্রন্থে পরিহাসচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী সমাজের দোষ-ত্রুটির উপর কটাক্ষপাত করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'দি স্পিরিট অব্ দি লজ' (The Spirit of the Laws) গ্রন্থে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বিভাগ, আইন-প্রণয়ন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—এই তিনটি বিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করেন। মন্টেস্কুর রচনা রাজনৈতিক ও সামাজিক তর্ক-বিতর্কের এক ব্যাপক প্রেরণা যোগাইল। (২) ফিজিওক্র্যাটস্ (Physiocrats) নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ যুক্তির ভিত্তিতে অর্থনীতির নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। কুয়েসনে (Quesnay) ছিলেন এই মতবাদের মূল প্রবর্তক। ফিজিওক্র্যাটগণ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ অর্থনীতিক এ্যাডাম্ স্মিথও তাঁহার বিখ্যাত 'দি ওয়েল্থ অব্ ন্যাশন্স্' (The Wealth of Nations) গ্রন্থে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ত্যাগ এবং অবাধ-বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। (৩) ভল্টেয়ার (Voltaire) ছিলেন এ-যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি নাটক, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি চার্চ-এর দুর্নীতি, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির অযৌক্তিকতা দর্শাইয়াছিলেন। (৪) ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর ফ্রান্সে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন রুশো (Jean Jacques Rousseau)। তাঁহার মূল বক্তব্য ছিল: "মানুষ স্বভাবত ভাল, সভ্যতাই তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।" অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যই শ্রেষ্ঠ রাজ্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁহার সামাজিক চুক্তির মতবাদ বা 'কনট্রাট সোশিয়েল' (Contrat Social) বিপ্লবের বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হস্তে রহিয়াছে। রাজা জনসাধারণের

রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

ফিজিওক্র্যাটস্—কুয়েসনে (১৬৯৪-১৭৭৪)

এ্যাডাম স্মিথ্ (১৭২৩-১৭৯০)

ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)

রুশো (১৭১২-১৭৭৮) Contrat Social

মতানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে রাজাকে পদচ্যুত করিবার অধিকার জনসাধারণের রহিয়াছে। রুশোর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা শাসন পরিচালনা করা।* রুশোর সামাজিক চুক্তির মতবাদ ফ্রান্স তথা ইওরোপের চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। চায়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের সর্বত্রই জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনা চলিল; বিপ্লব সৃষ্টিতে রুশো'র সামাজিক চুক্তির মতবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। (৫) ডেনিস ডিডেরো (Denis Diderot) এবং ডি' এলেমবার্ট (D' Alembert) 'এনসাইক্লোপিডিয়া' (Encyclopaedia) নামে একখানি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ মানুষের একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। ইহাতে সমসাময়িক চার্চ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছিল।

জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব

এনসাইক্লোপেডিস্ট (১৭৭৬)

ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা ফ্রান্সের যে কেবল বিপ্লবের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই নহে, সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তারেও তাঁহাদের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী জনসমাজের দৃষ্টি রাষ্ট্র, সমাজ ও চার্চের দোষ-ত্রুটির প্রতি আকর্ষণ করিয়া দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির সাহায্য করিয়াছিলেন।

দার্শনিকদের প্রভাব

ইংলন্ড ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব (Influence of the English & the American Revolutions): বিপ্লবের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহা কেবলমাত্র দার্শনিকদের প্রভাব হইতেই সম্পন্ন হয় নাই; আরও দুইটি ধারার প্রভাবও ইহার সাহায্য করিয়াছিল। এগুলি হইল ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) ও আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ। ইংলন্ডের এই বিপ্লবের সমসাময়িক ইংরাজ লেখক লক্ (Locke)-এর 'জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ' (Theory of Popular Sovereignty) পরবর্তী শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিকগণকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ (১৭৭৬) একাধিকভাবে ফরাসী বিপ্লবে সাহায্য করিয়াছিল। মানসিক প্রভাব ভিন্ন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও ইহার গুরুত্ব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ল্যাফায়েৎ প্রমুখ বহু ফরাসী অভিজাত ব্যক্তি সামরিক সাহায্যসহ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ফরাসী সরকার আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণকে অর্থ-সাহায্য দান করিয়া কপর্দকশূন্য হওয়ায় বিপ্লব আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮)

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রভাব

ল্যাফায়েৎ প্রমুখ নেতাদের অভিজ্ঞতা: ফরাসী সরকারের কপর্দকশূন্যতা

* "His Political ideal was a government for the people and by the people." *Camb. Modern History*, vol. viii, p. 28.

বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate Cause of the Revolution): অর্থাভাব হেতু ষোড়শ লুই যখন জাতীয় সভা স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর শরণাপন্ন হইলেন তখন ফরাসী জাতির মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। জাতীয় প্রতিনিধি সভা নিজ অধিকার গ্রহণে তখন বদ্ধপরিকর। রাজশক্তি স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনায় অক্ষম, এই সত্য উপলব্ধির ফলেই জাতীয় সভার সংকল্প ও শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্‌স্‌ জেনারেল-এর অধিবেশন আহূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। কিন্তু বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায় পার্লামেণ্ট ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় শুরু হইয়াছিল।

ষোড়শ লুই জাতির শরণাপন্ন স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর অধিবেশন আহূত

ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্নে ছিল প্রভোস্ট (Provost) বিচারালয়। প্রতি জেলা বা শহরে একটি করিয়া প্রভোস্ট বিচারালয় ছিল। এগুলি হইতে বেইলিফ (Beillife) বিচারালয়ে আপীল করা চলিত। রাজকর্মচারী-পদ-বিক্রয় ব্যবস্থাও তখন ছিল। এর ফলে কোন কোন শহরে বিচারকের পদ ক্রয় করিয়া 'প্রেসিডিয়েল চেয়ার' (Presidial Chair) নামে বিচারালয় স্থাপন করা হইয়াছিল। এই সকল বিচারালয় হইতে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টের কাছে আপীল করা চলিত। ফ্রান্সে মোট তেরটি প্রাদেশিক পার্লামেণ্ট ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পার্লামেণ্ট ছিল 'পার্লামেণ্ট অব্‌ প্যারিস' (Parlement of Paris)। এই সকল পার্লামেণ্টের সদস্যরা সকলেই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। বিচার করাই ছিল পার্লামেণ্টগুলির প্রধান কাজ। কিন্তু রাজা বা রাজসভা কর্তৃক কোন আইন পাস করা হইলে পার্লামেণ্টগুলি সেই আইন রেজিস্টারে লিখিয়া অর্থাৎ নথিভুক্ত করিয়া রাখিত। কোন আইন প্রচলিত অপরাপর আইন-বিরোধী হইলে সেগুলি নথিভুক্ত করিবার আগে রাজা বা রাজসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এইভাবে পার্লামেণ্টগুলি, বিশেষভাবে প্যারিসের পার্লামেণ্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা আইন নথিভুক্ত করিতে অস্বীকার করিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজা *Lit de Justice* নামে এক আদেশ দ্বারা পার্লামেণ্টের সদস্যদের ডাকিয়া আনিতেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিলে এবং পার্লামেণ্টের সদস্যদের প্রশ্নাদির যথাযথ জবাব দিলে পর সেই আইন নথিভুক্ত তাহারা করিতেন; বলা বাহুল্য, পার্লামেণ্টের সদস্যরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত।

পার্লামেণ্ট অব্‌ প্যারিস ও প্রাদেশিক পার্লামেণ্ট

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব শুরু হইবার পূর্বে পার্লামেণ্ট দৃঢ়ভাবে প্রশাসনের বিরোধিতা শুরু করিয়াছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গো খাদ্যশস্য আমদানি ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলে প্যারিসের পার্লামেণ্ট ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। তুর্গো অবশ্য ষোড়শ লুইয়ের সাহায্যে পার্লামেণ্টের বিরোধিতা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্টগুলি তুর্গোর বেগার খাটা (Corvee) বন্ধ করিবার আদেশের

বিপ্লবের প্রাথমিক পদক্ষেপ

বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। সামন্তদের স্বার্থ বিরোধী যে-কোন আদেশ বা আইনের তাহারা বিরোধী ছিল। এমন কি, প্যারিস পার্লামেণ্ট ভল্টেয়ার খাদ্য-শস্যের অবাধ-বাণিজ্য-নীতি সমর্থন করিয়া যে-প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বনসার্ফ (Boncerf) সামন্ত অধিকার নাকচ করিবার জন্য যে-প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সকল প্রচারপত্রও বন্ধ করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে দ্বিধা করে নাই। এইভাবে ক্রমেই প্রাদেশিক পার্লামেণ্টগুলি এবং বিশেষভাবে প্যারিসের পার্লামেণ্ট এক বিদ্রোহী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

পরবর্তী অর্থমন্ত্রী ক্যালোন ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করিলে প্যারিস পার্লামেণ্ট উহার বিরোধিতা করিয়াছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই ঋণ গ্রহণে বাধা দিতে পারে নাই। এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া সরকারের চরম অর্থসংকট দূর করিবার উদ্দেশ্যে ক্যালোন জমির উপর এবং স্ট্যাম্প (stamp)-এর উপর কর স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি বেগার শ্রম (corvee) উঠাইয়া দিলেন। ক্যালোন একথা জানিতেন যে, পার্লামেণ্ট-গুলি এই সকল ব্যবস্থার বিরোধিতা করিবে। তিনি এজন্য জনমত সরকারের পক্ষে টানিবার উদ্দেশ্যে তিন শ্রেণীর (Three Estates) প্রতিনিধি লইয়া 'কাউন্সিল অব্ নোটেব্‌ল্‌স্' (Council of Notables) আহ্বান করিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এই সভা যখন বসিল তখন একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ক্যালোন তথা রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল নূতন কর যাহা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা এই সভা কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লওয়া। এই কাউন্সিল অব্ নোটেব্‌ল্‌স্-এর মোট ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৪৬ জন ছিলেন অভিজাত ব্যক্তি, ১১ জন যাজক, ১২ জন রাজসভার সদস্য, ৩৮ জন ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, ২৫ জন মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী ও ১২ জন ছিলেন অপরাপর প্রতিনিধি। এই সভা রাজার মনোনীত ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। স্বভাবতই ইহাতে প্রকৃতপক্ষে অভিজাত ব্যক্তিদের প্রাধান্য ছিল। রাজকর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থবল তাহাদিগকে অনেকখানি অভিজাত ব্যক্তিদের মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্যালোন

নোটেব্‌ল্‌স্‌দের সভা

ক্যালোন একথা বিচার করিয়া দেখেন নাই যে, নোটেব্‌ল্‌স্‌দের সভা কর স্থাপন সমর্থন করিলেও সেই আদেশ একমাত্র পার্লামেণ্টই নথিভুক্ত করিতে পারে। সুতরাং পার্লামেণ্টকে সাময়িকভাবে এড়াইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত উহার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। নোটেব্‌ল্‌স্ সভায় রাজা প্রথম তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দিলে ক্যালোন সরকারী অর্থাভাবের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া নূতন কর স্থাপন, করভি ও ভিংটিয়েমে নামক কর রহিত করা, ক্যাপিটেশন কর হইতে অভিজাত শ্রেণীকে অব্যাহতি দেওয়া, টেইলি ও গেবেলা কর দুইটির পরিমাণ হ্রাস, খাদ্যশস্যের অবাধ-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যবস্থার কথা জানাইয়া সভার সমর্থন চাহিলেন। কিন্তু সদস্যরা নূতন কর স্থাপনের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন।

নোটেব্‌ল্‌স্ সভার বিরোধিতা

কিন্তু নোটেবল্‌স্‌-এর কর ও অপরাপর সংস্কার বিরোধিতা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিলে ক্যালোনকে রাজা পদচ্যুত করিলেন। নেকার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু কাউন্সিল অব্‌ নোটেবল্‌স্‌ আইনত কর স্থাপন অনুমোদন করিতে পারিত না। কেবলমাত্র জাতীয় সভা—এস্টেট্‌স্‌-জেনারেল (Estates-General)-ই এই কাজ করিতে পারে, তাহারা এই যুক্তি দেখাইল। এমতাবস্থায় রাণী ম্যারী আঁতোয়ানেত-এর কথায় রাজা নেকারের স্থলে ব্রিয়েন্‌ (Brienne)-কে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতেও কোন কাজ হইল না। ফ্রান্স ক্রমেই চরম অরাজকতার দিকে আগাইয়া চলিল। ব্রিয়েন্‌ শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল অব্‌ নোটেবল্‌স্‌ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

কর স্থাপনে জাতীয় সভা একমাত্র অধিকারী

পার্লামেণ্টকেও ব্রিয়েন্‌ বিরোধিতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিলেন না। নূতন কর স্থাপন একমাত্র স্টেট্‌স্‌-জেনারেলই করিতে পারে তাহারা একথা বলিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট অব্‌ প্যারিস কতকগুলি সরকারী সংস্কার আদেশ নথিভুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে দুইজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। রাজা পার্লামেণ্টের সদস্যদের কয়েকজনকে ভার্সাইয়ের রাজসভায় ডাকিয়া আনিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট অব্‌ প্যারিস ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। প্রাদেশিক পার্লামেণ্টগুলিও এই প্রতিবাদের সামিল হইল। এইভাবে পার্লামেণ্ট অব্‌ প্যারিস ফরাসী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিল।

প্যারিস পার্লামেণ্ট, ফরাসী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আরও দৃঢ়তার সহিত সরকারের বিরোধিতা শুরু করিল। সরকারী ঋণগ্রহণ নথিভুক্ত না করিয়া প্যারিস পার্লামেণ্ট ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের যে দুইজন সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করিতে শুরু করিল এবং কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা এইভাবে বিনা-বিচারে হরণ করা চলিবে না, এই দাবি উত্থাপন করিল। পার্লামেণ্ট এখন সম্পূর্ণ বিদ্রোহী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল। সরকার পার্লামেণ্টের আরও দুইজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহারা বিচারভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেনা-বাহিনীর সাহায্যে তাঁহাদিগকে দমন করা হইল। এদিকে রাজা পার্লমেণ্টের ক্ষমতা কেবলমাত্র বিচার কার্যে সীমাবদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিলেন। ' পার্লামেণ্ট এইভাবে প্রতিবাদ জানাইল যে, রাজা দেশের মৌলিক আইন-কানুনের পরিবর্তন করিতে পারেন না, এবং কোন-প্রকার কর স্টেট্‌স্‌-জেনারেল ভিন্ন অপর কেহ স্থাপন করিতে পারে না। পার্লামেণ্ট-এর এই প্রতিবাদ সরকার কতকটা ভীতির সহিত দেখিলে দেশে ষোড়শ লুইয়ের শাসন প্রকৃতক্ষেত্রে অসহায় হইয়া পড়িল। পার্লামেণ্ট তাহাদের বিদ্রোহের দ্বারা সমগ্র ফরাসী জাতির মধ্যে এক বিদ্রোহের মনোবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

সরকার কর্তৃক পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাসের তীব্র বিরোধিতা

সমগ্র জাতির মধ্যে বিদ্রোহের মনোবৃত্তি সৃষ্টি

কাউন্সিল অব্ নোটেব্‌ল্‌স্ ও প্যারিস পার্লামেন্টের বিদ্রোহ এবং স্টেট্‌স্-জেনারেল ভিন্ন অপর কাহারো পক্ষে কর স্থাপনের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত রাজাকে স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান করিতে বাধ্য করিল।

স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান

সমালোচনা (Criticism): ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন কারণগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। অধ্যাপক এফ. সি. মণ্টাগু* বলেন যে, কৃষকদের দুরবস্থাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। জে. হল্যাণ্ড রোজ-এর মতে, ফরাসী দার্শনিকগণের রচনাদির ফলে এক নূতন জীবনের যে আশা ফরাসী জাতির মনে জাগিয়াছিল তাহাতেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।† ঐতিহাসিক ফিশার বলেন: "ফরাসী রাজতন্ত্র সমাজের ঊর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার (Privileges)-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়াই বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সামন্ত-প্রথার দোষ-ত্রুটি অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায় ফরাসী দেশের জাতীয় জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; ফরাসী রাজ-শক্তি এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।"†† মর্স স্টিফেন্‌স্-এর মতে, ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দার্শনিক বা সামাজিক নহে।§ নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, 'আত্মগরিমা' অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্মান ও অধিকার ভোগের ব্যাপারে যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সম-পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছাই বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে।

মণ্টাগু, হল্যাণ্ড রোজ ও ফিশার

মর্স স্টিফেন্‌স্

নেপোলিয়ন

সাধারণত বিপ্লব সৃষ্টিতে ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু মর্স স্টিফেন্‌স্-এর মতে, দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লব সৃষ্টির ব্যাপারে ততটা প্রভাব বিস্তার করেন নাই, যতটা বিপ্লবের গতি এবং ইওরোপের অপরাপর দেশে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপ্লবে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই; ইহা ভিন্ন, তাঁহাদের রচনা

দার্শনিক কারণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ ফ্রান্স অপেক্ষা ইওরোপের অন্যান্য দেশে বিপ্লবের প্রভাব

*The condition of the peasants was undoubtedly a prime cause of the Revolution. Prof. F. C. Montague, *Camb. Modern History*, vol. viii, p. 61.

† "It was hope which made the Revolution................" Holland Rose, *The Revolutionary and the Napoleonic Era*, p. 26.

†† "The Revolution came because the monarchy was unable to solve the question of privilege, was not strong enough to overthrow the remains of feudalism which, in France as in most other continental countries, cumbered the ground." *A History of Europe*, p. 765, Fisher.

§ "The causes of movement were chiefly economical and political, not philosophical or social." *Revolutionary Europe*, p. 9, Morse Stephens.

বিস্তৃতির সহায়ক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে মানসিক প্রস্তুতি

ফরাসী জাতির অল্পসংখ্যক লোকই তখন পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তথাপি সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের উপর দার্শনিকগণের মতবাদের প্রভাব যে অতি ব্যাপক এবং গভীর ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী শাসনব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর যাবতীয় দোষ-ত্রুটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সাধন করিয়াছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

কোন বিপ্লবই কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে ঘটে না। ইহা কতকগুলি বিশেষ কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোনটিকে বাদ দিলে বিপ্লব ঘটিত তাহা বলা সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি কারণেরই এক-একটি বিশেষ প্রভাব ছিল, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক ফিশার-এর মন্তব্য এই যে, দুর্বল ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত-প্রথাজনিত বিশেষ অধিকার এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই বলিয়া বিপ্লব ঘটিয়াছিল—ইহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, কেবলমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্র থাকিলেই বিপ্লব ঘটিত না, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তখনকার লোকের মনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সুতরাং অপরাপর সমস্যা দূর করিতে পারিলেও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন না আসিলে বিপ্লব এড়ান যাইত না।

কোন একটি মত গ্রহণযোগ্য নহে

ফিশারের মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে

ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিভিন্ন কারণের গুরুত্বের পার্থক্য থাকিলেও সবগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকল বিপ্লবের পশ্চাতে অর্থনৈতিক মূল কারণ এই সাধারণ ধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, অপকৃষ্ট অর্থনীতিই ছিল মূল কারণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঘটিয়াছিল, তবে এই সকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক।* প্রত্যেক বিপ্লবের পশ্চাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কারণ থাকে; ফ্রান্সের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি ছিল প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক পীড়াদায়ক।

বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি

অর্থনৈতিক কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

* "The generalisation that money is the root of all revolutions has the defects of its simplicity; but among the varied influences which provoked the French Revolution vicious finance takes the first place." *Camb. Mod. History*, vol. viii, p. 66.

বিপ্লব ফ্রান্সে প্রথম দেখা দিয়াছিল কেন (Why did the Revolution break out First in France) : ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোচনা করিলে আমরা সর্বত্রই মোটামুটি একই চিত্র দেখিতে পাই। এমতাবস্থায় বিপ্লব প্রথমে ফরাসী দেশে আরম্ভ হওয়ার কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকা স্বাভাবিক। এই বিশেষ কারণগুলির জন্যই Ancient Regime বা Old Regime ফ্রান্সে প্রথম বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ইওরোপের সর্বত্রই একই ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ফ্রান্সে বিপ্লব সৃষ্টির বিশেষ কারণ

প্রথমত, ফরাসী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরাপর দেশের রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী রাজতন্ত্র দেশে শাসনের নৈতিক অধিকার নিজ অকর্মণ্যতাহেতু হারাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-বিপ্লব যুগের শাসনব্যবস্থা, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি প্রভৃতি ফরাসী জনসাধারণের যেরূপ সমালোচক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অপর কোন দেশে তাহা হয় নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ফ্রান্সেই তখন শিক্ষিত, সচেতন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ইংলণ্ড এবং সুইডেন ভিন্ন অপর কোন দেশে তখন মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি হয় নাই। ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজ ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার, মণ্টেস্কু, ডেনিস্ ডিডেরো, রুশো প্রভৃতির মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, এমন কি, অর্থবলে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও সর্বাত্মক প্রাধান্য তাহারা স্বভাবতই স্বীকার করিতে রাজী ছিল না। তাহারা সামাজিক সম-মর্যাদা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। চতুর্থত, ফরাসী কৃষক-সম্প্রদায় তদানীন্তন ইওরোপের অপরাপর দেশের কৃষক অপেক্ষা নিজ অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিল। তাহাদের মধ্যে শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক চেতনা জাগিয়াছিল। প্রতিবেশী জার্মানির কৃষকদের অপেক্ষা তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস এবং ইচ্ছা ছিল বহুগুণে বেশি।* ফরাসী কৃষকগণ অপরাপর দেশের কৃষকদের অপেক্ষা হীন অবস্থায় ছিল না। উপরন্তু তাহারা ছিল অধিকতর বিত্তশালী, স্বাধীনচেতা

ফরাসী রাজতন্ত্র অন্যান্য দেশ অপেক্ষা হীনবল

ফ্রান্সে দোষ-ত্রুটি সমালোচিত

শিক্ষিত, সচেতন ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজ

মধ্যবিত্ত সমাজের উপর দার্শনিকদের প্রভাব

ফরাসী কৃষক-সম্প্রদায় অপরাপর দেশের কৃষক অপেক্ষা অধিক সচেতন

দার্শনিকদের সমালোচনার প্রভাব : নূতন জীবনের আশা

---

* "It was because the French peasant was more independent, more wealthy and better educated than the German serfs that he resented the political and social privilege of his landlord and the payment of rent, more than the serf objected to his bondage." Morse Stephens, p. 8. (Contd.)

এবং শিক্ষিত। ফরাসী কৃষকদের প্রায় সকলেই ছিল স্বাধীন। ভূমিদাস-প্রথা ফ্রান্সে দ্বাদশ শতক হইতেই বিলোপ পাইতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আগে তাহাদের প্রায় সকলেই স্বাধীন কৃষকের মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিল। তাহারা সমাজের অপরাপর শ্রেণীর সহিত সম-মর্যাদাভুক্ত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিল। পঞ্চমত, ফরাসী দার্শনিকগণের দান এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তাঁহাদের রচনা দ্বারা ফরাসী জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরের দোষ-ত্রুটি লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সহজ, সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের এক আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। রুশোর 'জনগণের সার্ব-ভৌমত্ব' (Popular Sovereignty) ফরাসী জনগণের মধ্যে এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ষষ্ঠত, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া ল্যাফায়েৎ প্রভৃতি ফরাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ ফরাসী জাতি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহারাই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ল্যাফায়েৎ প্রমুখ নেতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তাহার সুযোগ গ্রহণ

উপসংহারে একথা বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানকালের মানদণ্ডে বিচার করিলে অষ্টাদশ শতকের অর্থাৎ প্রাক্-বিপ্লব যুগের ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক কাঠামো ছিল অবিন্যস্ত, সঙ্গতিহীন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়নীতি বর্জিত। ফরাসী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি হীন। ফরাসী সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের তুলনায় ইংলণ্ডের, উত্তর-ইতালির এবং জার্মানির কোন কোন অংশের নিম্নশ্রেণীর জন-সমাজের অবস্থা উন্নত ছিল বটে, কিন্তু ইওরোপের অপরাপর দেশ যথা জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চল, দক্ষিণ ও মধ্য-ইতালি, স্পেন, ন্যাপল্‌স, আয়র্লণ্ড প্রভৃতির সাধারণ মানুষের অবস্থা হইতে ফ্রান্সের নিম্নতর জনসমাজের অবস্থা উন্নততর ছিল। বস্তুত, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর হইতে ফরাসী বিপ্লবের সূচনার পূর্বাবধি প্রায় দুই দশকে ফ্রান্সের জনসংখ্যা, অর্থ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক যুক্তিবাদী ধারণা শাসন ও বিচার-ব্যবস্থায় এক উদার মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকালের কঠোরতা ষোড়শ লুইয়ের শাসনকালে আর ছিল না। সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা পূর্বাপেক্ষা বহু ব্যাপক ও অধিক মাত্রায় বিরাজিত ছিল, ভূসম্পত্তি কেবল যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর মালিকানায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমাজের সকল স্তরের লোকেদের এবং কৃষকদের মালিকানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

উপসংহার

"...in a society where personal freedom was general, landed property widely diffused, and every class aspiring to equality with the class above, evils which elsewhere might have been borne in patience, were felt to be intolerable."—*Camb. Modern History*, vol. viii, p. 65.

For a description of the condition of the French people both in Paris and the Provinces Arthur Young's Travels may be read. (Robinson : *Readings in European History*, vol, ii, p. 373 ff.)

সমাজের প্রতি স্তরের মানুষই উপরের স্তরের মানুষের সম-মর্যাদা ও সম-পর্যায়ভুক্ত হইতে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক অসাম্য, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, প্রভৃতি যাহা পূর্বে নির্বিবাদে মানুষ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিত, এখন আর তাহা সহ্য করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল না। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্বেকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকলপ্রকার ব্যবস্থা তাহাদের কাছে মূল্যহীন ও ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিল। জনসাধারণের মনোভাব যখন এইরূপ তখন স্বভাবতই নূতন নূতন মতবাদ, নূতন নূতন আশার বাণী তাহাদিগকে অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনা, অত্যাচার সব কিছুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার প্রেরণা যোগাইল। বিপ্লবের মানসিকতা যখন এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময়ে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া জাতীয় সভা স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের স্মরণস্থ হইলেন। বস্তুত, সমসাময়িক ইওরোপের কোন দেশের আর্থিক অবস্থাই ফ্রান্সের মত অতটা শোচনীয় ছিল না।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর অধিবেশন : বিপ্লবের সূত্রপাত

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৫ বৎসর পরে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর আহ্বান একদিকে যেমন ফরাসী রাজতন্ত্রের অক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ ছিল, অপর দিকে জনগণের অধিকারে সচেতন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন পুরাতন কাঠামোর পরিবর্তে নূতন কাঠামো প্রস্তুতে বদ্ধপরিকর। স্বভাবতই স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল বলা চলে।

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান (Contributions of Philosophers to the French Revolution) : ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ফরাসী বিপ্লব অর্থনৈতিক অত্যাচার-অবিচারের ফল অথবা দার্শনিকদের রচনার মধ্যে যে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল উহার ফলশ্রুতি, সে-বিষয়ে যে-বিতর্ক রহিয়াছে—সেই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকদের অবদান কতটুকু তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকগণের অবদান সম্পর্কে মতদ্বৈধ

ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় অংশগ্রহণকারী এবং তীক্ষ্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ফরাসী দার্শনিক জীন যোসেফ্‌ মুনিয়ার (Jean Joseph Mounier)-এর মতে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্বতন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিবার ব্যাপারে ফরাসী দার্শনিকদের দান খুবই অকিঞ্চিৎকর। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, দার্শনিকগণ তদানীন্তন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের যাবতীয় ত্রুটির সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় যে আদর্শবাদের প্রচার করা হইয়াছিল উহা জনসাধারণের অতি সামান্য অংশই পড়াশুনা করিয়াছিল বা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল।

যোসেফ্‌ মুনিয়ারের মত

যোসেফ্ মুনিয়ারের মতে রুশো অথবা ম্যাবুলির রচনা গুণাগুণের বিচারে খুবই উৎকৃষ্ট ধরনের ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' (Utopia) গ্রন্থের মতই অকার্যকর ছিল। ডেনিস্ ডিডেরো বা মন্টেস্কুর রচনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই স্পৃহা, যোসেফ্ মুনিয়ারের মতে ইংরেজ জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতালাভের দৃষ্টান্তে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ইংরেজ জাতি ও আমেরিকাবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা-ভোগের ভাগ্যকে তাহারা ঈর্ষা করিত। এই দুই দৃষ্টান্ত যোসেফ্ মুনিয়ারের মতে ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাব অপেক্ষা বহুগুণে বেশি প্রভাব ফরাসী জাতির উপর বিস্তার করিয়াছিল।*

আধুনিক ইতিহাস-সাহিত্যিক মর্স স্টিফেন্স্ (Morse Stephens) বলেন যে, ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে এক অহেতুক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। মর্স স্টিফেন্স্ একথা স্বীকার করেন যে, ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে ফ্রান্সের বাহিরে অর্থাৎ ইওরোপের অপরাপর দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা ফরাসী বিপ্লবের কোন প্রকৃত কারণ নহে। তাঁহার মতে ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সামাজিক বা দার্শনিক নহে।

মর্স স্টিফেন্স্-এর মত

যাহা হউক, ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদেরও অবকাশ ও যুক্তি আছে। ম্যালেট্ দু' প্যান (Mallet du pan) নামে জনৈক ফরাসী দার্শনিকের মতে, ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা চিরাচরিত রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে দ্বিধা ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া ফরাসী জাতির চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চিন্তাজগতে এই বিশৃঙ্খলার ও বিপ্লবের সূত্র ধরিয়াই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল।† সুতরাং ম্যালেট্ দু' প্যান-এর মতে দার্শনিকগণের অবদান ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ negative। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী দার্শনিকদের রচনা, বিশেষত রুশো'র রচনা সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের মনে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার রচনা ফরাসী জনসাধারণ রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় পড়িতে লাগিল। সর্বত্র রুশো'র জনসাধারণের

ম্যালেট্ দু'প্যান-এর মত : দার্শনিকদের অবদান নেতিবাচক

* "...this was for more due to an envious appreciation of English freedom and of American independence, than to the influence and teaching of the philosophers." *The Camb. Mod. History,* vol. viii, p. 1.

† "Intellectual anarchy prepared the way for social anarchy." *The Camb. Modern History,* vol. viii, p. 1.

সার্বভৌমত্ব-মতবাদের আলোচনা চলিল। রুশো ফরাসী জাতিকে 'জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এবং মানুষ ও মানুষের সমতার মতবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা এবং বিপ্লবের বাণীর প্রচারক হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বিপ্লব সংঘটনে ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাব সম্পূর্ণ নেতিবাচক (negative) একথা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

হল্যান্ড রোজ-এর মত

হল্যান্ড রোজ (Holland Rose)-এর মতে ফরাসী দার্শনিকগণ ফরাসী জনসাধারণকে রাজশক্তি ও চিরাচরিত প্রথা বা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার শিক্ষা দিয়াছিলেন, মানুষের মনে এক উন্নততর, অধিকতর সুখকর ও মুক্ত জীবনের আশার সৃষ্টি করিয়া ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবিগণকে সেই নূতন আশার-পথে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন।

উইলার্ট-এর মত

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনায় নূতন কিছুই বলেন নাই। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রভৃতির ধারণা রুশো বা ডেনিস্ ডিডেরো-এর পূর্বেই প্রচারিত ছিল। ঐতিহাসিক উইলার্ট (Willert)-এর মতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ রুশো না জন্মিলেও প্রচারিত হইত।* বস্তুত ফরাসী দার্শনিকগণের রচনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানুষ ও মানুষের সমতা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অধিকার, সম্পত্তি ভোগদখল করিবার সমান অধিকার, জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি যে-সকল নীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সেই সকল নীতি অনেক পূর্বেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের রচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য ফরাসী দার্শনিক মনটেইন স্বয়ং একথা বলিয়াছিলেন যে, মানুষের যুক্তিবাদ (Human reason) প্রকৃত সত্য নিরূপণের উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। কারণ যে-কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী অথচ অকাট্য যুক্তি দেখানও সম্ভব। সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রাধান্য দান করিলে সমাজে অরাজকতা দেখা দিবে একথা মনটেইন স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন।†

মনটেইন-এর মত

ফরাসী দার্শনিকগণের পূর্বেই তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদের সহিত ফ্রান্স ও ইওরোপবাসীর পরিচিতি

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণের রচনার বহু পূর্বেই যখন তাঁহাদের মূল বক্তব্য সম্পর্কে ইওরোপবাসী অবহিত ছিল তখন ফরাসী বিপ্লবে ফরাসী দার্শনিকদের কি প্রভাব থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক দার্শনিকের চিন্তাধারা ফরাসী দেশের অভ্যন্তরে ও ইওরোপে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইতে পারে।

* Vide, *The Cambridge Modern History*, vol., viii, p. 2.

† "Human reason cannot attain truth, and that every argument may be met by another equally cogent; the practical conclusion is that to make reason arbiter in social and political questions must lead to anarchy." Montaigne : *Ibid.*

একথা সত্য যে, ফরাসী দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণে যেমন অগ্রসর হন নাই তেমনি ফরাসী বিপ্লবে তাঁহারা কোন প্রত্যক্ষ অংশও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু দার্শনিকদের নিকট হইতে এরূপ নেতৃত্ব বা বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আশা করাও অনুচিত। কারণ, তাঁহাদের কার্যের প্রকৃত ক্ষেত্র হইল মানুষের ভাবজগতে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করা। ভলটেয়ার ছিলেন প্রাক্-বিপ্লব যুগের এক বহুমুখী ও শক্তিশালী লেখক। ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতি ছিল তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ফরাসী রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ফরাসী যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর 'বিশেষ অধিকারের'ও তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনা প্রধানত ছিল ধ্বংসাত্মক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক সমালোচনার মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল উহার জন্য তিনি জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন।* ডেনিস ডিডেরো, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতির রচনার মাধ্যমেও এইরূপ প্রস্তুতি ঘটিয়াছিল।

দার্শনিকগণ বিপ্লবের নেতৃত্ব বা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন নাই —ভাবজগতের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র

ভলটেয়ার

ডেনিস্ ডিডেরো, ডি' এলেমবার্ট

মণ্টেস্কু অবশ্য গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা নূতন পথের সন্ধান দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক ফরাসী রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবও তাঁহার "The Spirit of the Laws" নামক গ্রন্থে করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সাফল্য এবং আমেরিকার স্বাধীনতালাভের প্রভাবে প্রভাবিত ফরাসী জাতির মধ্যে মণ্টেস্কুর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রস্তাব এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে রুশো'র (Rousseau) দান ছিল সর্বাধিক। তাঁহার রচনায় কোন সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ লক্ (Locke)-এর মতবাদকেই তিনি প্রসারিত করিয়া তাঁহার 'Contrat Social' গ্রন্থে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদকে সর্বজনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের দাবি অস্বীকারকারী স্বেচ্ছাচারী ফরাসী রাজার রাজ্যশাসন করিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই, একথাই তিনি স্পষ্টভাবে সকলকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ ফরাসী বিপ্লবীদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

মণ্টেস্কু

রুশো

* "By habituating Frenchmen to the destructive criticism of received institutions Voltaire reduced the shock of the Revolution when eventually it came." *Ibid.*

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণ স্বৈরাচারী, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার যাবতীয় অবাঞ্ছিত বাধা-নিষেধ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নীতিগত অধিকার যে জনসাধারণের আছে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই অবদান প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিল। মানুষ মাত্রেরই সম-অধিকারের নীতিও তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতির নিকট দার্শনিকগণের প্রচারিত মতবাদ ও নীতি ধর্মনীতির ন্যায়ই পবিত্র ও পালনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।* ফরাসী জাতি স্বৈরাচারী, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন থাকিবার দুঃখ-দুর্দশার কথা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল। ফরাসী দার্শনিকগণ এই সকল বিষয়েই আলোকপাত করিয়া তাহাদের অন্তরের কথাই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই স্বৈরাচারী পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার যে জনসাধারণের আছে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই ফরাসী দার্শনিকদের প্রকৃত অবদান আমরা দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন, সমগ্র ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত করিবার পন্থাও তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সমগ্র ইওরোপের মানসিক ক্ষেত্রে এক নূতন চেতনা ও চিন্তার সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপে বিস্তারলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। P. F. Willert বলেন: একথাও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, দার্শনিকগণ বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই, বা যে-সকল মতবাদ তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে কোন অভিনবত্ব ছিল না, তথাপি তাঁহারা জনসাধারণের অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধারণাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া এবং জনসাধারণের অসন্তোষের কারণগুলির আলোচনা করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং উন্নততর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।† ফরাসী জাতি বিপ্লবের প্রাক্কালে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে যাহা ভাবিতেছিল অথচ প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিল না তাহাদেরই চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দার্শনিকগণ বিপ্লব সংঘটনে এক গভীর প্রভাব ও প্রেরণা বিস্তার করিয়াছিলেন।

দার্শনিকদের প্রকৃত অবদান—স্বৈরাচারী সমাজ ও শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি

ইওরোপে বিপ্লবী আদর্শ বিস্তারের পথ প্রস্তুতকরণ

জনসাধারণের অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধারণাকে স্পষ্ট রূপদান

* "The great work done by the philosophers was the part they took in exciting this fervour". *Idem.*

† "Even if we believe that the philosophers did not cause the Revolution nor originate the ideas which determined the form it was to take, we must allow that they precipitated it by giving a definite shape to vague aspirations by clearing away the obstacles which restrained the rapidly rising flood of discontent by depriving those whose interests and position made them the defenders of the old order, of all faith in the righteousness of their cause and by inspiring the assailants with hope and enthusiasm."—P. F. Willert, vide, *The Camb. Modern History,* vol. viii, p. 35.

অধ্যায় ৪

ফরাসী বিপ্লব : বিপ্লবের গতি

(French Revolution : Course of the Revolution)

ষোড়শ লুই (১৭৭৪-৯৩') : ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে পঞ্চদশ লুইয়ের পৌত্র ষোড়শ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী ম্যারিয়া থেরেসার কনিষ্ঠা কন্যা ম্যারি আঁতোয়ানেতকে বিবাহ করেন। তাঁহার শিক্ষা অনেক সীমিত ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যে-সকল জ্ঞান রাজাদের একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই সকল বিষয়ে অবশ্য ষোড়শ লুইয়ের জ্ঞানের অভাব ছিল না। ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবহারিক ভদ্রতার দিক হইতে বিচারে ষোড়শ লুই পঞ্চদশ লুইয়ের বিপরীত ছিলেন। তদানীন্তন রাজসভার ব্যাপক দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রভাবাধীন মানুষ হইলেও ষোড়শ লুই রাজসভার এই সকল দুর্নীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন। ধর্মক্ষেত্রেও তিনি সমসাময়িক পরধর্মবিদ্বেষ হইতে মুক্ত ছিলেন। তিনি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হউক ইহা আন্তরিকভাবে চাহিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতজীবনে মিতব্যয়িতা অনুসরণ এবং প্রশাসন ক্ষেত্রে সৎ এবং সুদক্ষ মন্ত্রী নিয়োগ করিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও ষোড়শ লুই একদিকে যেমন প্রকৃত স্বৈরাচারী শাসক হওয়ার অযোগ্য ছিলেন অপর দিকে বিপ্লবের প্রাক্কালে শাসন পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালনে অপারগ ছিলেন। ভীরু, দৃঢ় ব্যক্তিত্বহীন, শিকার এবং অপরাপর রাজকীয় আমোদ-প্রমোদে মত্ত ষোড়শ লুই প্রায়ই এত বেশি শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন যে, রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ঘুমাইয়া পড়িতেন। স্বামী হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার এই গুণই তাঁহার ত্রুটিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে তিনি ম্যারি আঁতোয়ানেতের মতের বিরোধিতা করিবার সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব ও মনোবৃত্তি হারাইয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দয়াপ্রবণ ও উদারচেতা হইলেও মানসিক দুর্বলতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তাঁহাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সে যখন দূরদর্শী, সুদক্ষ আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন রাজার প্রয়োজন সেই সময়ে ষোড়শ লুই-এর ন্যায় দুর্বলচেতা রাজার পক্ষে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধন, অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন, অভিজাত সম্প্রদায়কে দমন এবং রাজশক্তির পুনরুজ্জীবন সাধন অসম্ভব ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়কে করদানে বাধ্য করিবার ক্ষমতার মধ্যেই তখন রাজার আর্থিক নিরাপত্তার একমাত্র উপায় ছিল।

ষোড়শ লুইয়ের চরিত্র : দয়াপ্রবণতা, উদারতা, আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও দুর্বলতা

সমসাময়িক কঠিন সমস্যা

যাহা হউক, ষোড়শ লুই তুর্গো (Turgot) নামে জনৈক সুদক্ষ অর্থনীতিবিদকে ফ্রান্সের আর্থিক অব্যবস্থা দূর করিবার দায়িত্ব দিলেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য তাঁহাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে যেমন কোলবেয়ার ছিলেন অনন্যসাধারণ অর্থমন্ত্রী, তেমনি ষোড়শ লুইয়ের আমলে ছিলেন তুর্গো (Turgot)। কোলবেয়ারের (Colbert) মত তিনিও ছিলেন দেশের উন্নয়নের উৎসর্গীকৃত প্রাণ, দূরদর্শী, অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং ন্যায়-পরায়ণতায় অটল।

তুর্গোর নিয়োগ

ফ্রান্সের এক দরিদ্র পশ্চাৎপদ প্রদেশের ইন্টেনডেন্ট্ অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়া তুর্গো সেই প্রদেশটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অবাধ-বাণিজ্য, বিশেষভাবে খাদ্যশস্যের অবাধ-বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই প্রদেশের অভ্যন্তরীণ শুল্ক-নীতি ও অন্যান্য অনিষ্টকর নিয়ম-কানুন উঠাইয়া দিয়া ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ইওরোপের অর্থনীতিকদের মধ্যে তুর্গো ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ফ্রান্সের অর্থনীতি ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব লাভ করিয়া তুর্গো দেখিলেন যে, সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন ব্যয় সংকুলান করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বহুগুণে বেশি। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেশ এবং জনসাধারণের পক্ষে যে সর্বনাশাত্মক ছিল, একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলেন। সেই সময়ে (১৭৭৪) ফ্রান্সের জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৩৫০ মিলিয়ন ফ্রাঁ, অথচ আয়ের পরিমাণ ছিল ২১৩৫ মিলিয়ন ফ্রাঁ (franc)। জাতীয় ঋণের সুদের পরিমাণ ছিল ৮,৭০০,০০০ ফ্রাঁ। তুর্গো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন খরচ করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়া সরকারের আর্থিক অনটন দূর করিতে চাহিলেন। এই নীতি তিনটি ছিল : (১) সরকারের আর্থিক অভাব দূর করা, (২) কোন নূতন কর স্থাপন না করা, এবং (৩) কোন ঋণ গ্রহণ না করা। এই নীতি তিনটি কার্যকরী করিবার জন্য তিনি সরকারী ব্যয় হ্রাস করিলেন। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তিনি তাহাদের করদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। এজন্য তিনি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উৎসাহিত করিলেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে অল্পকালের মধ্যেই তুর্গো রাজকোষে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন। সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় রাজকর্মচারী-পদ ভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী-পদ উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সকল প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে গিয়া তিনি স্বভাবতই যে-সকল অভিজাত ব্যক্তি কোনপ্রকার কাজ না করিয়া বেতন বা সরকারী বৃত্তি ভোগ করিতেন তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত হানিলেন। ফলে তিনি এই সকল সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন, তাহারা তুর্গোর শত্রুতা করিতে শুরু করিল। খাদ্যশস্য চলাচলে নানাপ্রকার

তুর্গোর অর্থনৈতিক সংস্কার-নীতি

সরকারের অভাব দূর করা, নূতন কর স্থাপন না করা, ঋণ গ্রহণ না করা

অবাধ-বাণিজ্য-নীতির প্রচলন : একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘ বিলোপ' একচেটিয়া কারবার বিলোপ

আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক ও বাধা-নিষেধ কৃষক সমাজের ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তুর্গো অবাধ-বাণিজ্য-নীতি চালু করিলেন। শস্যাদির বিপণন ও চলাচলের ইহাতে সুবিধা বৃদ্ধি পাইল। প্রথমেই তিনি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। সরকার খাদ্যদ্রব্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া খাদ্যশস্য, রুটি প্রভৃতির দাম কমাইয়া রাখিতেন। ইহার ফলে কৃষকেরা উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহ পাইত না, কারণ তাহাদের ভাগ্যে লাভের মাত্রা খুবই সামান্য থাকিত। তুর্গো খাদ্য-দ্রব্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেন। একমাত্র প্যারিস শহরে খাদ্যদ্রব্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন রহিল। দার্শনিক ভল্টেয়ার তুর্গোর এই আদেশ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া এক পত্রে লিখিলেন যে, ইহার ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত। একচেটিয়া কারবার সংঘ ও একচেটিয়া ব্যবসায় নিষিদ্ধ করিয়া তিনি আদেশ জারি করিলেন। ফলে একচেটিয়া কারবারী ও তাহাদের সংঘ তুর্গোর শত্রুতা শুরু করিল।

সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অর্থাৎ দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তুর্গো সরকারী ব্যয় ৬৬,০০০,০০০ ফ্রাঁ'তে নামাইয়া আনিলেন এবং জাতীয় ঋণের সুদের পরিমাণ ৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ'য় নামাইয়া আনিলেন। ম্যালশার্বে তুর্গোর অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ লুইয়ের মন্ত্রী এবং ষোড়শ লুইয়ের পরোক্ষ কর বিভাগের—Cours des Aides-এর সভাপতি। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গো খাদ্যশস্যের অবাধ-বাণিজ্য প্যারিস শহরেও চালু করিলেন

তুর্গো কর্তৃক কয়েকটি এডিক্ট্ বা আদেশ জারি

এবং সেই ব্যবসায় যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেই সময়কার সকল দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অপসারণ করিলেন। তদুপরি গরু, চর্বি প্রভৃতির উপর হইতে কর উঠাইয়া দিলেন এবং কর্ভি (corvee) নামক বেগার খাটিবার যে-দায়িত্ব কৃষকদের ছিল তাহা নিষিদ্ধ করিলেন। অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ লোক নির্বিশেষে করদান বাধ্যতা-মূলক করা হইল। এইভাবে তুর্গো সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম শুরু করিলেন, বলা যাইতে পারে।

অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত প্যারিসের পার্লামেণ্ট (Parlement of Paris) সরকারী আদেশ বা আইন রেজিস্ট্রী করিত। অর্থাৎ রেজিস্টারে লিখিয়া রাখিত। পার্লামেণ্ট কেবলমাত্র কয়েকটি কর্মচারী-পদ বিলোপ সংক্রান্ত আদেশটি রেজিস্ট্রী করিতে রাজী হইল অন্যগুলি সামন্ত স্বার্থ-বিরোধী বলিয়া রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজা স্বয়ং পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইয়া আইনগুলি রেজিস্টারিভুক্ত করিতে আদেশ করিলে পার্লামেণ্ট তাহা করিতে বাধ্য হইত। ষোড়শ লুই তাহাই করিলে তুর্গোর চেষ্টা জয়যুক্ত হইল। পূর্বেকার অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া যাহারা অবৈধভাবে অর্থ আয় করিত তাহারা স্বভাবতই তুর্গোর শত্রুতে পরিণত হইল এবং তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিল। অভিজাত ও বণিক-সম্প্রদায়ের অনেকেই রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত-এর অনুগ্রহভাজন ছিল। তাহারা রাণীর সাহায্যে ষোড়শ লুইকে দিয়া তুর্গোকে পদচ্যুত করাইতে সচেষ্ট হইল। তুর্গো একই সঙ্গে বহু

সংস্কার সাধন করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁহার পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তথাপি তুর্গো জাতীয় সভার (National Assembly) গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চল হইতে ক্রমপর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া একটি আদেশ বা 'এডিকট্' (Edict) জারি করিলেন। ইহাতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি জাতীয় সভার সদস্য নির্বাচন করিবে এই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। তুর্গো মনে করিতেন যে, ফ্রান্স তখন গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠে নাই। সেজন্য এই জাতীয় সভাকে তিনি কেবল পরামর্শদানের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের বণিক শ্রেণী, শিল্পোৎপাদক, কৃষক যাহারা তুর্গোর অন্যান্য আদেশের ফলে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন অন্য সকলেই তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। ম্যরেপাস তুর্গোর ক্রম-বর্ধমান ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইলেন, তুর্গো কম সুদে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করায় ফ্রান্সের মহাজন শ্রেণীও ক্ষুব্ধ হইল। রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত প্রথমদিকে ব্যয়-সংকোচন-নীতি অনুসরণ করিলেও এখন আবার যথেচ্ছভাবে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। পলিগনাক্ পরিবারের জনৈক অভিজাত ব্যক্তিকে রাণীর অনুরোধে লণ্ডনে দূত হিসাবে পাঠান হইয়াছিল। সেইখানে তিনি নানাপ্রকার আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে জড়াইয়া পড়িলে তুর্গো তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন। রাণী এজন্য তাঁহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। কয়েকজন মন্ত্রী, অভিজাত ব্যক্তি গোপনে রাণীর সাহায্যে তুর্গোর অপসারণ চাহিলে রাণী ষোড়শ লুইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করিলেন। ম্যরেপাসও তুর্গোর বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

জাতীয়সভা গঠনের ও উহার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা রচনা

তুর্গো এইসব বিরুদ্ধ-শক্তি দমনে রাজার সাহায্য চাহিলে তিনি নির্বিকার রহিলেন। পরিস্থিতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া তুর্গো ষোড়শ লুইকে এক পত্রে (এপ্রিল ৩০, ১৭৭৬) জানাইলেন যে, এই দুর্বলতাই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের কারণ হইয়াছিল এবং ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লুই রাজা হইয়াও ক্রীতদাস অপেক্ষা অধিক কিছু ছিলেন না।*

মে মাসের ১২ তারিখ ষোড়শ লুই তুর্গোকে পদত্যাগ করিতে আদেশ করেন। তুর্গো সেই আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন।

ষোড়শ লুইয়ের দুর্বলতাই প্রধানত তুর্গোর পদচ্যুতির জন্য দায়ী ছিল। ষোড়শ লুই তাঁহার রাণীর মতামত উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়ভাবে তুর্গোর পশ্চাতে দাঁড়াইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই। ষোড়শ লুইকে তুর্গো পত্রে যাহা লিখিয়া-ছিলেন তাহা ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় পরবর্তী কালে সত্য হইয়াছিল। তুর্গোর পদচ্যুতির

* "Forget not sire, that it was weakness that brought to the block the head of Charles I...that made Louis XIII a crowned slave..." *Rousseau and Revolution*, Will and Ariel Durant, p. 864.

সংবাদে দার্শনিক ভল্টেয়ার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুর্গোর পতনে আমি আমার সম্মুখে কেবল মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি।"*

তুর্গোর পতন ফ্রান্সের পতনের পূর্বাভাস

ইহার পর তুর্গো যে-সকল কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও একে একে পদচ্যুত করা হইল। ম্যালশার্বে তুর্গোর পদচ্যুতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং নিজে ষোড়শ লুইয়ের নিকট পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন। রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত-এর মাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী ম্যারিয়া থেরেসা তুর্গোর পদচ্যুতির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শংকিত হইয়াছিলেন এবং ভল্টেয়ার, ফ্রেডারিক প্রভৃতির মত তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তুর্গোর পতন ফ্রান্সের পতনের পূর্বাভাস মাত্র।

নেকারের নিয়োগ

ষোড়শ লুই তুর্গোর স্থলে মসিয়ে নেকার (Monsieur Necker)-কে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিলেন (১৭৭৬)। দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা বা অর্থনৈতিক জ্ঞানের দিক দিয়া নেকার তুর্গোর সহিত তুলনীয় ছিলেন না সত্য, কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারক হিসাবে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলেন সন্দেহ নাই। তুর্গোর পদচ্যুতিতে কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি হইয়াছিল নেকারের নিয়োগে তাহা অনেকটা দূর হইল। তিনি তুর্গোর মিতব্যয়িতার

নেকারের সংস্কার

নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ইহা ভিন্ন, রাজসভার ব্যয় হ্রাস, পেনশন ইত্যাদির পরিমাণ হ্রাস করিয়া নেকার অর্থ সঞ্চয়ের পথ বাহির করিলেন। নেকার তুর্গোর অনুসৃত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে-সকল কর্মচারী-পদের কোন প্রয়োজন ছিল না সেইরূপ আরও কতক কর্মচারী-পদ তিনি উঠাইয়া দিলেন। মিতব্যয়িতা, হিসাব-পত্রে কঠোর নিয়ম-কানুন চালু করিয়া তিনি সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হইলেন। তিনি ১৪৮ মিলিয়ন ফ্রাঁ ঋণ গ্রহণ করিয়া সরকারের অর্থাভাব দূর করিলেন এবং সংস্কার কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি হাসপাতালগুলির উন্নয়ন, কর-ব্যবস্থায় যে অসঙ্গতি ছিল তাহা দূরীকরণ, স্বল্প সুদে দরিদ্রদের অর্থ ঋণ দানের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিচার-বিভাগের ব্যয় হ্রাস ও রাজ-পরিবার ও রাণীর ব্যক্তিগত ব্যয় হ্রাসের যে-চেষ্টা তুর্গো শুরু করিয়াছিলেন তাহা অব্যাহত রাখিলেন। পরোক্ষ করভার তিনি হ্রাস করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেন। ইহা ভিন্ন ষোড়শ লুইকে তিনি বেরি, গ্রেনোবল, ও মন্টাবানা প্রদেশে প্রাদেশিক সভা (Assembly) স্থাপনে রাজী করাইলেন এবং তাহাতে তৃতীয় শ্রেণী (Third Estate)-এর প্রতিনিধি সংখ্যা যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি সংখ্যার সমান হইবে, এই ব্যবস্থা করিলেন।

অবশ্য এই সকল সভার সদস্যগণ ষোড়শ লুই কর্তৃক মনোনীত হইবেন, এই নীতি নির্ধারিত হইয়াছিল। এই সকল প্রাদেশিক সভাকে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার

* "My eyes see only death in front of me now that Monsieur Turgot is gone". **Voltair,** *Idem.*

দেওয়া হয় নাই, বলা বাহুল্য। ইহা ভিন্ন নেকারের চেষ্টায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শ লুই একটি ঘোষণায় "দরিদ্র জনসাধারণের উপর করের চাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা সেই অনুপাতে করভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং এজন্য তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইতেছে, একথা মনে করিবেন না" এইরূপ বক্তব্য রাখিলেন।

মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সাহায্যে ঋণ গ্রহণ

এদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হইলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ ফ্রান্সের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিলে নেকার বাধ্য হইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উচ্চহারে সুদে বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করিলেন।

প্রথমবার মন্ত্রিত্ব ও পদচ্যুতি (১৭৭৭-৮১)

এই জাতীয় ঋণ বৃদ্ধিতে অভিজাত সম্প্রদায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। এইবারও রাণী আঁতোয়ানেতকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া অভিজাতগণ নেকারকে পদচ্যুত করাইলেন (মে, ১৯, ১৭৮১)। কিন্তু লুই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে পুনরায় নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন (আগস্ট, ২৫, ১৭৮৮)। বিপ্লব শুরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে নেকার সরকারের অর্থনৈতিক অনটন দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে আবার পদচ্যুত করা হইল।

পুনর্নিয়োগ ও দ্বিতীয়বার পদচ্যুতি (১৭৮৮-৮৯)

নেকারের প্রথমবার পদচ্যুতি ও পুনর্নিয়োগের অন্তর্বর্তী কালে (১৭৮১—৮৮) ক্যালোন (Calonne) অর্থসচিব নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে ঋণ গ্রহণ করিয়া সরকারের ও রাজসভার অমিতব্যয়িতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু শীঘ্র এই সর্বনাশাত্মক পন্থার ফলাফল কি হইবে বুঝিতে পারিয়া একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইলেন। এজন্য নূতন ভূমিকর স্থাপন করা হইল। পার্লামেন্ট অব্ প্যারিস ইহার বিরোধিতা করিবে নিশ্চিত জানিয়া ক্যালোন কাউন্সিল অব্ নোটেব্‌ল্‌স্ আহ্বান করিয়া উহার সমর্থন লইয়া নূতন কর চালু করিতে চাহিলেন (১৭৮৭)। অভিজাত শ্রেণী, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া সভা গঠন করা হইল। এই সভার নিকট ক্যালোন কতকগুলি প্রয়োজনীয় আইন উপস্থিত করিলেন। সকলের উপরই সম্পত্তিকর স্থাপন, অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রচলন, টেইলির পরিমাণ হ্রাস, কর্ভি প্রথা উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি আইনের প্রস্তাব করিলেন। সকলের উপর কর স্থাপন করিয়া অভিজাত ও অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার প্রস্তাবে কাউন্সিল অব্ নোটেব্‌ল্‌স্ রাজী হইল না। ক্যালোন কোন কার্যকরী কিছু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন দেখিয়া লুই তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং দুর্বলজনোচিত সিদ্ধান্ত লইয়া অভিজাত শ্রেণীর সন্তুষ্টি বিধান করিলেন।

ক্যালোন ঃ তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টা

ক্যালোনের পদচ্যুতি

স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বানের দাবি

মার্কুইস অব্ ল্যাফায়েৎ (Marquis of Lafayette) এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের জাতীয় সভা স্টেট্‌স্-জেনারেলই একমাত্র সভা যাহা কর স্থাপন করিতে পারে এই দাবি করিলেন। লুই এমতাবস্থায়

নোটেব্‌ল্‌স্‌ সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন কিন্তু এই সভায়ই আসন্ন বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

ক্রমে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল অধিবেশন ডাকিবার পক্ষে দাবি এমন সোচ্চার হইয়া উঠিল এবং সরকারের আর্থিক সংকট এমন চরমে পৌঁছিল যে, লুই বাধ্য হইয়া ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করিয়া আদেশ জারি করিলেন। এই সভা আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হইল।

স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান (৫ই জুলাই, ১৭৮৮)

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ষোড়শ লুই যখন ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচনের আদেশ জারি করিলেন তখন ফরাসী জাতি গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল নির্বাচিত হইতে চলিল। দীর্ঘ ১৭৪ বৎসরের অনভ্যাসবশত এই সভার নির্বাচন সম্পর্কে কাহারও কোনপ্রকার ধারণাই ছিল না। নিজ অভিজ্ঞতা হইতে নির্বাচন সম্পর্কে কিছু জানাইবার মত কোন লোকও জীবিত ছিল না। পুরাতন কাগজপত্র হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নির্বাচন ব্যবস্থা স্থির করা হইল। স্বভাবতই তাহাতে নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি রহিয়া গেল। যাহা হউক সরকার প্রকৃতই যে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় সভার সাহায্য-সহায়তা চাহেন এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ দূর করিতে বদ্ধপরিকর তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি এস্টেট্‌ বা স্টেট্‌স্‌-জেনারেল অর্থাৎ জাতীয় সভার প্রতিনিধি কিভাবে নির্বাচিত হইবে তাহার বিধি-নিয়ম প্রচার করিলেন এবং জনসাধারণকে *Cahiers de doleances* i.e. list of grievances—অভাব-অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করিতে জানাইলেন। এই সকল Cahiers বা অভাব অভিযোগের তালিকার উপর নির্ভর করিয়া এস্টেট্‌স্‌-জেনারেলের সভায় অলোচনা যাহাতে করা সম্ভব হয় তাহা ছিল এই আদেশের উদ্দেশ্য। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় যে-সকল 'কেহিয়াস' প্রস্তুত করিয়াছিল সেগুলিতে তাহারা এই দুই সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সুযোগ-সুবিধা অপরিবর্তিত রাখিবার দাবি করিল। অবশ্য কর স্থাপনে সমতার নীতি তাহারা মানিতে রাজী হইল এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের মত তাহারাও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কতকগুলি ত্রুটি দূর করিবার দাবি জানাইল। রাজতন্ত্রের অমিতব্যয়িতা, মন্ত্রীদের স্বৈরাচারী কার্যকলাপ, Lettre de cachet নামক পরওয়ানার সাহায্যে যে-কোন ব্যক্তির উপর আক্রোশ চরিতার্থ করা, ক্ষতিকর আন্তঃশুল্ক ব্যবস্থা প্রভৃতির অবসানও তাহারা দাবি করিল।

স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর সভ্য নির্বাচনের ঘোষণা (জুলাই ৫, ১৭৭৮)

দীর্ঘকালের অনভ্যাস : শান্তিপূর্ণভাবে ও ধৈর্যসহকারে নির্বাচন সম্পন্ন

'কেহিয়াস' (Cahiers)

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবি

তৃতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায় (Thrid Estate)-এর বুর্জোয়া (bourgeoisie) অংশ

অর্থবলে, শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল শ্রেষ্ঠ। তাহারা প্রচারপত্র ছাপাইয়া এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য সকলের উপর সহজেই প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইল। বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যে 'কেহিয়ার' প্রস্তুত করিল তাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বক্তৃতা বা রচনার মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে সমবেত হইবার স্বাধীনতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না হইবার স্বাধীনতা, যাজক, অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় এই তিনের সম্পূর্ণ সমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও দায়-দায়িত্ব পালনের সমতা এবং সামন্ত-প্রথাজনিত ভূমিদাস-প্রথার ও অপরাপর দায়িত্বের বিলোপ, দাবি করিল। গ্রামাঞ্চল হইতে যে-সকল কেহিয়ার প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেগুলি প্রধানত কৃষকদের পক্ষ হইতে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপরিভাগের লোকেরা যে-সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়াছিল গ্রামের কেহিয়ারেও সেই সকল দাবিই সমর্থন করা হইয়াছিল এবং সামন্ত-প্রথাজনিত যে-সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা, যেমন ভূমিদাসত্ব প্রভৃতির অবসান বিশেষভাবে দাবি করা হইয়াছিল। শহরের শ্রমিক শ্রেণীর কেহিয়ারের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা কয়েকটি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে খাদ্যশস্য, রুটি প্রভৃতির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযোগ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবি তাহাতে করা হয় নাই।*

তৃতীয় শ্রেণীর বুর্জোয়া অংশের দাবি

কৃষক ও মজুরদের দাবি

এই সকল কেহিয়ারের মোট ৬১৫টির মধ্যে ৫২২টি এখনও সংরক্ষিত আছে। এগুলি হইতে ফরাসী বিপ্লবের গতি কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। তথাপি ফরাসী জাতি অতিশয় শান্তিপূর্ণভাবে ও ধৈর্যসহকারে এই নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইল। কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য গোলযোগ না হইবার ফলে জাতীয় সভার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। এদিকে পরিস্থিতির চাপে ষোড়শ লুই নেকারকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট আবার অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব দিতে বাধ্য হইলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে† তারিখে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর সদস্যগণকে ষোড়শ লুই ভার্সাই-এর রাজসভায় সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন এবং সরকারের আর্থিক অনটনের কথা তাহাদিগকে জানাইলেন। ৫ই তারিখে এই সভার আনুষ্ঠানিক অধিবেশন শুরু হইল। ষোড়শ লুই, তাঁহার মন্ত্রী ও কম্পট্রোলার অব্‌ ফিনান্স—নেকার, প্রথমে বক্তৃতায় স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর সম্মুখীন সমস্যা সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করিলেন।

স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর আনুষ্ঠানিক অধিবেশন (৫ই মে, ১৭৮৯)

---

* Vide *The New Cambridge Modern History*, vol. viii, pp. 663-65.

† কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৪ঠা মে, ১৭৮৯

Vide *The Age of Napoleon*, p. 13, Will and Ariel Durant.

এই সকল বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে সদস্যগণকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

স্টেটস্-জেনারেল-এর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১২১৪। প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজকদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০৮ : অভিজাত সম্প্রদায়ের ২৮৫ এবং জনসাধারণের অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের ৬২১। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর বঞ্চিত, পদানতদের মধ্য হইতে উদ্ভূত হয় নাই, তৃতীয় শ্রেণীর উপরের অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়াদের মধ্য হইতেই নেতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। যাহারা বিত্ত, শিক্ষা-দীক্ষায় যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা উন্নততর ছিল অথচ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় যাহারা সমমর্যাদা-লাভে সমর্থ ছিল না সেই বুর্জোয়া, বুর্জোজি বা মধ্যবিত্তদের মধ্য হইতে ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বের উত্থান ঘটিয়াছিল। বস্তুত তৃতীয় শ্রেণীর ৬২১ জন প্রতিনিধির এক নগণ্য সংখ্যা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু স্টেটস্-জেনারেলের সদস্যদের মাথাপিছু একটি করিয়া ভোট ছিল না। সমগ্র প্রথম শ্রেণীর ১ ভোট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ ভোট এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১ ভোট—এইভাবে মোট তিনটি মাত্র ভোট ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে একটি ভোট থাকিবার ফলে, তৃতীয় সম্প্রদায়ের মোট সদস্যসংখ্যা প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী থাকা সত্ত্বেও কোন সুবিধা হইল না। কারণ, স্বার্থের খাতিরে প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় সর্বদাই এক পক্ষে থাকিত। তাহাদের মোট ভোট হইত দুইটি, অপরদিকে সাধারণ প্রতিনিধিদের ভোট থাকিত মাত্র একটি। এই কারণে তৃতীয় সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ, সদস্যদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট দাবি করিলেন। কারণ মাথাপিছু ভোটাধিকার দেওয়া হইলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইবেন। তাঁহারা দাবি করিলেন যে, তিন সম্প্রদায়ের সদস্যদিগকে লইয়া একটি জাতীয় সভা গঠন করা হউক এবং প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হউক। কিন্তু ষোড়শ লুই তাঁহাদের এই দাবি মানিতে রাজী হইলেন না। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণেরও স্বভাবতই ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। ২৭শে মে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদিগকে একই সভায় সম্মিলিত হইয়া এই সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ জানাইলেও সেই দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ একত্রে মিলিত হইতে রাজী হইলেন না। মন্ত্রীরাও এই অচলাবস্থার অবসানকল্পে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

প্রতিনিধি সংখ্যা : যাজক সম্প্রদায়; ৩০৮, অভিজাত সম্প্রদায় : ২৮৫, তৃতীয় সম্প্রদায় : ৬২১

তৃতীয় শ্রেণীর উপরাংশ অর্থাৎ বুর্জোজি বা মধ্যবিত্ত হইতে বিপ্লবের নেতৃত্ব

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে একটি মাত্র ভোট

জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ চিরকাল সংখ্যালঘিষ্ঠ দল

একই সভা এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট দাবি

এদিকে ব্রিটানি প্রদেশ হইতে কয়েকজন নির্বাচিত তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) প্রতিনিধি "ব্রেটন ক্লাব" (Club Breton) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। সায়েস, রোবস্পিয়ার, মিরাবো (Sieyes, Robespierre, Mirabeau) এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ কি কৌশল অবলম্বন করিবেন, এই ক্লাবে সায়েস ও অন্যান্য সভ্যরা-ই স্থির করিতেন। ১৬ই জুন (১৭৮৯) সায়েসের পরামর্শক্রমে স্থির হইল যে, যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে শেষবারের মত তৃতীয় শ্রেণীর সহিত মিলিতভাবে কাজ করিতে আহ্বান করা হইবে এবং ইহাতে তাহারা অসম্মত হইলে ফরাসী জাতির মোট জনসংখ্যার ২৫ মিলিয়নের মধ্যে ২৪ মিলিয়ন তৃতীয় শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি হিসাবে কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন শুরু করিবে। যাজক ও অভিজাত প্রতিনিধিগণ এই আমন্ত্রণে সাড়া না দেওয়ায় ১৭ই জুন (১৭৮৯), তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ৪৯১ জন পক্ষে এবং ৮৯ জন বিপক্ষে (কাহারো কাহারো মতে ৪৯০ পক্ষে ও ৯০ বিপক্ষে) ভোট দিয়া নিজেদের লইয়া জাতীয় সভা (National Assembly) গঠন করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা এক প্রস্তাবে বলিলেন যে, তাঁহারা ফরাসী জাতির শতকরা ৯৬ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহারাই জাতির প্রকৃত মুখপাত্র। এই সময় হইতেই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সূচনা হইল, বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজেদের 'জাতীয় সভা' (National Assembly) বলিয়া ঘোষণা, জুন ১৭, ১৭৮৯

এই পরিস্থিতিতে ১৯শে জুন অর্থাৎ দুই দিন পরে যাজক সম্প্রদায় ১৪৯ পক্ষে এবং ১৩৭ বিপক্ষে ভোটে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির সঙ্গে মিলিত হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ইহাতে অভিজাত প্রতিনিধিগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা ষোড়শ লুইকে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন।

যাজক সম্প্রদায়ের তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ

যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতাশালী অংশ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় ষোড়শ লুই তৃতীয় সম্প্রদায়কে দমন করিতে চাহিলেন। তিনি স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর অর্থাৎ জাতীয় সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে এ-বিষয়ে কোন খবর জানান হইল না। ২০শে জুন স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর অধিবেশন বসিবার সময় তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আসিয়া দেখিলেন যে, সভাগৃহ বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহার প্রবেশ-পথে সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে।* ইহা তাঁহারা

ষোড়শ লুই-এর দমন-নীতি

* ২০শে জুন জাতীয় সভা যে-হলে সমবেত হইবার কথা ছিল তাহা বন্ধ রাখা সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে. নিচে সেগুলি দেওয়া হইল :

"In the meantime sessions of all the estates were suspended, and the hall where the National Assembly was accustomed to meet, was closed and locked. Unfortunately for the king's plans, the Third Estate had not been informed in (contd.)

সমগ্র ফরাসী জাতির অপমান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে (Tennis Court) সমবেত হইলেন এবং সকলে গভীর আন্তরিকতার সহিত শপথ গ্রহণ করিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ফরাসী জাতির জন্য একটি সংবিধান রচনা না করিতে পারিবেন এবং ফরাসী রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক না করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া চলিবেন। এই শপথ 'টেনিস কোর্ট ওথ' (Tennis Court Oath) নামে বিখ্যাত। এই সময় হইতে জাতীয় সভা সংবিধান সভার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

টেনিস কোর্ট ওথ (Tennis Court Oath), জুন ২০, ১৭৮৯

এদিকে ষোড়শ লুই স্টেট্‌স-জেনারেল-এর সকল সদস্যের এক অধিবেশন আহ্বান করিয়া (জুন ২৩) প্রতিনিধিগণকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আলাদাভাবে ভোট দিতে হইবে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করিতে না পারিলে রাজতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িবে। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-গণকে তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা ফরাসী জাতির প্রতিনিধি এবং সেজন্য জাতীয় সভা গঠনের তাহারাই একমাত্র অধিকারী এই দাবি অন্যায় এবং অবৈধ। ষোড়শ লুই অবশ্য লেত্‌র দ্য কেশে, কর্ভি, আন্তঃশুল্ক, ভূমিদাস-প্রথা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু যাজক,অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি কোন কিছুর উপর হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করিবেন না এবং সেইরূপ কিছু করা হইলে তাহা নাকচ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। তিনি সকলকে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে এবং পরের দিন হইতে তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের

রাজা প্রতিনিধিবর্গকে চিরাচরিত প্রথা অনুসরণের কথা স্মরণ করাইলেন

time of this decision, and gathered as usual on the 20th to begin its sitting. When the deputies found the doors of the assembly-room barred and even picketed by armed guards, they regarded it as a calculated insult" *A Short History Modern Europe*, p. 282, Riker.

"On 20 June a further challenge was thrown down when the new Assembly found itself—accidentally it seems—locked out of its usual meeting-hall." *The New Camb. Modern History*, vol. viii, p. 668.

"Shocked by this desertion the heirarchy joined the nobility in an appeal to the king to prevent this union of the orders, if necessary by dismissing the Estates. Louis responded, on the evening of June 19, by ordering the Hotel des Menus Plaisiris (meeting hall) to be closed at once to permit its preparation for seating the three orders at a 'royal session' to be held on June 22. When the deputies of the Third Estate appeared on the twentieth they found the doors locked." *The Age of Napoleon*, p. 16, Will and Ariel Durant.

জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক কক্ষে সমবেত হইতে আদেশ করিলেন।* কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। রাজার বক্তৃতা শেষ হইলে পর অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সাধারণ সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তখনও বসিয়া রহিলেন। সভাগৃহের পরিচালক তাঁহাদিগকে সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলে মিরাবো (Mirabeau) নামক একজন প্রভাবশালী সাধারণ প্রতিনিধি উত্তর করিলেন: "আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে এখান হইতে বাহির করিতে হইলে একমাত্র বলপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন পন্থা নাই।"† এই সংবাদ যোড়শ লুয়ের নিকট পেঁছিলে তিনি নিতান্ত অসহায়ের মতই বলিয়াছিলেন: "বেশ, তাহা হইলে তাহারা সভাকক্ষে থাকুক।" ††

মিরাবো'র ঘোষণা

এদিকে ২৫শে জুন (১৭৮৯) অর্লিয়েন্সের ডিউক ৪৭ জন অভিজাত প্রতিনিধি লইয়া তৃতীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত যোগ দিলেন। এইভাবে অভিজাত ও যাজকদের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে জাতীয় সভায় একত্রে মিলিত হইবার এবং নিজ নিজ সামন্ততান্ত্রিক অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগের একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হইল। পরিস্থিতি বিবেচনায় যোড়শ লুই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে একত্রে একই সভায় বসিবার এবং প্রত্যেককেই একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার দান করিয়া আদেশ জারি করিলেন (২৬শে মতান্তরে ২৭শে জুন ১৭৮৯)। যোড়শ লুই কর্তৃক সাধারণ প্রতিনিধিগণের দাবি স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যে জনসাধারণের সর্বপ্রথম সাফল্য ঘটিল। এইভাবে বিপ্লবের গতি ক্রমেই সহজ ও অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

লুই কর্তৃক তিন সম্প্রদায়ের একত্রে অধিবেশন ও ব্যক্তিগত ভোট স্বীকৃত

জাতীয় সভার সদস্যগণ যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে ব্যস্ত তখন সভাগৃহের বাহিরেও বিপ্লবের প্রকাশ দেখা যায়। ঐ বৎসর অজন্মার ফলে কৃষকদের দারিদ্র্য চরমে পেঁছিল। তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্যারিস নগরীতে খাদ্যের সন্ধানে উপস্থিত হইল,

প্যারিস নগরীতে বিপ্লবাত্মক কার্যাদি

* "I order you, gentlemen, to disperse atonce and to appear tomorrow morning each in room set apart for his own order." Vide *The Age of Napoleon*, p. 16, Will and Ariel Durant.

† "Go and tell those who sent you that we are here by the will of the people and we will leave our places only if compelled by armed force." *The Age of Napoleon*, p. 17, Will and Ariel Durant.

"Know you that nothing but bayonet will avail to disperse the Commoners of France"—Mirabeau, Quoted by Riker, p. 283.

†† "Well, then let them stay" *Ibid*, p. 203.

ফলে প্যারিস নগরী বিপ্লবের আগুন ছড়াইবার উপযুক্ত দাহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ হইল। সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লুটপাট শুরু হইল। বিপ্লবের উন্মাদনা যেন সকলকেই পাইয়া বসিল। সৈন্যদের মধ্যেও এই উন্মাদনার প্রভাব বিস্তৃত হইল। প্যারিস নগরীর সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্বেই শহরে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। সাধারণ সম্প্রদায় হইতে গঠিত একটি নাগরিক সেনাদল (citizen army) প্যারিস নগরীতে স্থাপনের জন্য তাহারা জাতীয় সভা অর্থাৎ স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর নিকট আবেদন করিল।

শান্তিরক্ষার কার্যে নাগরিকগণের দায়িত্বশীল কার্যকলাপ

এদিকে ষোড়শ লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিচলিত হইলেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় তাঁহাকে পরিস্থিতি বিবেচনায় সুপরামর্শ দিতে পারিল না। লুই এক ভাড়াটিয়া জার্মান ও সুইস (Swiss) সৈন্যদল ভার্সাই নগরীর উপকণ্ঠে মোতায়েন করিলেন (জুলাই ১, ১৭৮৯)। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সভার সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করা, এমন কি, জাতীয় সভা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হইলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ স্বভাবতই রাজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। মিরাবো অনতিবিলম্বে এই সৈন্যদল অপসারণের দাবি করিলেন। ষোড়শ লুই জানাইলেন যে, এই সৈন্য মোতায়েনের একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভার্সাই নগরীর উপকণ্ঠে সৈন্য মোতায়েন

প্রতিনিধি সভা সন্দিগ্ধ

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরে (১১ই জুলাই, ১৭৮৯) অর্থমন্ত্রী বা কম্পট্রোলার অব্ ফিনান্স (Comptroller of Finance) নেকারকে লুই পদচ্যুত করিয়া এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিলেন। নেকার-এর সংস্কার জনস্বার্থ বৃদ্ধি করিয়াছিল, এই কারণে তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পদচ্যুতি বিপ্লবের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। প্যারিস ও অন্যত্র ব্যাপক মারামারি শুরু হইল। গোলাবারুদ ও বন্দুকের দোকানগুলি জনতা দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক আদায়ের কুঠিগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সামন্ত-প্রথাজনিত যাবতীয় শোষণযন্ত্রের বিনাশ সাধন করিল। এই সংবাদ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-বর্গের কানে পৌঁছিলে তাহারা সামন্ত-প্রথাজনিত আধিপত্য ও সুযোগ-সুবিধা আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে না বিবেচনায় স্বেচ্ছায় নিজ নিজ অধিকার ত্যাগ করিল। এইভাবে সামন্ত-প্রথার শেষ চিহ্নটুকুর বিলোপ সাধিত হওয়ায় সামাজিক

নেকার-এর পদচ্যুতি (১১ই জুলাই, ১৭৮৯)

ব্যাপক লুটপাট: গ্রামাঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ

সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণ এই পরিস্থিতি হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 'ন্যাশন্যাল গার্ড' (National Guard) নামে এক জাতীয় বাহিনী গঠন করিল। ল্যাফায়েৎ হইলেন এই বাহিনীর অধ্যক্ষ। কিন্তু ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯, এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল (Bastille) দুর্গ আক্রমণ করিয়া সেখানে রক্ষিত বন্দুক ও গোলাবারুদ হস্তগত করিতে এবং এই দুর্গকে ধূলিসাৎ করিয়া অত্যাচারী শাসনের প্রতীক নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিছুকাল পূর্ব হইতে এই দুর্গে বিনা-বিচারে লোককে আটক রাখা হইত বলিয়া বাস্তিল দুর্গটি অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইত। জনতার আক্রমণে বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিল। (১) অত্যাচারের প্রতীক নাশের মধ্যে বাস্তিল দুর্গের পতনের গুরুত্ব নিহিত ছিল। জনতা কর্তৃক বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার কেবলমাত্র স্বৈরাচারী অত্যাচারের প্রতীক বিনাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, (২) ইহার ফলে জাতীয় সভা রাজা ষোড়শ লুইয়ের ভার্সাই শহরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর প্রাধান্য হইতে মুক্ত হইয়াছিল, এবং (৩) প্যারিস শহরে প্রশাসনকে রাজা কর্তৃক মোতায়েন সেনাবাহিনীর আধিপত্য ও ভীতি হইতে রক্ষা করিয়াছিল। (৪) ইহা একদিকে যেমন বুর্জোয়া বিপ্লবকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল তেমনি প্যারিসের জনতার হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া প্রলিটারিয়েটদের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল,* (৫) বাস্তিলের পতন এক স্বাধীন, মানবিক এবং ন্যায়পরায়ণ যুগের সূচনা করিয়াছিল, বলা যাইতে পারে। (Camb. *Modern History*, vol. viii, p. 162) ইহার অব্যবহিত পরেই লুই নেকারকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন; ভার্সাই নগরীর উপকণ্ঠে যে সৈন্য তিনি মোতায়েন করিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া লইলেন। এই সাফল্যের মধ্য দিয়া ক্রমেই জনতা (mob) বিপ্লবের গতি পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

ন্যাশন্যাল গার্ড গঠন : ল্যাফায়েৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত

বাস্তিল দুর্গ পতনের গুরুত্ব

অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস : জনতার জয়লাভ : নেকারকে তৃতীয়বার নিয়োগ

প্যারিস নগরীর মারামারি কাটাকাটি তখনও থামে নাই। তথাকার জনসাধারণ দিন দিন অধিকতর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জনমত তখন এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। বহু সংখ্যক দৈনিক পত্রিকায় অশান্তির দৈনন্দিন খবর পরিবেশিত হইতে লাগিল। জীন পল ম্যারা (Jean Paul Marat)-এর "দি ফ্রেন্ড অব্ দি পিপল্" (The Friend of the People) পত্রিকা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের নিম্নতম দরিদ্র ব্যক্তিগণও জনমত গঠনের এবং জনমত প্রকাশের দায়িত্ব উপলব্ধি করিল।

প্যারিস নগরীতে অশান্তি : ম্যারা-এর নেতৃত্বে জনমত গঠন

এই সকল বিপ্লবাত্মক ঘটনার ফলে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল তাহাতে বেকারত্ব,

* Vide : *The Age of Napoleon*, pp. 19-20, Will and Ariel Durant.

দারিদ্র্য, অনাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতির সুযোগ লইয়া সব কিছুর দাম অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়া মাত্রাহীন মুনাফা লুটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফল হইল বিপরীত। জলযানে বাহিত খাদ্য শহরে পৌঁছিবার পথে লুঠ হইতে লাগিল। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে প্যারিস শহরে বিশেষভাবে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইল। নিরাপত্তার অভাবে পরিবহন-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গ্রামাঞ্চলে চোর-ডাকাত, খুনী, সমাজ-বিরোধীদের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলে গ্রামবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে চারি লক্ষ বন্দুক গ্রামবাসী সংগ্রহ করিল। চোর-ডাকাত, সমাজ-বিরোধীদের ভয় যখন হ্রাস পাইল তখন গ্রামবাসী ভূস্বামীদের নিকট হইতে তাহাদের জমির ইজারার দলিল বলপূর্বক আদায় করিয়া সেগুলি জ্বালাইয়া দিল। যাহারা দলিল জনতার নিকট দিতে রাজী হইল না তাহাদের বাড়ীঘর আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইল। আগস্ট মাসের (১৭৮৯) গোড়ার দিকে জাতীয় সভার নিকট সংবাদ পৌঁছাইল যে, ফ্রান্সের সর্বত্র গ্রামাঞ্চলের ভূস্বামীদের বাসস্থান জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সকল প্রকার সম্পত্তির উপর আক্রমণ চালান হইতেছে, কর বা সামন্তদের প্রাপ্য কোন কিছু আদায় করা সম্ভব হইতেছে না, আইন সম্পূর্ণ অচল এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে।*

প্যারিস ও ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস ধরিয়া প্যারিস শহরে খাদ্যের জন্য মারামারি চলিল। ভার্সাই নগরীর রাজসভার বিরুদ্ধে স্বভাবতই এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ম্যারা-এর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দারুণ উন্মত্ততার সৃষ্টি করিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন, "Put that Austrian woman (the Queen) and her brother-in-law (Artois) in prison···Seize the ministers and their clerks and put them in irons." প্যারিসের দরিদ্র পরিবারগুলির দুর্দশা চরমে পৌঁছিলে ৫ই অক্টোবর ল্যাফয়েতের নেতৃত্বে কয়েক হাজার স্ত্রীলোক (Six thousand fish-wives) খাদ্য দাবি করিতে ভার্সাই নগরীর দিকে রওনা হইল। এক উন্মত্ত-জনতার হস্তে একপ্রকার বন্দী অবস্থায়-ই রাজা ও রাণী ভার্সাই হইতে প্যারিস নগরীতে

দারিদ্র্য বৃদ্ধি : প্যারিসের দরিদ্র স্ত্রীলোকদের খাদ্যের জন্য ভার্সাই গমন : বন্দী হিসাবে রাজ-পরিবারের প্যারিসে আগমন

* "On the night of August 2, 1789, a deputy reported to the Assembly at Versailles: "Letters from all provinces indicate that property of all kinds is a prey to the most criminal violence; in all sides chateaux are being burnt, convents destroyed, and farms abandoned to pillage. The taxes, the feudal dues are extinct, the laws are without force and the magistrates without authority". *The Age of Napoleon*, p. 22, Will & Ariel Durant.

আসিতে বাধ্য হইলেন।* বাস্তিলের পতনের পর জনতা পুনরায় এইভাবে নিজ শক্তি প্রদর্শন করিল।

রাজা জনতার চাপে প্যারিসে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, তথাপি রাজার প্রতি তখনও জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা সম্মান নেহাত কম ছিল না। ষোড়শ লুই যদি দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেন এবং জনসাধারণের ইচ্ছার সহিত রাজতন্ত্রকে মানাইয়া লইতেন তাহা হইলে ফরাসী বিপ্লবের গতি অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু লুই সেই দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, ফলে ফরাসী জাতি ও জাতীয় প্রতিনিধিবর্গের সহিত তাঁহার ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও ক্রমেই রক্তে রঞ্জিত হইয়া চলিল।

রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য দূরদর্শী নীতির প্রয়োজন

লুই-এর সংকীর্ণতা ঃ বিপ্লবের নীতির প্রয়োজন

ভার্সাই হইতে রাজ-পরিবারের প্যারিস নগরীতে আসিবার ফলে জাতীয় সভাকেও প্যারিসে অধিবেশন বসাইতে হইল। এখন হইতে এই সভা ফ্রান্সের এক নূতন সংবিধান গঠনে মনোনিবেশ করিল। স্বভাবতই ইহা ফরাসী সংবিধান-সভা বা Constituent Assembly-তে পরিণত হইল।

জাতীয় প্রতিনিধি সভা জাতীয় সংবিধান-সভায় পরিণত

ফরাসী সংবিধান-সভা ঃ বিপ্লবী সংবিধান (The French Constituent Assembly : Revolutionary Constitution) ঃ প্রথমেই প্রশ্ন উঠিল—ফ্রান্সে রাজতন্ত্র রাখা হইবে কিনা। রাজতন্ত্র রক্ষা এবং উহা ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশানুক্রমিক করিতে সকলেই সম্মত হইলেন। তারপর সংবিধান-সভা এক প্রস্তাবনা-পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন, ইংলণ্ডের ম্যাগ্‌না কার্টা (Magna Carta), আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (Declaration of Independence) প্রভৃতির অনুকরণে "ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা" (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) নামে এক প্রস্তাবনায় ফরাসী নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি—রাজনৈতিক, সাংবিধানিক এবং সামাজিক—লিপিবদ্ধ হইল। এই প্রস্তাবনা-পত্র ম্যাগ্‌না কার্টা ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র ছাড়া রুশোর মতাবাদ হইতেও কতক নীতি গৃহীত হইল। ইহাতে মানুষ ও মানুষের প্রভেদ বিলুপ্ত করিয়া প্রত্যেককেই স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার দেওয়া হইল। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই ঘোষণা কেবল ফরাসী জন-

ফরাসী সংবিধানের কার্যাদি ঃ

(১) ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা ঃ

স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার ঃ আইনের চক্ষে সাম্য, বিনা-বিচারে বন্দী করা নিষিদ্ধ ; ব্যক্তি-

* "It has been appropriately called 'the Funeral march' of the old monarchy." Riker, p. 288.

স্বাধীনতা, সম্পত্তি-ভোগ ও ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, অন্যায়ের বিরোধিতা জন্মগত অধিকার ; ধর্মপালন ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

সাধারণের অধিকারের ঘোষণা ছিল না, ইহা ছিল সর্বজনীন—পৃথিবীর মানুষ মাত্রেরই অধিকারের ঘোষণা। ফরাসী বিপ্লবের সর্বজনীনতার মূল নীতি এখানেই আমরা দেখিতে পাই। নাগরিকের অধিকার বলিতে অবশ্য জাতীয় সভায় (সংবিধান-সভা) মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিবর্গ ফরাসী নাগরিকগণ যে-সকল নাগরিক অসুবিধা ভোগ করিত সেগুলি দূর করিবার যে আশা পোষণ করিতেন সেগুলিই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।* ইহাকে "*Death certificate of Old Regime*" বলা হইয়াছে (ডেভিড টমসন)। এই ঘোষণা পত্রে বলা হইল ঃ (১) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং মানুষমাত্রেই সমান অধিকারের অধিকারী। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত ; (২) আইনের দৃষ্টিতে সকল ব্যক্তিই সমান এবং বিনা-বিচারে কাহাকেও বন্দী করা বা গ্রেফতার করা চলিবে না ; (৩) ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি-ভোগের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরোধিতা করা ব্যক্তিমাত্রেরই মৌলিক অধিকার ; (৪) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই সমভাবে থাকিবে : (৫) সরকারী চাকরি যোগ্যতা অনুযায়ী সকলেই সমানভাবে পাইবার অধিকারী ; (৬) করভার সকলের উপরেই ন্যায্যভাবে বণ্টিত হইবে।

(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ

প্রস্তাবনা-পত্র পাস করিয়া সংবিধান-সভা একটি গণতান্ত্রিক এবং শ্রেণীগত বৈষম্য-হীন শাসনতন্ত্র গঠনে মনোযোগী হইল। এই নূতন শাসন-পদ্ধতিতে রাজার স্থান কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে সংবিধান-সভার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

রাজ-ক্ষমতা নির্ধারণে মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ

(১) রাজার ক্ষমতা প্রতিনিধি-সভার অধীনে স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। রাজ-ক্ষমতা নির্ধারণে সংবিধান-সভা মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন (Separation of powers) নীতি অনুসরণ করিলেন।

রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঃ সিভিল লিস্ট প্রস্তুতকরণ

(২) রাজার ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং রাজ-পরিবারের ব্যয় কি হইবে তাহার একটি তালিকা, 'সিভিল লিস্ট' (Civil list) প্রস্তুত করা হইল। এই তালিকা অনুযায়ী রাজাকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে স্থির হইল। (৩) রাজা সেনাবাহিনীর প্রধান থাকিবেন। আইনসভার মত ভিন্ন কোন যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন তিনি করিতে পারিবেন না। (৪) দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা গঠন করা হইবে কিনা সে-বিষয়ে বিশদ আলোচনার পর এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল ; এই সভার সদস্যগণ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন স্থির হইল। কিন্তু ভোটদানের ক্ষমতা সকলকে দেওয়া হইল না। সম্পত্তির ভিত্তিতে জনগণকে 'সক্রিয়' (Active) ও 'নিষ্ক্রিয়' (Passive)

* Vide *Europe Since Napoleon*, p. 11, David Thomson.

নাগরিক—এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। কেবলমাত্র 'সক্রিয়' নাগরিকগণই ভোটাধিকার লাভ করিল। এইভাবে নাগরিকগণকে সম্পত্তির ভিত্তিতে দুই ভাগ করিয়া ভোটাধিকার দেওয়ার ফলে বহুলোক ভোটাধিকার হারাইল। ২৫ মিলিয়ন ফরাসী জনসংখ্যার মধ্যে চারি মিলিয়নের সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক নাগরিকের এবং প্যারিস শহরে মাত্র ৩৫ হাজার নাগরিকের আইনসভার সদস্য-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল। লক্ষ লক্ষ নাগরিক যাহারা পূর্বে স্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর সদস্য নির্বাচনে ভোট দিয়াছিল তাহারা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। (৫) রাজা নিজ মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইবেন না। কার্যনির্বাহক বিভাগ (Executive) রাজা নিজে পরিচালনা করিবেন। কিন্তু রাজা কোন নূতন আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না, বা আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন না। রাজা আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন Suspensive veto প্রয়োগ করিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবেন। কিন্তু আইনসভার পর পর তিনটি অধিবেশনে সেই আইন পাস হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। (৬) সমগ্র দেশকে ৮৩টি 'ডিপার্টমেণ্ট' (Department) বা প্রদেশে ভাগ করা হইল। এই সকল প্রদেশের শাসনকর্তা ও বিচারপতিগণ প্রদেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন স্থির হইল।

যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি-স্থাপনে আইনসভার মত প্রয়োজন

এক-কক্ষযুক্ত আইন-সভা ঃ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ঃ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিক

মন্ত্রিগণ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা আইন-সভার সদস্য হইবেন না, রাজা আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না

রাজার Suspensive veto ক্ষমতা

সমগ্র দেশ ৮৩টি ডিপার্টমেণ্টে বিভক্ত

সরকারের আর্থিক সমস্যার সমাধান এবং জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা-বিধান সংবিধান-সভার সর্বাধিক কঠিন সমস্যা ছিল। ষোড়শ লুই আর্থিক দুরবস্থা হেতুই জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং সংবিধান-সভা এ-বিষয়ে বিলম্ব না করিয়াই হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন, বিপ্লব শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর আদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্টেট্‌স্‌-জেনারেল সংবিধান-সভা নাম ধারণের পূর্বে যখন 'ন্যাশন্যাল এ্যাসেম্বলি' বা জাতীয় সভা নামে কার্য করিতেছিল, তখনই বৈষম্যমূলক প্রত্যক্ষ কর বিলোপ করিয়া দিয়া সম্পত্তির উপর কর স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই সকল কর আদায় করা তখনও সম্ভব হয় নাই। নেকার দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়া সকলের নিকট সরকারের জন্য আর্থিক সাহায্য চাহিলেন ; ইহাতে কোন ফল হইল না। এমতাবস্থায় সংবিধান-সভা চার্চের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই সম্পত্তির উপর 'এসাইনেট্‌' (Assignat) নামে একপ্রকার নোট বাহির করিল। এই সকল নোট সাধারণ কাগজী নোটের ন্যায় প্রচলিত হইল। সাময়িকভাবে এই নোটের সাহায্যে সরকারের আর্থিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব হইল।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা ঃ

অর্থাভাব ঃ করদান বন্ধ ঃ অর্থ-সাহায্যের জন্য নেকার-এর আবেদন বিফল

এসাইনেট্‌ নামক নোট চালু

ফ্রান্সকে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ এবং ফরাসীদের একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে একই ধরনের ওজন ও মাপ চালু করা হইল, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইল। অপরাধের শাস্তি কি হইবে তাহা আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হইল এবং সর্বত্র সেই ব্যবস্থা চালু করা হইল। সক্রিয় নাগরিকদের লইয়া গঠিত জুরির সাহায্য লইয়া ফৌজদারি বিচার এবং দেওয়ানি বিচার বিচারপতিরা (জজ) করিবেন, এই প্রথা চালু হইল। পূর্বেকার যে-সকল পার্লামেণ্ট ছিল, সেগুলির স্থলে স্থানীয় সভা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারালয় এবং সেই সকল বিচারালয়ের বিচারপতিদের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠন করা হইল। এইভাবে বিচারপতি নির্বাচন করিয়া বংশানুক্রমে বিচারপতি-পদে আসীন থাকিবার ত্রুটি দূর করা হইল।

বিচার-ব্যবস্থা সংস্কার

ইহার পর Civil Constitution of the Clergy নামে এক অত্যধিক বিপ্লবাত্মক আইন পাস করা হইল। এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ডায়োসেস্ (Dioces) স্থাপন করা হইল এবং চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগে পরিণত এবং চার্চের যাবতীয় সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। যাজকগণ সরকার হইতে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় মাহিনা পাইবেন এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। তাঁহাদের নির্বাচন পোপের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে না।

(৪) Civil Constitution of the Clergy, চার্চ সরকারী বিভাগে পরিণত: বেতনভোগী যাজকগণ

(৫) রোবস্পিয়ার-এর প্রস্তাব: সংবিধান-সভার সদস্য আইন-সভার সভ্য হওয়া নিষিদ্ধ

সর্বশেষে, রোবস্পিয়ার-এর প্রস্তাবে সংবিধান-সভা এক আইন পাস করিল যে, সংবিধান-সভার কোন সদস্য নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত আইনসভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

সমালোচনা (Criticism): সংবিধান-সভার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য ছিল পূর্বেকার শাসনব্যবস্থার (Old Regime) যাবতীয় ত্রুটি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা। মানুষকে সম-মর্যাদায় স্থাপন করিয়া সংবিধান-সভা ফরাসী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য আনিয়াছিল। পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন জাতির লোক আন্দোলন করিয়াছে। এই সভা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া জনমতের উপর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এদিক দিয়া সংবিধান-সভার কার্যাদি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যে দ্রুতগতিতে পূর্বেকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, অনুরূপ দ্রুতগতিতে গঠনমূলক কার্য করিতে এই সভা সক্ষম হইল না।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, রাজতন্ত্র জনমতের উপর নির্ভরশীল

দ্রুতগতিতে পূর্বেকার কাঠামো ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাঠামো গঠনের অক্ষমতা

সংবিধান-সভা ফ্রান্সের জন্য যে-সংবিধান রচনা করিয়াছিল তাহা সভার সদস্যগণ একটি অসাধারণ দলিল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। বস্তুত এই সংবিধান বিপ্লব যে-সফলতা লাভ করিয়াছিল, সেই সাফল্যকে সুস্পষ্ট আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সংবিধান-সভায় মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায়ের নিম্ন পর্যায়ের জনগণ তখনও ছিল নিরক্ষর এবং আইনসভা বা প্রশাসনিক কার্যে অক্ষম। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত বা বুর্জোজি সম্প্রদায়ের পক্ষেই প্রশাসনকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে পরিচালন করা সম্ভব ছিল। এই কারণেই সম্পত্তির ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিক—এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া সংবিধান অনুযায়ী যে-এ্যাসেম্বলি গঠিত হইবে তাহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

সামন্ত-প্রথাজনিত সর্বপ্রকার বৈষম্য, ঊর্ধ্বতন ভূম্যধিকারীর প্রতি কর্তব্য পালন, সার্ফ প্রথা, টাইথ নামক ধর্মকর ইত্যাদির উচ্ছেদ সাধন করিয়া এবং অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যাপারে অসাম্য দূর করিয়া সংবিধান-সভা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই সভা ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দান করিয়া রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অত্যাচারের পথ বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচন ব্যাপারে জনসাধারণকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকে ভাগ করিয়া এই সভা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধিতা করিয়াছিল এবং "ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণার" (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্যনীতি স্থাপন

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকত্ব গণতন্ত্র ও Declaration of the Rights of Man and of the Citizen-এর বিরোধী

ফরাসী জাতি যখন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে, তখন দ্রুতগতিতে গঠনমূলক কার্য সম্পাদনের উপরই এই সভার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু অযথা বক্তৃতা করিয়া এই সভা কালক্ষেপ করিয়াছিল। বিপ্লবের গতিকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিতে এই বিলম্বই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী।

অযথা বক্তৃতায় কালক্ষেপ

সংবিধান-সভার সদস্যবর্গের আইন-প্রণয়নের কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা বাস্তবতাবর্জিতভাবে কেবলমাত্র আদর্শ, ন্যায় ও সত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।

আইন-প্রণয়নে অনভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা-বর্জিত কার্যকলাপ

নূতন শাসনব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা খর্ব করিতে গিয়া তাঁহারা মণ্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির (Separation of powers) অত্যধিক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সংবিধানে রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর কার্যনির্বাহের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। অথচ প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের প্রস্তাব বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা

মণ্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির অত্যধিক প্রয়োগ

রাজার হাতে না থাকায় শাসনব্যবস্থা যে পঙ্গু হইয়া পড়িবে ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। রাজাকে সাময়িকভাবে আইন স্থগিত রাখিবার (veto) ক্ষমতা দান করিবার ফলে ভবিষ্যতে রাজা এবং আইন-সভার মধ্যে বিবাদের পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কারণ, এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া রাজা আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোন আইন একেবারে বাতিল করিতে পারিতেন না, অথচ ইহার প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে আইনসভার বিরাগভাজন হইতে হইত।

রাজার ভেটো ক্ষমতা : ভবিষ্যতে গোলযোগ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত

পূর্বেকার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার স্থলে বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে শাসনব্যবস্থায় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিল। ইহাতে অব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রাদেশিক শাসনকার্যের জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হইল না। কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করিয়া প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশকে এক-একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত করায় রাষ্ট্রের ঐক্য ব্যাহত হইল। বিচারপতি-পদ নির্বাচনমূলক করিয়া স্বাধীন এবং নির্ভীক বিচারের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দুর্বলতা তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়াছিল।

সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসনের আকস্মিক পরিবর্তন

বিচারকার্যে নির্ভীকতা বিনষ্ট

এসাইনেট্ (Assignats) নামক কাগজী মুদ্রার প্রবর্তন সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশাল পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু করিবার ফলে এবং যে-সকল ভূ-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া এসাইনেট্ চালু করা হইয়াছিল, সেই সকল ভূ-সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এসাইনেট্-এর মূল্য হ্রাস পাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কেহ আর এসাইনেট্ গ্রহণে রাজী হইল না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল ও সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইল।

এসাইনেট্ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভার সুবিধা যুক্তি হিসাবে যতই সুবিধাজনক বলিয়া মনে হউক-না-কেন, কার্যক্ষেত্রে ইহা তেমন সুবিধাজনক হইল না। পরবর্তী কালে পুনরায় দুই-কক্ষযুক্ত আইন পরিষদ স্থাপনের প্রয়োজন হইল। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দিক দিয়া সংবিধান-সভার কার্যাবলী নানাপ্রকার ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

এক-কক্ষযুক্ত আইন-সভার অকার্যকারিতা

ধর্মাধিষ্ঠান, অর্থাৎ চার্চকে শাসনব্যবস্থার একটি বিভাগে পরিণত করিবার ফলে সংবিধান-সভার সদস্যগণ দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। Civil Constitution of the Clergy নামক আইন পাসের পূর্বাবধি সংবিধান-সভার সভ্যগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইন পাস করিবার

Civil Constitution of the Clergy

সদস্যদের মধ্যে বিভেদ

ফলে ধর্মভীরু সদস্যগণ বিপ্লবের বিরোধিতা করিতে শুরু করিলেন। কারণ, অনেকেই ধর্মাধিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফরাসীরাজ যোড়শ লুই-এর ধর্মমতও এই আইনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি জাতীয় সভার শত্রুতে পরিণত হইলেন, আপস-মীমাংসার পথ এই সময় হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

রাজা জাতীয় সভার শত্রুতে পরিণত

রোব্‌স্‌পিয়ার-এর এক প্রস্তাব গৃহীত হইলে সংবিধান-সভার কোন সদস্যই নূতন আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না স্থির হইল। ইহার ফলে সংবিধান-সভার সদস্যগণ যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা হইতেও ফরাসী জাতি বঞ্চিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে আইনসভা গঠিত হইল তাহাতে অনভিজ্ঞ সদস্যগণ যোগদান করিলে নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা কঠিন হইল। স্বভাবতই সংবিধান-সভার কার্যাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

রোব্‌স্‌পিয়ার-এর প্রস্তাব ঃ ভবিষ্যৎ আইন-সভা অনভিজ্ঞদের সভা

সংবিধান-সভার কার্যাদি অস্থায়ী

ফরাসী সংবিধান-সভার একটি সহজাত ত্রুটি ছিল। এই সভার সদস্যগণ ছিলেন আইন, তথা সংবিধান সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ। সংবিধান-সভার কোন ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্নতা (historical continuity) ছিল না, কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপেই এই সভা গঠিত হইয়াছিল। ইহার ভাল এবং মন্দ দুই দিকই ছিল। অনভিজ্ঞতার অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নূতন ভাবধারাকে কার্যকরী করিবার পক্ষে ইহার সুবিধাও নেহাত কম ছিল না।

সংবিধান-সভা অনভিজ্ঞ ও ঐতিহ্য-বিহীন ঃ অনভিজ্ঞতার সুবিধা ও অসুবিধা

এই সভায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের প্রাধান্য ছিল। বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাদিগকে নেতৃত্ব করিবার মত নৈতিক অধিকার দান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। উদারতা, দেশের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার আগ্রহ তাঁহাদের প্রচুর ছিল। তাঁহারা বিপ্লবের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে এবং বিপ্লবকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নেতৃত্ব

উদারতা ও শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি

সংবিধান-সভার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইহা সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদে অত্যধিক বিশ্বাসী ছিল। রুশো, মন্টেস্কু প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদকে কাজে লাগাইতে গিয়া প্রতিনিধিগণ বাস্তবতার সহিত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে ত্রুটিহীন নেতৃত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস ঃ ফলে বাস্তবতাহীন

সংবিধান-সভার সদস্যগণের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায়, তাঁহারা বক্তৃতাদানের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। দ্রুতগতিতে কার্য সম্পন্ন করা যখন সাফল্যের একমাত্র পন্থা ছিল তখন তাঁহারা বাগ্মিতার দ্বারা প্রশংসা অর্জনেই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি তাঁহাদের পরিস্থিতির কথা ভাবিলে তাঁহারা যতদূর সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগকে বিস্মিত করে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বক্তৃতাদানের আনন্দে কালক্ষেপ

পরিস্থিতির তুলনায় সফলতার প্রাচুর্য

অধ্যায় ৫

বিপ্লবের গতি : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
(Course of the Revolution : Napoleon Bonaparte)

সংবিধান-সভা যখন সংস্কারকার্যে ব্যস্ত, তখন মিরাবো ষোড়শ লুই-এর পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত হইলেন। মিরাবো ছিলেন সমসাময়িক ফরাসী রাজনীতিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অতুলনীয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁহার বন্ধু লা মার্ক (La Marck)-এর নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: "সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। রাজা ও রাণী উভয়েই অপসৃত হইবেন, এবং তুমি দেখিবে যে, জনতা তাঁহাদের অসহায় (মৃত) দেহের উপর বিজয় উল্লাসে হাঁটিয়া যাইবে।"* তিনি রাজা ও রাণীকে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজশক্তি উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

মিরাবো ষোড়শ লুই-এর পরামর্শদাতা

শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন এবং রাজার নিকট লিখিত তাঁহার গোপন পত্রাদিতে তিনি দেশ এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন একথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয় সুপরামর্শ দিবার মত যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ রহিল না।

মিরাবো'র মৃত্যুতে রাজতন্ত্র রক্ষার শেষ আশা বিলুপ্ত

লুই দেখিলেন যে, রাজপ্রাসাদে রাজকীয় মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে এবং দিন দিন বিপ্লবের আবর্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। ভার্সাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্যারিসের টুইলারিস্ (Tuileries) প্রাসাদে থাকাকালীন ষোড়শ লুই ও রাণী আঁতোয়ানেত দেখিলেন যে, জনতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব সময়েই তাঁহাদের উপর রহিয়াছে। নানসি নামক স্থানে সুইস বাহিনী (Swiss Regiment) মাহিনা সময় মত না পাওয়ায় এবং উর্দ্ধতন অফিসারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহ করিলে অনেককে গুলি করিয়া হত্যা করা হয় এবং অনেককে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক বিদ্রোহীকে নৌ-যানের দাঁড় টানিবার কাজে লাগান অর্থাৎ galley slaves করা হয়। প্যারিসের এক বিশাল জনতা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ল্যাফায়েৎ ও রাজাকে দোষারোপ এবং মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করে। এই সময়ে নেকার তৃতীয়বার পদচ্যুত হন (সেপ্টেম্বর,

রাজশক্তি দুর্বল, মর্যাদাহীন : সংবাদ-পত্রের অপমানজনক আক্রমণ : জনতার দৃষ্টির অধীন

* "All is lost. The King and Queen will be swept away, and you will see the populace triumphing over their helpless bodies". Mirabeau to L. Marck, Sept. 28, 1789. *The Age of Napoleon*, p. 30, Will and Ariel Durant.

১৭৯০)। সেই সময়ে ক্ষমতাহীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পত্রিকার অপমান-সূচক প্রচারকার্য অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্যারিস নগরীর জনতার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে জাতীয় সভা সংবিধান পাস করিয়া উহা রাজার স্বাক্ষরের জন্য যখন উপস্থিত করিল তখন লুই যাজক, অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজতন্ত্রকে চিরাচরিত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে মনের দিক হইতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিজাত শ্রেণীর অনেকে এবং ঋণী স্বয়ং ষোড়শ লুইকে ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া যাইতে গোপন পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লুই ইহা বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল হইবে মনে করিয়া কিছুতেই রাজী হইলেন না। কিন্তু "সিভিল কন্স্টিটিউশন অব্ দি ক্লার্জি" (Civil Consitution of the Clergy) যখন তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইল, তখন তিনি নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং ফ্রান্স হইতে পলায়নে সম্মত হইলেন। তাঁহার বন্ধু কাউন্ট এক্সেল প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ২০-২১শে জুন রাত্রিতে ষোড়শ লুই ও ম্যারি আঁতোয়ানেত মঁসিয়ে ও মাদাম করফ্ নামে ছদ্মবেশে গোপনে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে গিয়া ভেয়ারনেস্ (Varennes) নামক স্থানে ধরা পড়িলেন। রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার যেটুকু আশা তখনও ছিল, তাহাও নষ্ট হইল। এই পলায়নের বৃথা চেষ্টার বিষময় ফল নানাদিক দিয়া প্রকাশ পাইল।

পলায়নের বৃথা চেষ্টাঃ ভেয়ারনেস্ নামক স্থানে ধৃত

প্রথমত, রাজতন্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা এবং আস্থা যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইল এবং ফরাসী জাতি প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।*

দ্বিতীয়ত, ফরাসী জাতির প্রতীতি জন্মিল যে, লুই বিপ্লবের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে রাজী নহেন।

তৃতীয়ত, রাজা বিদেশী সাহায্যে নিজশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও লোকের নিকট পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িল।

ফলাফল

চতুর্থত, এই সূত্রে 'ক্যাভেলিয়ার ক্লাব' নামে এক রাজনৈতিক সংঘের নেতা দঁতোঁ (Danton) ও ম্যারা (Marat)-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসানকল্পে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকে ন্যাশন্যাল গার্ডের গুলিতে প্রাণ হারাইল (১৭ই জুলাই, ১৭৯১)।

পঞ্চমত, রাজার পলায়নের বৃথা চেষ্টা সমগ্র ইওরোপের নিকট এই কথাই প্রমাণ করিল যে, ফরাসীরাজ নিজ রাজধানীতে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। ফলে ষোড়শ লুই-এর রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত-এর ভ্রাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ফরাসী রাজতন্ত্রের সাহায্যে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন।

ষষ্ঠত, এই সময় হইতে জনসাধারণ বিপ্লবের গতি-নির্ধারণে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ভেয়ারনেস্ হইতে পলাতক রাজ-পরিবারকে ধরিয়া লইয়া আসিবার

* "The flight to Varennes made it definitely republican". Guedalla, p. 147.

ফলে জনতার উল্লাস রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বিজয়-গৌরবের প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

রাজা-রাণীর পলায়নের সময় হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের সহিত জড়িত হইতে লাগিল। ফরাসী রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত-এর ভ্রাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড প্যাডুয়া নামক স্থান হইতে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করিলেন (জুলাই ৬, ১৭৯১)। এই প্রচারপত্রে (Manifesto of Padua) তিনি ইওরোপের রাজগণকে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইংলন্ড এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না। ইংলন্ডে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ঐ সময়ে এক অতি উচ্চ আশা জাগিয়াছিল। ইংরেজ কবি সাউদি, কোলরীজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রথমে ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজনীতিকদের অনেকে এই বিপ্লবের মধ্যে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ইংলন্ড এবং গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সমবায় ও সৌহার্দ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ এবং প্রাশিয়া, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ লিওপোল্ডের অনুরোধ নিজ নিজ স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া মানিয়া লইলেন। লিওপোল্ড অবশ্য ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ততটা পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ফরাসী রাজতন্ত্রকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে।

প্যাডুয়ার প্রচারপত্র (জুলাই ৬, ১৭৯১)

ইংলন্ড ও ফরাসী বিপ্লব : সাউদি, কোলরীজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

ইওরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন স্বার্থ

প্যাডুয়ার প্রচারপত্রের ফলস্বরূপ পিলনিজ নামক স্থানে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্বিতীয় উইলিয়াম ও লিওপোল্ড-এর মধ্যে এক বৈঠক বসিল। ফরাসী দেশ হইতে রাজতন্ত্রের যে-সকল সমর্থক পলাইয়া আসিয়াছিল তাহারা লিওপোল্ড ও ফ্রেডারিককে ফরাসী রাজতন্ত্রের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল। পিলনিজের বৈঠকে ষোড়শ লুই-এর দুই ভ্রাতা—পরবর্তী কালের ফরাসীরাজ অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লস্—উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ২৭শে আগস্ট তারিখে লিওপোল্ড ও ফ্রেডারিক উইলিয়ম পিলনিজের ঘোষণা (Declaration of Pillnitz) প্রচার করিলেন। ইহাতে বলা হইল যে, ফরাসীদের পরিস্থিতি ইওরোপীয় রাজগণের চিন্তার বিষয়। ইওরোপীয় অপরাপর রাজগণের সাহায্য পাওয়ামাত্রই অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। এইরূপ ভীতি-প্রদর্শনের ফলে ফরাসী জাতি অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মোটেই ভীত হইল না।

পিলনিজের ঘোষণা (২৭শে আগস্ট, ১৭৯১)

ফ্রান্স আক্রমণের ভীতি-প্রদর্শন

এদিকে ষোড়শ লুই জনতার হাতে একপ্রকার বন্দী। তিনি বাধ্য হইয়াই নূতন

সংবিধান স্বীকার করিয়া লইলেন (২১শে মতান্তরে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান-সভার তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটিল। ইহার পূর্বেই নূতন সংবিধান অনুযায়ী যে 'এ্যাসেম্বলি' বা আইনসভা স্থাপিত হইবার কথা ছিল, উহার সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১লা অক্টোবর হইতে নূতন আইনসভা (Legislative Assembly) ক্ষমতায় আসীন হইল এবং নূতন সংবিধান চালু হইল।

নূতন সংবিধান স্বীকৃত (২১শে মতান্তরে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯১) ; ১লা অক্টোবর নূতন আইনসভার অধিবেশন শুরু

আইনসভা, ১লা অক্টোবর, ১৭৯১—২০শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২ (**The Legislative Assembly, October 1, 1791—September 20, 1792**): নূতন সংবিধান অনুসারে নির্বাচন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহাদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত করিয়াছিলেন এবং প্যারিসের বিভিন্ন ক্লাব বা সংঘ সেই নির্বাচনে নানাভাবে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়াছিল। একমাত্র প্যারিস শহরেই তখন ১৩৩টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ব্রিশো, ম্যারা, ল্যুস্টেলট, ডেসমোলিনস্, লেক্লস্, ফ্রেরণ প্রভৃতি প্রত্যেকের এক-একটি পত্রিকা ছিল। সেই সময়ে পত্রিকার উপর কোনরূপ সরকারী বাধা-নিষেধ না থাকায় সেগুলির মাধ্যমে সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর কঠোর সমালোচনা প্রকাশের কোন বাধা ছিল না। জনমত গঠনে এবং জনমতের উপর প্রভাব বিস্তারে পত্রিকা তখন এক অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতা স্বভাবতই অর্জন করিয়াছিল। সব কয়টি পত্রিকায়ই স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী মৌলিক সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশিত হইতেছিল। মিরাবো ষোড়শ লুইকে বলিয়াছিলেনঃ "সিংহাসন এবং নিজের মাথা যদি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কয়েকজন জনপ্রিয় সংবাদপত্র-সেবীকে অর্থ দিয়া বশ করুন।"*

পত্র-পত্রিকার প্রভাব

ক্লাব বা সংঘগুলির প্রভাবও পত্র-পত্রিকা হইতে কম ছিল না। ব্রেটন ক্লাব, যাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে, রাজা-রাণী প্যারিসে চলিয়া আসিলে জেকোবিন্ ধর্মাধিষ্ঠানের এক পরিত্যক্ত ভোজন কক্ষে আসিয়া তাহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিল। এই ক্লাবই জেকোবিন্ ক্লাব নামে পরিচিতি লাভ করে। এইভাবে কর্ডেলিয়ার ক্লাব, ফিউল্যাণ্ট ক্লাব নিবাচনকালে নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ করিয়াছিল।

জেকোবিন্ (Jacobin) কর্ডেলিয়ার (Cordelier) ফিউল্যাণ্ট(Feuillant) ক্লাবের প্রভাব

যাহা হউক, নূতন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত আইনসভার অধিবেশন বসিল

* "Mirabeau had told the King that if he wished to keep his throne or his head, he must buy some popular journalists". *The Age of Napoleon*, p. 33, Will and Ariel Durant.

(অক্টোবর ১লা, ১৭৯১)। সভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন শাসনবিষয়ে অনভিজ্ঞ। রোবস্পিয়ার-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান-সভার কোন সদস্য এই নূতন আইন-সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিলেন না। স্বভাবতই সংবিধান-সভার সদস্যগণ আইন-প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিষদের কর্মপন্থা সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার সুযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

অনভিজ্ঞ সদস্যগণ

আইনসভার সদস্যগণ প্রথম হইতেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মোট ৭৪৫ জন সদস্যের অধিকাংশই কোন উগ্র রাজনৈতিক মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা সভাগৃহের মধ্যস্থলের আসনগুলি অধিকার করিলেন। যাঁহারা শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবার এবং রাজতন্ত্র রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ফিউল্যান্টস্ (Feuillants or Constitutionalists) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সভাগৃহের দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৪। সভাগৃহের বামদিকে বসিলেন জেকোবিন্ ও কর্ডেলিয়ার এই দুই দল।* ইঁহাদের আসন একটু উচ্চে ছিল বলিয়া ইঁহারা 'মাউন্টেন' (Mountain) নামে পরিচিত হইলেন। ৩৫৫ জন প্রতিনিধি যাঁহারা কোন বিশেষ দলভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে চাহিলেন না এবং সভা-কক্ষের মধ্যস্থলে বসিলেন তাঁহারা 'প্লেইন' (plain) নামে পরিচিত হইলেন। জেকোবিন্ দল হইতেই 'গিরন্ডিস্ট্' নামে এক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দলের উদ্ভব ঘটিল। ইঁহাদের সকলেই গিরন্ডি (Gironde) ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ প্রদেশ হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা গিরন্ডিস্ট্ নামে পরিচিত হইলেন। রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় তাঁহারা জেকোবিন্‌দের সহিত একমত হইলেও সমগ্র ফ্রান্সের উপর প্যারিসের প্রাধান্যের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দার্শনিক কনডরসেট্ (Condorcet) ছিলেন তাঁহাদের তাত্ত্বিক নেতা। এইভাবে আইনসভায় মোট চারিটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইল: (১) দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক দল; (২) রাজতন্ত্র-বিরোধী, বামপন্থী জেকোবিন্-কর্ডেলিয়ার ও (৩) গিরন্ডিস্ট্ দল, এবং (৪) মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল।

৭৪৫ জন সদস্য
চারিটি রাজনৈতিক দল

(১) দক্ষিণপন্থী শাসনতান্ত্রিক দল, (২) বামপন্থী জেকোবিন্-কর্ডেলিয়ার দল, (৩) বামপন্থী গিরন্ডিস্ট্ দল, (৪) মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল

আইনসভার সম্মুখে দুইটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। প্রথমত, যে-সকল যাজক Civil Constitution of the Clergy নামক আইন মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। দ্বিতীয়ত, 'এমিগ্রি' (Emigres) অর্থাৎ যে-সকল রাজতন্ত্রে

আইনসভার সমস্যা

* বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দল বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা ফরাসী আইনসভার সদস্যদের আসন গ্রহণের পদ্ধতি হইতেই উদ্ভূত।

বিশ্বাসী ফ্রান্সের অধিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়া বিদেশী শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের সীমান্তে Coblenz নামক স্থানে বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কেই বা কি পন্থা অনুসরণ করা হইবে। রাজতন্ত্রের সপক্ষে 'এমিগ্রি'দের ফ্রান্স আক্রমণের চেষ্টা এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার 'পিল্‌নিজ ঘোষণা' আইনসভার সদস্যগণকে দ্রুত রাজতন্ত্র-বিরোধী করিয়া তুলিল।

গিরণ্ডিস্ট্‌ দলের যুদ্ধ-স্পৃহা

এমতাবস্থায় গিরণ্ডিস্ট্‌ দল* ফরাসী বিপ্লব-বিরোধী বিদেশী শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবকে ফ্রান্সের সীমার বাহিরে সমগ্র ইওরোপে বিস্তৃত হইতে দেওয়া এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ফরাসী রাজতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে রাজতন্ত্রের অবসান করা।

দক্ষিণপন্থীদের যুদ্ধ-স্পৃহা, রাজা ও রাণীর যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা

রোবস্‌পিয়ার শান্তিকামী

দক্ষিণপন্থী ফিউল্যান্টস্‌ দল ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের মতে যুদ্ধের ফলে সংবিধান-বিরোধীদের অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিকদের দমন করা সম্ভব হইবে এবং ফরাসী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হইবে। এদিকে রাণী আঁতোয়ানেত বিদেশী রাজগণকে তাঁহাদের অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজা-রাণীর সাহায্যে অগ্রসর হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। ষোড়শ লুই স্বয়ং প্রাশিয়া, রাশিয়া, স্পেন সুইডেন, এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজগণকে সমবেত সৈন্য সহ আসিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। কেবলমাত্র রোবস্‌পিয়ার প্রমুখ কয়েকজন জেকোবিন্‌ নেতা যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে আইনসভার বাহিরে জনমত-গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বাধিলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিবে না।† কিন্তু আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই তখন যুদ্ধের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ষোড়শ লুই আইনসভার চাপে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (২০শে এপ্রিল, ১৭৯২)

এমিগ্রিদের উপর আদেশ

অপর দিকে 'এমিগ্রি' অর্থাৎ দেশত্যাগী রাজতান্ত্রিকদিগকে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করা হইল। এই আদেশ যাহারা অমান্য করিবে, তাহাদের সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে—এরূপ একটি আইন পাস করা হইল।

* এই দলের অধিকাংশ সভ্য ফ্রান্সের গিরণ্ড নামে এক প্রদেশ হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা গিরণ্ডিস্ট্‌ নামে পরিচিত ছিলেন।

† "The thing for us to do is to set our own affairs in order and to acquire liberty for ourselves before offering it to others."—Robespierre : Quoted by Riker, p. 306.

যে-সকল যাজক Civil Constitution of the Clergy মানিতে অস্বীকৃত হইবে তাহাদের ভাতা, পেনশন এবং অপরাপর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হইবে এবং তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে, অপর এক আইনে এই ঘোষণা করা হইল।

যাজকের পেনশন ও সুযোগ-সুবিধা বন্ধের ঘোষণা

ষোড়শ লুই উভয় আইন-ই ভেটো (Veto) করিলেন। কারণ তিনি দেখিলেন যে, রাজতন্ত্রের একমাত্র সহায়ক ছিল 'এমিগ্রি' এবং Civil Constitution-বিরোধী যাজকগণ। ইহাদের রক্ষা করা স্বভাবতই তিনি তাঁর কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন।

লুই-এর ভেটো

ষোড়শ লুই আইনসভার উপরি-উক্ত দুইটি আইন-ই 'ভেটো' করিলে এক দারুণ গণবিক্ষোভ দেখা দিল। জুন মাসের ২০ তারিখে এক বিরাট জনতা লুই-এর 'টুইলারিস' (Tuileries) নামক প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে 'ভেটো' প্রত্যাহারে বাধ্য করিতে চাহিল। জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ একদিকে যেমন রাজতন্ত্রের অবসানের ইঙ্গিত দিল, অপরদিকে তেমনি বিপ্লবের নেতৃত্ব যে ক্রমেই উচ্ছৃংখল জনতার হস্তে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিল। এই অবস্থায় দূরদর্শী ল্যাফায়েৎ রাজতন্ত্রের সাহায্যে দাঁড়াইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্য রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত-এর ঔদ্ধত্যের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইল।

জনতা কর্তৃক টুইলারিস প্রাসাদ আক্রান্ত

উচ্ছৃংখল জনতার প্রাধান্য

লুই ফরাসী রাজতন্ত্র রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় দেখিতে পাইলেন বিদেশী রাজগণের সামরিক সাহায্য-গ্রহণে। ইহা ভিন্ন তিনি দাঁতোঁ (Danton) প্রভৃতি নেতাগণকে ঘুষের দ্বারা বশীভূত করিতে চাহিলেন। এদিকে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত জনসাধারণ যে-কোন উচ্ছৃংখলতার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় আইনসভা জাতীয় রক্ষীবাহিনী (National Guard)কে অস্ত্রধারণের আদেশ দিলেন। সমগ্র দেশে এক বিরাট উত্তেজনা দেখা দিল। প্যারিস নগরীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যাধীনে 'প্যারিস কমুন' নামে তথাকার স্বায়ত্তশাসন কার্য পরিচালনার জন্য যে-সভা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া 'বিপ্লবী কমুন' নামে জনতার এক নূতন সভা গঠন করা হইল। এই সভা এখন হইতে প্যারিসের নাগরিক জীবনের উপর এক স্বৈরাচারী প্রাধান্য স্থাপন করিল। চতুর্দিকে যখন পরিস্থিতি এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ, এমন সময় অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজগণের নির্দেশমত প্রাশিয়ার সেনাধ্যক্ষ ডিউক অব্ ব্রান্সউইক এক ঘোষণা (Brunswick Manifesto) জারি করিলেন যে, তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিবেন এবং ঐ সময়ে প্যারিসের বা গ্রামাঞ্চলের জনতা যদি বাধা দান করে, তাহা হইলে যুদ্ধের আইন অনুযায়ী তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে এবং তাহাদের বাড়ী-ঘর সমস্ত কিছু ধূলিসাৎ করা হইবে। ঐ সময়ে ষোড়শ লুইয়ের

লুই-এর বিদেশী সাহায্য লাভের আশা

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন

'বিপ্লবী কমুন' গঠিত

ব্রান্সউইক-এর ঘোষণা

টুইলারিস্ প্রাসাদ যদি আক্রান্ত হয় অথবা রাজা ও রাণীর নিরাপত্তা এতটুকু বিঘ্নিত হয় বা তাঁহাদের উপর ন্যূনতম আক্রমণ করা হয়, রাজা-রাণী ও রাজ-পরিবারের সকলের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা যদি অনতিবিলম্বে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম সেনাবাহিনী প্যারিসের উপর এমন প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে যাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং শহরটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবে (কোব্‌লেন্‌জ হইতে ব্রান্স্‌উইকের ঘোষণা, জুলাই ২৫, ১৭৯২)। যদি ষোড়শ লুই-এর নিরাপত্তা কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রান্স্‌উইক স্বয়ং তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবেন।

ব্রান্স্‌উইকের ঘোষণা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। আইনসভার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে রাজতন্ত্রের অবসানের দাবি সোচ্চার হইয়া উঠিল। আইনসভা, প্যারিস কম্যুন ও প্যারিসের নাগরিকদের নিকট ইহা এক চ্যালেঞ্জ বলিয়া মনে হইল। যে কোন উপায়ে এবং যে-কোন মূল্যে বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। ম্যারা টুইলারিস্ প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজা ও রাজ পরিবারের সকলকে বন্দী করিতে জনগণের নিকট আবেদন করিলেন। ১০ই আগস্ট ১৭৯২, প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ (Tuileries) আক্রমণ করিয়া রাজার সুইট্‌জারল্যান্ডবাসী সৈন্যদের লইয়া গঠিত এক দেহরক্ষী দলকে হত্যা করিল। রাজা ও রাণী পূর্বাহ্ণে খবর পাওয়ায় আইনসভাগৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জনতা আইনসভাগৃহ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিধিবর্গকে রাজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য করিল। এইভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিলে রাজ-পরিবারকে টেম্পল (Temple) নামক কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। সেইখানে লুই, রাণী আঁতোয়ানেত ও তাঁহাদের অসুস্থ পুত্র তাঁহাদের ভাগ্যের শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জনতা কর্তৃক রাজ-প্রাসাদ আক্রান্ত রাজ-পরিবার বন্দী

রাজাকে পদচ্যুত করিবার ফলে ফ্রান্স প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। এদিকে বিদেশী সৈন্য ফরাসী শহরগুলি একের পর এক দখল করিতে লাগিল। প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহবশে কয়েক হাজার রাজতান্ত্রিক দেশদ্রোহী যাজককে বন্দী করিল। উন্মত্ত জনতা বন্দিশালার অভ্যন্তরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাহাদের অনেকের প্রাণনাশ করিল (সেপ্টেম্বর ২-৫, ১৭৯২)। ইহা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' (September Massacre) নামে পরিচিত। ইহা ছিল ব্রান্স্‌উইক ঘোষণার প্রত্যুত্তর। ম্যারা (Marat) এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য নিজে গর্বের সহিত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর নেতা ছিলেন দঁতোঁ (Danton)।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড (সেপ্টেম্বর ২-৫, ১৭৯২)

শুধু তাহাই নহে, যাজকদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি রেজিস্ট্রী করিবার অধিকার নাকচ করা হইল। সেই সকল কাজ সরকারী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হইল। রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করিতে গিয়া কম্যুন, জেকোবিন্, গিরোণ্ডিস্ট্‌গণ প্রভৃতি রাজতন্ত্রের অবসানে ফ্রান্সে যে-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য এবং শ্রদ্ধাই

যাজকদের ক্ষমতা হ্রাস: ধর্মনিরপেক্ষতার আতিশয্য

প্রকৃত ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইল। ভগবান, যীশু ও হোলি গোস্ট (God, the Son and the Holy Ghost) এই তিনের পরিবর্তে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity) স্থান পাইল। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২২শে সেপ্টেম্বর (১৭৯২) করা হইবে স্থির হইল।

এদিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিল। লা ভেণ্ডি, দৌফিনি ও প্যারিসের কোন কোন অংশে রাজতন্ত্রের সপক্ষে প্রতিবিপ্লব দেখা দিল। প্যারিস কম্যুন, ও এ্যাসেম্বলি সকল সবলদেহ ব্যক্তিকে এই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষার আহ্বান জানাইল।

শাসনতন্ত্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত নূতন সংবিধান বাতিল হইয়া গেল। 'ন্যাশন্যাল কনভেনশন' (National Convention) নামে এক জাতীয় সভার উপর নূতন সংবিবান রচনার ভার দেওয়া স্থির হইল। এই 'জাতীয় কনভেনশন' প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ভোটে নির্বাচিত হইবে, এই নীতিও গৃহীত হইল।

ন্যাশন্যাল কনভেনশন

ন্যাশন্যাল কনভেনশন, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২-১৭৯৫ (National Convention, September 22, 1792 1795): বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর হইতে গণনা করিলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন ছিল তৃতীয় বিপ্লবী-প্রতিনিধি-সভা। রাজার পতনের পর যেহেতু কোন নূতন সংবিধান তখনও রচিত হয় নাই, সেইজন্য কোন আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা আইনসম্মত ছিল না। এক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জাতীয় কনভেনশন বা জাতীয় সভা আহ্বান করিয়া নূতন সংবিধান রচনার প্রস্তুতি শুরু হইল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে* সেপ্টেম্বর যখন এই জাতীয় সভার অধিবেশন বসিল, তখন ফ্রান্স প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রজাতান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য বিরাজ করিতেছে। ফলে, এই সভায় পূর্বগামী সংবিধান-সভা এবং আইনসভার উল্লেখযোগ্য সদস্য মাত্রেই নির্বাচিত হইলেন।†

ন্যাশন্যাল কনভেনশন তৃতীয় বিপ্লবী প্রতিনিধি-সভা

এই সভায় প্রধানত দুইটি দল ছিল, যথা গিরণ্ডিস্ট দল ও জেকোবিন দল। সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৫০ (মতান্তরে ৭৮২)। ইহাদের মাত্র দুইজন ভিন্ন সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। আইনসভায় যে গিরণ্ডিস্ট দল বামপন্থী ছিল উহা এখন দক্ষিণপন্থী হইল। এই দলের সভ্যগণ সভাগৃহের দক্ষিণে বসিলেন, বামে বসিল জেকোবিন দল। ইহারা এখন মাউন্টেন (Mountain) নামেও পরিচিত হইল, কারণ তাহাদের আসনগুলি একটু উচ্চে ছিল। আইন-সভার মধ্যবর্তী দলের ন্যায় একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ দলও এখানে ছিল তাহারা ছিল 'প্লেইন' (Plain) নামে পরিচিত।

প্রধান রাজনৈতিক দল : গিরণ্ডিস্ট ও জেকোবিন বা মাউন্টেন

নিরপেক্ষ বা প্লেইন দল

* মর্স স্টিফেনসনের মতে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২।

†"Of the 782 members of the New Convention, 75 had sat in the Constituent and 183 in the Legislative". *Camb. Modern History*, vol viii p. 248.

গিরন্ডিন্‌ বা গিরন্ডিস্ট্‌ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮০। এই দল ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত, শিক্ষিত, এবং জাতীয় সভার (ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনের) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। গিরন্ডিস্ট্‌, জেকোবিন্‌ ও প্লেইন সকলেই ঐক্যমত হইয়া ফ্রান্সকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিল (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। এইভাবে ফ্রান্সের প্রথম প্রজাতন্ত্রের (First French Republic) প্রতিষ্ঠা হইল।

প্রথম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

গিরন্ডিস্ট্‌ দল চাহিয়াছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া প্যারিস নগরীর উচ্ছৃংখলতা ও প্রাধান্য খর্ব করা। জেকোবিন্‌ দল ঠিক বিপরীত কর্মপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল প্যারিসের উচ্ছৃংখল জনতার সাহায্য গ্রহণ করা। গিরন্ডিস্টগণ ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, জেকোবিন্‌ দল ছিল জনতার প্রতিনিধি। গিরন্ডিস্ট্‌ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব গিরন্ডিস্ট্‌দের উপরই ন্যস্ত হইল।

গিরন্ডিস্ট্‌ দলের উদ্দেশ্য বিপ্লবকে উচ্ছৃংখলতা হইতে মুক্ত করা

জেকোবিন্‌ দলের উদ্দেশ্য উচ্ছৃংখল জনতার সাহায্য গ্রহণ করা

[illegible]শনের কার্যাদি (Activities of the Convention): ফরাসী বিপ্লবী নেতা ক্যামিল ডেসমোলিনস্‌ (Camille Desmoulins)-এর কথায় কন্‌ভেন্‌শনের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের 'জনগণ সৃষ্টি করা' (to make the people)। (১) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রথমে কন্‌ভেন্‌শন্‌ সর্বসম্মতিক্রমে ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া ফ্রান্সকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (২২ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। রাজার অপসারণের পর ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক মতের যে-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে প্রজাতন্ত্র ভিন্ন অপর কোন শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। (২) প্রচলিত রোমান বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করা হইল। মাসের নামগুলির পরিবর্তন করা হইল।* (৩) ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতির পরিবর্তন করা হইল এবং এখন

[illegible] ১৭৯২)

বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তন, ওজন ও পরিমাপ পরিবর্তন: 'মেট্রিক'-পদ্ধতি গৃহীত

---

* বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী হিসাবে মাসগুলির নূতন নামকরণ করা হইল। সেপ্টেম্বর মাসে নূতন বর্ষপঞ্জী শুরু হইয়াছিল বলিয়া সেপ্টেম্বর হইতে আগস্ট মাসের বিপ্লবী নাম দেওয়া হইল: সেপ্টেম্বর—'ভেণ্ডিমিয়ার' (Vendemiaire), অক্টোবর—'ব্রুমেয়ার' (Brumaire), নভেম্বর—'ফ্রিমেয়ার' (Frimaire), ডিসেম্বর—'নিভোস' (Nivose), জানুয়ারি—'প্লুভিয়োস' (Pluviose), ফেব্রুয়ারি—'ভেণ্টোস' (Ventose), মার্চ—'জার্মিন্যাল' (Germinal), এপ্রিল—'ফ্লোরিয়েল' (Florial), মে—'প্রেইরিয়্যাল' (Prairial), জুন—'মেসিডোর' (Messidor), জুলাই—'থার্মিডোর' (Thermidor), আগস্ট—'ফ্রাক্টিডোর' (Fructidor)। এই সকল মাসের ইংরেজী অনুবাদ কতকটা কৌতুক করিয়াই এইভাবে করা হইয়াছে: Wheezy, Sneezy, Freezy, Slippy, Drippy, Nippy, Showery, Flowery, Bowery, Wheaty, Heaty, Sweety। এইরূপ অনুবাদের কারণ ছিল, বিপ্লবীরা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাসগুলির নামকরণ করিয়াছিলেন।

হইতে 'মেট্রিক-পদ্ধতি' (metric system) গৃহীত হইল। (৪) রুশোর মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা কন্‌ডরসেট্ (Condorcet) নামক জনৈক প্রভাব-শালী সদস্য কর্তৃক রচিত হইল। প্রাথমিক স্কুল ও এগুলির উপর সেণ্ট্রাল স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুল (Normal School) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। (৫) 'সকল ব্যক্তিই আইনের চক্ষে সমান' এই নীতিকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আইন-বিধির পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু হইল। কন্‌ভেন্‌শন্ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেও শেষ পর্যন্ত আইন-বিধির পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা : প্রাথমিক স্কুল, সেণ্ট্রাল স্কুল ও নর্মাল স্কুল

আইন-বিধির পরিবর্তনের চেষ্টা

(৬) রাজার বিচার লইয়া ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। গিরণ্ডিস্ট্ দল রাজার প্রাণনাশের পক্ষপাতী ছিল না সত্য, কিন্তু এই কথা তাহারা স্পষ্টভাবে বলিতে সাহসী ছিল না, কারণ তাহা হইলে গিরণ্ডিস্ট্‌গণ রাজ-তন্ত্রের সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। এজন্য তাহারা রাজার বিচার আদৌ করা হইবে কিনা সে-বিষয়ে গণভোট (referendum) গ্রহণের প্রস্তাব করিল। জেকোবিন্ দলের ভয় ছিল, যদি রাজা পুনরায় সিংহাসন ফিরিয়া পান তাহা হইলে তাহাদিগকে চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং জেকোবিন্‌গণ ছিল রাজার প্রাণনাশের পক্ষপাতী। তাহারা গণভোটের বিরোধী ছিল কারণ তাহারা একথা স্পষ্ট জানিত যে, জনসাধারণ তাহাদের মত সমর্থন করিবে না। ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনের সম্মুখে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল : রাজা ষোড়শ লুই দোষী কিনা, যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে কিনা, এবং রাজার শাস্তির ব্যাপারে কোন গণভোট লওয়া হইবে কিনা। রোঁমা দ্য সীজ ষোড়শ লুইয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তি দেখাইলেন যে, সংবিধানে রাজাকে বিচার করিবার কোন অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ইহা ভিন্ন রাজা নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন যেমন দয়ালু তেমনি উদারচেতা। কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যগণকে রোমাঁ দ্য সীজ স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রাজা বহু জনহিতকর সংস্কার চালু করিয়াছেন। কিন্তু ষোড়শ লুইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা যুক্তি দেখাইলেন যে, রাজা বিদেশী সাহায্য লইয়া বিপ্লব দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশদ্রোহী রাজাকে সাধারণ দেশদ্রোহীর মতই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে নতুবা তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের জন্য দেশে ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ লাগিয়া থাকিবেই। কন্‌ভেন্‌শনে রাজা দোষী কিনা, সেই প্রশ্নে ভোট লওয়া হইলে অধিকাংশ সদস্যই রাজা দোষী, এই মত সমর্থন করিলেন। রাজার শাস্তি হইবে কিনা সে-বিষয়ে গণভোট লওয়া হইবে কিনা এই প্রস্তাবে গিরণ্ডিস্ট্‌রা পরাজিত হইল। গণভোটের প্রস্তাব নাকচ হইয়া গেল। পরবর্তী

গিরণ্ডিস্ট্ দল রাজার প্রাণনাশের বিপক্ষে জেকোবিন্ দল রাজার প্রাণনাশের পক্ষে

বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড

প্রশ্ন ছিল রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে কিনা। সেই প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিল। মঃ ল্যাজুনেইস্ (Monsieur Laujuinais) দাবি করিলেন যে, রাজার মৃত্যুদণ্ড দিতে হইলে কন্‌ভেনশন্ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখনকার মোট ৭৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন অনুপস্থিত ছিলেন, ৩২১ জন মৃত্যুদণ্ড না দিয়া অপর কোন শাস্তি দিবার পক্ষে ভোট দিলেন। এদের অনেকেই রাজার কারাদণ্ডের পক্ষপাতী ছিলেন। ২৬ জন মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিলেন কিন্তু তাঁহাদের ভোটের শর্ত ছিল রাজার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখিতে হইবে। ১৩ জন মৃত্যুদণ্ড যদি স্থগিত রাখা হয় তবে মৃত্যুদণ্ড দিবার সমর্থনে ভোট দিতে রাজী আছেন জানাইলেন। যে সকল প্রতিনিধি পূর্বদিন সন্ধ্যায়ও রাজার মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, পরের দিন প্রাণভয়ে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিলেন। মোট ৩৬১ জন সদস্য সরাসরি মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে ভোট দিলেন। সুতরাং নিঃশর্তভাবে মাত্র ১ ভোট বেশী হওয়ায় রাজাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। বিচারের ন্যায়নীতির দিক হইতে দেখিলে ইহা ছিল সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ। জেকোবিন্ দল এইভাবে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিল।* ম্যারা (Marat) চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লুই-এর প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হউক, এই প্রস্তাব করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি হতভাগ্য ষোড়শ লুই প্রাণ হারাইলেন। লুইয়ের প্রাণদণ্ডে জেকোবিন্ দল, প্যারিস কম্যুন এবং বিপ্লবীদের যুদ্ধ-নীতির জয় সূচিত হইল। এদিকে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিয়া শহরের পর শহর দখল করিতেছিল। কিন্তু গিরণ্ডিস্টদের পরিচালনায় ফরাসী সৈন্য প্রথম দিকে পরাজিত হইলেও ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর যেদিন কন্‌ভেনশনের অধিবেশন শুরু হইল, সেই দিন ফরাসী সেনা স্যাভয় অধিকার করিয়া লইল। স্যাভয় তখন সার্ডিনিয়ার রাজ্যভুক্ত ছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর নিস্ বা নাইস, ২৯শে সেপ্টেম্বর ভিল্লেফ্রেঞ্চ ফ্রান্সের সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে স্পেয়ার, মেইনজ্, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লিজ, এন্টোয়ার্প ফ্রান্স জয় করিয়া লইল। এই সকল জয়ে উৎসাহিত হইয়া বিপ্লবী ফ্রান্স, ফ্রান্সের সীমারেখা প্রাকৃতিক সীমারেখা অর্থাৎ পিরেনীজ, রাইন নদী ও আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তার করিতে প্রস্তুত হইল। ইহা

একটি ভোটাধিক্যে রাজার প্রাণদণ্ড দান

গিরণ্ডিস্ট্ শাসনে যুদ্ধ-নীতির সাফল্য

যুদ্ধের নূতন আদর্শঃ সীমা প্রাকৃতিক

* "The death of the tyrant is necessary to reassure those who fear that one day they will be punished for their daring, and also to terrify those who have not yet renounced the monarchy. A people cannot find liberty when it respects the memory of its chains." *St. Just, an enthusiastic follower of Robespierre.* "When a nation has been forced into insurrection, it returns to a state of nature with regard to the tyrant. There is no longer any law but safety of the people."—Robespierre, vide, Holland Rose, pp. 71-72.

সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তার, ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের বাহিরে বিস্তার

ভিন্ন ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই সকল দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিল। অন্য কথায়, ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের সীমার বাহিরে বিস্তারের চেষ্টা চলিল।

জেকোবিন্ দল 'বিপ্লবী প্যারিস কম্যুন' নামক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সভার সমর্থন পাইয়া আসিতেছিল। জেকোবিন্ দলেরই ইঙ্গিতে ইতিমধ্যে (মে ২১, ১৭৯২) গিরণ্ডিস্ট্ দল পরিচালিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনের অবসানকল্পে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা কনভেনশন্-সভা আক্রমণ করিল। কনভেনশন্-সভা জনতার ইচ্ছামত গিরণ্ডিস্ট্ নেতৃবর্গের একত্রিশ জনকে সদস্য-পদচ্যুত করিল। এইভাবে জেকোবিন্ দল প্রজাতন্ত্রের পরিচালনার ভার হস্তগত করিল।

গিরণ্ডিস্ট্ দলের প্রাধান্য নাশ : জেকোবিন্ প্রাধান্য স্থাপন

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং স্পেনের যুদ্ধ বাধিল। ফলে বিপ্লবী ফ্রান্সকে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়া, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ও স্পেনের এক শক্তিসংঘের (Coalition) বিরুদ্ধে যুঝিতে হইল। ইহা ভিন্ন এই মর্মান্তিক ঘটনার উত্তেজনা সর্বত্র ফরাসী বাহিনীর পরাজয়ে পরিলক্ষিত হইল। এইভাবে বিপ্লবকে আঘাত করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা শুরু হইল।

লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেনের সহিত যুদ্ধ

বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স যখন বিব্রত, তখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও নানাপ্রকার অসুবিধা ও সমস্যা বিপ্লবী সরকারের স্থিতিশীলতা বিনাশ করিতে চলিয়াছিল। এদিকে চার্চের ভূ-সম্পত্তি, এবং যে-সকল রাজতন্ত্রের সমর্থক দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল (emigres) তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াও সরকারের আর্থিক অনটন দূরীভূত হয় নাই। 'এসাইনেট্' (assignats)-এর বাজার-মূল্য ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকিলে সেগুলি কেহ লইতে চাহিল না। নূতন কর স্থাপনের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দিল যে, তাহা আদায় করিতে যে-খরচ হইল আদায়ের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইল। জবরদস্তিমূলক ভাবে ঋণ (Forced Loan) আদায়ের নীতি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করিলে তাহারা গিরণ্ডিস্ট্ প্রতিনিধিদিগকে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বভাবতই সাহায্য করিতে বলিল। ফলে গিরণ্ডিস্ট্ ও জেকোবিনদের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত গিরণ্ডিস্ট্ ও অধিক মাত্রায় বামপন্থী জেকোবিনদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রুটির দাম বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণ রুটির এবং অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দাম বাঁধিয়া দিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কনভেনশন্ এক কমিটির উপর এই কাজের ভার ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইল। শুধু রুটি নহে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, হিসাব-পত্র, অর্থ, শিক্ষা, সমাজ-উন্নয়ন, ঔপনিবেশিক বিষয়াদি সব কিছুর জন্য পৃথক পৃথক কমিটি নিয়োগ

বহিঃশত্রুর আক্রমণ : অভ্যন্তরীণ সমস্যা

কনভেনশন্ কর্তৃক বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ

কমিটিগুলির প্রশংসনীয় কার্যকলাপ

করা হইল। পরিস্থিতির জটিলতা সত্ত্বেও এই সকল কমিটি যথেষ্ট গঠনমূলক কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহাদের নির্ধারিত নীতি পরবর্তী কালে নেপোলিয়নের আইন-বিধিতে (Code Napoleon) স্থান পাইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লব ও ইওরোপ : সন্ত্রাসের শাসনকাল (France & Europe : Reign of Terror) : কনভেনশনের শাসনকাল শুরু হওয়ার পূর্ব হইতেই ফ্রান্স ইওরোপীয় শক্তিগুলির কয়েকটির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির কি মনোভাব ছিল, তাহার আলোচনার মধ্য দিয়াই কনভেনশনের সহিত ইওরোপের দেশগুলির যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনায় পৌঁছান যুক্তিযুক্ত হইবে।

কনভেনশনের পূর্ব হইতেই ফ্রান্সের সহিত ইওরোপীয় শক্তির যুদ্ধ

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির মনোভাব (Attitude of European countries towards the French Revolution) : আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইওরোপের অপরাপর দেশগুলির যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই মনে হইবে। ইওরোপের অপরাপর শক্তিগুলি ফরাসী বিপ্লবকে প্রথমে একটি স্থানীয় বিদ্রোহ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিপ্লবী ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যাও নেহাত কম ছিল না। এমতাবস্থায় বিপ্লব যখন আরম্ভ হইল, তখন ফ্রান্স এবং অপরাপর দেশগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধ ঘটিবার কোন কারণ ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে ফ্রান্সের সহিত অপরাপর দেশের যুদ্ধ ঘটিবার কারণের অভাব

ইহা ভিন্ন, ইওরোপীয় দেশগুলি ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়াতে প্রথম দিকে খুশি-ই হইয়াছিল। কারণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে দুর্বলীকৃত ফ্রান্স তখন ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিবার ক্ষমতা হারাইয়াছিল। এই সুযোগে ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পাইয়াছিল।

বিপ্লবে বিব্রত ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে অপরাপর দেশগুলির স্বার্থসিদ্ধি

ষোড়শ লুই-এর পলায়নের চেষ্টা এবং ভেয়ারনেস্ (Varennes) নামক স্থানে ধৃত হইবার খবর ইওরোপের রাজগণের বিশেষত অস্ট্রিয়ার নিকট পৌঁছিলে বিপ্লব সম্পর্কে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। প্যাডুয়ার ঘোষণা (Declaration of Padua) এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত পিল্‌নিজ্ ঘোষণা (Declaration of Pillnitz) ইহার পরিচায়ক।* ক্রমে ইওরোপীয় দেশগুলি বিপ্লবে বিব্রত ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লওয়া এবং ফরাসী বিপ্লবকে ফ্রান্সের সীমারেখার মধ্যেই ধ্বংস করিয়া নিজ নিজ দেশকে বিপ্লবের প্রভাব হইতে রক্ষা করা—এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগদান করিল।

ষোড়শ লুই-এর পলায়নের বৃথা চেষ্টা : ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মনোভাবের পরিবর্তন

প্যাডুয়া ও পিল্‌নিজের ঘোষণা

---

* ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রথমে যুদ্ধে অস্বীকৃতি ঃ নেদারল্যান্ড ও স্পেনকে সাহায্য দানে অস্বীকৃতি (১৭৯০)

দেশ-জয় ও অপরের স্বাধীনতা হরণের নীতি ত্যাগ

বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্রান্স ইওরোপের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইতে চাহে নাই। নেদারল্যান্ড যখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিল এবং স্পেন যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিল (১৭৯০), তখন ফরাসী সংবিধান-সভা উভয় অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এমন কি, ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই যাহাতে কোন যুদ্ধ সৃষ্টি না করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সভার অনুমতি ভিন্ন রাজার যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সংবিধান-সভা দেশ-জয়ের উদ্দেশ্যে বা অপরের স্বাধীনতা যাহাতে বিনষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ যুদ্ধে ফ্রান্স যোগদান করিবে না, এইরূপ একটি নীতিও গ্রহণ করিয়াছিল।

এভিগনন্ ফরাসী রাজ্যভুক্ত

বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

কিন্তু উপরি-উক্ত নীতি ফ্রান্স সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে এভিগনন্ (Avignon) নামক স্থানটি পোপের অধীনতা ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইতে চাহিলে ফ্রান্স উহা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে এভিগনন্বাসীদের ইচ্ছা ছিল ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু নূতন সংবিধান অনুসারে যখন আইনসভা (The Legislative Assembly) গঠন করা হইল (অক্টোবর, ১৭৯১), তখন হইতে বিপ্লবী নেতাগণ ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের বাহিরেও বিস্তার করিতে চাহিলেন।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফরাসী রাজ-পরিবারের পক্ষ অবলম্বন ; 'এমিগ্রি'দের যুদ্ধসজ্জা

অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া কর্তৃক ষোড়শ লুই ও তাঁহার রাণী আঁতোয়ানেত-এর পক্ষ অবলম্বন, দেশত্যাগী ফরাসী 'এমিগ্রি'দের (Emigres) ফরাসী সীমান্তে সামরিক-সজ্জা এবং সর্বোপরি গিরণ্ডিস্ট্ দল এমন কি, দক্ষিণপন্থীদের যুদ্ধস্পৃহা ইওরোপের সহিত ফ্রান্সের সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

ফ্রান্স ও ইওরোপের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ঃ
(১) বিপ্লবের বিস্তৃতি,
(২) রাজগণের বিপ্লব-ভীতি

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার প্রকৃত কারণ হইল ঃ (১) ফরাসী বিপ্লবের আবর্ত-বৃদ্ধি এবং (২) ইওরোপীয় রাজগণের বিপ্লব-ভীতি। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বিপ্লব যখন স্বৈরাচারী রাজশক্তিকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল তখন স্বভাবতই বিপ্লবের গতি বহির্মুখী হইয়া উঠিল ; ফরাসী রাজ্যের সীমার মধ্যে বিপ্লবের প্রভাবকে আর আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। অপর দিকে ফ্রান্সের সামন্ত-প্রথাজনিত অভিজাতবর্গের সুযোগ-সুবিধার বিলুপ্তি, কৃষক ও ঊর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা ইত্যাদির প্রভাব ইওরোপের অপরাপর দেশে স্বভাবতই বিস্তারলাভ করিবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া ইওরোপের রাজগণ প্রমাদ গণিলেন। উপরি-উক্ত দুইটি কারণ ভিন্ন আরও দুইটি কারণ ছিল। (৩) ফ্রান্স এভিগনন্

(৩) ফ্রান্স কর্তৃক এভিগনন্ দখল

নামক স্থান দখল করিলে ইওরোপের রাজগণের মনে বিপ্লবী ফ্রান্সের পররাজ্য গ্রাসনীতি সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এবং (৪) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্সের রাজ্যাংশ দখল এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রাধান্য চিরতরে বিলোপ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপর দিকে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজগণের আক্রমণ হইতে বিপ্লবকে রক্ষা করিবার এবং বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইওরোপকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চাহিয়াছিল।

রাজগণের স্বার্থান্বেষণ
(৪) ইওরোপীয় ও বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব

বিপ্লবী ফ্রান্সকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ভীতি প্রদর্শন : যুদ্ধ ঘোষণা

অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া যুগ্মভাবে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন করিতে শুরু করিল, তখন আইনসভার চাপে ষোড়শ লুই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (২০শে এপ্রিল, ১৭৯২)।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ

প্রথম দিকে ফ্রান্স কেবলমাত্র বিপ্লবকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লব মাত্রেই সংগ্রামশীল। সুতরাং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিণত হইতে অধিক-কাল লাগিল না। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্স 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী' এই বাণী ইওরোপের সর্বত্র এবং সর্বজনের নিকট পৌঁছাইবার জন্য অগ্রসর হইল। এই আক্রমণাত্মক নীতির সহিত জাতীয়তা-বোধের সংমিশ্রণের ফলে বিপ্লবী যুদ্ধ এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হইল। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ, বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তার ও রাজ্য-বিস্তার প্রভৃতির সূক্ষ্ম ব্যবধান দূরীভূত হইয়া বিপ্লব ক্রমেই দিগ্বিজয়ের পথে ধাবিত হইল।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিণত

যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্রান্সের পরাজয়

অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হইলে, প্রথম দিকে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিলে নিছক সৌভাগ্যবশতই ফ্রান্স নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল। কারণ ঠিক ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ শুরু হইয়াছিল। প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ সুযোগ বুঝিয়া পোল্যাণ্ড আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহাতে নির্লিপ্ত থাকা প্রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রাশিয়া পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণে ব্যস্ত থাকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একাগ্রতা সহকারে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। অস্ট্রিয়ার পক্ষেও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। এই কারণে ফ্রান্স ভাম্যি'র (Valmy) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল (সেপ্টেম্বর ২০, ১৭৯২)।

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ লইয়া অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ব্যস্ততার ফলে ফ্রান্সের জয়লাভ

ভাম্যি'র (Valmy) যুদ্ধে জয়লাভ

জাতীয় কনভেনশন ও বৈদেশিক যুদ্ধ (The National Convention & Foreign Wars) ঃ কনভেনশন বা প্রজাতান্ত্রিক ফরাসী সরকারের অধীনে ফ্রান্স নেদারল্যান্ড আক্রমণ করিয়া বেলজিয়ামকে অস্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করে, এবং সার্ডিনিয়ার রাজার অধীন স্যাভয় ও নিস্ নামক স্থান দুইটি দখল করিয়া লয়। রাইন নদীর তীর পর্যন্ত ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ফলে বুরবোঁ আমলের 'প্রাকৃতিক সীমারেখা'-নীতি বিপ্লবী ফ্রান্সের অধীনে সাফল্য লাভ করে। বেলজিয়াম অস্ট্রিয়ার অধীনতামুক্ত হইলেও ফ্রান্সের দখলে রহিল ; শেল্ট্ নদী (The Scheldt) সকল দেশের বাণিজ্যপোত চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। হল্যান্ডের বাণিজ্য-স্বার্থ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। ইংলণ্ড ও হল্যান্ড ইহার প্রতিবাদ জানাইলে ফ্রান্স এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঃ স্যাভয়, নিস্ দখল

রাইন নদীতীরে ফ্রান্সের প্রাধান্য

বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অর্থাভাবে বিজিত দেশ হইতে রসদ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। বেলজিয়ামবাসীদের উপর অত্যধিক করভার স্থাপন এবং তথাকার চার্চের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ফলে স্বভাবতই সেখানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইল। ফরাসী সেনানায়ক ডোমোরিজ (Domouriez) এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিপ্লবী নেতা দাঁতোঁর সহিত গোপনে পত্রালাপ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াই তিনি সসৈন্যে দেশে ফিরিবেন এবং ষোড়শ লুই-এর পুত্র সপ্তদশ লুইকে ফরাসী সিংহাসনে বসাইয়া প্রজাতান্ত্রিক অব্যবস্থার অবসান ঘটাইবেন। কিন্তু নীয়ারউইনডেন (Neerwinden)-এর যুদ্ধে ডোমোরিজ পরাজিত হইলে (মার্চ ২৮, ১৭৯৩) তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইল না। তাঁহার অধীন সৈন্যগণও প্যারিস নগরীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে রাজী ছিল না। ডোমোরিজ নিজ সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে জানুয়ারি মাসে (১৭৯৩) ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে এবং বিপ্লবী নেতাদের অপরাপর দেশের জনসাধারণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিদানের ফলে ফেব্রুয়ারি মাসে (১৭৯৩) ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, ন্যাপল্‌স্ স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসংঘ গঠন করিল। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইহাই ছিল প্রথম শক্তিসংঘ (First Coalition)। ইওরোপীয় দেশগুলি সৈন্য সরবরাহ করিল, ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড নিজ নৌবলের সাহায্যে ফরাসী উপনিবেশ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য দখল করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইল।

বেলজিয়ামের উপর করভার ঃ চার্চের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

ফরাসী সেনানায়ক ডোমোরিজ ও বিপ্লবী নেতা দাঁতোঁর রাজতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের ষড়যন্ত্র

নীয়ারউইনডেন-এর যুদ্ধে ডোমোরিজের পরাজয়

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড

প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসংঘ গঠন ঃ ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, স্পেন, ন্যাপল্‌স্, পোর্তুগাল প্রভৃতির যোগদান

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ (First Coalition)

ইংল্যান্ড স্বার্থ-সিদ্ধিতে প্রবৃত্ত

বহির্দেশ হইতে এইভাবে এক বিরাট শক্তিসংঘ ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রমণ করিল। ঐ সময়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও এক অতিশয় ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। লা-ভেণ্ডি (La Vendee) নামক স্থানের কৃষকগণ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তথাকার কৃষকগণ ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। তাহারা বিপ্লবী সরকারের চার্চ-বিরোধী নীতি এবং বাধ্যতামূলক সামরিক কার্যগ্রহণ নীতির বিরোধী ছিল। ইহা ভিন্ন তাহারা রাজতন্ত্রের অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ আগুনের ন্যায়-ই দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে লায়ন্স্ (Lyons) নামক স্থানেও বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলপূর্বক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্রমে বিদ্রোহ অন্যান্য শহরেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে দেশে অন্তর্যুদ্ধ যখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে গতানুগতিক কোন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার কোন আশা ছিল না, বলা বাহুল্য। এইরূপ পরিস্থিতি স্বভাবতই ফ্রান্সে বিপ্লবের গতির উপর গভীর প্রভাব ফেলিল। গিরণ্ডিস্টদের ক্ষমতা ইহার ফলে বিলুপ্ত হইল। বস্তুত রাজার মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই গিরণ্ডিস্ট্ দলের প্রাধান্যের অবসান শুরু হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এই দুই সমস্যার চাপে গিরণ্ডিস্টরা ক্ষমতাচ্যুত হইল। এই পরিস্থিতির সুযোগ চরমপন্থায় বিশ্বাসী জেকোবিন্ দল গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিল না। ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবস্পিয়ার ছিলেন জেকোবিন্ দলের এক দুর্ধর্ষ নেতা। তাঁহার রাজনৈতিক উন্মত্ততা, চরম নির্মমতা, নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অসাধারণ একাগ্রতা জেকোবিন্ দলকে কন্‌ভেনশন্ নামক জাতীয় সভায় নিরঙ্কুশ প্রভাব ও প্রাধান্য দান করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রোবস্পিয়ার প্রথম জন-নিরাপত্তা সমিতির (Committee of Public Safety) সদস্য-পদ গ্রহণ করিবার সময় হইতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে গিলোটিনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া পর্যন্ত এক বৎসরকাল তিনি ছিলেন ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধিনায়ক বা ডিক্টেটর। বিপ্লবী ফ্রান্স আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দলীয় স্বৈরতন্ত্র বা পার্টি ডিক্টেটরশিপের (Party Dictatorship) মাধ্যমে অত্যাচার শুরু করিয়াছিল।*

ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রান্ত

লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ

লায়ন্স্ ও অন্যান্য শহরে বিদ্রোহ

রোবস্পিয়ারের নির্মম, স্বৈরতন্ত্রী শাসন

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সহিত যুঝিবার জন্য যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গঠন করা হইল উহার শাসনকালকে 'সন্ত্রাসের শাসন' (Reign of Terror) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রশাসন কতকগুলি কমিটি ও ট্রাইবুন্যাল (Committees and tribunals)-এর মাধ্যমে চালান হইত।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা

* "The revolution, on the defensive, sought salvation in personal tyranny—the first, perhaps, of all single-party dictatorship of modern world". *Europe Since Napoleon*, p. 18, David Thomson.

সন্ত্রাসের শাসন সংগঠন (Organisation of the Reign of Terror) ঃ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য অস্বাভাবিক ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, একথা অনস্বীকার্য। এজন্য কনভেনশন (১) জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety), (২) বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal), (৩) সন্দেহভাজনদের আইন (Law of Suspects), এবং (৪) সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security)—এই চারিটি লইয়া এক শাসনব্যবস্থা চালু করিল। ইহা সন্ত্রাসের শাসন (Reign of Terror) নামে ইতিহাসে আখ্যায়িত হইয়াছে। দেশকে অন্তর্যুদ্ধ হইতে রক্ষা এবং বিপ্লবের সমর্থক ও রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া রোধ করিতে জননিরাপত্তা সমিতির (Committee of Public Safety) উপর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কনভেনশন জননিরাপত্তা সমিতি গঠন করে। ইহার সদস্যগণ প্রতিমাসেই কনভেনশন কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন স্থির ছিল, পরে অবশ্য সদস্যগণ পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে প্রায় স্থায়ীই হইয়া গিয়াছিলেন। জননিরাপত্তা সমিতি প্রশাসনিক যাবতীয় দায়িত্ব-প্রাপ্ত ছিল এবং কর্তব্য সম্পাদনে উহার ব্যাপক স্বাধীন ক্ষমতা ছিল।

সন্ত্রাসের শাসনের প্রয়োজনীয়তা
সন্ত্রাসের শাসনের সংগঠন

(১) জননিরাপত্তা সমিতি (২) বিপ্লবী বিচারালয় (৩) সন্দেহভাজনদের আইন, (৪) সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি

জননিরাপত্তা সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা প্রথমে ছিল ৯ জন, পরে ইহা বাড়াইয়া ১২ জন করা হইল। তখনও মন্ত্রিগণই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু নিরাপত্তা সমিতি মন্ত্রিগণ বা কনভেনশন অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইল। এই সমিতি জাতির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন পন্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। এই সমিতির সরাসরি অধীনে দেশের সর্বত্র "বিপ্লবী সমিতি" (Revolutionary Committee) গঠন করা হইল।

জননিরাপত্তা সমিতির অধীনে বিপ্লবী সমিতি

এই সকল বিপ্লবী কমিটির কাজ ছিল Law of Suspects নামে এক ভয়াবহ আইন প্রয়োগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে পূর্বেকার রাজতন্ত্রের (Old Regime) সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করা হইত, এমন কি, যাহারা বিপ্লবে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই সেই সকল ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহবশে 'বিপ্লবী বিচারালয়' (Revolutionary Tribunal)-এর সম্মুখে বিচারের জন্য প্রেরণ করা। বিপ্লবী বিচারালয়ের শাখা ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলেও গঠন করা হইয়াছিল। Law of Suspects ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর চালু করা হইয়াছিল।

সন্দেহের আইন (Law of Suspects)

বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal)

বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal) দেশদ্রোহী এবং বিপ্লব-বিরোধী ব্যক্তিদের বিচারের ভারপ্রাপ্ত হইল। ক্রমেই এই বিচারালয়ের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার অধীনে আরও বহুসংখ্যক বিচারালয় স্থাপিত হইল।

বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালের অধীনে অনুরূপ বিচারালয় স্থাপিত

অপর একটি সমিতি ছিল সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security)। এই সমিতির কাজ ছিল পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথমবার কনভেনশন কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও অল্প দিন পর হইতেই এই সমিতির সদস্যগণ জননিরাপত্তা সমিতি দ্বারা মনোনীত হইতেন।*

এইভাবে 'সন্ত্রাসের শাসন' (Reign of Terror) স্থাপিত হইল। প্রথমে এই শাসনব্যবস্থার নীতি ছিল প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করিয়াও দেশের শান্তি বজায় রাখা এবং বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু ক্রমেই ইহা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

মূলনীতি ক্রমশ বর্জিত : ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ

প্রথমে এই নূতন শাসনব্যবস্থা লা-ভেণ্ডি ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিল। কৃষকদের সুবিধার জন্য খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইল। 'এমিগ্রি' (Emigre) অর্থাৎ দেশত্যাগী রাজতান্ত্রিকদের বাজেয়াপ্ত-করা ভূ-সম্পত্তি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত, তাহাও স্থির করা হইল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর হইতে যুদ্ধের করভার লাঘব করা হইল। একমাত্র অত্যধিক ধনিক সম্প্রদায়ের উপর যুদ্ধের করভার স্থাপন করা হইল।

লা-ভেণ্ডির কৃষকদের প্রতি উদারতা : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের করভার লাঘব

বিদেশী শত্রুদের সহিত প্রথমে যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার মনোবৃত্তি দেখা গেল। সম্মানজনক শর্তে যুদ্ধ মিটাইয়া বিপ্লবকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করিবার আগ্রহ দাঁতোঁর (Danton) মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ উদারতা এবং পররাষ্ট্রীয় শান্তিপ্রিয়তা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। দাঁতোঁর অকৃতকার্যতার ফলে তাঁহার স্থলে রোবস্পিয়ার নেতৃত্বে আসীন হইলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রকৃত 'সন্ত্রাসের শাসন' শুরু হইল।

বিদেশী শত্রুদের সহিত যুদ্ধ মিটাইবার আগ্রহ

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ যখন উদারতার দ্বারা প্রশমিত করা সম্ভব হইল না, তখন বিদ্রোহীদিগকে গিলোটিন (guillotine) করিয়া—অর্থাৎ গিলোটিন নামক এক-প্রকার শিরশ্ছেদ-যন্ত্রে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হাজার হাজার বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করা হইল। Law of Suspects নামক আইনের প্রয়োগে ব্যাপক ধরপাকড় এবং বিপ্লবী বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। বিপ্লবের বিরোধী অথবা রাজতন্ত্রের সহিত

উদার-নীতি বিফল : ব্যাপক হত্যাকাণ্ড

* *Ibid*, p. 20.

রাণী আঁতোয়ানেত ও ম্যাডাম রোলান্ডের গিলোটিন

কোনপ্রকারে জড়িত থাকিবার সন্দেহ উপস্থিত হইলেও গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ হারাইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ষোড়শ লুই-এর রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত এবং গিরণ্ডিস্ট্ দলের ম্যাডাম রোলাণ্ডকেও গিলোটিন করা হইল।

নিছক সন্দেহবশে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ

যে-ব্যক্তিকেই বিপ্লবী বিচারালয়ে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইত, তাহাকেই 'গিলোটিন' (Guillotine) যন্ত্রে শিরশ্ছেদ করা হইত। একমাত্র প্যারিস শহরের বিপ্লবী বিচারালয়েই মোট ২৬৩৯ জনকে এবং ফ্রান্সে ১৭ হাজার ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আরও ৪০ হাজার ব্যক্তিকে দলবদ্ধভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোন নীতি ছিল না। বস্তুত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ৭০ শতাংশ ছিল কৃষক ও শ্রমিক।*

শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার অধীনে কনভেনশনের সদস্যগণকে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশ, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে প্রজাতন্ত্রের প্রতি লোকের আনুগত্য সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত। এইভাবে সমগ্র দেশের শাসনকার্য কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতে লাগিল।

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি : পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত অত্যাচার

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থাকে পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত অত্যাচার হিসাবে গণ্য করা উচিত। একজন বিপ্লবী নেতা ইহাকে 'Dictatorship of Distress' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।† দেশের অভ্যন্তরে যখন ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, ফ্রান্স যখন প্রায় সমগ্র ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দ্বারা আক্রান্ত, ঐ সময়ে একমাত্র কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসন দ্বারাই দেশরক্ষা সম্ভব ছিল। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল। বিদেশী শত্রুগণ যখন ফ্রান্সের দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পাওয়া গেল না। অথচ দেশরক্ষার জন্য বিরাট সংখ্যক লোকের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি প্রয়োজন ছিল অখণ্ড আনুগত্যের।

উদ্দেশ্য : বিদ্রোহ-দমন ও আনুগত্য-সৃষ্টি

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ দ্বারা এই দুই প্রকার প্রয়োজন মিটান। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিবার এবং আনুগত্যের অভাব

* "The Terror was not an instrument of class war, and 70 per cent of its victims belonged to the peasantry and laboring classes, mostly in rebellion against the State." *Europe Since Napoleon*, p. 20, David Thomson.

† Riker: "The terror was an emergency despotism, a dictatorsdip of distress." p. 326.

দেখিলে সেখানে বলপূর্বক আনুগত্য সৃষ্টি করিবার জন্যই সন্ত্রাসের শাসনের প্রয়োজন ছিল। যাহাদের সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না তাহারা সন্ত্রাসের শাসনাধীনে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়াছিল।*

অভূতপূর্ব শাসনব্যবস্থা

ইহার প্রয়োজনীয়তা

'সন্ত্রাসের শাসন' যে এক অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব শাসনব্যবস্থা ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ঐ সময়কার পরিস্থিতি ছিল তেমনি অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব। ঐরূপ পরিস্থিতিতে কোনপ্রকার সাধারণ শাসনব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব ছিল না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপিত না হইলে ফ্রান্স ইওরোপীয় যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। সন্ত্রাসের শাসন-ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা অনুচিত হইবে না। এই শাসনব্যবস্থার অধীনে বহু নির্দোষ ব্যক্তি নিছক সন্দেহবশে ধৃত হইয়াছিল এবং গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ দিয়াছিল সত্য, তথাপি মোট কার্যের সুফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে সন্ত্রাসের শাসনকালের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে।† কিন্তু ইহার কুফলও নেহাত কম ছিল না। সন্ত্রাসের শাসনকালের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ইওরোপের অপরাপর দেশ-গুলির মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে এক ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। বিপ্লবের নামে হত্যালীলা ইওরোপের উদারপন্থীরাও সমর্থন করে নাই।

রাজনৈতিক দূর-দর্শিতার পরিচায়ক

দাঁতোঁ ও রোবস্‌পিয়ারের প্রাধান্য

'সন্ত্রাসের শাসন' পরিচালকদের মধ্যে দাঁতোঁ ও রোবস্‌পিয়ার ছিলেন প্রধান। কিন্তু এই দুই নেতার মত ও আদর্শ ছিল ভিন্ন। রোবস্‌পিয়ার এবং জেকোবিন্‌ দলের অনেকে "বিপ্লবী প্যারিস কমুন"-এর ক্ষমতা নাশ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারিস কমুনের বহু সদস্যকে গিলোটিন করা হইল। সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া দাঁতোঁ ইহার উগ্রতা হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিলেন। দাঁতোঁর সেক্রেটারি ক্যামিল ডেসমোলিনস্‌ (Camille Desmoulins) তাঁহার Le Vieux Cordelier নামক পত্রিকায় ফ্রান্সের কারাগারে নিছক সন্দেহবশে যে ২০০,০০০ লোককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিবার দাবি উত্থাপন করিলেন। জননিরাপত্তা সমিতি সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাহাদের শত্রুদের শেষ করিতে পারিবে না মনে করিয়া থাকিলে ভুল করিবে,

* "It must not be supposed, of course, that the great majority of the people actually suffered under the Terror......Certainly, the joy of life was not abolished by Terror. The theatres were well-attended; even a little prosperity returned." Riker, p. 327.

† "It was, in short, a marvellous product of practical statesmanship; and it saved France." *Ibid*, p. 327.

কারণ একজন শত্রুকে গিলোটিন করিলে তাহার পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে অন্তত আরও দুইজন নূতন শত্রুর সৃষ্টি হইবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Liberty) যদি স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সন্ত্রাসের অবসান ঘটাইয়া জননিরাপত্তা সমিতিকে (Committee of Public Safety) জন-দরদী সমিতিতে (Committee of Public Clemency) রূপান্তরিত করিতে হইবে। দাঁতোঁ নিজেও জননিরাপত্তা সমিতির সদস্যবর্গকে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং গিলোটিনে মানুষের প্রাণনাশের বিরোধিতা শুরু করিলেন। এজন্য পক্ষান্তরে রোবস্‌পিয়ার দাঁতোঁ ও ডেসমোলিনস্ দুইজনকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন।

দাঁতোঁ ও ডেসমোলিনস্-এর সন্ত্রাসের শাসনের বিরোধিতা

অল্পকালের মধ্যেই দাঁতোঁ, ডেসমোলিনস্ ও অপরাপর অনেকে অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। ফলে, তাঁহাদিগকে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালের সম্মুখীন হইতে হইল এবং বিচারে অপরাপর অনেকের ন্যায় দাঁতোঁ ও ডেসমোলিনস্‌কে গিলোটিনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।* এইভাবে রোবস্‌পিয়ারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। তিনি কনভেনশনেরও সভাপতি হইলেন, সেণ্ট্ জাস্ট্ ও কোথোঁ ছিলেন তাঁহার দুইজন ঘনিষ্ঠ সহকারী। নিজ ক্ষমতা সীমাহীন মনে করিয়া যেন দাঁতোঁ এবং ডেসমোলিনস্-এর আত্মাকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যেই রোবস্‌পিয়ার ১০ই জুন, ১৭৯৪, এক আইন পাস করিয়া রাজতন্ত্রের সমর্থন, প্রজাতন্ত্রের কুৎসা, ব্যভিচার, মিথ্যা সংবাদ প্রচার, কোন সরকারী সম্পত্তি চুরি, অর্থ তছরূপ, খাদ্যদ্রব্যের পরিবহনে বাধা সৃষ্টি, যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করা প্রভৃতি যে-কোন অপরাধে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনজীবীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা বিপ্লবী বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত করা হইল। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া জনৈক জুরি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমি সব সময়ই এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছি যে, যে-ব্যক্তিকেই এই বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে, তাহাকেই প্রাণদণ্ড দিতে হইবে"। কিন্তু ক্রমেই এই অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রোবস্‌পিয়ার, সেণ্ট্ জাস্ট্ ও কোথোঁ (Robespierre, Saint Just and Couthon) এই ত্রিমূর্তির (Triumvirate) ভয়ে জননিরাপত্তা সমিতির সদস্যদের মনেও কখন কাহার প্রাণ গিলোটিনে হারাইতে হয়, সেই ভয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় কনভেনশনের ৭৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১১৭ জন সভায় উপস্থিত হইতেন। এঁদের মধ্যেও অনেকে কোন ব্যাপারে ভোট গ্রহণ করা হইলে ভোটদানে বিরত থাকিতেন পাছে তাহাতে কাহারো প্রতি শত্রুতা

দাঁতোঁ ও ডেসমোলিনস্-এর গিলোটিন

সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

রোবস্‌পিয়ারের স্বৈরাচারী ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত

* "Danton predicted 'Before these months are out the people will tear my enemies to pieces. Vile Robespierre, the scaffold claims you too. You will follow me." *The Age of Napoleon*, p. 13, Will and Ariel Durant.

প্রকাশ পায়। ক্রমেই সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিল। বিশেষভাবে রোবস্‌পিয়ারের উপর দোষারোপ শুরু হইলে, তিনি জননিরাপত্তা সমিতির সভায় যোগ দেওয়া বন্ধ করিলেন।

বহিরাক্রমণের ভীতি জনসাধারণকে নির্মম অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কিন্তু ফরাসী নৌবহরের নিকট ব্রিটিশ নৌবহরের পরাজয় (জুন ১, ১৭৯৪) এবং শার্লেরয় নামক স্থান হইতে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিতাড়ন (জুন ২৫, ১৭৯৪), ফ্লুরাসের যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়লাভ এবং সর্বোপরি লীজ ও এন্টওয়ার্প ফরাসী সৈন্য কর্তৃক দখল যখন যুদ্ধের গতি ফ্রান্সের সপক্ষে ফিরাইয়া দিল, তখন রোবস্‌পিয়ারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। রোবস্‌পিয়ার যখন আরও কয়েকজনের নাম গিলোটিনের জন্য তালিকাভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া খবর প্রকাশ পাইল, তখন সেইসব ব্যক্তিরাই বিশেষভাবে ফাউক, ট্যালিয়ে, ফ্রেরোঁ (Fouche, Tallen and Freron) রোবস্‌পিয়ারকে গিলোটিন করিবার মধ্যে নিজেদের প্রাণ রক্ষার একমাত্র পথ দেখিতে পাইলেন।

২৬শে জুলাই রোবস্‌পিয়ার কনভেন্‌শনের সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁতোঁকে হত্যার অভিযোগ আনা হইল। রোবস্‌পিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি এবং প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ, এবং তাঁহার সকল কিছুই সত্য-নির্ভর, এই উক্তি তাঁহার প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি করিল। ঐ দিনই সন্ধ্যায় জেকোবিন্ ক্লাবে তিনি একই বক্তব্য পুনরায় রাখিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। ২৭শে জুলাই, ১৭৯৪, কনভেন্‌শন্ রোবস্‌পিয়ার-ও তাঁহার দুই সহকারী—সেণ্ট্ জাস্ট্ ও কোথোঁ—এবং আরও কয়েকজনকে গিলোটিন করিবার আদেশ দিল। এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রোবস্‌পিয়ার পলায়নের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ২৮শে জুলাই ১৭৯৪, কনভেন্‌শনের নির্দেশমত রোবস্‌পিয়ার ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করা হইল। রোবস্‌পিয়ারের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে 'সন্ত্রাসের শাসন'-এর অবসান ঘটিল।

রোবস্‌পিয়ারের প্রাণদণ্ড : সন্ত্রাসের শাসনের অবসান

সন্ত্রাসের শাসনের পতন (Fall of the Reign of Terror): রোবস্‌-পিয়ারের পতন তথা গিলোটিনে মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রোবস্‌পিয়ার সন্ত্রাসের শাসনের অধিকর্তা ছিলেন এজন্য তাঁহার পতনে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সন্ত্রাসের শাসনের পতনের মূল কারণ ছিল উহার সীমাহীন নৃশংসতা এবং উহার ফলে সন্ত্রাসের শাসনের প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা। এমন কি, সন্ত্রাসের শাসনের পশ্চাতে প্রথমে যে-সকল ব্যক্তির পূর্ণ সমর্থন ছিল, তাহারাও উহার কার্যকলাপে শেষ পর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া

পতনের কারণসমূহ

পড়িয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে কনভেনশন বা জাতীয় সভা আইনের শাসন এবং সংযমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। ২৭শে জুলাই বা ৯ই থারমিডোর (9th Thermidor) হইতে সন্ত্রাসের শাসনের পতন ও আইনের শাসন স্থাপনে কনভেনশনের যে-সকল সদস্য উৎসাহী ছিলেন তাঁহারা নিজেরাই সন্ত্রাসের শাসনকালে অবর্ণনীয় অত্যাচারের জন্য দায়ী ছিলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁহারা সংযমের পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া সন্ত্রাসের শাসনকালের যাবতীয় ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁহারা রোবস্‌পিয়ারকেই দায়ী করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং নিজেদের আইন এবং শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবান বলিয়া জাহির করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। এখানে দাঁতোঁকে গ্রেফতার করিবার পর তাঁহার উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন এইভাবে আমি বিপ্লবী বিচারালয় গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সেজন্য আজ আমি ভগবান ও মানুষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বিপ্লবের কালে ক্ষমতা দুর্বৃত্তদের হস্তগত হইয়া পড়ে।"*

সাময়িক ব্যবস্থা

দূরদর্শী মিরাবো বহুপূর্বেই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বিপ্লব "শনি দেবতার ন্যায় নিজ সন্তানদের গলাধঃকরণ করিবে।"† তাঁহার এই উক্তি সন্ত্রাসের শাসন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায়ই প্রমাণিত হইয়াছিল। বস্তুত, সন্ত্রাসের শাসন স্বাভাবিকভাবেই ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। পরিস্থিতির চাপে উহার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্বভাবতই উহার অবসান ঘটিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসংঘের বিরুদ্ধে কনভেনশন তথা সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার যুদ্ধ পরিচালনা

সন্ত্রাসের শাসনকালে যুদ্ধ পরিচালনা (Conduct of War under the Terror)ঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ স্থাপিত হইলে জননিরাপত্তা সমিতি সমর পরিচলনার ভার গ্রহণ করিল। ল্যাজারে ক্যারনো (Lazarre Carnot) নামে একজন সদস্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমর-বিভাগের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করা হইল। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তিগ্রহণ নীতি চালু করিয়া সাড়ে সাত লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করা হইল। ইতিপূর্বে এত বিরাট সংখ্যক সেনাবাহিনী কোন দেশই যুদ্ধে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই বিশাল বাহিনীর গঠন ও দক্ষতার নিকট

* "One day like this I organised the Revolutionary Tribunal ... I ask pardon for it of God and man ... In revolutions authority remains with the greatest scoundrels". *The Age of Napoleon,* p. 77, Will and Ariel Durant.

† "....The Revolution, like the God Saturn, would end by devouring its own offsprings." *A History of Europe,* Schevill, p. 414.

ইওরোপীয় শক্তিসংঘের (coalition) তুলনা হইতে পারে না। শক্তিসংঘের মোট সৈন্যসংখ্যা ফরাসীবাহিনী অপেক্ষা কম না হইলেও মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগ, সৈন্য সংগঠন ইত্যাদির অভাবহেতু শক্তিসংঘ অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী সৈন্য এক গভীর দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা লইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। অপর দিকে ইওরোপীয় শক্তিসংঘের সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না।

ফরাসী সৈন্যসংখ্যা, দক্ষতা, সংগঠনের দিক দিয়া ইওরোপীয় শক্তিসংঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ফরাসী সৈন্যের উৎসাহ-উদ্দীপনা

ইহা ভিন্ন, বংশমর্যাদা বা পরিবারের প্রাধান্য, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সামরিক দক্ষতার ভিত্তিতে সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগের পদ্ধতিও ফ্রান্সের বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। ক্ষমতা থাকিলে সকলের নিকটই উন্নতির পথ সমানভাবে উন্মুক্ত,—এই চেতনা ফরাসী সেনাপতিগণের তথা যে-কোন কর্মচারীর মনে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল কারণে ফ্রান্স সর্বত্র শক্তিসংঘের সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। ইংলন্ড ডানকার্ক বন্দরের অবরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। টুলোঁ (Toulon) নামক ফরাসী সামরিক বন্দরে এক ইংরেজ নৌবাহিনী উপস্থিত হইলে (আগস্ট ২৮, ১৭৯৩) সেখানকার বাসিন্দারা ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং কনভেনশনের অর্থাৎ বিপ্লবী শাসনের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সপ্তদশ লুই-এর সপক্ষে তাহাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করিল। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টির চেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যেই ইংরেজ নৌবাহিনীকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না; আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বেলজিয়মকে ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করিল। হল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া নামে মাত্র স্বাধীন রাখিয়া উহাকে ফ্রান্সের অধীন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিল। এদিকে প্রাশিয়া শক্তিসংঘ ত্যাগ করিল। অল্পকালের মধ্যেই স্পেনও প্রাশিয়ার পন্থা অনুসরণ করিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ব্যাসেল (Basel)-এর সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা মানিয়া লইল। এইভাবে ইওরোপের প্রথম শক্তিসংঘ (First coalition) ভাঙ্গিয়া গেল। কেবলমাত্র ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়া তখনও ফ্রান্সের সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিল না। এদিকে রোবস্পিয়ারের গিলোটিনের সঙ্গে সঙ্গে (২৮ জুলাই, ১৭৯৪) সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। তারপর কিছুকাল সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Thermidorean Reaction) চলিল।

উন্নতির পথ সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত

বিজয়ী ফ্রান্স

নেপোলিয়ন কর্তৃক টুলোঁ বন্দর হইতে ইংরেজ বিতাড়ন

বেলজিয়াম জয় এবং হল্যান্ড পদানত

প্রাশিয়া ও স্পেনের শক্তিসংঘ ত্যাগ

থার্মিডোরিয়ান* (অর্থাৎ নভেম্বর মাসের) প্রতিক্রিয়া : নূতন সংবিধান রচনা : জুলাই ২৯, ১৭৯৪—অক্টোবর ২৬, ১৭৯৫ (Thermidorean Reaction : New Constitution : July 29, 1794—October 26, 1795) : ২৮শে জুলাই (১৭৯৪) রোবস্‌পিয়ার ও তাঁহারা ঘনিষ্ঠ সহকারীদের গিলোটিনের পর ২৯শে জুলাই সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়ার বলি তাঁহারা হইয়াছিলেন উহারই অনুসরণ করিয়া প্যারিস কম্যুনের ৭০ জন সদস্যকে হত্যা করা হইল। সন্ত্রাসের অত্যাচারী শাসন ও হত্যাকাণ্ডে প্যারিস কম্যুনের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল, এই কারণেই ৭০ জন উৎসাহী সদস্যকে প্রাণ দিতে হইল। তারপর তাঁহার বিরোধী যে-সকল ব্যক্তিকে রোবস্‌পিয়ার জেলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে কনভেনশন মুক্তি দিল।

রোবস্‌পিয়ারের পতনের পর সন্ত্রাস-বিরোধী প্রতিক্রিয়া

বিপ্লব। বিচারালয়গুলিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হইল যাহাতে লোকে ন্যায়-বিচার পাইতে পারে। জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) যদিও উঠাইয়া দেওয়া হইল না, কিন্তু দুইয়েরই অত্যাচারী ক্ষমতার অবসান ঘটান হইল। এই পরিস্থিতিতে রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকা আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং অতি-বিপ্লবী মতাবলম্বী পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল, কারণ এগুলি আর জনসাধারণের সমর্থন পায় নাই। ফ্রান্সের সর্বত্র জেকোবিন ক্লাবের শাখা-প্রশাখা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল (নভেম্বর, ১২)। কনভেনশনে 'প্লেইন' (Plain) নামে যে-প্রতিনিধি দল ছিল উহা এখন দক্ষিণপন্থী হইয়া গেল এবং সভাকক্ষের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করিল। গিরণ্ডিস্টদের অবশিষ্ট ৭৩ জন প্রতিনিধি যাহাদিগকে বহিষ্কার করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কনভেনশন সভায় ফিরাইয়া আনা হইল। এইভাবে বিপ্লব পুনরায় 'বুর্জোজি' (Bourgeoisie) বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বাধীন হইয়া পড়িল।

নভেম্বর (Thermidor) প্রতিক্রিয়া : কার্যকলাপ

বিপ্লবের আতিশয্যে ভগবানের স্থলে ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে স্থাপন করা হইয়াছিল। এখন ধর্মাচরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। লা-ভেণ্ডি (La Vendee) নামক স্থানের বিপ্লব-বিরোধীদের সহিত এক চুক্তি দ্বারা তাহাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল (ফেব্রুয়ারি, ১৫, ১৭৯৫) ; কিছুদিনের মধ্যেই এই স্বাধীনতা ফ্রান্সের সর্বত্র প্রসারিত হইল। রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগ হইতে চার্চকে পৃথক করিয়া পূর্বেকার অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়া হইল। রাষ্ট্র ও চার্চ পূর্বেকার মত পৃথক দুইটি সংস্থায় পরিণত হইল।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা : চার্চ অর্থাৎ ধর্মাধিষ্ঠান রাষ্ট্র হইতে পৃথকীকৃত

---

* ফরাসী বিপ্লব শুরু হইলে ফ্রান্সে এক বিপ্লবী পঞ্জিকা চালু করা হইল। মাসের নামও নূতন ভাবে রাখা হইল। নভেম্বর মাসের নাম রাখা হইল 'থার্মিডোর' (Thermidor)।

সন্ত্রাসের শাসনকালে সর্বোচ্চ মূল্যস্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনুরূপ মজুরীরও পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কনভেনশন এখন সর্বোচ্চ মূল্যস্তর ও সর্বোচ্চ মজুরীর আইন (*the maxima*) বাতিল করিয়া দিলে কৃষকরা তাহাদের উৎপন্নের মূল্য নিজেরা নির্ধারণ করিতে পারিল, অনুরূপ মজুরগণ তাহাদের মজুরী কি হইবে নিজেরাই স্থির করিতে লাগিল। ফলে সব জিনিসেরই মূল্য পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্যারিস শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রুটির জন্য দাঙ্গা শুরু হইল। এক জনতা কনভেনশন সভায় উপস্থিত হইয়া খাদ্য এবং অতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার বন্ধের দাবি করিল। কনভেনশন জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী—National Guard ডাকিয়া আনিয়া এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিল, কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি কনভেনশন দিতে বিলম্ব করিল না। কনভেন-শনের বিরুদ্ধে অভিযানকারীদের নেতৃত্ব যাহারা দিয়াছিল তাহাদের কয়েকজনকে শাস্তি দেওয়া হইলে জনসাধারণ কনভেন-শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই শুধু করিল না, কনভেনশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আহ্বান জানাইয়া নানা ধরনের প্রচারপত্র ছড়াইতে লাগিল। ২০শে মে (১৭৯৫) একদল স্ত্রীলোক ও কিছু সশস্ত্র পুরুষ কনভেনশন আক্রমণ করিয়া খাদ্য, যে-সকল বিপ্লব-বাদীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের মুক্তি এবং কনভেনশনের পদত্যাগ দাবি করিল। কনভেনশনের একজন সদস্যকে হত্যা করিয়া তাহার ছিন্ন মুণ্ড কনভেনশনের সম্মুখে বর্শায় বিদ্ধ করিয়া কনভেনশনের সভাপতি বাঁস দা এ্যাংলাস্-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। দুই দিন পর (২২শে, মে) জেনারেল পিশেগ্রু (Pichegru) এই বিদ্রোহী জনতাকে বলপূর্বক দমন করিলেন। মে মাসের অবশিষ্ট কয়দিন এবং সমগ্র জুন মাস ধরিয়া এক নূতন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিল। ইহা "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror) নামে পরিচিত। এই সন্ত্রাস বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত নরমপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। জেকোবিনগণ-ই এই সন্ত্রাসের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। এইভাবে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান না ঘটিয়া সন্ত্রাস একদল হইতে অপর দলের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল মাত্র। মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ এখন আর প্রোলিট্যারিয়েট অর্থাৎ, কৃষক, মজুর শ্রেণীর বা শহরের শ্রমিক শ্রেণীর (সাঁকুলাৎ) সাহায্য-নির্ভর ছিল না। কারণ তাহারা এখন পিশেগ্রুর মত সামরিক অধিনায়কদের সমর্থন পুষ্ট ছিল।

মূল্যস্তর ও মজুরী বাঁধিয়া দিয়া যে-আইন পাস করা হইয়াছিল তাহা বাতিল

ফল: মূল্যস্তর ও মজুরী বৃদ্ধি

জনতা কর্তৃক কনভেনশন অভিযান

জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহি-নীর সাহায্যে জনতার অভিযান দমন: নেতাদের শাস্তি

জনতা কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণ: জেনারেল পিশেগ্রু কর্তৃক দমন

মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror)

এদিকে পিশেগ্রু হল্যাণ্ড দখল করিয়া ফ্রান্সের অধীন "বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র"

(Batavian Republic) নামে এক অধীন তাঁবেদার প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ লইয়া অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থের প্রতিযোগিতা স্বভাবতই এই সকল দেশকে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে অমনোযোগী করিয়া তুলিল। এদিকে ফরাসী জেনারেল পিশেগ্রু, হসি, জর্দান, মরো (Pichegru, Hoshe, Jourdan, Moreau) তাঁহাদের বিজয়ের গর্বে স্ফীত এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের ক্ষমতার প্রতিযোগী হিসাবে কন্‌ভেন্‌শন্‌ মার্কুইস্‌ ফ্রাঁসোয়াকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়া রাইন নদীর বাম তীর, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, হেসি-ক্যাসেল দখল করিলেন। স্পেন সাণ্টো ডোমিনিগো ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এদিকে কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকিয়া রহিল।

ফরাসী জেনারেলদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ঃ কন্‌ভেন্‌শনের ভীতি

জুন মাসের শেষ দিকে (১৭৯৫) তিন হাজার ছয় শত এমিগ্রিকে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ফ্রান্সের কুইবারণ নামক স্থানে আসিয়া নামাইয়া দিলে তাহারা ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের সমর্থকদের লইয়া বিদ্রোহ শুরু করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু পিশেগ্রু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ৭৪৮ জনকে বন্দী করিলেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইতিমধ্যে ষোড়শ লুইয়ের পুত্র ডোফাঁ (Dauphin)*, ভাবী সপ্তদশ লুই, ফরাসী কারাগারে মারা গেলে এমিগ্রিগণ ষোড়শ লুইয়ের দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ জনকে অষ্টাদশ লুই বলিয়া ঘোষণা করিল। অষ্টাদশ লুইয়ের মূল নাম কম্‌টি দ্য প্রভেন্স্‌। তিনি আগ্রহের আতিশয্যে এবং এমিগ্রিদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি যদি দেশে অর্থাৎ ফ্রান্সে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি বিপ্লবের পূর্বেকার শাসনব্যবস্থা (Old Regime—Ancien Regime) পুনঃস্থাপন করিবেন। এই ঘোষণার ফলশ্রুতি ছিল সুদূরপ্রসারী। ফরাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কৃষক, সাঁকুলাৎ অর্থাৎ শহরের শ্রমজীবীরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে ইওরোপীয় দেশগুলির যুদ্ধের সময় সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

এমিগ্রিদের ফ্রান্সে অবতরণ ঃ পিশেগ্রু কর্তৃক পরাজিত

ডোফাঁর মৃত্যু ঃ কম্‌টি দ্য প্রভেন্স্‌ অষ্টাদশ লুই বলিয়া ঘোষিত

লুইয়ের প্রতিশ্রুতি ঃ তাহার ফল, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা

যাহা হউক ফরাসী জাতি এতদিনে বিপ্লবের নৃশংসতা, জীবনযাত্রার দুর্বিষহতা, সন্ত্রাস, ভীতি, স্বচ্ছন্দগতিহীন জীবন ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতার ফলে শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবসমাজ যাহাদের মধ্যে সহজাত বিপ্লবী চেতনা পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লব করিতে শুরু করিল। তাহারা তাহাদের অদ্ভুত পোশাক, লম্বা

বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লব

* ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজকে বলা হইত ডোফাঁ (Dauphin), ইংলণ্ডে বলাহয় Heir apparent.

কোঁকড়ানো চুল এবং হাতে মারাত্মক ধরনের লাঠি লইয়া রাজতন্ত্রের সপক্ষে ধ্বনি দিয়া দলবদ্ধভাবে পথ-পরিক্রমা করিতে লাগিল।* এমতাবস্থায় যখন গুজব রটিল যে, কনভেনশন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তখন প্যারিসের রাস্তায় মানুষ আনন্দে নৃত্য শুরু করিল।

কিন্তু কনভেনশন মারা যাইতেও সময় প্রয়োজন ছিল। জুন মাসে (১৭৯৫) তাহারা এক নূতন সংবিধান রচনার কাজে মনোনিবেশ করিল। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের হিসাবে এই সংবিধানকে "তৃতীয় বৎসরের সংবিধান" (Constitution of the year III) বলা হয়। এই সংবিধানে সর্বপ্রথম ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের "মানুষ ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা"—Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen—পরিবর্তন করিয়া বলা হইল "মানুষ মাত্রেই স্বাধীন হইয়াই জন্মায়, সমগ্র জীবন স্বাধীনতা এবং পরস্পর সমতা ভোগ করে।" সমতা বলিতে আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার বুঝায়। নির্বাচন প্রত্যক্ষ না হইয়া পরোক্ষভাবে করা হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক ভোটদাতাগণ মধ্যবর্তী প্রতিনিধিমণ্ডলী (electoral college) নির্বাচন করিবে। এই মধ্যবর্তী প্রতিনিধিমণ্ডলী জাতীয় প্রতিনিধি, বিচারক ও প্রশাসনিক সংস্থার সদস্য নির্বাচন করিবে। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটাধিকার সম্পত্তির মালিকানা-নির্ভর করা হইল। সম্পত্তির পরিমাণ এত বেশি রাখা হইল যে, মাত্র ত্রিশ হাজার ফরাসী নাগরিক জাতীয় সরকার নির্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্থনীতির উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগ উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ধর্মপালনের স্বাধীনতা এবং মাত্রা না ছাড়াইয়া স্বাধীনতা ভোগের অধিকার সংবাদপত্রকেও দেওয়া হইল। [মূল সংবিধানের আলোচনা পরে পৃথক শীর্ষাধীনে করা হইয়াছে।]

কনভেনশন কর্তৃক নূতন সংবিধান রচনা

সংবিধানের নূতন নীতিসমূহ

অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ হইতে জনসাধারণ ও বিপ্লবকে রক্ষা করিয়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কনভেনশন ডিরেক্টরি (Directory) নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিল। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের তৃতীয়বর্ষে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'Constitution of the Year III' নামে পরিচিত।

ডিরেক্টরি নামক নূতন শাসনব্যবস্থা

* "Youngsters, constitutionally rebellious were now rebelling against revolution, organised themselves into bands...proud in their rich or bizarre dress, their long or curly hair, they walked the streets weilding dangerous clubs and boldly proclaiming royalist sentiments". *Age of Napoleon*, p. 86, Will and Ariel Durant.

২৩শে সেপ্টেম্বর (১৭৯৫) নূতন সংবিধান ফ্রান্সের জনসাধারণের অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইল। এই সংবিধান অনুসারে পাঁচজন ডিরেক্টর লইয়া একটি কার্যনির্বাহক সভা (Directory) স্থাপন করা স্থির হইল। বর্ষীয়ান বা প্রবীণ পরিষদ (Council of the Ancients) ও পাঁচশত সভ্যের পরিষদ (Council of the Five hundred) নামে দুই-পরিষদ-যুক্ত এক আইনসভার ব্যবস্থা করা হইল। নূতন শাসনব্যবস্থায় কোনপ্রকার রাজতান্ত্রিক প্রাধান্য যাহাতে না ঘটিতে পারে সেইজন্য নূতন আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য কনভেনশনের সভ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বাধ্যতামূলক করা হইল। এই ব্যবস্থা জাতীয় রক্ষীবাহিনীর (National Guard) ও প্যারিস নগরীর জনতার মনঃপূত হইল না। কনভেনশন নিজ হাতে ক্ষমতা রাখিবার উদ্দেশ্যে এই নীতি গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া তাহারা টুইলারিস নামক রাজপ্রাসাদে অধিবেশনরত কনভেনশনের সদস্যগণকে আক্রমণ করিল (অক্টোবর ৫, ১৭৯৫)। এই সংকটজনক অবস্থা হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কনভেনশনকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্যসহ তিনি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ত্রিশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুইশত ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে সেই দিন ফ্রান্সের জাতীয় সভা কনভেনশন উচ্ছৃংখল জনতা ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

পাঁচজন ডিরেক্টর, প্রবীণ পরিষদ, পাঁচশত সভ্যের পরিষদ

জাতীয় রক্ষীবাহিনী ও জনতার কনভেনশন আক্রমণ : নেপোলিয়ন কর্তৃক কনভেনশন রক্ষা (অক্টোবর ৫, ১৭৯৫)

এই ঘটনার পর হইতে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান আধুনিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ইহার অল্পদিন পরেই (২৬ শে অক্টোবর, ১৭৯৫) কনভেনশন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিল।

জাতীয় কনভেনশনের কৃতিত্ব (Achievements of the National Convention) :

কনভেনশনের কার্যকালে সন্ত্রাসের শাসন, নানাবিধ বিশৃংখলা, নিজের সৃষ্ট বিভিন্ন কমিটির আজ্ঞাবহ হিসাবে কাজ করা, সাঁকুলাৎ অর্থাৎ শহরের জনতার চাপে নিজ সভার কিছু সংখ্যক সদস্যকে বহিষ্কার প্রভৃতি কনভেনশনের বিরুদ্ধ সমালোচনা হিসাবে উল্লেখ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। এইগুলি সবই জাতীয় কনভেনশনের দুর্বলতা, সন্দেহ নাই।

দুর্বলতা

তথাপি, জাতীয় কনভেনশনের পক্ষেও কতকগুলি কৃতিত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্যারিস শহরে যখন আইন-কানুন বলিতে কিছু ছিল না, বস্তুত আইন-কানুনের ও শান্তি-শৃংখলার মূল ভিত্তিই যখন বিধ্বস্ত

আইনের শাসন চালু রাখা

হইয়া পড়িয়াছিল, সেই পরিস্থিতিতে কনভেনশন মোটামুটিভাবে আইনের শাসন চালু রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, কনভেনশন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ধনী বণিকদের অর্থ-লোলুপতা তাহারা দমন করিতে এবং উচ্ছৃংখল জনতাকে উপবাস হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তৃতীয়ত, ইহা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সেনাবাহিনী গঠন করিতে এবং সমসাময়িক ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর অধিনায়ক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল জেনারেল ও সৈন্য রাইন অঞ্চল, আল্পস্, পিরেনীজ এবং সমুদ্র, সর্বক্ষেত্রে তাহাদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারিয়াছিল।

মধ্যবিত্তের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণ—ব্যবসায়ীদের লোভ দমন—জনতার খাদ্য যোগান

সৈন্য, জেনারেল প্রভৃতির সাফল্যের পশ্চাতে অবদান

চতুর্থত, দশমিক (metric) প্রথা চালু করা, প্রাকৃতিক ইতিহাসের মিউজিয়াম (Museum of Natural History), পলিটেকনিক শিক্ষালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, কনভেনশনের বহুমুখী কর্তব্যবোধের প্রমাণস্বরূপ, বলা বাহুল্য।

অপরাপর কার্যকলাপ

পঞ্চমত, কনভেনশন নূতন সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক নীতি যোগ করিয়া এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের মানুষ ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণার (Declaration of the Rights of Man and the Citizen) কতক পরিবর্তন ও ব্যাখ্যা করিয়া, নিজেদের নিষ্ঠা. কর্তব্য-পরায়ণতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছিল।

সংবিধান রচনা

ডিরেক্টরি, নভেম্বর ২, ১৭৯৫—নভেম্বর ৯, ১৭৯৯ (The Directory, November 2, 1795—November 9, 1799)ঃ কনভেনশন কর্তৃক রচিত সংবিধানে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বা অংশ ছিল, যথা ঃ (১) পাঁচশত সদস্যের পরিষদ (Council of Five Hundred), (২) বর্ষীয়ান বা প্রবীণ পরিষদ (Council of Ancients or Elders)—ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০। পাঁচশত সদস্যের পরিষদ ও বর্ষীয়ান পরিষদ লইয়া আইনসভা (Legislative Assembly) গঠিত ছিল। (৩) চল্লিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি ডিরেক্টরি (Directory) বা ডিরেক্টর সভা, (৪) বিচার বিভাগ (Judiciary) এবং (৫) কোষাগার (Treasury)।

পাঁচটি অঙ্গ বা অংশ লইয়া নূতন সংবিধান

(১), (২) তৃতীয় বৎসরের সংবিধানে (Constitution of the year III) দুই-কক্ষ-যুক্ত আইনসভা থাকিবে—নিম্নকক্ষের নাম পাঁচশত সদস্যের পরিষদ এবং উর্ধ্বকক্ষ ২৫০ সদস্যের বর্ষীয়ান বা প্রবীণ পরিষদ। পাঁচশত সদস্যের পরিষদ অর্থাৎ নিম্নকক্ষ কর্তৃক গৃহীত আইন উর্ধ্বকক্ষ অর্থাৎ বর্ষীয়ান বা প্রবীণ পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত হইলেই উহা কার্যকরী হইবে। এই আইন-সভার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবৎসর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই সকল

আইন সভা ঃ নিম্নকক্ষ, উর্ধ্ব কক্ষ

শূন্যপদ মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ "ইলেক্টরেল কলেজ" (Electoral College) কর্তৃক নূতন সদস্য নির্বাচন করিয়া পূরণ করিবেন। সাধারণ ভোটদাতার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও ইলেক্টরেল কলেজের সদস্য হইতে হইলে যে-পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানার প্রয়োজন ছিল তাহাতে সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র ত্রিশ হাজার নাগরিক সেই অধিকার পাইয়াছিল।

৩। সরকারের কার্যকরী (Executive) বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল পাঁচ জন সদস্যের এক ডিরেক্টরি সভার উপর। ডিরেক্টরির সদস্যদের ন্যূনতম চল্লিশ বৎসর বয়স হওয়া প্রয়োজন ছিল। পাঁচশত সদস্যের পরিষদ পঞ্চাশ জন ব্যক্তির নাম নির্বাচন করিয়া বর্ষীয়ান পরিষদের নিকট পাঠাইবে, বর্ষীয়ান পরিষদ এই পঞ্চাশ জনের মধ্য হইতে পাঁচ জন নির্বাচন করিবে। ডিরেক্টরি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে, কিন্তু প্রতি বৎসর একজন ডিরেক্টর পদত্যাগ করিবেন, সেই স্থলে নূতন একজন নির্বাচিত হইবেন। লাক্সেমবুর্গ প্রাসাদে ডিরেক্টরির কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা হইল। প্রথম যে পাঁচ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন পল ব্যারা, লুই লেপো, ফ্রাঁসোয়া রিউবেল, চার্লস্ লেটরন্যু, এবং ল্যাজারে কার্নো। ইঁহারা সকলেই ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ডের সহিত জড়িত। মূলত জেকোবিন্ হইলেও তাঁহারা এখন মধ্যবিত্তদের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে চলিতেছিলেন এবং একমাত্র কার্নো ব্যতীত কাহারও চারিত্রিক সততা ছিল, বলা চলে না, যদিও সকলেই ক্ষমতাবান সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ডিরেক্টরি দেশের সেনা ও নৌবাহিনী এবং পররাষ্ট্র-নীতির দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল।

ডিরেক্টরি ঃ পাঁচ জন ডিরেক্টর

প্রথম পাঁচ জন ডিরেক্টর

৪', ৫। বিচারপতিগণ ও কোষাগারের পদস্থ যাবতীয় কর্মচারী ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট (Department) অর্থাৎ প্রদেশের মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হইবে স্থির হইল।

বিচারপতি ও কোষাগারের পদস্থ কর্মচারী নির্বাচিত

সমালোচনা (Criticism) : তৃতীয় বৎসরের সংবিধান (Constitution of the year III) অর্থাৎ ডিরেক্টরি, গণতন্ত্রের পোশাকের অন্তরালে গণতন্ত্রের মূলনীতিরই অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিল। জনসাধারণের সরকার গঠনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিবৎসর আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের পদত্যাগ এবং সেই পদে ইলেক্টরেল কলেজ কর্তৃক সদস্য নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ভাওতা দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সংবিধানকে এইচ. এ. এল. ফিশার একটি সাংবিধানিক ভাওতাবাজী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই সংবিধানে জনসাধারণের উপর সংবিধান-রচয়িতাদের যে, কোন বিশ্বাস ছিল না তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির আইন-প্রণয়ন বা আইন-সম্পর্কিত প্রস্তাব আনিবার কোন

ক্ষমতা ছিল না। প্রতি বছর একজন করিয়া ডিরেক্টর পদত্যাগ করিতেন এবং একজন নূতন সদস্য ঐ শূন্য স্থানে নির্বাচন করা হইত। স্বভাবতই, সভ্যগণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া যখনই সুদক্ষভাবে কার্য-পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করিতেন, ঐ সময়েই তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত। ডিরেক্টরগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। ডিরেক্টরির ক্ষমতা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল যে, এই নূতন শাসনব্যবস্থায় আইনসভারই সর্বপ্রকার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এই আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য কনভেনশনের সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে, এই গণতন্ত্র-বিরোধী নীতিও গৃহীত হইল।

ডিরেক্টরির গঠনতন্ত্র

ঐতিহাসিক রাইকারের (Riker) মতে ডিরেক্টরির শাসন যদিও চারি বৎসর টিকিয়াছিল তথাপি গুণগত বিচারে ইহা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ সরকার। যে-সকল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ। অনেকেই মুনাফাখোরী, ফাটকাবাজী প্রভৃতি গর্হিত পন্থায় অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন।

দুর্নীতিপরায়ণ শাসন

ডিরেক্টরির শাসনের ত্রুটি, অব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধানত সংবিধানের ত্রুটি হইতেই উপজাত বলা চলে। ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের কৃতকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না। একবার নির্বাচিত হইতে পারিলেই পাঁচ বৎসর যথেচ্ছভাবে চলিবার, অর্থ উপায় করিবার সুযোগ পাওয়া যাইত, এই কারণে নির্বাচনে অবাধভাবে দুর্নীতি অর্থাৎ ঘুষ দেওয়া প্রভৃতি চলিত।

ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের কৃতকার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহে

অর্থাভাব দূর করিতে গিয়া পুনঃপুনঃ এসাইনেট (assignat) নামক কাগজী মুদ্রা চালু করিবার ফলে দেশ ক্রমেই অর্থনৈতিক সর্বনাশের দিকে ধাবিত হইতেছিল। সাধারণ লোক মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তদুপরি সরকার কর্তৃক জবরদস্তিমূলকভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ফলে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। দরিদ্র শ্রেণী ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রাঁসোয়া বেবিউফ (Francois Babeuf) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে "Act of Insurrection" নামে এক প্রচারপত্রে অপরাপর বক্তব্যের সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, আইনসভা ও ডিরেক্টর সভা জনসাধারণের অধিকার অবৈধভাবে নিজেদের হস্তগত করিয়াছেন। এই উভয় সংস্থাই তুলিয়া দিয়া সকল সদস্যকে জনসাধারণের সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত করা প্রয়োজন। দেশের যাবতীয় সরকারী সম্পত্তি জনসাধারণের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। বিপ্লবী জনসাধারণের দ্বারা গঠিত বিপ্লবী পরিষদের হস্তে বিপ্লবের অবসান, স্বাধীনতা এবং সমতা

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

বেবিউফের বিপ্লবী ঘোষণা: গ্রেপ্তার ও কারাগারে নিক্ষেপ

স্থাপন এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান বিপ্লবী আইনসভা কর্তৃক মনোনীত এক সভার উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। বেবিউফ্-এর এই ঘোষণায় পুনরায় এক জনতার ডিক্টেটরশিপের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু জনসাধারণ এই ঘোষণায় তেমন সাড়া দিল না। বেবিউফ্ ও তাঁহার অনুচর কয়েকজনকে কারারুদ্ধ করা হইল। এমতাবস্থায় নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান ফ্রান্সের ইতিহাসের গতি অন্য পথে চালিত করে।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) ঃ ডিরেক্টরির পররাষ্ট্র-নীতি ছিল কন্‌ভেনশনের নীতির অনুসরণ মাত্র। কন্‌ভেনশন্ পরিচালিত পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া এবং প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসংঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া ডিরেক্টরির কাজ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছিল। ডিরেক্টরির সম্মুখীন সমস্যা ছিল ইওরোপীয় শক্তিসংঘের অবশিষ্ট শক্তিগুলি অর্থাৎ ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করা।

ডিরেক্টরির পররাষ্ট্র-নীতি কন্‌ভেন্‌শনের নীতির অনুসরণ মাত্র

ফ্রান্স তখন জলপথে ইংরেজ নৌশক্তি দ্বারা আক্রান্ত, উত্তর-পূর্ব সীমায় ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধবাহিনী আক্রমণ-উদ্যত। আর পূর্ব-সীমায় অস্ট্রিয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার যুদ্ধবাহিনী ফ্রান্সের দিকে ধাবমান। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই সময় ফ্রান্স নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় এক অসাধারণ সমরকুশল নায়কের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল।

পররাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা ঃ ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করা

নেপোলিয়নের প্রথম কাজ হইল সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করা। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁহার অধীন সৈন্য লইয়া এই দুই দেশের যুদ্ধবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিবেন, এমন আশা ছিল না। এই কারণে তিনি এই দুই দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। নেপোলিয়ন চারিটি নীতি সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন ঃ "রসদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করিবে, যুদ্ধের সময় ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবে, সামরিক আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে থাকিবে এবং ক্ষিপ্রগতিতে কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে"।* যুদ্ধবিষয়ে সময়ের অধিকতর সদ্ব্যবহার নেপোলিয়ন অপেক্ষা অপর কোন সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শত্রুসংঘকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ

নেপোলিয়নের সামরিক নীতি

* "He at once put in force his four maxims—'Divide for finding provisions ; Concentrate to fight ; Unity of command is necessary for success ; Time is everything." p. 99, Holland Rose.

প্রথমেই নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে সার্ডিনিয়া আক্রমণ করিয়া স্যাভয় ও নিস্ দখল করিলেন। কণি, টর্‌টোনা ও আলেসেণ্ড্রিয়া (Coni, Tortona & Alessandria) এই তিনটি দুর্গ সার্ডিনিয়া নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল এবং ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিল।

সার্ডিনিয়া আক্রমণ: কণি, টর্‌টোনা ও আলেসেণ্ড্রিয়া দখল

ইহার পর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে মিলান হইতে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হইলেন। মিলানের একমাত্র সুরক্ষিত দুর্গ ছিল ম্যাণ্টুয়া (Mantua)। নেপোলিয়ন ম্যাণ্টুয়া অবরোধ করিলে অস্ট্রিয়া ৮৭ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ম্যাণ্টুয়া রক্ষার্থে পাঠাইল। কিন্তু নেপোলিয়ন অমিতবিক্রমে আর্‌কোলার (Arcola) যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৭৯৬) এবং ইহার অল্পকালের মধ্যেই রিভলি (Rivoli) ও লা-ফেভোরিটা (La-Favorita)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। ম্যাণ্টুয়া নেপোলিয়নের পদানত হইল।

মিলানের ম্যাণ্টুয়া দুর্গ অবরোধ

আর্‌কোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটার যুদ্ধে জয়

অতঃপর নেপোলিয়ন ইতালিস্থ পোপের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি পোপকে টোলেনশিও (Tolentio)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে পোপ এভিগ্‌নেনের উপর তাঁহার দাবি ত্যাগ করিলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু অর্থ দিতে বাধ্য হইলেন। নেপোলিয়ন রোম নগরীর প্রাচীন ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি, চিত্র, প্রস্তরমূর্তি ইত্যাদি ফ্রান্সে লইয়া গেলেন। পোপ রোমানা ও ফেরারা নামক স্থানের দূতাবাস উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। বোলোনা, ফেরারা, রোমানা প্রভৃতি স্থান লইয়া Cisalpine Republic নামে এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা হইল।

পোপের রাজ্য আক্রমণ: টোলেনশিও-এর সন্ধি

এই যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন পুনরায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। অস্ট্রিয়া ক্যাম্পো-ফর্‌মিও (Campo-Formio)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (অক্টোবর ১৭, ১৭৯৭)। এই সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার নেদারল্যাণ্ড অর্থাৎ বেলজিয়াম, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ভেনিশিয়া নামক স্থানের সমগ্র নৌবহর দখল করিল। অস্ট্রিয়া রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব-সীমারেখা হিসাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইতালির লোম্বার্ডি, ভেনিশিয়ার একাংশ মোডেনা প্রভৃতি স্থান Cisalpine Republic-এর সহিত যুক্ত করা হইল। ইহা নামে প্রজাতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের অধীন রহিল। অস্ট্রিয়া উত্তর-ইতালি হইতে বিতাড়িত হইল, উপরন্তু Cisalpine

অস্ট্রিয়ার পরাজয়: ক্যাম্পো-ফর্‌মিও-এর সন্ধি (১৭৯৭)

Cisalpine Republic

Republic-কে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এই সকল স্বীকৃতির বিনিময়ে অস্ট্রিয়া ভেনিস্ বা ভেনিশিয়া, ইস্ট্রিয়া ও ডালম্যাশিয়া দখল করিল। নেপোলিয়ন আড্রিয়াটিক দ্বীপসমূহের মধ্যে করফু, জান্টে, সেফালোনিয়া ফ্রান্সের অধিকারে রাখিলেন।* জেনোয়া নামক স্থানের জনসাধারণ নেপোলিয়নের ইঙ্গিতে তাহাদের মুষ্টিমেয়তন্ত্র (Oligarchy) ধ্বংস করিয়া Ligurian Republic নামে ফ্রান্সের অধীন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিল।

Ligurian Republic

নেপোলিয়নের বিজয়-গৌরব ঃ ফরাসী জাতির অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন

সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়া ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা ত্যাগে বাধ্য হইলে নেপোলিয়নের ইতালীয় অভিযান বিস্ময়জনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইল। নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতালি-অভিযান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে নেপোলিয়ন স্বভাবতই ফরাসী জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিলেন।

মিশর অভিযান

এখন ফ্রান্সের একমাত্র শত্রু রহিল ইংলণ্ড। মিশর দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে ভারতবর্ষ ইত্যাদি অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডকে আঘাত করাই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। নেপোলিয়ন ইংরেজ নৌসেনাপতি নেল্‌সনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া এক নৌবহরসহ নীলনদের মোহনা বা আবুকির উপসাগরে উপস্থিত হইলেন (মে, ১৭৯৮)। কিন্তু নেপোলিয়নের সৈন্য মিশরে পৌঁছিলে নেল্‌সন ফরাসী নৌবহরটিকে আবুকির উপসাগরে ধ্বংস করিলেন। মিশরে পিরামিডের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আবুকির উপসাগরে (Aboukir Bay) ব্রিটিশ নৌ-অধ্যক্ষ নেল্‌সন কর্তৃক তাঁহার নৌবাহিনী ধ্বংস হওয়ার ফলে ফ্রান্সের সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে ১৭৫০ জনের মৃত্যু ঘটিল, ১৫০০ জন আহত হইল। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের মাত্র ২০৮ জনের মৃত্যু হইল এবং নেল্‌সন সহ ৬৭২ জন আহত হইল। নেপোলিয়ন সিরিয়া দখল করিয়া সেই পথে ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন খবর পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডিরেক্টরি সুইটজারল্যাণ্ড জয় করিয়া তথায় হেল্‌ভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র (Helvetian Republic)

নীলনদের বা আবুকির উপসাগরের যুদ্ধ ঃ নেল্‌সনের জয়লাভ

Helvetian Republic

* Napoleon wrote to the Directory on August 16, 1797, "These matter more to us than all the rest of Italy put together." *The age of Napoleon*, p. 105, Will and Ariel Durant.

স্থাপন করিয়াছে। রোম নগরীতে একজন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে, সেই সুযোগে ফরাসী সৈন্য রোম আক্রমণ করিয়া পোপকে নজরবন্দী করিয়াছে। সুইট্‌জারল্যান্ড আক্রমণ ও পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার, পাইড্‌মণ্ট্‌ ও জেনিভা দখল ইত্যাদি কারণে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই সুযোগে ইংলন্ড রাশিয়া, তুরস্ক, ন্যাপল্‌স্‌, পোর্তুগাল ও অস্ট্রিয়ার সহযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসংঘ স্থাপন করিল (মার্চ ১২, ১৭৯৯)। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইংলন্ড হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য পাইল এবং সহজেই ইতালি ও জার্মানি হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত করিল। নেপোলিয়নের ইতালীয় অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল।

ইওরোপীয় দেশগুলিতে ভীতির সঞ্চার: দ্বিতীয় শক্তিসংঘ স্থাপন (মার্চ ১২, ১৭৯৯)

ইতালি হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত

অভ্যন্তরীণক্ষেত্রেও ডিরেক্টরির কর্মপন্থা বিফলতায় পর্যবসিত হইল। সেই সময় ফ্রান্সে এক দারুণ রাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সকল সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন সামান্য কয়েকজন সৈন্যসহ ইংরেজ নৌবাহিনীর সতর্ক প্রহরা এড়াইয়া ফ্রান্সে পৌঁছিলেন। ফ্রান্সে পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে যে-অব্যবস্থা তখন দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে একমাত্র নেপোলিয়নই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই ধারণা সর্বত্র নেপোলিয়নকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তিনি ডিরেক্টরির একজন সদস্য এ্যাবি সাইস (Abbe Sieyes)-এর সহায়তায় ডিরেক্টরিকে পদচ্যুত করিয়া কন্‌সালেট্‌ (Consulate) নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন (নভেম্বর ৯, ১৭৯৯)। ইহা *Coup d'etat of 18th Brumaire* নামে পরিচিত।

অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা

নেপোলিয়ন একমাত্র রক্ষক: ডিরেক্টরি পদচ্যুত (নভেম্বর ৯, ১৭৯৯)

ডিরেক্টরির অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of the Directory): অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে ডিরেক্টরির প্রধান সমস্যা ছিল জেকোবিন্‌ দল ও রাজনৈতিক দলের আক্রমণ হইতে নিজেদের ও দেশকে রক্ষা করা। জেকোবিন্‌ দলের নেতা বেইবিউফ্‌ (Babeuf) ছিলেন উগ্র বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। তিনি গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজ মতবাদ চালু করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অপর দিকে ব্রোটিয়ার (Brotier) নামে একজন রাজতান্ত্রিক নেতা রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ডিরেক্টরি বেইবিউফ্‌-এর ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। আর লা-ভেণ্ডি নামক

অভ্যন্তরীণ সমস্যা: জেকোবিন্‌ বেইবিউফ্‌ ও রাজতান্ত্রিক ব্রোটিয়ার-এর বিরোধিতা

বেইবিউফ্‌-এর প্রাণদণ্ড

স্থানে ব্রোটিযার প্ররোচিত রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ জেনারেল হোসি (Hoche) কর্তৃক দমিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহীদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করা হইল না। হোসি ঘোষণা করিলেন যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে জনপ্রিয় করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যথাসম্ভব নম্রতার সহিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন। এইরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার ফলে এক বৎসরের মধ্যেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। ফলে, ফরাসী জাতির মনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের সৃষ্টি হইল।

লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ দমন

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডিরেক্টরি যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা কোনপ্রকার নূতন কর স্থাপন না করিয়াই প্রথম দিকে সমাধান করা সম্ভব হইল। সেই সময়ে ফরাসী সেনাপতিগণ ইওরোপের বিভিন্ন স্থান অধিকার করিতেছিলেন। তাঁহারা নিজ সৈন্যের ব্যয় সংকুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ ফ্রান্সে প্রেরণ করিতেন। এই অর্থের সাহায্যে ডিরেক্টরি সাময়িকভাবে দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইল।

সেনাপতিগণ-প্রেরিত অর্থে আর্থিক সমস্যার সমাধান

কিন্তু কিছুকাল পরে ফরাসী জাতি প্রজাতন্ত্র হইতে রাজতন্ত্রের পক্ষে মত পরিবর্তন করিতে শুরু করিল। রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জেনারেল পিশেগ্রু (Pichegru)-এর নেতৃত্বে কয়েকটি রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে ডিরেক্টরি ক্রমেই সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। সামরিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল অত্যাচারী নীতি অবলম্বন করিয়া ডিরেক্টরি কোনক্রমে শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু জনসাধারণের আনুগত্য দিন দিনই হারাইতে থাকিল। এই সময়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে এক ধর্মভাবের প্রাধান্য দেখা দেয়। স্বভাবতই ডিরেক্টরির যাজক-বিরোধী নীতি সর্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। ক্রমেই ডিরেক্টরি কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজ ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টিত হইল। আইনসভার কতিপয় সদস্যকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করা হইল। বিদেশী আক্রমণে সীমান্ত রক্ষা কঠিন হইতেছে দেখিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হইল। জবরদস্তিমূলক ঋণ গ্রহণ করা হইল। এইভাবে যখন অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ডিরেক্টরি সম্পূর্ণভাবে বিব্রত এবং জনসাধারণ যখন ডিরেক্টরির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ তখন নেপোলিয়ন ডিরেক্টরিকে অপসারিত করিয়া 'কনসালেট্' নামক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন।

রাজতান্ত্রিক মতের প্রাধান্য ঃ পিশেগ্রুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ

ডিরেক্টরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল

আইনসভার সদস্য বহিষ্কৃত, সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক

কনসালেট্ স্থাপন

নেপোলিয়ন যে এইরূপ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা তিনি ইতালিতে অবস্থানকালেই তাঁহার অনুচরদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "তোমরা কি মনে কর যে, ডিরেক্টরির আইনজীবী সদস্যদের জন্য আমি ইতালিতে যুদ্ধ জয় করিতেছি?" ইহা "আমার উন্নতির প্রথম সোপানমাত্র।"* এই উক্তি এবং ডিরেক্টরির মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই নেপোলিয়নের শান্তি স্থাপন বা নূতন আক্রমণ শুরু করিবার মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte): যে-সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, কর্মপন্থা ও অপারসীম সাহস ও শক্তি দ্বারা ইতিহাসের গতি-পরিবর্তনে সক্ষম হইয়াছেন, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি তাঁহাদের অন্যতম। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া লর্ড এ্যাক্টন্ (Lord Acton) মন্তব্য করিয়াছেন যে, "নেপোলিয়নের মত বিশ্ববিশ্রুত এবং সর্বাধিক দক্ষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা প্রণিধান জ্ঞানানুশীলনের পক্ষে যতটা শক্তির সঞ্চার করে অন্য কিছুই ততটা করে না।"† কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের এজাকচো (Ajaccio) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয় (১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯)। কার্লো বোনাপার্টি ছিলেন তাঁহার পিতা, তাঁহার মাতার নাম ছিল লেটিজিয়া বোনাপার্টি। তাঁহার জন্মের পনর মাস পূর্বে জেনোয়া কর্সিকা দ্বীপটি ফ্রান্সের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। সেই কারণে নেপোলিয়ন ফরাসী নাগরিক হন।

প্রথম জীবন

লর্ড এ্যাকটনের মন্তব্য

নেপোলিয়ন সম্পর্কে প্রায় দুই লক্ষ জীবনী গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। শতাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক নেপোলিয়নকে সমগ্র ইওরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার এবং ইওরোপীয় আইন-কানুনের মূল উৎস বা কাঠামো রচনার কৃতিত্ব দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সম-সংখ্যক ঐতিহাসিক তাঁহাকে ইওরোপের অর্থ এবং শোণিত যথেচ্ছভাবে ক্ষয় করিয়া নিজের ব্যক্তিগত অহমিকা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইওরোপের

নেপোলিয়ন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত

* "Do you suppose that I am gaining my victories in Italy in order to advance the lawyers of the Directory?" "I am only at the beginning of my career". Riker, p. 342; Fisher, p. 823.

† "No intellectual exercise can be more envigorating than to watch the working of the mind of Napoleon the most known as well as the ablest of historic men"—Lord Acton, Vide Will and Ariel Durant. p 96.

দেশগুলিকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া "দৈত্য" (Ogre) আখ্যা দিয়াছেন। এই-ভাবে নেপোলিয়ন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মত প্রকাশিত হইয়াছে।

চরিত্র ঃ অনমনীয়, নির্ভীক, শান্ত ও অটল, ভাবপ্রবণ, চিন্তাশীল ও অধ্যবসায়ী

নেপোলিয়নের চরিত্রে কর্সিকার প্রাকৃতিক প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।* কর্সিকার পাহাড়-পর্বতের অনমনীয়তা, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, শান্ত ও অটল প্রকৃতি যেন নেপোলিয়নের চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার পরিবারসুলভ ভাবপ্রবণতা, চিন্তামগ্নতা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো ও র‍্যানাল প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে আনন্দ পাইতেন। শিক্ষা সমাপন

ইতিহাস, অংকশাস্ত্র ও দর্শন ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ

করিয়া তিনি সাব-লেফটেন্যান্ট হিসাবে ফরাসী সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তখনও তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি ইতিহাস, অংকশাস্ত্র, প্লুটার্ক, প্ল্যাটো প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনা, প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের জীবনী, ইংলন্ড, সুইটজারল্যান্ড, স্পার্টা, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন।

কর্সিকার স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছা ঃ বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি

প্রথম জীবনে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কর্সিকার স্বাধীনতা অর্জন করা। কর্সিকা প্রথমে ছিল জেনোয়ার অধীন। পরে ইহা ফরাসী দেশের অধীনে আসে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্সিকাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে মর্যাদা এবং অভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দান করা হইলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করিলেন। তিনি ফরাসী নাগরিক হিসাবে ফ্রান্সের জাতীয় আদর্শের সহিত নিজেকে যুক্ত করিলেন।

নেপোলিয়নের জেকোবিন পক্ষ সমর্থন ঃ টুলোঁ বন্দর হইতে ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী বিতাড়ন

বিপ্লবী আইনসভার গিরন্ডিস্ট ও জেকোবিনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ন জেকোবিন পক্ষ সমর্থন করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টুলোঁ (Toulon) বন্দর হইতে ইংরেজ নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বপ্রথম বিজয়। এই বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (Brigadier General) পদে উন্নীত করা হয়।

* "Corsica is a rugged mountainous, almost uninhabitable island. The people resemble their country, being as ungovernable as wild beasts"—Livy.

ইহার কিছুকাল পরে সন্দেহবশত তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব-বিরোধী কার্যের প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং নিজ পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। ঐ সময়ে তিনি জনতার আক্রমণ হইতে কনভেনশনকে রক্ষা করেন (অক্টোবর, ১৭৯৫)।

জনতার আক্রমণ হইতে কনভেনশনকে রক্ষা (১৭৯৫)

ডিরেক্টরির অধীনে নেপোলিয়ন ইতালি অভিযানে অগ্রসর হন। এই অভিযানে তিনি সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করেন। অস্ট্রিয়াকে আরকোলা, রিভলি এবং লা-ফেভোরিটা'র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি ম্যান্টুয়া দখল করেন। ইহার পর তিনি পোপকে টলেনশিও'র সন্ধি এবং অস্ট্রিয়াকে ক্যাম্পো-ফর্মিও'র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন (১৭৯৭)। এইভাবে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ ভাঙ্গিয়া দেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন এবং পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু নীলনদের অর্থাৎ আবুকির উপসাগরের যুদ্ধে নেলসনের হস্তে তাঁহার নৌবাহিনী ধ্বংস হয়। মিশরে থাকাকালেই তিনি ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসংঘ গঠনের এবং ডিরেক্টরির শোচনীয় পরিস্থিতির সংবাদ পান। তিনি দ্রুতগতিতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯ (১৮ই ব্রুমেয়ার) ডিরেক্টরিকে বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফলে, ঐ সময় হইতেই তিনি ফ্রান্সের সর্বেসর্বা হন।

ইতালি অভিযান : আরকোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটা'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়, ক্যাম্পো-ফর্মিও'র সন্ধি পিরামিডের যুদ্ধ নীলনদের যুদ্ধ

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন ডিরেক্টরির অপসারণ

কনসালেট, ৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯—১৮ই মে, ১৮০৪ (The Consulate, November 9, 1799—May 18, 1804) : ডিরেক্টরিকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নেপোলিয়ন কনসালেট নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। ইহা 'অষ্টম বৎসরের শাসনতন্ত্র' (Constitution of the year VIII) নামে পরিচিত। এই শাসনব্যবস্থায় তিনজন কনসাল-এর এক ক্ষুদ্র সভার উপর শাসনভার ন্যস্ত করা হইল। নেপোলিয়ন হইলেন প্রথম কনসাল (First Consul)। অপর দুই কনসাল ছিলেন সায়েস (Sieyes) ও রজার ডুকোস (Roger Ducos)। আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইল। এই অংশের প্রথমটি ২৫ জন সদস্যের 'কাউন্সিল-অব্-স্টেট্' (Council of State) আইনের প্রস্তাব আনিবে, দ্বিতীয়টি ১০০ জন সদস্যের 'ট্রিবিউন্যাট' (Tribunate) সেই প্রস্তাব আলোচনা করিবে, তৃতীয়টি ৩০০ জন সদস্যের 'লেজিস্‌লেচার' (Legislature) আলোচনা না করিয়া কেবল ভোটে পাস করিবে এবং চতুর্থটি ৮৫ জন সদস্যের 'সিনেট' (Senate) এই আইনের

কনসালেট 'Constitution of the year VIII'

কনসালেট-এর গঠনতন্ত্র

শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতার বিষয় বিচার করিয়া দেখিবে। এইভাবে বিভক্ত আইনসভার প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতাই রহিল না। ফলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। এই শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রেরিত হইলে বিপুল ভোটাধিক্যে পাস হইল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর নেপোলিয়ন ঘোষণা করিলেন যে, বিপ্লবের মূল নীতি জয়যুক্ত হইয়াছে এবং বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।*

নেপোলিয়নের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত

কনসালেটের সম্মুখীন সমস্যাগুলি ছিল প্রশাসনে শৃংখলা আনয়ন, সরকারী কোষাগারে অর্থ সংগ্রহ করা, ফ্রান্সের বিভিন্ন দলগত রেষারেষি বন্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণের মনে ডিরেক্টরিকে বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করিবার ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা।

সম্মুখীন সমস্যাসমূহ

প্রথম কনসাল্ অর্থাৎ নেপোলিয়ন প্রথমেই তাঁহার সামরিক পোশাকের পরিবর্তে বে-সামরিক পোশাক ব্যবহার করিতে শুরু করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের উপর সামরিক জয়লাভ অপেক্ষা দুই দেশের মধ্যে শান্তি-নীতি অনুসরণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিপ্লবের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ নেপোলিয়নকে "বিপ্লবের সন্তান" (Son of the Revolution), "বিপ্লবের ফল", "বিপ্লবের রক্ষক", "বিপ্লবের অর্থনৈতিক সুফলের সংরক্ষক" প্রভৃতি প্রশংসাসূচক নামকরণ করিয়াছিলেন।

শান্তির চেষ্টা

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের মন্তব্য

নেপোলিয়ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন স্বভাবতই চাহিলেন। কারণ তাহাদের অর্থ-সাহায্য ভিন্ন শাসন পরিচালনা সম্ভব ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ৩৮ জন ব্যক্তিকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, কারণ দেশের শান্তি ও শৃংখলার পক্ষে এই সকল ব্যক্তি বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনা শুরু হইলে নেপোলিয়ন অর্থাৎ প্রথম কনসাল্ সেই সকল ব্যক্তিকে দেশের অভ্যন্তরেই নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দিলেন।

নেপোলিয়নের প্রাথমিক কয়েকটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

লা ভেণ্ডি (La Vendee) নামক স্থানের ক্যাথলিকদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি তাহাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেন।

লা ভেণ্ডির ক্যাথলিকদের ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা দান

* "Citizens, the Revolution is established upon the principles which were its origin. It is at an end." Quoted by Riker, p. 344.

বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল ব্যক্তিকে, যথা ল্যাফায়েৎ, ব্যারিরে প্রভৃতি, নির্বাসিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে নেপোলিয়ন দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ড, গিরন্ডিস্ট্‌দের কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা, রোবস্‌পিয়ারের পতনের দিনকে প্রতি বৎসর জাতীয় উৎসব বলিয়া পালন করা হইত। নেপোলিয়ন এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ-উদ্রেককারী অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন।

দেশবাসীর মধ্যে বিদ্বেষভাব হ্রাসের ব্যবস্থা

নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal reforms of Napoleon) : তার পর নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতকগুলি সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়নের সংস্কারকার্যের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, তিনি জনহিতকর কার্য করিয়া জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে চাহিয়াছিলেন। এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন।* তৃতীয়ত, স্থায়ী, কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্যও কতক কতক সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নেপোলিয়নের সংস্কারগুলির মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সুশৃংখল সমাজ গঠন করা যে-সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিনা-বাধায় নিজ নিজ ইচ্ছামত যে-কোন পেশা অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। বিপ্লবজনিত অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা, ভীতি ও সন্ত্রাসের পর এই ধরনের নিরাপত্তার একান্ত প্রয়োজন ছিল একথা নেপোলিয়ন সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারকার্যাদির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের সুফলগুলিকে স্থায়িত্ব দান করা, যেমন আইনের চক্ষে নাগরিক মাত্রেরই সমতা, সমাজের কোন অংশেরই কোন বিশেষ অধিকার (Privileges) বজায় না রাখা প্রভৃতি। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবী আতিশয্যের অবসান ঘটাইয়া বিপ্লবের সুফলগুলিকে চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন।

সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য: (১) কৃতজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন, (২) খ্যাতি, (৩) কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

সুশৃংখল সমাজ গঠন

বিপ্লবের সুফলগুলিকে স্থায়িত্বদান

এজন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী এক কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা যাহাতে যে-কোন সমস্যার সমাধানকল্পে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তাহা তখন সম্ভব ছিল না। কনসালেট নামক শাসনব্যবস্থা সেই কারণে ছিল এক-কেন্দ্রিক স্বৈরাচার। সুতরাং নামে প্রজাতান্ত্রিক হইলেও বাস্তব

শাসনতান্ত্রিক ও গঠন-মূলক সংস্কার : এক-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা

* "I hope to leave to posterity a renown that may serve as an example or as a reproach to my successors"—Napoleon, Quoted by Riker, P. 349.

ক্ষেত্রে ইহার সকল প্রকৃত ক্ষমতা কনসালের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই কারণে কতক-গুলি প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে (১) জনসাধারণ কর্তৃক সরকারী কর্মচারিগণের নির্বাচনব্যবস্থা লোপ করা হইল। উহার পরিবর্তে প্রধান কনসাল্ এবং পরে নেপোলিয়ন সম্রাট-পদ গ্রহণ করিলে, সম্রাট কর্তৃক পদস্থ সকল সরকারী কর্মচারী মনোনয়ন ব্যবস্থা গৃহীত হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নেপোলিয়নের পররাষ্ট্রীয় সাফল্য তাঁহার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তি সংঘ (Second European Coalition) বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইলে তিনি ফরাসী জাতির নিকট যে-জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার সুযোগ লইয়া তিনি নিজেকে "যাবজ্জীবন কনসাল্" (Consul for Life) পদে স্থাপন করিলেন। ইহা ছিল পরবর্তী পদক্ষেপে সম্রাট-পদ গ্রহণের পূর্বাভাস। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রজাতন্ত্রের বাহ্যরূপ ত্যাগ করিয়া সম্রাট-পদ গ্রহণ করেন। সরকারী কর্মচারিগণ যেমন প্রথম কনসাল্ এবং পরে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন তাঁহাদের কার্যকালও প্রথম কনসাল্ বা সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। (২) দেশকে পূর্বেকার ৮৩টি 'ডিপার্টমেণ্ট' বা প্রদেশেই বিভক্ত রাখা হইল, কিন্তু এখন হইতে এই সকল বিভাগকে অধিকতর সুবিন্যস্ত করা হইল। (৩) প্রত্যেক 'ডিপার্টমেণ্ট' বা প্রদেশে একজন করিয়া প্রিফেক্ট্ নিযুক্ত করা হইল। বিচার বিভাগের কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হইল না বটে, কিন্তু বিচারপতিগণ এবং প্রিফেক্টগণ এখন হইতে প্রধান কনসাল্ এবং পরে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হইল। (৪) প্রথম কনসাল্ হিসাবে নেপোলিয়নের সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক জরুরী সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর করা এবং দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করা। ডিরেক্টরির আমলেই এসাইনেট্ নামক কাগজী মুদ্রার বিলোপ সাধন করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ধাতুনির্মিত মুদ্রার পুনঃপ্রচলন করিয়া মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করিলেন, তেমনি ফরাসী মুদ্রার উপর জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, শিল্পোৎপাদনকারী ও বিদেশীদের শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিলেন। (৫) নেপোলিয়ন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স (Bank of France) নামে ফরাসী জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মুদ্রা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)-এর মাধ্যমে সহজতর হইয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ এই প্রতিষ্ঠান হইতে যাহাতে অর্থ সাহায্য পায় সেই ব্যবস্থা করা হইল। (৬) কর দেওয়া নাগরিকদের একটি অবশ্য পালনীয়

নির্বাচনমূলক ব্যবস্থার স্থলে নিয়োগের পদ্ধতি

প্রদেশগুলি সুবিন্যস্ত

প্রধান কনসাল্ ও পরে সম্রাটের দ্বারা বিচারপতিগণ মনোনীত

অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূরীকরণ—মুদ্রা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন

ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স স্থাপন

মুদ্রানীতির পরিবর্তন, করদানে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি

কর্তব্য—এই কথা তিনি ফরাসী নাগরিকদের ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করিলেন। নূতন কর ধার্য করা হইল না বটে তবে পুরাতন কর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে আদায় হয় সেই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

মিতব্যয়িতা ও ন্যায়পরায়ণতা

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি

বহুকাল পরে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত হইল। ফলে, রাষ্ট্রের ব্যয়-ব্যাপারে কোনপ্রকার অমিতব্যয়িতা বা দুর্নীতির অবকাশ রহিল না। (৭) নেপোলিয়নের আদেশে ফরাসী সরকার জনহিতকর সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ার করা হইল এবং পুরাতন রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইল। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক নাব্য খাল খনন করা হইল। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইল।

(৮) নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হইল তাঁহার আইন-বিধি (Code Napoleon)। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে স্থানীয় রীতিনীতি, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন-কানুন এবং রোমান আইন-কানুনের সংমিশ্রণের ফলে যে বিশৃংখলাপূর্ণ, সামঞ্জস্যহীন আইন কানুন চালু ছিল বিপ্লবের ফলে তাহার অবসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই স্থলে কোন সুষ্ঠু আইন-বিধি রচিত হয় নাই। কনভেনশন ফরাসী আইন-বিধির সংস্কারের চেষ্টা পূর্বে একবার করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন তাহা কার্যে পরিণত করিলেন। দেশের আইনজ্ঞদের এক পরিষদ আইন-সংস্কারের কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন স্বয়ং এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিদর্শন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সংস্কারের ফলই 'নেপোলিয়ন আইন-বিধি' (Code Napoleon) নামে পরিচিত। আইনের চক্ষে ব্যক্তিমাত্রেরই সমতা এই আইন-বিধিই সর্বপ্রথম স্থাপন করিল। পূর্বে ইওরোপের কোন দেশেই আইনের প্রয়োগ সকলের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। স্বভাবতই 'নেপোলিয়ন আইন-বিধি' সমগ্র ইওরোপের সম্মুখে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এই আইন-বিধির অনুকরণেই ইওরোপীয় দেশগুলির পূর্ববর্তী আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছিল। ইওরোপে এমন কোন দেশ নাই যাহার আইন-কানুন কোন-না-কোন ভাবে নেপোলিয়নের আইন-বিধির নিকট ঋণী নহে।

নেপোলিয়ন আইন-বিধি (Code Napoleon)

আইনের চক্ষে সমতা : ইওরোপের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ

(৯) নেপোলিয়ন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হন। মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন

জাতীয় শিক্ষার উন্নতি : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন

নাই।* তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল সরকারের অনুগত নাগরিক সৃষ্টি করা। 'স্কুলের শিক্ষকগণ হইবেন সরকারের প্রতি অটল আনুগত্য সম্পন্ন এবং তাঁহারা ছাত্রদিগকেও অনুরূপ আনুগত্য প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিবেন। কোন নূতন রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে কাহারো কোন সচেতনতার সৃষ্টি হউক, ইহা নেপোলিয়ন চাহিতেন না।'† বলা বাহুল্য, ইহা স্বৈরাচারী শাসক-সুলভ মনোবৃত্তির-ই পরিচায়ক।

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি

(১০) সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে যে-সকল কর্মচারী রাষ্ট্রসেবায় পরাকাষ্ঠা দেখাইবে তাহাদিগের উপযুক্ত সম্মান ও উপাধিদানের ব্যবস্থা করা হইল। (১১) বেকার-সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন নানাপ্রকার জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেও সচেষ্ট হইলেন।

সামরিক ও বেসামরিক উপাধিদানের ব্যবস্থা, বেকার-সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা

ধর্মাধিষ্ঠান-সংক্রান্ত সংস্কার (Reforms relating to the Church) : নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিতে চার্চের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন, চার্চের ঐক্য স্থাপিত হউক ইহাও তাঁহার কাম্য ছিল। এই কারণে তিনি পোপের সহিত ফরাসী চার্চের যোগাযোগ পুনরায় স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। Civil Constitution of the Clergy পাস হওয়ার পর হইতেই ফরাসী চার্চ ও পোপের মধ্যে বিরোধ শুরু হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন। '১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ধর্ম মীমাংসা' (Concordat of 1801) দ্বারা স্থির হইল যে, ফরাসী চার্চের ঊর্ধ্বতন যাজকগণ প্রথমে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পোপ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হইবে; অপর দিকে, নিম্নস্তরের যাজকগণকে বিশপগণ নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু এই নিয়োগ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। যাজকগণ সরকার হইতে বেতন পাইবেন। নেপোলিয়ন এইভাবে পোপের সহিত বিরোধের মীমাংসা করিলেন এবং পরোক্ষভাবে চার্চের উপর নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে চার্চের গুরুত্ব

পোপের সহিত বিরোধের মীমাংসা Concordat, 1801

---

* "Bonaparte also planned a national educational system in three main stages, primary, secondary and university. He succeeded in realising his program on only secondary and university level." *A History of Europe,* p. 248, Schevill.

† "The purpose of the schools he felt to be the rearing of devoted citizens, taught by men with 'fixed principles'—as he put it. He was in fact, too much of an autocrat to countenance anything likely to lead to a demand for political change" Riker, P. 350.

সমালোচনা (Criticism) ঃ নেপোলিয়নের সংস্কার ফরাসী জাতীয় জীবনের এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন সধান করিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করিয়া বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। তথাপি বিপ্লবপ্রসূত সাম্য-নীতি, জনকল্যাণ প্রভৃতি উদার নীতিও তিনি এই স্বৈরাচারের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে জনগণকে তিনি অংশ দান করেন নাই সত্য, কিন্তু জনগণের কল্যাণার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করা নেপোলিয়নের অভিপ্রেত ছিল ইহা অনস্বীকার্য।* নেপোলিয়ন স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে তাঁহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন এই পরিচয় আমরা তাঁহার শাসনতান্ত্রিক ও অপরাপর জনহিতকর সংস্কার প্রবর্তনের পন্থার মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এই সকল সংস্কার প্রবর্তন এবং প্রশাসন পরিচালনার মূলে ইঙ্গিত ও নির্দেশ দিবার মত অসাধারণ ক্ষমতা যে তাঁহার ছিল তাহা অনস্বীকার্য।

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন ঃ বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক শক্তিনাশ

জনকল্যাণের সহিত স্বৈরাচারের সামঞ্জস্য-বিধান

শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক—সংস্কারের পশ্চাতে তাঁহার ব্যক্তিগত নির্দেশ

তিনি নিজেই সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। এমন কি, নেপোলিয়ন ক্রমেই রাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া ইমানুয়েল যোসেফ সায়েস এবং ডুকোসও যখন পদত্যাগ করেন তখন নেপোলিয়ন জেক্‌স্ ক্যাম্‌বাসিরিস ও ফ্রাঁসোয়া লেব্রানকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্‌সাল্-পদে নিজেই নিযুক্ত করেন। ক্যাম্‌বাসিরিস ডিরেক্টরির অধীনে বিচার-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ, সৎ কর্মচারী। নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে তিনি কাউন্সিল অব্ স্টেট্, সিনেট প্রভৃতির সভাপতিত্ব করিতেন। 'নেপোলিয়ন আইন-বিধি' (Code Napoleon) রচনায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি নেপোলিয়নকে স্পেনের সহিত শত্রুতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন অবশ্য সেই নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই। লেব্রান নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন। উভয়েই শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের অনুরক্ত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। অপরাপর কর্মচারী নিয়োগেও নেপোলিয়ন দল-মত নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নির্বাচন করিতেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কন্‌সাল্ ও কর্মচারী-পদে নিয়োগ

নেপোলিয়ন প্রকৃতই বিপ্লবের সন্তান ছিলেন, কারণ তিনি ফরাসী জনসাধারণকে

* "By his work of reorganisation Napoleon purged the Revolution of the features which seemed to make for chaos, and retained those which might be calculated to bring out merit and to render the state a more efficient machine. In this sense he harnessed the revolution to the chariot of autocracy." *Ibid.* p. 351.

অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচারী ব্যবহার, রীতি-নীতি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পুলিশ বিভাগ যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার না করে সেইজন্য নেপোলিয়ন পৃথক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ এবং সৎ লোকদের বিচারক নিযুক্ত করিয়া বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বিপ্লবের সুফলগুলিকে স্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি কোন শর্তেই পূর্বেকার রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহেন নাই। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি ফরাসী সিংহাসনের ভাবী রাজা বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুই এক পত্রে নেপোলিয়নকে লিখিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে তিনি আনন্দিত এবং নেপোলিয়ন যেমন বিরাট ফরাসী জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তেমনি যেন ফ্রান্সের রাজাকেও অর্থাৎ বুরবোঁ রাজবংশের বংশধর অষ্টাদশ লুইকেও সিংহাসনে ফিরাইয়া আনেন।* নেপোলিয়ন বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া ফরাসী জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিলেন না, তিনি অষ্টাদশ লুইয়ের পত্রের কোন উত্তরই দেন নাই।

বিচার-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তিদের নিয়োগ

বিপ্লবের সুফল সুরক্ষা

এমন কি, পোপের সহিত মিটমাটের শর্ত-সংবলিত যে-চুক্তি (Concordat) নেপোলিয়ন স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহার পর পোপ যখন নেপোলিয়নকে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত করিতে রাজী হইয়া তাঁহাকে বাইবেলের উপর হাত রাখিয়া শপথ বাক্য পাঠ করিতে আদেশ করেন, তখন নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাজ্যসীমা রক্ষা করিবার, কনকর্ডাটের শর্তাদি কার্যকরী করিবার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দানের, আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তির সমতা ও রাজনৈতিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার, আইনসম্মত উপায় ভিন্ন শুল্ক বা কর স্থাপন না করিবার, ফরাসী জনসাধারণের স্বার্থ, সুখ, শান্তি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবার এবং শাসন পরিচালনার শপথ গ্রহণ করিলেন।† ইহা হইতেও নেপোলিয়ন 'বিপ্লবের সন্তান' এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

অভিষেক ক্রিয়াকালে নেপোলিয়নের শপথ বাক্য 'বিপ্লবের সন্তান' —এই দাবির প্রমাণস্বরূপ

---

* "Restore her king to her and future generations will bless you. You will be always too necessary to the state for me..."

"Napoleon let this appeal remain unanswered. How could he return the throne to a man who had promised his faithful followers to follow his own restoration with that of its *status quo ante* the Revolution?" *The Age of Napoleon*, p. 169, Will and Ariel Durant.

† "I swear to maintain the territory of the Republic in its integrity and to enforce the laws of the Concordat and the freedom of worship, to respect and enforce equality before law, political and civil liberty···to lay no duty, to impose no tax except according to law,...to govern only in accordance with the interest the happiness and the glory of French people." *Ibid*, p. 199.

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : প্রথম কন্সাল্ হিসাবে নেপোলিয়নের সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসংঘ বিনাশ করা। দ্বিতীয় শক্তিসংঘে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যোগদান করিয়াছিল। ক্রমে ইহাতে ন্যাপল্স্, পোর্তুগাল এবং তুরস্কও যোগদান করে। এদিকে ইঙ্গ-রুশ যুগ্মবাহিনী হল্যান্ড আক্রমণ করিল। হল্যান্ড তখন ফ্রান্সের তাঁবেদার প্রজাতান্ত্রিক (Batavian Republic) দেশ ছিল। অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী ইতালি আক্রমণ করিয়া ম্যাণ্টুয়া ও আলেকজান্ড্রিয়া দখল করিয়া লইল। সুভারোফ্ (Suvaroff) নামক এক রুশ সেনাপতি ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেনোয়ার দিকে ধাবিত হইলেন। নেপোলিয়ন মিশর হইতে ফিরিবার পূর্বেই অবশ্য ইওরোপীয় শক্তিসংঘের অগ্রগতি প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছিল। রুশ সেনাপতি সুভারোফ্ এবং ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব্ ইয়র্ক ফরাসী সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব্ ইয়র্ক আল্কামার নামক চুক্তি দ্বারা সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইলেন। অপর দিকে রুশ জার পল (Czar Paul) স্থলযুদ্ধে আর অংশগ্রহণ না করাই স্থির করিলেন। এই সময়ে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়ন ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রজাতন্ত্রের বদলে ফরাসী সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শর্ত না মানিলে তিনি সন্ধি স্থাপনে অস্বীকৃত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়ন শত্রুপক্ষের মনোভাব বুঝিবার এবং কালক্ষেপ করিবার জন্যই এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রধান সমস্যা : ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসংঘ নাশ

দ্বিতীয় শক্তিসংঘ কর্তৃক ফ্রান্সের অধীন বিভিন্ন স্থান আক্রান্ত

রুশ ও ইংরাজ সেনাপতিদের পরাজয়

রাশিয়ার যুদ্ধ ত্যাগ

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

পর বৎসর (১৮০০) নেপোলিয়ন ইতালিতে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কার্থেজীয় সেনাপতি হ্যানিবল-এর ন্যায় তিনিও আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইতালিতে প্রবেশ করিলেন। ঐ বৎসরই তিনি ম্যারেংগো (Marengo)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ইতালিতে ফ্রান্স যে-সকল স্থান হারাইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিলেন। অপর দিকে ফরাসী সেনাপতি মোরো (Moreau) হোহেন্লিন্ডেন (Hohenlinden)-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভিয়েনার প্রবেশপথে উপস্থিত হইলেন। ম্যাকডোনাল্ড নামে অপর একজন ফরাসী সেনাপতি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় অস্ট্রিয়া লুনিভাইল (Luneville)

ম্যারেংগোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

লুনিভাইল-এর সন্ধি

নামক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইল (১৮০১)। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া ক্যাম্পো-ফরমিও'র সন্ধির শর্তাদি পুনরায় স্বীকার করিয়া লইল। ইহা ভিন্ন, বাটাভিয়ান, সিস্-এলপাইন্, হেল্ভেশিয়ান প্রজাতন্ত্রকেও অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। রাইন নদীর বামতীরস্থ অঞ্চলে এবং বেলজিয়ামের উপর ফরাসী আধিপত্য অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল।

বাটাভিয়ান, সিস্-এল-পাইন্, হেল্ভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বীকৃত

এই সময় হইতে নেপোলিয়ন এক বিশাল ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পুনরায় গঠনের জন্য তিনি নৌবিভাগের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি স্যান ডোমিনিগো দ্বীপে ফরাসী অধিকার পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা করিলেন এবং স্পেনকে লুইসিয়ানা নামক উপনিবেশটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। অবশ্য এই স্থানটি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফরাসী-অধিকৃত স্থানের মাধ্যমে নেপোলিয়ন ভারতীয়দের সহিত যোগাযোগ-বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়নের ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা

এদিকে কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। এই শান্তি চুক্তি এমিয়েন্স-এর সন্ধি (Peace of Amiens) নামে পরিচিত। সিংহল ও ত্রিনিদাদ ভিন্ন অপরাপর যে-সকল ফরাসী উপনিবেশ ইংলণ্ড এই কয় বৎসরের যুদ্ধে অধিকার করিয়াছিল তাহা ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন, মিনরকা স্পেনকে এবং মাল্টা সেণ্ট্জনের সামন্তদের ফিরাইয়া দিল। অপর-পক্ষে নেপোলিয়ন মিশর, ন্যাপল্স্ ও পোর্তুগাল হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে ইওরোপে দ্বিতীয় শক্তিসংঘের অবসান ঘটিল।

এমিয়েন্স-এর সন্ধি

ইওরোপের দ্বিতীয় শক্তিসংঘের অবসান

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রধান কন্সাল্-পদ লাভ করিয়াই নিবৃত্ত হইল না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসংঘ বিনাশ করিয়া অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে যাবজ্জীবন কন্সাল্-পদে নিযুক্ত করা হইল। ইহা রাজতন্ত্রেরই পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপোলিয়নের সমর্থকগণ যুক্তি দেখাইলেন যে, বংশপরম্পরায় নেপোলিয়ন পরিবারের উপর শাসনভার না দিলে শান্তি বজায় রাখা কঠিন হইবে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রজাতন্ত্রের মুখোশ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া নিজেকে ফরাসী সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহা হউক, নেপোলিয়ন নিজে বলিলেন যে, ফরাসী রাজমুকুট ধূলায়

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঃ যাবজ্জীবন কন্সাল্ নিযুক্ত

রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ, ১৮০৩, নেপোলিয়নের সম্রাট উপাধি গ্রহণ, ১৮০৪

লুণ্ঠিত হইতেছিল, তিনি তাঁহার তরবারির সাহায্যে উহা মাথায় উঠাইয়া লইয়াছেন। বস্তুত সামরিক শক্তির উপরই তাঁহার এই সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সম্রাট-পদ গ্রহণের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য গণভোট গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের নামের তখন এক সম্মোহনী শক্তি সৃষ্টি হইয়াছিল, কাজেই জনসাধারণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার সম্রাট-পদ গ্রহণ অনুমোদন করিল। ঐ সময় হইতেই নেপোলিয়নের আদেশে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য চিরতরে বিলুপ্ত হইল ও সেই স্থলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

সামরিক শক্তির দ্বারা নেপোলিয়নের সম্রাট-পদ সমর্থিত ঃ গণ-ভোটেও অনুরূপ সমর্থন লাভ

ফরাসী সাম্রাজ্য ঃ নেপোলিয়ন (The French Empire : Napoleon) ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সম্রাট-পদ লাভ কন্‌সালেট্‌ আমলের স্বৈরাচারী একক-শাসনের পরিসমাপ্তি এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নেপোলিয়ন সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, জনসাধারণের বিপুল ভোটাধিক্যেও তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। এদিক হইতে বিচার করিলে নেপোলিয়নের একক আধিপত্যের পশ্চাতে ফরাসী জনগণের সমর্থন ছিল এবং সেইহেতু উহা আইনত গ্রাহ্য ছিল বলা যাইতে পারে।

সম্রাট-পদ লাভ কন্‌সালেট্‌ পদ্ধতির চরম পরিণতি মাত্র

জনগণের সমর্থন লাভ

নেপোলিয়ন নিজ মর্যাদা অনুযায়ী রাজসভা গঠন করিতে কার্পণ্য করিলেন না। প্যারিসবাসিগণ পুনরায় রাজপদের মর্যাদা এবং রাজসভার আড়ম্বর দেখিয়া আনন্দই পাইল। নেপোলিয়ন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সহিত ফরাসী চার্চের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়া ক্যাথলিক ধর্ম ও ধর্মাধিষ্ঠানের পুনঃস্থাপক হিসাবে অসংখ্য ধর্মভীরু দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন।

রাজসভা গঠন ঃ ক্যাথলিক চার্চের পুনঃপ্রবর্তন

সম্রাটের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী লইয়া রাজসভা গঠিত হইল। গ্র্যান্ড ইলেক্টর, আর্চ চ্যান্সেলর (Arch Chancellor), আর্চ ট্রেজারার (Arch Treasurer), গ্র্যান্ড এ্যাডমিরাল, গ্র্যান্ড মার্শাল প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মচারী এই সভায় স্থান পাইলেন।

রাজসভার সদস্যগণ

কন্‌সালেট্‌-এর আমলে যেরূপ সিনেট, কাউন্সিল-অব্‌-স্টেট্‌, ট্রিবিউনেট্‌ ও আইনসভা—এই চারিটি বিভিন্ন সভা ও সমিতি কন্‌সাল্‌গণকে সাহায্য করিত, সেইরূপ ব্যবস্থা এখনও রহিল বটে, কিন্তু এই সকলেরই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

বিভিন্ন সভাসমিতি সম্রাটের উপর নির্ভরশীল

ফরাসী জাতি সম্রাটের অধীনে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছিল কেন? (Why did the French Nation agree to come under imperial rule): নেপোলিয়ন

কর্তৃক ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থাপন বিপ্লবের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাম্রাজ্যের উত্থানই হইল বিপ্লবের শেষ পর্যায়। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স পুনরায় একক-অধিনায়কত্বের অধীনে আসিতে স্বীকৃত হইল কেন সেই প্রশ্ন স্বভাবতই বিস্ময়ের উৎপাদন করিবে। স্বৈরাচারী শাসকের অধীনতামুক্ত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার লাভের পরও ফরাসী জাতি সামরিক স্বৈরাচারের অধীনে আসিতে দ্বিধাবোধ না করিবার কয়েকটি বিশেষ যুক্তি ছিল।

সাম্রাজ্যের উত্থান—বিপ্লবের শেষ পর্যায় ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসন মানিয়া লওয়ার পশ্চাতে যুক্তি

প্রথমত, বিপ্লব শুরু হইবার পর হইতে নেপোলিয়নের সম্রাট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে নানাপ্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা, নানাপ্রকার ভাগ্যবিবর্তনের মধ্য দিয়া ফরাসী জাতিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। অনিশ্চয়তা ও বিপ্লবের বিভৎসতায় তাহারা এত বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল যে, তাহারা ক্রমেই শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়নের ন্যায় দক্ষ সমর-নায়কের অধীনে শান্তি স্থাপিত হইবে এই বিশ্বাস তাহাদের ছিল। ঐ সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একেবারে বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত, জনমত দিশাহারা—এইরূপ অবস্থায় নেপোলিয়নের ন্যায় নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা সমর-নায়কের হাতে শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হইলে ফরাসী জাতি স্বভাবতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, জাতির মনে এক গভীর আশার সঞ্চার হইল।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে শ্রান্ত ফরাসী জাতি শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব

দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন ছিলেন—সাধারণ শ্রেণীর লোক। বংশের আভিজাত্য তাঁহার ছিল না। সাধারণ শ্রেণীর লোক হইয়া তাঁহার শাসন-কার্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সম্রাটের মর্যাদালাভের মধ্যে ফরাসী জাতি গণতান্ত্রিক সাম্য-নীতির জয় দেখিতে পাইল। নেপোলিয়নের অধীনে পূর্বেকার অভিজাত-প্রধান শাসনব্যবস্থা বা সমাজ পুনঃস্থাপিত হইবে না—ইহা তাহারা বুঝিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের পতনের ফলে জনসাধারণ যে-সকল জমি দখল করিয়াছিল সেগুলি নেপোলিয়নের ন্যায় সম্রাটের অধীনে ফিরাইয়া দিবার প্রশ্ন উঠিবে না সেই বিশ্বাসও তাহাদের ছিল।

নেপোলিয়নের সম্রাট-পদ লাভ গণতান্ত্রিক নীতির পরিচায়ক : অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হওয়ার প্রশ্ন লোপ

তৃতীয়ত, কন্‌সালেট্‌-এর শাসন এবং পরে প্রধান কন্‌সালের একক প্রাধান্য এবং ঐ সময় যে-সকল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাতে নেপোলিয়নের কার্যপন্থা শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুকূল হইবে, সে-বিষয়ে জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

নেপোলিয়নের শাসন শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুকূল হওয়ার ধারণা

চতুর্থত, নেপোলিয়নের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফরাসী জাতির উপর এক সম্মোহনী

শক্তি-মন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়াছিল। "নেপোলিয়ন"-এর নামে ফরাসী জাতি তখন অভূতপূর্ব গৌরববোধ করিত। নেপোলিয়নের অন্তর্দৃষ্টি ও তাঁহার জনহিতৈষণা তাঁহাকে ফরাসী জাতির অভিপ্রেত স্থায়ী সাম্যপন্থী শাসনব্যবস্থা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অংশ না দিলেও জনসাধারণ যাহা চাহিয়াছিল তাহা দিতে নেপোলিয়ন সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ফরাসী জাতি নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী শাসন নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিল।

'নেপোলিয়ন' নামের সম্মোহনী শক্তি, জনকল্যাণের ইচ্ছা

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও বিপ্লব (Napoleonic Empire and the Revolution) : নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী সম্রাট-পদ গ্রহণ এবং ইওরোপে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবের মূল গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী-ধারার পরিপন্থী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। প্রথমত, সাম্রাজ্যের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনাসম্ভূত নহে। বিপ্লবের বিবর্তনেই সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যকে বিপ্লবের শেষ পর্যায় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। ডিরেক্টরির পর কনসালেট এবং তারপর সমগ্র জীবনব্যাপী নেপোলিয়নকে প্রধান কনসাল নিযুক্ত করা—এই সকল পদক্ষেপের শেষ এবং স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সম্রাট-পদের সৃষ্টি হয়। ডিরেক্টরি বা কনসাল আমলে বিপ্লবের যদি অবসান ঘটিয়া না থাকে তবে সম্রাট-পদ সৃষ্টিতে তাহা ঘটিয়াছিল এই কথা বলা যাইবে কিরূপে? দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন ইওরোপের উপর ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি গ্রহণ করিয়া সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের পূর্বে ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশ ইতালি ভিন্ন অপর কোথাও বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তৃতিই অপরাপর দেশে বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। সম্রাট-পদ গ্রহণের কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-নীতি বিপ্লবের প্রসারে সাহায্য করিয়াছিল। টিলজিট-এর সন্ধি (১৮০৭) পর্যন্ত নেপোলিয়নের যুদ্ধনীতি এবং উহার আনুষঙ্গিক পররাজ্য-গ্রাসনীতি ইওরোপীয় শক্তিসংঘের প্রত্যুত্তর হিসাবেই অনুসৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ সময় পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করিতেছিল। টিলজিট-এর সন্ধির পর হইতে

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের অপরিপন্থী

সম্রাট-পদ কনসাল-পদের চরম পরিণতি-মাত্র

সাম্রাজ্য-সৃষ্টির ফলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপের সর্বত্র বিস্তৃত

টিলজিট-এর সন্ধি পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলি বিপ্লবের শত্রুতা-সাধনে তৎপর

অবশ্য নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইওরোপকে নেপোলিয়নের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল—বিপ্লবের নহে। ঐ সময়ে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-নীতি বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। চতুর্থত, নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানি ও ইতালি দখল তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ-প্রসূত হইলেও বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তারে এবং এই দুই দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে নেপোলিয়নের অসীম অবদান রহিয়াছে।

পরবর্তী কালের ইওরোপ ঃ নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য-নীতির ফলে শত্রুতে পরিণত

মধ্যযুগীয় সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনৈক্য, মধ্যযুগীয় আইন-কানুনের অসমতা দূর করিয়া এবং শাসন-ব্যাপারে ঐক্যবন্ধ করিয়া নেপোলিয়ন ভবিষ্যতে এই দুই দেশের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে শাসিত হওয়ার ফলে এই দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূর হইয়া এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যাধীনে আসিবার ফলে গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই সকল দেশের অধিবাসিগণ এক অতি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

জার্মানি ও ইতালির ভবিষ্যৎ ইতিহাসে নেপোলিয়নের অবদান

ইতালি ও জার্মানিতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি

পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি এবং পররাষ্ট্র-নীতি উভয় দিক দিয়াই নেপোলিয়ন কনভেনশন ও কনসালেট-এর নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের 'ইওরোপীয় পর্যায়' বলা যাইতে পারে। সুতরাং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের সর্বনাশ সাধন না করিয়া বিপ্লবের বিস্তার সাধন করিয়াছিল।*

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের সর্বনাশ সাধন না করিয়া বিপ্লবের বিস্তৃতিতে সাহায্যদান

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব (Napoleon and the French Revolution)ঃ বিপ্লব সম্পর্কে নেপোলিয়নের মনোভাব কি ছিল এবং নেপোলিয়ন ও বিপ্লবের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাঁহারই দুইটি উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এক সময়ে নেপোলিয়ন 'আমি-ই বিপ্লব' (I am the Revolution) এই উক্তি করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি-ই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি" (I destroyed the Revolution)।

"আমি-ই বিপ্লব" "আমি-ই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি"

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি পরস্পর-বিরোধী, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলে এই দুই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি

* "Empire was not an interruption, but an extension of the Revolution." Guedalla, p. 225.

(১) বিপ্লবের ফলে ফরাসী জনসমাজের মধ্যে যে-সমতা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই ছিলেন নেপোলিয়ন স্বয়ং। সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নেপোলিয়নের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ধনী-দরিদ্র ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে ক্ষমতা ও প্রতিভা থাকিলে উন্নতির পথ সকলের নিকট সমভাবে উন্মুখ থাকিবে (Career open to talent)—এই গণতান্ত্রিক নীতির জয় পরিলক্ষিত হয়। এদিক দিয়া নেপোলিয়ন বিপ্লব প্রসূত সাম্য-নীতির প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন। (২) আইনের চক্ষে সকলকেই সম-মর্যাদায় স্থাপন করিয়া, কৃষকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নেপোলিয়ন বিপ্লবের একটি প্রধান নীতিকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, ও সামাজিক-সমতা, আইনের চক্ষে সমতার নীতিতে নেপোলিয়ন যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা পোপ কর্তৃক নেপোলিয়নের অভিষেক কালে নেপোলিয়নের শপথবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। (৩) তিনি ইওরোপের বিভিন্ন দেশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া বিপ্লবকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। উপরন্তু তিনিই ইওরোপীয় দেশগুলিকে ফরাসী সাম্রাজ্যাধীনে আনয়ন করিয়া বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপে বিস্তৃত হইবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি "নিজে-ই বিপ্লব" অর্থাৎ বিপ্লবের প্রতীক, অথবা তিনি বিপ্লবের সন্তান (Son of the Revolution), একথা বলা ভুল হইবে না।

নেপোলিয়ন গণতান্ত্রিক সাম্য-নীতির প্রতীক

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

ফরাসী বিপ্লবের সমাজ-নীতি রক্ষা

ইওরোপীয় দেশগুলিকে সাম্রাজ্যাধীনে আনিয়া বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত

অপর দিকে ঘন ঘন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল এবং শ্রান্তি দেখা দিয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। জাতি কি চাহিতেছে তাহা বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল। ফরাসী জাতি তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়েও সুদৃঢ় স্থায়ী শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ন পূর্বকালীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিফলতার কথা স্মরণ করিয়া একমাত্র স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশে শান্তি স্থাপন সম্ভব, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ন্যাশন্যাল কনভেনশনের আমল হইতেই স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজনীয়তা দিন-দিনই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং সম্রাট-পদ গ্রহণের পূর্বে, কনসাল হিসাবেই তিনি গণতান্ত্রিক বাহ্যরূপের অন্তরালে স্বৈরাচারী একক-অধিনায়কত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি শাসন-ব্যাপারে জনগণকে কোন অধিকার দেন

অভ্যন্তরীণ অবস্থা : স্বৈরাচারী শাসন-স্থাপনের প্রয়োজন

পূর্বকালীন গণতান্ত্রিক শাসনের বিফলতার ফলে স্বৈরাচারী শাসন জনগণ কর্তৃক সমর্থিত

নাই। কিন্তু শাসনব্যবস্থা শাসিতের উপকারার্থে পরিচালনা করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—বিপ্লবের এই তিনটি আদর্শের প্রথমটিই, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা, তিনি স্থাপন করেন নাই, পত্র-পত্রিকার স্বাধীনতাও তিনি বিলোপ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অপর দুইটি তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই স্থাপন করিয়াছিলেন ; বস্তুত সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের অবাধ এবং শৃঙ্খলাহীন স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা-ই রাজনৈতিক জটিলতার জন্য দায়ী ছিল। তিনি বিপ্লবের অবাঞ্ছিত নীতিগুলির অবসান ঘটাইয়াছিলেন। এদিক দিয়া তিনি বিপ্লবের ধ্বংসকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবের মূল্যবান কতকগুলি অবদানকে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি নিজেকে 'বিপ্লব' এবং 'বিপ্লবের ধ্বংসকারী' এই উভয় রূপেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শাসনকার্যে জনগণের অংশ না থাকিলেও শাসনকার্য ছিল জনকল্যাণকর

অবাঞ্ছিত নীতির অবসান ও মূল্যবান অবদানকে স্থায়িত্ব দান

সম্রাট নেপোলিয়ন ও ইওরোপ (Napoleon & Europe) :— ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এমিয়েন্স (Amiens)-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসংঘের অবসান ঘটে। কিন্তু এই শান্তি অধিককাল স্থায়ী হইল না। নেপোলিয়ন পাইডমণ্ট-জেনোয়ার প্রজাতন্ত্র, ইতালির প্রজাতন্ত্র, হল্যাণ্ড ও সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্সের দখলে আনিলে ইংলণ্ড এমিয়েন্স-এর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মাল্টা ত্যাগ করিতে রাজী হইল না। ইহা ভিন্ন, ঐ সময়ে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও সংবাদপত্রগুলির অপমানসূচক আক্রমণ বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ নৌবহর ফরাসী বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে এইরূপ প্রায় এক হাজার ইংরেজ ভ্রমণকারীকে বন্দী করিলেন এবং হ্যানোভার ও ন্যাপল্স্ দখল করিলেন। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের উদ্যোগে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ফ্রান্স-বিরোধী এক মিত্রতা (Third Coalition) স্থাপিত হইল। নেপোলিয়ন এইবার ইওরোপের তৃতীয় শক্তিসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ট্রাফালগার (Trafalgar)-এর নৌ-যুদ্ধে ইংরেজ নৌসেনাপতি নেল্সনের তৎপরতায় ফরাসী নৌবাহিনী পরাজিত হইল (অক্টোবর ২১, ১৮০৫)। কিন্তু নেল্সন এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন

ইতালি, হল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত : এমিয়েন্স-এর সন্ধির শর্ত ভঙ্গ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংরেজী সংবাদপত্রের হীন প্রচারকার্য : ইংলণ্ড কর্তৃক ফরাসী নৌবহর আক্রমণ : ফ্রান্স কর্তৃক ন্যাপল্স্ ও হ্যানোভার দখল, তৃতীয় শক্তিসংঘ স্থাপন

ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধ : ইংলণ্ডের জয় — নেল্সনের মৃত্যু—

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সমগ্র ইওরোপকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থির করিলেন। ইতালি হইতে শুরু করিয়া এল্‌ব নদীর মোহনা পর্যন্ত যাবতীয় ইওরোপীয় বন্দরে তিনি ব্রিটিশ সামগ্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক অস্ত্রে আঘাত করিতে চাহিলেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয় পরোক্ষভাবে নেপোলিয়নের পতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলেই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম" (Continental System) নামক সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এই অবরোধই তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়: নেপোলিয়নের পতনের প্রথম পদক্ষেপ

ট্রাফালগারের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সেনাপতিকে আল্‌ম (Ulm) নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীকে অস্টারলিজ (Austerlitz)-এর যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া (ডিসেম্বর ২, ১৮০৫) প্রেসবার্গের সন্ধি (Treaty of Presburg) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন (ডিসেম্বর, ২৬)। প্রেসবার্গের সন্ধি (Treaty of Presburg) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির আরও একটি সফল পদক্ষেপ। এই যুদ্ধের ফলে জার আলেকজাণ্ডার নিজ সৈন্য লইয়া পূর্ব-ইওরোপের দিকে পশ্চাৎ-অপসারণ করিতে বাধ্য হন, অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস তৃতীয়বার নেপোলিয়নের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অস্ট্রিয়া এই সন্ধির শর্তানুসারে ভেনিস, ইস্ট্রিয়া, ডালম্যাশিয়া ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন, অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নকে ইতালির রাজা বলিয়া স্বীকার করে; টাইরল নামক স্থানটি বেভেরিয়াকে এবং পশ্চিম-জার্মানিস্থ অস্ট্রিয়ার স্থানগুলি উর্টেমবার্গ ও ব্যাডেন-এর নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল জার্মানির পুনর্গঠন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট তথা জার্মানির সম্রাট উপাধি ত্যাগ করেন। নেপোলিয়ন "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের" অবসান ঘটাইয়া এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইহা 'না পবিত্র, না রোমান, না সাম্রাজ্য' (Neither Holy, nor Roman nor an Empire)। ইহা ভিন্ন, জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যের অবসান ঘটান হয়। দক্ষিণ এবং পশ্চিম জার্মানির ষোলটি রাজ্য লইয়া ফ্রান্সের অধীন 'কন্‌ফেডারেশন অব্‌ দি রাইন' নামে এক রাজ্য গঠন করা হয়। এই সন্ধির ফলে অস্ট্রিয়ার সহিত আড্রিয়াটিক সাগর ও রাইন নদীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এদিকে প্রাশিয়াও ইংলণ্ডের পক্ষ গ্রহণ করিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাশিয়া জেনা (Jena) এবং অ্যারস্ট্যাডাট্‌ (Auerstadt)-এর যুদ্ধে ফ্রান্সের হস্তে পরাজিত হইয়া স্কনব্রুণ (Schonbrun)-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিতে বাধ্য হইল এবং বিনিময়ে

আলমে ও অস্টারলিজ-এর যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়: প্রেসবার্গের সন্ধির গুরুত্ব:

'জেনা ও অ্যারস্ট্যাডাট্‌-এর যুদ্ধে প্রাশিয়ার পরাজয়: স্কনব্রুণের সন্ধি

ইংলণ্ডের জার্মানিস্থ স্থান হ্যানোভার লাভ করিল। বিজেতা হিসাবে নেপোলিয়ন বার্লিনে উপস্থিত হইলেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন 'কনফেডারেশন অব্ দি রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে জার্মান রাজগণের এক রাষ্ট্রীয় সংঘ স্থাপন করেন।* এই রাষ্ট্রীয় সংঘের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল ফ্রান্সের উপর। এইভাবে ফ্রান্সের পূর্ব-সীমান্তে নেপোলিয়নের কর্তৃত্বাধীনে এক মধ্যবর্তী (Buffer) রাজ্যের সৃষ্টি হইলে ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত্তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল।

কনফেডারেশন অব্ দি রাইন
ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি

'কনফেডারেশন অব্ দি রাইন' গঠন করিয়া নেপোলিয়ন বার্লিন হইতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ ঘোষণা করেন (নভেম্বর, ১৮০৬)। ইহা 'বার্লিন ডিক্রি' (Berlin Decree) নামে খ্যাত।

বার্লিন ডিক্রি (নভেম্বর, ১৮০৬)

প্রাশিয়াকে পদানত করিয়া নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ই-ল্যা (Eylau) নামক স্থানে নেপোলিয়ন রুশ সেনাবাহিনীর নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন। কিন্তু দ্রুত নিজ সেনাবাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করিয়া তিনি ফ্রাইডল্যাণ্ড (Friedland)-এর যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিলেন (জুন, ১৮০৭)। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার টিলজিট্ (Tilsit)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

ই-ল্যা'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়
ফ্রাইডল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় : টিলজিট্-এর সন্ধি (১৮০৭)

এই সন্ধির শর্তানুসারে (১) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। (২) রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপের যাবতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন মানিয়া লইলেন। (৩) প্রাশিয়া রাজ্যের একাংশ লইয়া 'ওয়েস্টফেলিয়া' নামক এক নূতন রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজা হইলেন নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্ট। (৪) পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ হইতে রাশিয়া যে-সকল স্থান দখল করিয়াছিল তাহা লইয়া ওয়ারসো নামক 'ডাচি' (Duchy) স্থাপনের স্বীকৃতিও আলেকজাণ্ডারকে দিতে হইল। এই 'ডাচি'-টি সাক্সনির রাজার অধীনে স্থাপন করা হইবে স্থির হইল। (৫) জার আলেকজাণ্ডার ইংলণ্ডের সহিত নেপোলিয়নের বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে সাহায্য করিতে—অর্থাৎ ফ্রান্স কর্তৃক ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবরোধের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; বিনিময়ে নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারকে সুইডেন ও তুরস্কের রাজ্যাংশ দখলে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

টিলজিট্-এর সন্ধির শর্তাদি

* Confederation of the Rhine consisting of the kings of Bavaria, Wurttemburg, the Dukes of Baden, Hesse and Berg, the Archbishopric of Mainz and nine Minor Princes.

টিল্‌জিটের সন্ধি (Treaty of Tilsit) : টিল্‌জিট্-এর সন্ধি (১৮০৭) নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরম প্রকাশ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতালি, জার্মানি তথা সমগ্র মধ্য-ইওরোপ তখন নেপোলিয়নের পদানত, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার শক্তি বিধ্বস্ত। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলে প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের যে-সকল অংশ দখল করিয়াছিল তাহা লইয়া নেপোলিয়ন ওয়ারসো (Warsaw) নামক ডাচি (Duchy) অর্থাৎ ডিউক-শাসিত এক রাজ্য স্থাপন করিলেন। সর্বোপরি রাশিয়া তখন নেপোলিয়নের অনুগত মিত্রশক্তি। নবম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লেম্যানের সাম্রাজ্যের পর এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য অপর কেহ গঠন করিতে পারেন নাই। টিল্‌জিটের সন্ধির (Treaty of Tilsit) দুইটি অংশ ছিল, একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপনীয়।

টিল্‌জিট্-এর সন্ধির গুরুত্ব : নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরম প্রকাশ

প্রকাশ্য অংশের শর্তগুলি ছিল : (১) নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার যে-সকল অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ওয়ারসো ডাচি গঠন করিয়াছিলেন সেই সকল কাজ জার আলেকজাণ্ডার স্বীকার করিয়া লইলেন। এই ডাচি স্যাক্সনির রাজার অধীনে স্থাপন করা হইল। (২) প্রাশিয়ার পশ্চিমের একাংশ ও হ্যানোভার লইয়া ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করিয়া সেই রাজ্যে নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্টি (Jerome Bonaparte)-কে স্থাপন করা হইল। (৩) এইভাবে আলেকজাণ্ডার প্রাশিয়ার অখণ্ডতা বিসর্জন দিলেন, পক্ষান্তরে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা বিসর্জন দিলেন।

টিল্‌জিটের সন্ধির প্রকাশ্য ও গোপন—দুই অংশ : প্রকাশ্য অংশের শর্তাদি

গোপন অংশের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার আলেকজাণ্ডারের সমর্থন আদায়। ইহার কোন বাহ্যিক রূপ ছিল না। (১) জার আলেকজাণ্ডার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক যুদ্ধ সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অথাৎ নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া যথা কর্তব্য করিবেন। (২) প্রথম শর্তের প্রতিদান হিসাবে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্য ও সুইডেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি অনুসরণে সাহায্য করিবেন। অবশ্য জার আলেকজাণ্ডার কন্‌স্টান্‌টিনোপল্ অধিকার করিতে গেলে নেপোলিয়ন তাহা মানিয়া লইবেন না। ইহার কারণ নেপোলিয়ন কন্‌স্টান্‌টিনোপল দখল করিয়া এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধি নেপোলিয়নের চরম উন্নতির নিদর্শন হইলেও ঐ উন্নতির পশ্চাতেই তাঁহার ভবিষ্যতের পতনের বীজ নিহিত ছিল। এই সন্ধিতে উভয় পক্ষের স্বার্থও সমভাবে রক্ষিত হয় নাই। জার আলেকজাণ্ডার অদূর ভবিষ্যতেই এই সন্ধির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিয়া নেপোলিয়নের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। আর নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনমনীয় শত্রু গ্রেট ব্রিটেন তখনও অপরাজিত। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধের সূত্রেই নানাবিধ সামরিক ও অপরাপর যে-সকল সমস্যা ও বিপত্তি দেখা দিয়াছিল সেগুলিই নেপোলিয়নের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে টিল্‌জিট্-এর সন্ধির বাহ্যিক বিজয় গৌরবের অন্তরালে নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ-পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল, বলা যাইতে পারে।

গোপন শর্তাদি

উন্নতির অন্তরালে পতনের বীজ নিহিত

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম (Continental System) : টিল্‌জিট্‌ (Tilsit)-এর সন্ধির পর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে নির্বান্ধব অবস্থায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হাতে মারিতে না পারিয়া তিনি ইংরেজ জাতিকে 'ভাতে' মারিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাই তিনি অর্থনৈতিক অস্ত্রে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধে অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিয়া শত্রুর পরাজয় ত্বরান্বিত করিবার নীতি বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। নেপোলিয়ন সেই অস্ত্রকে সর্বাত্মকভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি সমগ্র ইওরোপের বন্দরগুলি ইংলণ্ডের বাণিজ্য জাহাজের নিকট বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নেপোলিয়ন ইংরেজ জাতিকে "দোকানদারের জাতি" (Nation of shop-keepers) বলিয়া অভিহিত করিতেন।

'অর্থনৈতিক অস্ত্র' দ্বারা ইংলণ্ডকে আঘাতের চেষ্টা

সেইজন্য অর্থনৈতিক চাপেই তাহারা বেশী বিব্রত হইবে ভাবিয়া তিনি ইতিপূর্বেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'বার্লিন ডিক্রি' (Berlin Decree) জারি করিয়াছিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা (নভেম্বর, ১৮০৬) তিনি ইওরোপের কোন বন্দরে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের কার্য শুরু হইল। নেপোলিয়নের এই অর্থনৈতিক অবরোধ নীতি 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' (Continental System) নামে পরিচিত। কিন্তু ইহার পূর্বেই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ ডিরেক্টরির শাসনকালেই ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ফ্রান্সে আমদানি করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এমন কি, কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে করিয়াও যদি কোন মাল আসিত এবং তাহা ইংলণ্ডে প্রস্তুত বলিয়া কোন সন্দেহের কারণ থাকিত তাহা হইলেও সেই সকল দ্রব্যাদি ফ্রান্সে আমদানি করা চলিত না।

বার্লিন ডিক্রি (১৮০৬)

পূর্ব হইতেই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম-এর সূত্রপাত

নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের পশ্চাতে কেবলমাত্র যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যই ছিল এমন নহে, ইহার পশ্চাতে শিল্পক্ষেত্রে ফরাসী প্রাধান্য বৃদ্ধির ইচ্ছাও বলবতী ছিল।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম-এর উদ্দেশ্য : (১) ইংলণ্ডকে আঘাত, (২) ফরাসী বাণিজ্যের প্রসার

বার্লিন ডিক্রির প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড "অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল" (Orders-in-Council) পাস করিয়া ইওরোপের সকল বন্দরের পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করিল (১৮০৭)। নিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষেও এই সকল বন্দরে বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হইল। ঐ বৎসরই ইংলণ্ড ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের নৌবহর দখল করিয়া লইল। ডেনমার্কের নৌবহর নেপোলিয়নের কবলে পড়িলে ফ্রান্সের নৌশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এই ভয়ে ইংলণ্ড ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর নেপোলিয়ন "মিলান ডিক্রি" (Milan Decree) দ্বারা নিরপেক্ষ তথা যে-কোন দেশের জাহাজ

ইংলণ্ড কর্তৃক পাল্টা অবরোধ : Orders-in-Council, ১৮০৭

ইংলণ্ড কর্তৃক ডেনমার্কের নৌবহর দখল : নেপোলিয়ন কর্তৃক মিলান ডিক্রি পাস

ইংলণ্ডে পেঁৗছিবার চেষ্টা করিলে তাহা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত হইবে, এই আদেশ জারি করিলেন। সুতরাং নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের দুইটি অংশ ছিল—বার্লিন ডিক্রি ও মিলান ডিক্রি। সমগ্র ইওরোপীয় কণ্টিনেণ্টকে নেপোলিয়ন তাঁহার সামুদ্রিক অবরোধের আওতায় আনিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম" (Continental System)।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম-এর দুইটি অংশ: (১) বার্লিন ডিক্রি, (২) মিলান ডিক্রি

নেপোলিয়নের পক্ষে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। কারণ, এজন্য যে বিশাল নৌশক্তির প্রয়োজন ছিল তাহা নেপোলিয়নের ছিল না। টিল্‌জিট্-এর সন্ধি দ্বারা নেপোলিয়ন জার আলেক-জাণ্ডারকে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে বাধ্য করিলেন। পোপ এ-বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবেন জানাইলে নেপোলিয়ন তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন এবং পোপকে একপ্রকার বন্দী করিয়া রাখিলেন। তথাপি তিনি এই ব্যবস্থা চালু রাখিতে পারিলেন না। তৎকালে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড ইওরোপের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপীয় বন্দরগুলির অবরোধ ঘোষণা করিবার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ইহাতে একদিকে যেমন গোপনে ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতে লাগিল অপর দিকে তেমনি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে নেপোলিয়নের প্রতি প্রত্যেক দেশেরই গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। ইহাতে অবশ্য ইংলণ্ডের বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইতে লাগিল, এমন কি, অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল জারি করিবার ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এক যুদ্ধেরও সৃষ্টি হইল (১৮১২-১৪)। তথাপি ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংলণ্ডের সর্বনাশ সাধন করিতে গিয়া নেপোলিয়ন নিজেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ব্যর্থতা তিনি নিজেই প্রমাণ করিলেন। কারণ তিনি নিজ সেনাবাহিনীর জন্য বুট জুতো গোপনে ইংলণ্ড হইতে আনাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের নৌশক্তির অভাব: রাশিয়ার সাহায্য

পোপের সহিত বিরোধ

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফল: নেপোলিয়নের প্রতি ব্যাপক বিদ্বেষ

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে গিয়া নেপোলিয়ন পোর্তুগাল ও স্পেন অধিকার করিলেন। পোর্তুগাল চিরকালই ইংলণ্ডের অনুগত ছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের চাপে পোর্তুগালকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্যদ্রব্যাদি দখল করিতে রাজি না হওয়ায় নেপোলিয়ন পোর্তুগাল জয় করিয়া লইলেন। পোর্তুগাল দখল করিবার সূত্রে স্পেনও নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইল। ব্যাসেল (Basel)-এর সন্ধির সময় হইতে (১৭৯৫) স্পেন ফ্রান্সের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এখন স্পেনের বুরবোঁ বংশের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। পোর্তুগাল দখল করিবার অজুহাতে নেপোলিয়ন স্পেনে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং আকস্মিক ভাবে স্পেনের শক্তিশালী চারিটি দুর্গ দখল করিলেন। স্পেনরাজ

পোর্তুগাল ও স্পেন অধিকার

ব্যাসেল-এর সন্ধি

চতুর্থ চার্লস, রাণী মেরি লুই এবং মন্ত্রী গোডোয় পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। স্পেনবাসীরা রাজাকে তাঁহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ডের পক্ষে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। এদিকে পিতা পুত্রের সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্বের সুযোগে নেপোলিয়ন নিজ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টিকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

নেপোলিয়ন কর্তৃক অন্যায়ভাবে স্পেন দখল ঃ নিজ ভ্রাতাকে স্পেনীয় সিংহাসনে স্থাপন

সুইডেন নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে টিল্‌-জিট্‌-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ড সুইডেনের সাহায্যার্থে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিল। এমন সময় সুইডেনের রাজা চতুর্থ গাস্টাভাসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে ইংরেজবাহিনী সুইডেন ত্যাগ করিল। জার আলেকজাণ্ডার সুইডেনকে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

সুইডেন ও কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ঃ রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সংগঠন (Organisation of the Napoleonic Empire) ঃ ফরাসী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের আমলে বিজিত রাজ্যগুলিকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সম্রাট-পদ লাভ করিলে স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর চালু রহিল না। (১) পূর্বেকার 'বাটাভিয়ান রিপাবলিক' (Batavian Republic) হল্যাণ্ড রাজ্যে পরিণত হইল। নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্টি তথাকার রাজা হইলেন। লুই বোনাপার্টির সুশাসনে সেখানে সাহিত্য, শিল্প, রাস্তাঘাট ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইল। হল্যাণ্ডের জটিল আইন-কানুনের স্থলে নূতন আইন-বিধি প্রবর্তিত হইল। কিন্তু কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম প্রবর্তিত হইলে ওলন্দাজগণের মধ্যে এক গভীর নিরাশা দেখা দিল। লুই বোনাপার্টি নেপোলিয়নের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া রাজপদ ত্যাগ করিলেন (১৮১০)।

ফরাসী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার পরিবর্তন

'বাটাভিয়ান রিপাবলিক' হল্যাণ্ড রাজ্যে পরিণত ঃ লুই বোনাপার্টিকে রাজপদে স্থাপন

নেপোলিয়ন পূর্বেই 'ইতালির রাজা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহার সৎ পুত্র (step son) ইউজিনীকে ইতালির ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু টাস্কেনি, পাইডমণ্ট, লুক্কা ও জেনোয়া সরাসরিভাবে ফ্রান্সের শাসনাধীন রহিল। রোম ও ক্যাম্পানা নগর দুইটি ফ্রান্সের সহিত যুক্ত করা হইল। ন্যাপল্‌স্ নামক দেশটিকে একটি পৃথক রাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা হইল। ক্রমে এই রাজ্যের সহিত সিসিলিকে যোগ করিবার ইচ্ছা নেপোলিয়নের ছিল। ন্যাপল্‌সের রাজা হইলেন নেপোলিয়নের অগ্রজ যোসেফ বোনাপার্টি। তিনিও আইন-কানুন ও শান্তি-শৃংখলার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ, শাসব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ এবং আইনের

ইতালি রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত

ন্যাপল্‌স্ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত ঃ যোসেফ বোনাপার্টি রাজা নিযুক্ত

দৃষ্টিতে সকলকে সম-পর্যায়ে স্থাপন করিয়া তিনি ন্যাপলসের জনগণের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের নিজ আধিপত্যভুক্ত

ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া নামক ইলিরীয় (Illyrian) প্রদেশ দুইটি নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি জেনারেল মারমণ্ট বা মারমোঁ কর্তৃক শাসিত হইত। ইনি তাঁহার কার্যের জন্য নেপোলিয়নের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন।

জার্মানিতে বিভিন্ন রাজ্য গঠন

(১) বেভেরিয়া রাজ্য

(২) উর্টেমবুর্গ রাজ্য

(৩) ব্যাডেন নামক ডিউক রাজ্য

(৪) ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য

(২) জার্মানির বিভিন্ন অংশ লইয়া বিভিন্ন রাজ্য গঠিত হইল। (ক) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সীমান্তরাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন বেভেরিয়া ও নিকটবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান লইয়া একটি রাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করিলেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান যোসেফ্ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। (খ) বেভেরিয়া রাজ্য যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে সেইজন্য নেপোলিয়ন উহার পশ্চিম সীমায় উর্টেমবুর্গ নামে একটি রাজ্য গঠন করিলেন। তথাকার ডিউক ফ্রেডারিক 'রাজা' উপাধি লাভ করিলেন। (গ) দক্ষিণ-জার্মানিতে ব্যাডেন (Baden) নামক অপর একটি ডিউক রাজ্য গঠিত হইল এবং তথাকার ইলেক্টর 'গ্র্যান্ড ডিউক' উপাধি লাভ করিলেন। (ঘ) এল্‌ব নদীর বাম তীরবর্তী প্রাশিয়ার রাজ্যাংশ এবং হেসি-ক্যাসেল লইয়া নেপোলিয়ন টিল্‌জিটের সন্ধির সময়েই ওয়েস্ট-ফেলিয়া রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তথায় নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্টি রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যের আর কোন পরিবর্তন করা হইল না। (ঙ) প্রাশিয়া ও বেভেরিয়ার অংশ লইয়া নেপোলিয়ন বার্গ নামক ডিউক-রাজ্য গঠন করিলেন। পেপোলিয়নের শ্যালক মুরা (Murat) হইলেন এই স্থানের গ্র্যান্ড ডিউক।

(৫) বার্গ নামক ডিউক-রাজ্য

(৬) স্যাক্সনি রাজ্য

(চ) পূর্ব-জার্মানির প্রধান রাজ্য ছিল স্যাক্সনি। তথাকার ইলেক্টর এখন 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। (ছ) কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বাদে অপরাপর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিকটবর্তী রাজ্যগুলির সহিত যুক্ত করিয়া নেপোলিয়ন জার্মানির শতধা-বিচ্ছিন্ন অবস্থার কতক প্রতিকার সাধন করিলেন।

(৭) কন্‌ফেডারেশন অব্ দি রাইন

জার্মানির বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ, ওয়েস্টফেলিয়া ও স্যাক্সনি এই চারিটি রাজ্য, পাঁচটি গ্র্যান্ড ডাচি এবং তেইশটি ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া নেপোলিয়ন 'কন্‌ফেডারেশন অব্ দি রাইন' (Confederation of the Rhine) গঠন করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন এই কন্‌ফেডারেশন গঠন করা হইয়াছিল তখন ইহার মোট রাজ্যসংখ্যা ছিল পনর। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইল বত্রিশ।

(৩) পোল্যাণ্ড রাজ্য সম্পর্কে নেপোলিয়ন অতি দুর্বল নীতি অনুসরণ করেন। তিনি স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইলেন না, কারণ তাহাতে রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় ছিল। তথাপি তিনি প্রাশিয়া ও রাশিয়া হইতে সামান্য সামান্য অংশ লইয়া 'গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো' (Grand Duchy of Warsaw) গঠন করিলেন এবং ইহা সাক্সনির রাজার অধীনে স্থাপন করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের অন্যায় দূরীভূত হইল না, অপর দিকে তেমনি রাশিয়ার কতক অসন্তুষ্টির কারণ রহিয়া গেল। এই অদূরদর্শী আংশিক কার্যের ফলে শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ও জার আলেকজাণ্ডারের মৈত্রী বিনষ্ট হইয়াছিল।*

গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো

নেপোলিয়নের পতন (Downfall of Napoleon): উত্থানের পর পতন—নেপোলিয়নের ন্যায় বীরের ভাগ্যেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। ১৮১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য উহার বিস্তৃতি ও গৌরবের চরম শিখরে আসীন। অস্ট্রিয়া তখন অবদমিত, স্পেন, পোর্তুগাল পদানত, পোপ আজ্ঞাবহ, সুইডেন আনুগত্যাধীন, রাশিয়ার সহিত বিবাদ মীমাংসিত, ব্রিটেন অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধের দিকে ধাবিত। নেপোলিয়নের আদেশ তখন বাল্টিক হইতে ভূমধ্যসাগর এবং টেগাস হইতে নীমেন নদী পর্যন্ত আইনের ন্যায় বলবৎ। কিন্তু নেপোলিয়নের এই বিশাল সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য ও সম্রাট-পদের গৌরবের অন্তরালে তাঁহার সাম্রাজ্যের ও তাঁহার নিজের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। বস্তুত, তাঁহার সাম্রাজ্যের ইমারত সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই উহা ধসিয়া পড়িতে লাগিল।†

উত্থানের পর পতন—প্রাকৃতিক নিয়ম

স্পেন, জার্মানি ও রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক দমন-নীতির ফলে এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ায়, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হইল।

নেপোলিয়নের প্রতি ব্যাপক বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি

* "In this half and half policy with regard to Poland was to be found the greatest peril to the newly formed alliance between Alexander and Napoleon." Morse Stephens, p. 261.

† "The building (the Imperial edifice) was, in fact, never completed, never made storm-and-weather-proof before it began to crack and crumble to show a fissure here or a breach there where England directed her battering-arms." Ketelbey : *A Short History of Modern Times*, p. 126.

নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ; তাঁহার সংগঠনশক্তি ছিল অপরিসীম। সাম্রাজ্য গঠনের পরও যদি তাঁহার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি হয়ত তাঁহার সম্মুখীন সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, "সমগ্র ইওরোপের জন্য এক শাসনব্যবস্থা, এক আইন-বিধি, এক বিচারালয় স্থাপন। এইভাবে সমগ্র ইওরোপে এক ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ গঠন।"

নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষা সমগ্র ইওরোপে 'এক আইন-বিধি, এক শাসন, এক বিচার, এক জনসমাজ সৃষ্টি'

পেনিনসুলার যুদ্ধ (The Peninsular War)ঃ নেপোলিয়ন একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারাই স্পেন দখল করিয়াছিলেন। ইহার উপর স্পেনের সিংহাসনে নিজ ভ্রাতাকে স্থাপন করিয়া তিনি স্পেনবাসীর আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তার উপর আঘাত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনে মারাত্মক ত্রুটিগুলির অন্যতম, সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ন নিজেও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্পেনের প্রদেশগুলি একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অত্যাচার ও প্রাণদণ্ডের ভয় ভুলিয়া গিয়া স্পেনীয় দেশপ্রেমিকদের বিভিন্ন প্রতিরোধী দল (juntas) গেরিলা-যুদ্ধ শুরু করিল। তাহারা ফরাসী সেনাপতি ডুপোঁ (Dupont)-কে বে-লেন (Baylen) নামক স্থানে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করিল (১১ই জুলাই, ১৮০৮)। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র ইওরোপে এক উল্লাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যনীতিকে পরাজিত করিয়া জাতীয়তাবাদ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে—এইরূপ এক ধারণা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

স্পেনের প্রতি দুর্ব্যবহার

স্পেনে জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি ঃ বে-লেন-এর যুদ্ধ

স্পেন ইংলণ্ডের সাহায্য চাহিলে সেখান হইতে সার আর্থার ওয়েলসলি (পরবর্তী কালে ইনিই ডিউক অব্ ওয়েলিংটন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) সৈন্যসহ পোর্তুগালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (আগস্ট ১৯, ১৮০৮)। তিনি অনায়াসে পোর্তুগালে অবস্থিত ফরাসী সেনাপতি জুনো (Junot) ও তাঁহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। জুনো পোর্তুগাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পোর্তুগাল ইংরেজ অধীনে আসিলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপে যুদ্ধ চালাইবার সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। পোর্তুগালকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইল।

ইংলণ্ডের সাহায্য

পোর্তুগালকে ঘাঁটি করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

* "I embarked very badly on the Spanish affair, I confess ; the immorality of it was too patent, the injustice too cynical, the whole thing wears an ugly look." Napoleon, at St. Helena, Vide, *Modern European History*, Hoyland p. 223.

এদিকে স্পেনবাসীরা ইংরেজবাহিনীর পোর্তুগাল-বিজয়ে আরও উৎসাহিত হইল। তাহারা ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করিলে নেপোলিয়নের ভ্রাতা যোসেফ্ বোনাপার্ট মাদ্রিদ ত্যাগ করিলেন।

স্পেন অধিকতর উৎসাহিত

নেপোলিয়ন স্পেন ও পোর্তুগালের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে তিনি রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের সহিত মিত্রতাচুক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য আরফার্ট (Erfurt) নামক স্থানে এক বৈঠক আহ্বান করিলেন। স্পেনে উপস্থিত হইবার পূর্বে সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে যাহাতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য আলেকজাণ্ডারের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে এক গোপন চুক্তিতে স্থির হইল যে, রাশিয়া অস্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের সীমা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' কার্যকরী করিবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে আলেকজাণ্ডার ফিনল্যাণ্ড, মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নামক স্থান লাভ করিবেন। আলেকজাণ্ডারের ভগিনীর সহিত নেপোলিয়নের বিবাহেরও এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। আলেকজাণ্ডার অবশ্য এই প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন।

আরফার্ট-এর বৈঠক

আরফার্টের বৈঠকের পর নেপোলিয়ন স্পেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বার্গোস (Bergos) নামক স্থানে তিনি স্পেনীয় সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া মাদ্রিদ দখল করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্‌কে পুনরায় স্পেনীয় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮০৮)। এদিকে উত্তর-স্পেনে ইংরেজ সেনাপতি সার জন মুর (Sir John Moore)-এর নেতৃত্বে এক ব্রিটিশবাহিনী উপস্থিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন করুন্না (Corunna)-র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া (জানুয়ারি ১৬ ১৮০৯) দ্রুত প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্পেন দমনের ভার সেনাপতি সাউল্ট্ (Soult)-এর উপর ন্যস্ত করা হইল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। প্রথম ফরাসীবাহিনী এসপার্ণ-এস্‌লিং (Aspern-Essling) এর যুদ্ধে পরাজিত হইল, কিন্তু ওয়াগ্রাম (Wagram)-এর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে অস্ট্রিয়া ভিয়েনার সন্ধি (Treaty of Vienna) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল (জুলাই ১৬, ১৮০৯)। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া ওয়ারসো (Warsaw)-র ডিউককে পশ্চিম-গ্যালিশিয়া, রাশিয়াকে পূর্ব-গ্যালিশিয়া, ফ্রান্সকে ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া, বেভেরিয়াকে টাইরল দান করিতে বাধ্য হইল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হইল এবং অস্ট্রিয়া কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। এইভাবে

নেপোলিয়নের স্পেনীয় অভিযান ঃ বার্গোস-এর যুদ্ধে স্পেনের পরাজয়

করুন্না-যুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয়

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান ঃ এস্‌পার্ণ-এস্‌লিং-এর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়, ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে জয়লাভ ; ভিয়েনার সন্ধি (১৮০৯)

পোর্তুগাল, স্পেন ও অস্ট্রিয়া পুনরায় ফ্রান্সের পদানত হইল। কিন্তু এই বিজয়ে নেপোলিয়নের সামরিক সুবিধা হইলেও তাঁহার পতনের পথ রুদ্ধ হইল না। এই সকল যুদ্ধ হইতে নেপোলিয়ন যে অপরাজেয় নহেন তাহা প্রমাণিত হইল। "স্পেনের ক্ষত" (Spanish Ulcer) উপশমিত না হইয়া দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

স্পেন, পোর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া পুনরায় নেপোলিয়নের পদানত

স্পেনে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জার্মানিকেও প্রেরণা দান করিল। ইহা ভিন্ন স্পেন ও পোর্তুগাল হইতে এতদিন ফ্রান্স যে-কর আদায় করিতেছিল তাহা এই বিদ্রোহের সময় হইতে বন্ধ হইল। সর্বোপরি নেপোলিয়নের সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল এবং কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা দিন-দিনই কঠিনতর হইয়া উঠিল। স্পেনবাসী নেপোলিয়নের বিরোধিতার মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করিল যে, কোন জাতি যদি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহা হইলে সেই জাতিকে পদানত রাখা সম্ভব হয় না।

"স্পেনের ক্ষত" বৃদ্ধি

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা অধিকতর কঠিন

সামরিক বিজয় লাভ করিলেও স্পেন-পোর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থাৎ পেনিনসুলার যুদ্ধের (Peninsular War) অবসান ঘটিল না। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগাল হইতে ফরাসী সৈন্যকে বিতাড়িত করিলেন এবং স্পেনে টালাভেরা (Talavera)-র যুদ্ধে বিরাট ফরাসীবাহিনীকে সামান্য সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। নেপোলিয়ন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য দ্বারা স্পেন ছাইয়া ফেলিলেন। এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ম্যাসিনা (Massena)। বুসাকো (Busaco)-র যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর ১০, ১৮১০) ওয়েলিংটন ফরাসী-বাহিনীকে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। তিনি পোর্তুগালে টোরিস ভেড্রাস (Torres Vedras) নামক স্থানে সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া টেগাস নদী পর্যন্ত তিনটি রক্ষা-প্রাচীর প্রস্তুত করিলেন। এই প্রাচীরের বাহিরে কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন জনমানবের চিহ্ন রহিল না। কৃষক, সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় লোক ও জিনিসপত্র এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া আসা হইল। এই রক্ষা-প্রাচীরের বিরুদ্ধে ম্যাসিনা-র সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নানা প্রকার অসুস্থতা ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে ফরাসী সৈন্য পোর্তুগাল ত্যাগ করিয়া স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিল (মার্চ, ১৮১১)। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসী সৈন্য ফুয়েন্টস্-ডি ওনোরো (Fuentes d'onoro) নামক স্থানে পুনরায় পরাজিত হইয়া পোর্তুগাল পুনরধিকারের আশা ত্যাগ করিল।

পুনরায় যুদ্ধ শুরু: টালাভেরা'র যুদ্ধ

বুসাকো'র যুদ্ধ

টোরিস ভেড্রাসে তিনটি রক্ষা-প্রাচীর নির্মাণ

ফুয়েন্টস্-ডি-ওনোরো'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়

রাশিয়ার সহিত মৈত্রীনাশ (Breach with Russia) : আরফার্টের বৈঠকের এক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়ার জার আলেকজান্ডারের মনেও নেপোলিয়নের তোষণ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জার আলেকজান্ডারও নেপোলিয়নের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। নেপোলিয়ন ও রাশিয়ার মৈত্রীনাশের কারণগুলি অনেক পূর্ব হইতেই অনুধাবন করিতে হইবে। প্রথমত, টিলজিট্-এর সন্ধিতে নেপোলিয়ন নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের সমান মর্যাদা বা সমান স্বার্থ রক্ষিত না হইলে কোন মিত্রতাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। টিলজিট্-এর সন্ধিতে নেপোলিয়ন সুইডেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া জার আলেকজান্ডারকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই জার আলেকজান্ডার দেখিলেন যে, নেপোলিয়নের সহিত বন্ধুত্বের ফলে তাঁহার দায়িত্ব দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তিনি নেপোলিয়নের তাঁবেদারে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছেন।

(১) টিলজিট্-এর সন্ধির ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, পোর্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ যখন নেপোলিয়নের শক্তি প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল, তখন জার আলেকজান্ডার তুরস্ক অধিকারে নেপোলিয়নের সাহায্যের উপর আর ভরসা রাখিতে পারিলেন না। উপরন্তু নেপোলিয়ন তখন চতুর্দিকে এমনভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার পক্ষে রাশিয়ার স্বার্থ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না।

(২) পোর্তুগাল কর্তৃক নেপোলিয়নের পরাজয় : রাশিয়ার আশা লোপ

তৃতীয়ত, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যান্ডের সামান্য অংশ লইয়া গ্র্যান্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো (Grand Duchy of Warsaw) গঠন করিয়া নেপোলিয়ন একদিকে যেমন পোল্যান্ডের পুনর্গঠন সম্পন্ন করিতে পারিলেন না, অপর দিকে তেমনি রাশিয়াকে পোল্যান্ডের একাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া জার আলেকজান্ডারের বিরাগভাজন হইলেন। পরবর্তী কালে এই ডাচির সহিত অস্ট্রিয়ার অধিকৃত পশ্চিম-গ্যালিশিয়া যুক্ত করিয়া ক্রমেই ইহার আয়তন বৃদ্ধি করায় জার আলেকজান্ডারের মনে সন্দেহ জাগিল যে, নেপোলিয়ন হয়ত পূর্বেকার স্বাধীন পোল্যান্ড রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) গ্র্যান্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো গঠনে জার আলেকজান্ডারের অসন্তুষ্টি

জার আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের নিকট হইতে পোল্যান্ড পুনর্গঠিত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি চাহিলে, নেপোলিয়ন তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে আলেকজান্ডার স্বভাবতই সন্দিগ্ধ ও ভীত হইলেন। চতুর্থত ওল্ডেনবার্গের ডিউক ছিলেন আলেকজান্ডারের ভগ্নীপতি। নেপোলিয়ন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ওল্ডেনবার্গ দখল করিলে জার আলেকজান্ডার স্বভাবতই বিরক্ত হইলেন।

(৪) ওল্ডেনবার্গ দখল : জার আলেকজান্ডারের অসন্তুষ্টি

পঞ্চমত, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম-এর ফলে এই ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্য প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইওরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় রাশিয়ার কারখানাগুলি বন্ধ হইতে চলিল, বেকার-সমস্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে

(৫) কন্টিনেন্টাল সিস্টেম-প্রসূত মনোমালিন্য

লাগিল, জিনিসপত্রের দামও দিন-দিন বাড়িয়া চলিল।* এমতাবস্থায় জার আলেকজাণ্ডার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি ইহা স্পষ্টই জানিতেন যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে নেপোলিয়নের পক্ষে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম চালু রাখা সম্ভব ছিল না।

জার আলেকজাণ্ডার কর্তৃক কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম অগ্রাহ্য

জার আলেকজাণ্ডার বুকারেস্ট (Bucharest)-এর সন্ধি (১৮১২) দ্বারা তুরস্কের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া বেসারাবিয়া লাভ করিল এবং সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। আলেকজাণ্ডার ইংলণ্ড ও সুইডেনের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্য-জাহাজের জন্য রাশিয়ার বন্দরগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এই সকল কারণে নেপোলিয়ন স্বভাবতই জার আলেকজাণ্ডারকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

মস্কো অভিযানের প্রস্তুতি

নেপোলিয়ন বলপূর্বক প্রাশিয়া হইতে কুড়ি হাজার সৈন্য যোগাড় করিলেন এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে কতক কতক সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিলেন।

মস্কো অভিযান, ১৮১২ (**Moscow Campaign, 1812**): নেপোলিয়ন তাঁহার এক বিরাট বাহিনী লইয়া মস্কো অভিযানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পতনের সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ এইভাবে গৃহীত হইল। ২০০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া নেপোলিয়ন জুন মাসের ২৪-২৬ (১৮১২) তারিখ টিলজিট্-এর নিকট নিমেন নদী অতিক্রম করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পূর্বে এই টিলজিট্ নামক স্থানেই নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে আমৃত্যু বন্ধুত্বের শর্তে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। রুশ সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। পশ্চাদপসরণের কালে তাহারা নেপোলিয়নের সৈন্যদল ব্যবহার করিতে পারে এইরূপ কোন কিছুই ফেলিয়া রাখিয়া গেল না। এইখানেই সর্বপ্রথম 'পোড়ামাটি নীতি' (Sco ched earth policy) অবলম্বন করা হয়। অবশেষে বোরোডিনো (Borodino) নামক স্থানে রুশ সেনাপতি কুটুসফ্ (Kutusoff) নেপোলিয়নকে বাধা দিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে নেপোলিয়ন মস্কো নগরী দখল করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮১২)। তিনি ভাবিলেন সমগ্র রাশিয়াই তাঁহার পদানত হইয়াছে। তিনি সাগ্রহে আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে আত্মসমর্পণসূচক প্রস্তাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিটার্সবার্গ হইতে কোন প্রস্তাবই আসিল না।

মস্কো অভিযান: পতনের সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ

রাশিয়ার 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন

মস্কো প্রবেশ (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮১২)

---

* "Factories were idle, men unemployed, prices daily rising". Hoyland, p. 227.

অক্টোবর মাসে শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন তাঁহার সেনাবাহিনীকে মস্কো ত্যাগের আদেশ দিলেন (অক্টোবর ১৯, ১৮১২); কারণ ফ্রান্স প্রাশিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে এত দূরবর্তী দেশে বেশী কালক্ষেপ করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। ইহা ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে চতুর্থ ইওরোপীয় শক্তিসংঘ গঠনের প্রস্তুতির সংবাদ এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বিরোধ দেখা দিবার ফলে প্রশাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এই খবরও তিনি পাইয়াছিলেন।

মস্কো ত্যাগের আদেশ (অক্টোবর ১৯, ১৮১২)

রাশিয়া হইতে ফিরিবার পথে শীতের প্রকোপ, অনাহার, কোসাক্ গেরিলাবাহিনী ও বন্যজন্তুর সম্মিলিত আক্রমণে নেপোলিয়নের হাজার হাজার সৈন্য পথিমধ্যে প্রাণ হারাইল।* অবশেষে যখন তাঁহার বিশাল বাহিনী রুশ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতে উদ্যোগ করিল তখন রুশ গোলন্দাজদের আক্রমণে অবশিষ্ট সৈন্যের অনেকেই প্রাণ হারাইল। মুষ্টিমেয় সৈন্য (২০ হাজার) সহ নেপোলিয়ন ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়াই পুনরায় সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোযোগ দিলেন।

অনাহার, শীত, কোসাক্ আক্রমণ

সীমান্তে রুশ গোলন্দাজদের আক্রমণ

মুক্তি-সংগ্রাম (The War of Liberation): নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সমগ্র ইওরোপে এক উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করিল। পেনিনসুলার যুদ্ধের সময় হইতেই প্রাশিয়ায় এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়ন প্রাশিয়া হইতে যে সৈন্যবাহিনী মস্কো অভিযানের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই বাহিনীর সেনানায়ক ইয়র্ক (York) এবং জার আলেকজাণ্ডার এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া সমগ্র ইওরোপকে নেপোলিয়নের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। জার্মানির অন্যান্য অংশ হইতেও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার প্রস্তাব আসিতে লাগিল। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মান জাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আবেদন জানাইলেন। সমগ্র দেশের ছাত্র, অধ্যাপক, রাজন্যবর্গ, খনি, কারখানা ও কৃষি-শ্রমিকগণ সেনাদলে ভর্তি হইলেন। এমন কি, নারীগণও নিজেদের গহনা প্রভৃতি এই জাতীয় বাহিনী গঠনের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য অকাতরে দান করিলেন। নেপোলিয়নকে এখন কেবল বিরোধী সৈন্যদলের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে হইল না—এক নবচেতনা, এক বিরাট জাগরণের বিরুদ্ধেও যুঝিতে হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ হইতে ইওরোপের মুক্তির প্রস্তুতি

প্রাশিয়ার জাগরণ

চতুর্থ শক্তিসংঘ স্থাপন

---

* "Cossacks, wolves, starvation, and frost made havoc at will upon the fleeing mob." Hoyland, p. 229.

অস্ট্রিয়া মিলিতভাবে ইওরোপের চতুর্থ শক্তিসংঘ (Fourth Coalition) স্থাপন করিল (আগস্ট, ১৮১৩)।

এইভাবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির পর যখন যুদ্ধ শুরু হইল তখন রাশিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী সেনাপতি ব্লুকারের অধীনে সাইলেশিয়া হইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। উত্তর দিকে সুইডেনের এক সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দক্ষিণ দিক হইতে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী ড্রেসডেনের দিকে ধাবিত হইল। ড্রেসডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য জয়লাভ (আগস্ট, ১৮১৩)। কিন্তু এই জয়লাভের সুযোগ গ্রহণ করিবার মত শক্তি তাঁহার আর ছিল না। চতুর্দিকেই তাঁহার সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ফ্রান্সের আগ্রাসী নীতির ফলে অর্থনৈতিক, সামরিক এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর যে চাপ পড়িয়াছিল, তাহাতে সর্বত্র এক নেপোলিয়ন বিরোধী মনোবৃত্তি ও প্রতিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া লাইপ্‌জিগ (Leipzig)-এর যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন (অক্টোবর, ১৮১৩)। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সৈন্য যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে ইওরোপীয় 'জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ' (Battle of the Nations) নামে বর্ণনা করা হয়।

নেপোলিয়ন চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত

লাইপ্‌জিগ-এর যুদ্ধঃ নেপোলিয়নের পরাজয় (১৮১৩)

লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। বেভেরিয়া, মেক্লেনবার্গ, ওয়েস্টফেলিয়া, কনফেডারেশন অব্‌ দি রাইন বা রাইনের রাজ্যসংঘ প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বাল্টিক সাগরতীরস্থ শহরগুলি ফ্রান্সের সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইল এবং রাইন নদীতীরস্থ স্থানগুলি প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল। ডেনমার্ক ইওরোপীয় শক্তিসংঘের সহিত এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করিল, কিন্তু হল্যাণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অরেঞ্জ পরিবারের নেতৃত্বে এক স্বাধীন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল।

লাইপ্‌জিগ-এর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলাফল

সেই সময় হইতে নেপোলিয়ন এবং তাঁহার দুই সহকারী জেনারেল মর্টিয়ার (Mortier) ও মার্মো (Marmont) আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ চলাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তে নিজ রাজধানী রক্ষার কার্যে মনোযোগ দিলেন। সকল প্রকার সুপরামর্শ উপেক্ষা করিয়া নেপোলিয়ন যুদ্ধের পন্থাই অনুসরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু ইওরোপের সম্মিলিত শক্তি প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তখন তাঁহার আর ছিল না। ক্রমে প্যারিস নগরী আক্রান্ত হইল। প্যারিসের পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। প্যারিস

নেপোলিয়নের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধনীতি

প্যারিস নগরী আক্রান্ত

নগরী শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ফরাসী সিনেট ও আইনসভা নেপোলিয়নের পদত্যাগ দাবি করিল (এপ্রিল ২, ১৮১৪)। নির্বান্ধব, পরাজিত সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই (মতান্তরে ১৩) এপ্রিল রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং মিত্রপক্ষের অপরাপর মিত্রবর্গ এবং নেপোলিয়নের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে, ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন : একমাত্র আলেকজাণ্ডারের উদার মনোবৃত্তি এবং মানবতাবোধের ফলে নেপোলিয়নের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তগুলি নেপোলিয়নের মর্যাদার হানিকর হইতে পারে নাই।* নেপোলিয়নের প্রতি সেই দিন সমবেদনা জানাইবার মত বেশী লোক ফ্রান্সে ছিল না। একমাত্র নেপোলিয়নের অধীন সৈন্যগণই সেই দিন তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল।†

নেপোলিয়নের প্রথমবার সিংহাসন ত্যাগ : এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত (এপ্রিল ১১, ১৮১৪)

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন : 'একশত দিবসের রাজত্ব' (Napoleon's Return : The Hundred Days) : নেপোলিয়নকে ইতালির পশ্চিম উপকূলে এল্‌বা নামক দ্বীপে নির্বাসিত করিয়া ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গ ভিয়েনা সম্মেলনে (Congress of Vienna) সমবেত হইলেন (১৮১৪)। নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য কিভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করা হইবে ইহা লইয়া তাঁহারা পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভিয়েনা সম্মেলন

---

* Agreement :

Art I. His Majesty the Emperor Napoleon renounces himself, his successors··· all rights of sovereignty and dominion as well in the French Empire···

Art II. Their Majesties the Emperor Napoleon and Empress Marie Louise shall retain their titles and rank. The mother, brothers···of the Emperor shall also retain, wherever they reside, the titles of the Princes of the Emperor'sfamily,

Art III. The island of Elba, adopted by his Majesty the Emperor Napoleon as his place of residence shall form during his life a separate principality which shall be possessed by him in full sovereignty and property.

There shall besides be granted···to the Emperor Napoleon an annual revenue of 2,000,000 francs···in the great book of France. *Ibid*, p. 727.

†নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে বিদায়ের কালে এক চিঠিতে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি যোসেফাইনকে কখনও ভুলিবেন না, জানাইয়াছিলেন। কন্‌স্ট্যাণ্ট্ নামে যে-লোকটি তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ করিত তাহার এবং রুস্তম নামে তাঁহার এক মামেলুক দেহরক্ষীর নিকট হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। যে সেনাবাহিনী তখনও তাঁহার সঙ্গে এবং তাঁহার অনুরক্ত ছিল তাহাদিগকে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"Soldiers, I bid you farewell. For twenty years we have been together, your conduct has left nothing to desire···With you and the brave men who still are

(contd.)

নেপোলিয়ন যখন তাঁহার সৈন্যদলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি পদত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন ব্যাপারেই আমি নতি স্বীকার করি নাই।"* এই উক্তির মধ্যেই ভবিষ্যতে তাঁহার ফ্রান্সে ফিরিয়া আসার ইঙ্গিত ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনার সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে এক সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। এদিকে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। নেপোলিয়নের পদত্যাগের পর ফ্রান্সের বুরবোঁ পরিবারের অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'ইমিগ্রি' অর্থাৎ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের ঔদ্ধত্যের ফলে অষ্টাদশ লুই-এর উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার সুফল বিনষ্ট হইল। যুদ্ধকারী হাজার হাজার ফরাসী সৈন্য দেশে ফিরিয়া নেপোলিয়নের অধীনে তাহাদের যুদ্ধজয়ের দিনগুলির কথা ভাবিয়া পুনরায় যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কারণ যুদ্ধ করা তাহাদের একপ্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়নের নাম ফরাসী দেশের প্রতি গৃহে সসম্মানে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুরবোঁ-শাসন সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বিপ্লবের সুফলগুলি বুরবোঁ রাজগণের অধীনে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়নের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত

অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন লাভ

নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা

এদিকে নেপোলিয়ন মে ৩, ১৮১৪ তারিখে এলবা দ্বীপে পৌঁছিলেন এবং পরের দিন সকালে শহরে প্রবেশ করিলেন। কয়েক দিন পূর্বেও এলবার ১২,০০০ অধিবাসী নেপোলিয়নকে যুদ্ধামোদী, শান্তির শত্রু বলিয়া তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে বিশাল পরিমাণ অর্থ এই ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিলে দ্বীপের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত ভাবিয়া তাহারা নেপোলিয়নকে সম্রাটের উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে স্বাগত জানাইল এবং তথাকার গবর্ণরের বাসস্থানে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া গেল। সম্রাটসুলভ জীবনযাত্রার ধারা, দেহরক্ষী, চারিশত সৈন্য, গাড়ী, ঘোড়া, ভৃত্য, প্রভৃতি এলবা দ্বীপে এক নূতন জীবনপ্রবাহ আনিল।

নেপোলিয়নের এলবা দ্বীপে আগমন

faithful, I might have carried on a civil war, but France would be unhappy. Be faithful to your new king, be obedient to your new commanders and desert not our beloved country.

"Do not lament my lot. I will be happy when I know that you are so. I might have died [নেপোলিয়ন পরাজয়ের পর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।] ...if I consent to live it is still to promote your glory..."

* "I abdicate ; I yield nothing"—Napoleon. Vide, Riker, p. 371.

ফরাসী সরকার হইতে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আসিল না। নেপোলিয়নের সঙ্গে কয়েক মিলিয়ন ফ্রাঁ'র সোনা-রুপা ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা দ্বারা খরচপত্র চলিতে লাগিল। কিন্তু এক বৎসরের অধিককাল তাহাতে ব্যয়-সংকুলান সম্ভব হইবে না, সেই চিন্তা স্বভাবতই নেপোলিয়নের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

ফরাসী সরকার কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ করিয়া অর্থপ্রেরণ বন্ধকরণ

ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ পেঁছিতে লাগিল যে, ফ্রান্সে সেনাবাহিনী প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকরা পুনরায় সামন্তদের অত্যাচার শুরু হইবে এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার স্থলে ক্যাথলিক ধর্মাচরণ বাধ্যতামূলক হইয়াছে, জেকোবিনগণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সর্বোপরি ভিয়েনা কংগ্রেসের সদস্যগণ নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া আরও কোন দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

ফ্রান্সের পরিস্থিতি সম্পর্কে নেপোলিয়নের নিকট বিশদ সংবাদ

আর কালবিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করা স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একখানা দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ (Brig) এবং চারিখানা ছোট জাহাজও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এলবা দ্বীপে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য যে-সকল সৈন্য রাখা হইয়াছিল নেপোলিয়ন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মোট এক হাজার পঞ্চাশ জন (কাহার কাহারও মতে প্রায় ১৬০০) সৈন্যসহ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়নকে বাধাদানের জন্য যে-রাজকীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইল তাহাদের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইয়া নেপোলিয়ন বলিলেন, "সৈনিকগণ, তোমাদের কেহ যদি তোমাদের সম্রাটকে হত্যা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা অনায়াসেই করিতে পার। আমি তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছি।"* নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া সৈন্যগণ তাঁহার বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন মার্শাল নে'কে তাঁহার পক্ষে যোগ দিতে জানাইলে মার্শাল নে তাঁহার অধীন সৈন্যদের স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, বুরবোঁরাজ অষ্টাদশ লুইয়ের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসী সৈন্যের সর্বেসর্বা, তিনিই এখন হইতে ফ্রান্সে রাজত্ব করিবেন। সৈন্যগণ নেপোলিয়নের জয়ধ্বনি দিয়া নে'র আদেশ পালনে প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ন যখন প্যারিস নগরীর নিকটবর্তী হইলেন তখন মার্শাল মাইকেল নে (Ney) তাঁহার পক্ষ অবলম্বন

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন (১লা মার্চ, ১৮১৫)

অষ্টাদশ লুই-এর সেনাবাহিনীর নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান

মার্শাল নে-র নেপোলিয়নের পক্ষ অবলম্বন

* "On approaching the first large body of royalist troops sent to oppose him, Napoleon advanced towards them alone, and cried : Soldiers, if there is one among you who wishes to kill his emperor, he can do so : here I am." Vide, Hoyland, p. 239.

করিলেন। পরিস্থিতির এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা

নেপোলিয়ন এইবার স্বৈরাচারের পরিবর্তে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে একদল মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। একটি অভিজাত সভা ও একটি জাতীয় প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হইল। বিচারপতিগণ অবশ্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন। লা-ভেণ্ডি নামক স্থানে রাজতন্ত্রের সমর্থনে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপোলিয়ন এই বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট উদারতা দেখাইলেন।

প্রধান সমস্যা ইওরোপীয় শক্তি-গুলিকে প্রতিহত করা

কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল ইওরোপের বিভিন্ন দেশের যুগ্ম শক্তিকে পরাজিত করা এবং ফ্রান্সকে রক্ষা করা। ইতিমধ্যে ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ নেপোলিয়নকে আইনের নিরাপত্তা হইতে বহিষ্কৃত (outlaw) বলিয়া—অর্থাৎ তাঁহার জীবননাশ অপরাধ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, এই ঘোষণা করিলেন।

ইওরোপীয় বাহিনীর বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উপস্থিতিতে ভীত হইয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলির সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। লোরেন-এর দিকে এক লক্ষ সত্তর হাজার রুশ সৈন্য, ইতালির দিক হইতে অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার যুগ্মবাহিনীর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, 'লীজ' (Liege) নামক স্থান হইতে সেনাপতি ব্লুকার-এর অধীনে এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য এবং এক লক্ষ সৈন্যের ইঙ্গ-ওলন্দাজ বাহিনী ব্রাসেলস্ হইতে ফ্রান্স আক্রমণে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম বেলজিয়াম অভিমুখে মাত্র এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন।

নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

জেনারেল সাউল্ট ছিলেন তাঁহার সৈন্য-সংগঠক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা কয়েক লক্ষে পরিণত হইল। ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশ হইতে সৈন্য আসিয়া তাঁহার বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল।

লিঞ্জি ও কোয়াটার ব্রাস-এর যুদ্ধ ঃ নেপোলিয়নের জয়লাভ

ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ভাবিতে পারেন নাই যে, তখনও নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লিঞ্জি (Lingy) নামক স্থানে মাত্র ৬৮ হাজার ফরাসী সৈন্য ৮৭ হাজার প্রাশিয়ান সৈন্যকে পরাজিত করিল। প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুকার এই যুদ্ধে আহত হইলেন। ঐদিনই সেনাপতি নে (Ney), কোয়াটার ব্রাস (Quatre Bras)-এর যুদ্ধে ইঙ্গ-বেলজিয়ান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন।

নেপোলিয়নের সামরিক ভুল

কিন্তু নেপোলিয়ন প্রাশিয়ান ও ইংরেজবাহিনী যাহাতে একত্রিত না হইতে পারে সেইদিকে তেমন মনোযোগ না দিয়া মারাত্মক ভুল করিলেন।

এদিকে সেনাপতি ওয়েলিংটন ওয়াটারলু নামক স্থানে এক সুরক্ষিত প্রান্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওয়াটারলু'র প্রান্তরে পৌঁছিতে নেপোলিয়নের একদিন বিলম্ব হইল। যুদ্ধের শ্রান্তির ফলেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। পূর্বরাত্রে (১৭ই জুন) বৃষ্টির ফলে পরের দিন (১৮ই জুন, ১৮১৫) যুদ্ধ আরম্ভ হইতে দেরী হইল। ঐদিন প্রায় দ্বিপ্রহরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে জয়লাভ যখন একপ্রকার নিশ্চিত, তখন প্রাশিয়ার জেনারেল ব্লুকার ইংরেজ পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন। ইহার ফলেই নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল। নেপোলিয়নের পঁচিশ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। আর অপর পক্ষের মৃতের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার তিনশত ষাট।

ওয়াটারলু'র যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পরাজয়

ওয়েলিংটনের অধীনে ব্রান্সউইকের ডিউকের পুত্র ফ্রেডারিক, ডরনবার্গ, অলটেন, কেম্পট, সমারসেট, আক্সব্রিজ, হিল, পনসনবি, ও পিকটন প্রভৃতি দুর্ধর্ষ সামরিক পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, পক্ষান্তরে ফ্রান্সের সেনাপতি মাইকেল নে'র অধীনে ছিলেন গ্রাউচি, জেরার্ড, ভ্যান্ডেমি, ক্যামব্রোন, কেলারম্যান, রীলি, লবো, এবং সর্বোপরি নেপোলিয়ন। ইংরেজ পক্ষে প্রাশিয়ার জেনারেল ব্লুকার বুলো, জীটেন, এবং পার্চ প্রভৃতি সামরিক অফিসারদের লইয়া যোগ দিয়াছিলেন।

দুই পক্ষের সামরিক নেতৃবৃন্দ

নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্যারিস নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফ্রান্সে পৌঁছিয়া নেপোলিয়ন পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে সেনাপতি গ্রাউচি লাওন নামক স্থানে ত্রিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন প্যারিসে উপস্থিত হইলে অসংখ্য সাধারণ লোক এলিসি প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইয়া নেপোলিয়নের জয়ধ্বনি দিতে লাগিল এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তাহাদিগকে দিতে বলিল যাহাতে তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে পারে। এদিকে তখন প্রতিনিধি সভা (Chamber of Representatives) নেপোলিয়নের পদত্যাগ দাবি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট নামক এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন : "এই সকল লোককে আমি না দিয়াছি অর্থ, না দিয়াছি সম্মান। আমার কাছে তাহারা কোনভাবেই ঋণী নহে। ইহাদের সাহায্যে আমি ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা (Chamber of Representatives) মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি ফ্রান্সকে রক্তস্নান করাইবার জন্য এলবা হইতে আসি নাই।"

নেপোলিয়নের পক্ষে জনসমর্থন

ফরাসী জনসাধারণের রক্তপাতে নেপোলিয়নের অনিচ্ছা

প্রতিনিধি সভা উপস্থিত পরিস্থিতিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুগ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে না করিয়া নেপোলিয়নের পদত্যাগ দাবি করাই স্থির করিল। নেপোলিয়ন সেই দাবি মানিয়া লইলেন। একমাত্র কারনো (Carnot) শেষ অবধি ইহার বিরোধিতা করিলেন এবং নেপোলিয়নের প্রতি সমবেদনায় তিনি শিশুর মত অসহায়ভাবে কাঁদিয়াছিলেন। ২২শে জুন, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন দ্বিতীয় এবং শেষবারের মত সম্রাট-পদ ত্যাগ করিলেন। নেপোলিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনায় কাটাইতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইভাবে প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। কিন্তু যে-জাহাজে করিয়া তাঁহার যাইবার কথা ছিল উহার গতিপথ ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ অবরোধ করিলে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ জাতির স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও উদারতার উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটিশ জাহাজ বেলারোফোন (Bellerophon) তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গেলে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে পশ্চিম আফ্রিকা হইতে ১২০০ মাইল দূরবর্তী সেণ্ট্ হেলেনা নামে এক ক্ষুদ্র ব্রিটিশ দ্বীপে কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও অনুচর, ভৃত্য ইত্যাদি লইয়া বসবাসের অনুমতি দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডে নেপোলিয়নকে রাখা ব্রিটিশ সরকার নিরাপদ মনে করিলেন না। মিত্র শক্তিবর্গের অপরাপর সকলে ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে 'নর্থাম্বারল্যাণ্ড' জাহাজ আগস্ট মাসের ৮ তারিখ (১৮১৫) নেপোলিয়ন ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া সেণ্ট্ হেলেনা (St. Helena) রওনা হইল। সেখানে ব্রিটিশ গবর্ণরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনের বাকী কয়েক বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু এতদিনের অভ্যস্ত কর্ম-জীবনের সব কিছু বন্ধ* হইয়া যাওয়ায়, নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ৫৩ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

দ্বিতীয়বার পদত্যাগ (জুন ২২, ১৮১৫)

সেণ্ট্ হেলেনা নির্বাসন

মৃত্যু : মে ৫, ১৮২১

নিয়তির চক্রে সমগ্র ইওরোপের অধীশ্বর শেষ পর্যন্ত সেণ্ট্ হেলেনার ঊষর পরিবেশের মধ্যে বন্দিদশায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের ও কার্যকলাপের ঐতিহাসিক মূল্য নেহাত কম ছিল না। তিনি একজন প্রকৃত দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিয়া ইওরোপের ইতিহাসে জনহিতৈষী সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনটিই ছিল

নেপোলিয়নের জীবনের ঐতিহাসিক মূল্য

* "How I have fallen ! I whose activity knew no limits, whose head never rested ! I am plunged into a lethargic stupor." Napoleon.

ইওরোপের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতীকস্বরূপ। মধ্যযুগীয় যাহা কিছু তখনও ইওরোপের জাতীয় জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বিনাশ সাধন করিয়া তিনি ইওরোপে সমতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক নীতিগুলির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধের ফলেও ইওরোপ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিল।*

মধ্যযুগীয় প্রভাব নাশঃ সমতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির বিস্তার

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of the downfall of Napoleon) :

নেপোলিয়নের পতনের কারণ তাঁহার চরিত্র ও নীতির ত্রুটির মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজ পতনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন। নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যেরূপ ত্রুটিহীন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, তাহা নেপোলিয়নের শেষ অবধি আর ছিল না। বিজয় গৌরবের উম্মাদনায় তিনি মানুষের শক্তির যে একটা সীমা আছে তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যাহাতে হাত দিবেন তাহাই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। তাঁহার এই অত্যধিক আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁহার পতনের জন্য দায়ী। ফ্রান্স ও ইওরোপের পক্ষে কি মঙ্গলজনক তাহা একমাত্র তিনিই অনুমান করিতে সক্ষম, ফরাসী জাতি বা ইওরোপবাসীর মতামত সে-বিষয়ে অবান্তর, এই ছিল তাঁহার ধারণা। ফলে ক্রমেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রত্যয় বাস্তবতাবর্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'Impossible is a word to be found in fool's dictionary'—এ-কথা তিনিই বলিয়াছিলেন।

চরিত্র ও নীতির ত্রুটির মধ্যে পতনের কারণ :

(১) নেপোলিয়নের অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভীতি প্রদর্শন এবং অনুগ্রহ বিতরণের দ্বারা নেপোলিয়ন ইওরোপের বহু রাজাকেই পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই উপায়ের কোনটিই স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের উপযুক্ত পন্থা ছিল না। নেপোলিয়ন তাঁহার যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রশাসনিক দায়িত্বও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জাতি, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, চরিত্রগত গুণ সকল দিক দিয়া পৃথক অঞ্চলের জনসমষ্টি হইতে স্বাভাবিক কারণেই তিনি

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে আনুগত্য-বন্ধনের অভাব : ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিতরণ

* "The Europe of the nineteenth century bore Napoleon's marks, as he had desired it should, in his laws and institutions, in a shaken feudalism, in the beginnings of the principle of an open career, as he neither desired nor foresaw, in a great development of the spirit of the nationality". Holland Rose.

আনুগত্য লাভে সমর্থ হন নাই। বিদেশী শাসকের প্রতি আনুগত্য তাহাদের থাকিবে না, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে। নেপোলিয়নের বিশাল সাম্রাজ্য স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর গড়িয়া উঠে নাই। আনুগত্যহীন বিশাল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যাকে কেবলমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা স্ববশে রাখা সাময়িক কালের জন্য সম্ভব হইলেও ইহা স্বভাবতই বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যও তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(৩) স্পেনের প্রতি অন্যায় আচরণ স্পেনীয়দের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত—'স্পেনীয় ক্ষত'

স্পেনের উপর অধিকার বিস্তার করিতে গিয়া নেপোলিয়ন কেবলমাত্র নীতি-জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেন নাই, তিনি নিজ ভ্রাতাকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্পেনবাসীদের জাতীয়তাবোধ ও দেশ-প্রেমে আঘাত করিয়াছিলেন। তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই পেনিনসুলার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্পেনবাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাহাদের জাতীয় মর্যাদা-বোধ একদিকে যেমন নেপোলিয়নকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ, স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর জাতিকে পদানত রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি অপর দিকে সমগ্র ইওরোপকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মনোবল আনিয়া দিয়াছিল। নেপোলিয়ন নিজেই তাঁহার স্পেনীয় নীতিকে 'স্পেনীয় ক্ষত' (Spanish Ulcer) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম—পতনের অন্যতম প্রধান কারণ

নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাঁহার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম। টিলজিটের সন্ধির (১৮০৭) পর তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টিকে নিজ অদম্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। সমসাময়িক ইওরোপের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক হইতে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের মারাত্মক ফলাফলের কথা তিনি চিন্তা করেন নাই। এই অর্থনৈতিক অবরোধ সফল করিয়া তুলিতে হইলে যে-পরিমাণ নৌবহরের প্রায়াজন ছিল নেপোলিয়নের তাহা ছিল না। স্বভাবতই তিনি বলপূর্বক এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া ইওরোপীয় দেশগুলিকে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। তাহাদের কারখানাগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল, বেকার-সমস্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানিতে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় ইওরোপীয় দেশসমূহে নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক অবরোধের বিরোধিতা শুরু হইল। এই সকল কারণে একদিকে যেমন গোপনে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিল অপর দিকে নেপো-লিয়নের প্রতি বিদ্বেষও তেমনি বাড়িয়া চলিল। এই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে গিয়া নেপোলিয়ন ওল্ডেনবার্গ দখল করেন এবং তাহাতে জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তোষের সৃষ্টি করেন। এইভাবে সমগ্র ইওরোপে নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্যের শৈথিল্য দেখা দিল। ফলে মিত্র শক্তিগুলিও বিরোধী হইয়া উঠিল। পোপের রাজ্য দখল, পোপের

পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার

প্রতি দুর্ব্যবহার, পোর্তুগাল দখলের ব্যর্থতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর জন্যই দায়ী ছিল কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম।

(৫) স্পেনের জাতীয় জাগরণ—প্রাশিয়া ও রাশিয়ায় বিস্তার লাভ

স্পেনে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল কেবলমাত্র স্পেন রাজ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমে জার্মানি ও রাশিয়ায়, এক কথায় সমগ্র ইওরোপে এই জাতীয়তাবোধ বিস্তৃত হইল। জার আলেকজাণ্ডার ক্রমেই জনমতের চাপে এবং নিজ বিতৃষ্ণাবশত নেপোলিয়ন তোষণ-নীতি ত্যাগ করিয়া কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের বিরোধিতা শুরু করিলেন। রাশিয়ার সাহায্য ভিন্ন এই অর্থনৈতিক অবরোধ বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন রাশিয়ারও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন।

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধ

'ওয়ারসো ডাচি' (Warsaw Duchy) সৃষ্টি করাও নেপোলিয়নের পক্ষে অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল। ইহার ফলে টিলজিট্-এর সন্ধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া ক্রমেই ফ্রান্স বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে নেপোলিয়নের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাশিয়া ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে 'মুক্তি-যুদ্ধ' (War of Liberation) শুরু করিল।

(৬) ব্রিটিশ নৌশক্তির সাফল্য ঃ নীলনদের যুদ্ধ, ট্রাফালগারের যুদ্ধ, পোর্তুগালকে সাহায্য, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ব্যর্থকরণ

ইংলণ্ডের বা ব্রিটিশ নৌশক্তি ছিল নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। নীলনদের যুদ্ধে ও ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংলণ্ড নেপোলিয়নের নৌশক্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। পোর্তুগালকে সাহায্য দান, স্পেনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমকে ব্যর্থকরণ প্রভৃতি সকল কাজেই ব্রিটিশ নৌবহর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

(৭) মস্কো অভিযানের অদূরদর্শিতা

নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া মস্কো অভিযান করিতে গিয়া তাঁহার পতনের পথ সহজ করিয়াছিলেন। বিনা বাধায় মস্কো পৌঁছিবার পর মধ্য-ইওরোপ হইতে বহু দূরে অবস্থিত মস্কো নগরীতে অবস্থান করা সমীচীন নহে মনে করিয়া তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যদি যথেষ্ট দূরদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে তিনি মস্কো অভিযানের বাসনা ত্যাগ করিতেন। এই অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি ও মর্যাদা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল এবং তাঁহার পতনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৮) ফরাসী জাতির শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা

দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া শ্রান্ত ফরাসী জাতি স্বভাবতই শান্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে নেপোলিয়ন জনপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-নীতি সকলের সমর্থন লাভ করে নাই।

সর্বশেষে ওয়াটারল্যু'র যুদ্ধের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। লিঞ্জি এবং কোয়াটার ব্রাসের যুদ্ধের পর শত্রু-পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া নেপোলিয়ন ব্লুকার ও ওয়েলিংটনের সেনাবাহিনী মিলিত হইবার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। এই সামরিক ত্রুটির জন্য নেপোলিয়নের ঠিক বিজয়ের মুহূর্তেই ব্লুকারের সহায়তায় ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(৯) সামরিক ভুল ঃ ওয়াটারল্যু'র যুদ্ধে পরাজয়

ইতিহাসে নেপোলিয়নের (১ম) তাৎপর্য (Significance of Napoleon in History)ঃ ইতিহাসে নেপোলিয়নের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে নানাবিধ মত এবং মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সকল রক্ষণশীল ব্যক্তি নেপোলিয়নের পতন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা নেপোলিয়নের কার্যকলাপ এক অনন্যসাধারণ অথচ ক্ষতিকারক ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ক্ষতি ইওরোপবাসীর কয়েক প্রজন্মের পক্ষে পূরণ করা সহজ-সাধ্য হইবে না বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহারা নেপোলিয়নকে একজন কঠোর জেকোবিন (Jacobin) এবং গণতন্ত্র ও বিপ্লবের ভুঁইফোড় নেতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই নেতৃত্ব করিতে গিয়া তিনি ফ্রান্সের স্থিতিশীল যাবতীয় ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করিয়াছেন এবং ইওরোপের প্রচলিত শৃংখলা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনাশ করিয়াছেন।

রক্ষণশীলদের মত

যাঁহারা ইতিহাসের দিক হইতে নেপোলিয়নের কার্যকলাপ বিচার করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, নেপোলিয়ন ইওরোপকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা (medieval barbarism) হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের যে আগ্রাসী যুদ্ধ-নীতি, তাহা বীরত্ব, ক্রুসেড্ নামক ধর্মযুদ্ধের ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং হত্যা, রক্তক্ষয়ের সুদীর্ঘ কাহিনীই নহে, ইহা বিপ্লবের আগুনে পবিত্রীকৃত এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টাও বটে। পুরাতন রাজ্যসীমা মুছিয়া দিয়া, সামন্ত-প্রথা-প্রসূত সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া, অভিজাত শ্রেণী, বাণিজ্যিক সংঘ (trade guild), ধর্মের প্রাধান্য প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিয়া নেপোলিয়ন এক নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক বিচারে নেপোলিয়ন মধ্যযুগীয় বর্বতার অবসান— নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলনকারী

তৃতীয় এক মতবাদে নেপোলিয়নের কার্যকলাপের মূল তাৎপর্য হইল উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্য; উদাহরণস্বরূপ ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য এবং জার্মানির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধন। হল্যাণ্ডে পূর্বেকার অভিজাততন্ত্রের শাসনের স্থলে বর্তমান উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার সূচনা নেপোলিয়নের কার্যাবলীর অন্যতম ফলশ্রুতি। সার্বিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড প্রভৃতির স্বাধীনতা-স্পৃহা নেপোলিয়নের ইওরোপীয় বিস্তার নীতিরই পরোক্ষ ফল।

তৃতীয় এক মতবাদ ঃ ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা ও ঐক্য, হল্যান্ডের উদার শাসনব্যবস্থা, সার্বিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ডের স্বাধীনতা-স্পৃহা— নেপোলিয়নের অবদান

ইংরেজ জাতির চক্ষে নেপোলিয়ন ছিলেন স্বৈরাচারী। তিনি কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন, এবং তিনি কোন অপরাধ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি ছিলেন জনসাধারণের হত্যাকারী, দেশের পর দেশের শাসনব্যবস্থা ধ্বংসকারী এবং পঞ্চম শতকের হূণ নেতা এটিলার সহিত তুলনীয়। কিন্তু ঝড়ের বেগে যেমন বহু কিছু বিধ্বস্ত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি ঝড়ের সঙ্গে বহু বীজও বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ নেপোলিয়নের বিধ্বংসী কীর্তির ফলে ইংলণ্ডে কতকগুলি সুফলও ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী বহুলাংশে বিধ্বস্ত হইবার ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে সিংহল, উত্তমাশা অন্তরীপ, অস্ট্রেলিয়া অধিকার সম্পূর্ণ করা এবং মারাঠা শক্তিকে পরাভূত করা সম্ভব হইয়াছিল।* নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহরের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে বহু লেখক নেপোলিয়নের কার্যকলাপের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়াছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংরেজদের পক্ষে নেপোলিয়নের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য

ফ্রান্সের দিক দিয়া বিচার করিলে নেপোলিয়নের শেষ পর্যায়ের কর্মপন্থার ফলে ফ্রান্স রাইন সীমান্ত হারাইয়াছিল। রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমা প্রসারিত করা ছিল ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান চিরাচরিত উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী যুদ্ধের প্রথম দিকে সেই উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষতি সত্ত্বেও নেপোলিয়নের কার্যকলাপ হইতে ফ্রান্স নানাভাবে লাভবান হইয়াছিল। (১) নেপোলিয়ন বিপ্লবের অবাস্তবতা হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া রাজনৈতিক দলের প্রভাবের ঊর্ধ্বে শাসনব্যবস্থাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২) তিনি রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। (৩) ফ্রান্সের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বিপ্লব শুরু হইবার পর যখন পুনঃ পুনঃ সাংবিধানিক পরীক্ষা চলিতেছিল এবং ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল সেই সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণ চাহিয়াছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতায় তাহারা তখন বীতশ্রদ্ধ। নেপোলিয়ন সেই আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও শান্তি দিয়াছিলেন। (৪) নেপোলিয়ন সামাজিক ক্ষেত্রে

ফ্রান্সের পক্ষে নেপোলিয়নের তাৎপর্য

ফ্রান্সের ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের অবদান

* "...which gave us Ceylon and the Cape of Good Hope, promoted the occupation of Australia, and led to the destruction of the Maratha power. The sea-power of France broken by the disorders of the Revolution, was finally shattered by the wars of the Empire. So impressive was the aggrandisement of England beyond the seas that some writers have regarded the augmentation of the British Empire as the most important result of Napoleon's career." *The Cambridge Modern History*, vol. ix, pp. 769-71.

এবং আইনের চক্ষে সমতা স্থাপন করিয়াছিলেন। (৫) নেপোলিয়ন আইন-বিধি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এই সকল অবদানের কথা নেপোলিয়নের শত্রুপক্ষও স্বীকার করিয়া থাকে। বস্তুত কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দেশ এত বেশী উপকৃত হয় নাই।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জনসাধারণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের, বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে স্থান, ব্যক্তি, জাতি, জন্ম, কোন কিছুরই কোন বিশেষ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। সেই শাসনব্যবস্থা ছিল সমদর্শী, সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত শাসন-নীতি এবং নেপোলিয়নের প্রশাসনাধীনে যে-সকল ব্যক্তি কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দক্ষতার ঐতিহ্য পরবর্তী কালে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল।*

কেন্দ্রীভূত শাসন—সমদর্শী, সুদক্ষ

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের জয়লাভের কারণ (Causes of the success of the European Powers against Napoleon): নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের জয়লাভের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, ইওরোপীয় শক্তিসংঘের মোট সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি ফরাসী সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি হইতে বহুগুণ বেশী ছিল।

(১) ইওরোপীয় বাহিনীর সংখ্যাধিক্য

দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন নিজ হস্তে সামরিক দায়িত্ব এমন-ভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন যে, নিম্নস্তরের সেনানায়কদের ও কর্মচারীদের পক্ষে দায়িত্ব লইয়া কাজ করিবার তেমন কোন অবকাশ ছিল না।

(২) নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী দায়িত্ব গ্রহণ নীতি

তৃতীয়ত, নেপোলিয়ন ক্রমাগত যুদ্ধের শ্রান্তি ও সৈন্যক্ষয় হেতু ড্রেসডেনের যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্বে লিগ্নি ও কোয়াটার ব্রাসের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি শত্রুপক্ষের অনুসরণ করেন নাই। ইহা ভিন্ন ব্লুকার ও ওয়েলিংটনের সৈন্য-বাহিনী একত্রে মিলিত হইবার বিপদ অনুধাবন করেন নাই এবং সেই পথও তিনি বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

(৩) সামরিক ত্রুটি

চতুর্থত, একথা সত্য যে, নেপোলিয়নের বিপক্ষে যে সামরিক নেতাগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহাদের সৈন্যও ফরাসী সৈন্য অপেক্ষা অধিক সমরকুশলী ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। নেপো-লিয়নের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে তাঁহারা এক দারুণ উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সামরিক ত্রুটি তাঁহারা

(৪) বিরুদ্ধ পক্ষের গভীর দেশপ্রেম

* Vide, *Ibid*, p. 771.

জাতীয়তাবোধের দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী সেই তুলনায় মানসিক দিক দিয়া ততটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল না।

সর্বোপরি, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের জয়লাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইংলণ্ডের বিশাল নৌবহর। ফ্রান্সের নৌবহর সেই তুলনায় দুর্বল ছিল। ফলে, একদিকে যেমন কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমকে অকার্যকর করিবার ব্যাপারে ব্রিটিশ নৌবহর সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে নীলনদের যুদ্ধে এবং ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফরাসী নৌশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া ইওরোপীয় মিত্রবর্গের জয়লাভের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

ব্রিটিশ নৌবহর

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the French Revolution) ঃ

ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতা উহার সামগ্রিক ফলাফলের বিচারেই বুঝিতে হইবে। ফরাসী জাতি এবং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উপর ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য ও প্রভাব কতটুকু, এই তাৎপর্য ও প্রভাব কি এমন সুদূরপ্রসারী যাহার জন্য ফরাসী বিপ্লবের আনুষঙ্গিক দুঃখ-দুর্দশা, হত্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন ছিল?

ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতা (?)

অভাব-অভিযোগ যখন গতানুগতিক সংস্কারের মাধ্যমে অর্থাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে দূর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। ফ্রান্সের অভাব-অভিযোগ বিবর্তনের (Evolution) মাধ্যমে দূর করা সম্ভব ছিল না বলিয়াই বিপ্লব (Revolution)-এর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আর বিপ্লব শুরু হইলে প্লাবনের কালে যেমন বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত সকলই প্লাবনের স্রোতে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও বহু বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই দুইয়ের একটি হইতে অপরটিকে বিপ্লবের কালে রক্ষা করিয়া বিপ্লবের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে উহা বিপ্লব না হইয়া বিবর্তনেই রূপান্তরিত হইত। বিবর্তনের মাধ্যমে ফরাসী জাতির অভাব-অভিযোগ যখন দূর হওয়া সম্ভব ছিল না, তখনই প্রয়োজন হইয়াছিল বিপ্লবের।

বিবর্তন ও বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা

যাহা হউক, ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা, তাৎপর্য ও প্রভাব শুধু ফ্রান্সের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র ইওরোপ, তথা পৃথিবীতে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপকে এক বিরাট প্লাবনের তরঙ্গের ন্যায়ই আঘাত করিয়াছিল। ফ্রান্স হইতে দূরত্বের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশের উপর এই বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতের তারতম্য ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই।

ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা, তাৎপর্য ও প্রভাবের বিস্তার

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রভাব

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ফরাসী জাতির মধ্যে স্থায়িভাবে স্থানলাভ করিয়াছিল। সামন্ত-প্রথার অবসান ঘটিয়া স্বাধীন কৃষক সমাজ এবং আংশিকভাবে কৃষক-মালিকানার (Peasant Proprietory) সৃষ্টি হইয়াছিল। সামন্ত বিচারালয়ের স্থলে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্থলে সীমিত হইলেও জনপ্রতিনিধিমূলক শাসন, অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। আইনের চক্ষে ব্যক্তি-মাত্রেরই সমতা স্থাপন করিয়াছিল। বিপ্লবের অবসানে বুরবোঁ রাজবংশ ফরাসী সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলে বিপ্লবের নৈতিক প্রভাব তাহাদের উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতকে ইওরোপে যে উদার-নীতির বিস্তার ও প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা ফরাসী বিপ্লবের-ই ফলশ্রুতি।

ফ্রান্স: (১) ফরাসী জাতির উপর স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্থায়ী প্রভাব, সামন্ত-প্রথার অবসান, স্বাধীন কৃষক-মালিকানার উদ্ভব

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটাধিকার, সভা-সমিতির অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ফরাসী দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রচারিত যে-নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ফ্রান্সে নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেগুলি ফরাসী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করিল। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা নামেমাত্রই স্বৈরাচারী রহিল, বস্তুত শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমেই গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা যে, ইওরোপের জনসাধারণ পুনরায় গ্রহণ করিবে না, এই উপলব্ধি ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত, উদার-নীতিরই ফল, বলা বাহুল্য।*

(২) রাজনৈতিক: ভোটাধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষিজীবীদিগকে জমির মালিকানা লাভের সুযোগ করিয়া দিবার ফলে ফ্রান্সের সমগ্র কৃষি-জমির পঞ্চাশ শতাংশ কৃষকদের মালিকানায় চলিয়া গিয়াছিল। জমির মালিকানা লাভের ফলে কৃষকগণ স্বাভাবিক ভাবেই রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। বুর্জোয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের সহিত তাহাদের মৈত্রী স্থাপিত হইলে প্রোলিট্যারিয়েটদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা হইতে কৃষক-মালিক সমাজ (Peasant Proprietors) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালের রাজা তথা রাষ্ট্রপ্রধান মাত্রেই একথা স্মরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদ ও ক্ষমতা জনসাধারণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছিল ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক প্রভাবের অন্যতম ফলশ্রুতি।

যুক্তিবাদের জ্ঞান বিস্তারের ফলে যেমন বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তেমনি ধর্মক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা দেখা দিয়াছিল। ধর্ম-সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ইচ্ছাধীনভাবে চলিবার স্বাধীনতা ইওরোপীয় দেশসমূহে ক্রমেই স্বীকৃত হইতে লাগিল।

(৩) ধর্ম: পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, ধর্মের স্বাধীনতা

---

* *A History of Europe*, **Schevill, pp. 466-67.**

(৪) সামাজিক ঃ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিলোপ ঃ আইনের চক্ষে সমতা, স্বাধীন কৃষক সমাজ, স্বাধীন শ্রমজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি

সামাজিক ক্ষেত্রে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা (privilege) বিলুপ্ত হওয়ায় সমাজ-জীবনে মানুষে ও মানুষে কোন পার্থক্য রহিল না। আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইল। বিপ্লবের সময়ে ভূ-সম্পত্তি যেভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল তাহার ফলে এক স্বাধীন কৃষক সমাজের সৃষ্টি হইল। সামন্ত-প্রথা চিরতরে দূর হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে শিল্পোন্নতি ঘটিল তাহাতে ক্রমেই ফরাসী শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইওরোপ ঃ
(১) নেদারল্যান্ড ন্যাপল্‌স্‌, জার্মানি, রাইন অঞ্চলের দেশগুলিতে সমতা, ধর্ম-সহিষ্ণুতার বিস্তারলাভ
২) ইওরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন-বিধির মূলনীতি গৃহীত

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ইওরোপের উপরও নানাভাবে প্রকাশ পাইল। নেপোলিয়নের আমলে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে আসিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে, বিশেষভাবে নেদারল্যান্ড, ন্যাপল্‌স্‌, জার্মানি, রাইন নদীর তীরবর্তী দেশগুলিতে সামাজিক সমতা, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন-বিধির (Code Napoleon) মূলনীতিগুলি এবং উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে লাগিল।

(৩) রাজনৈতিক ঃ ইতালি ও পোল্যান্ডে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

ইতালিতে বিজিত রাজ্যগুলি লইয়া একটি ইতালীয় রাজ্য গঠন করিয়া এবং পোল্যান্ডের একাংশ লইয়া 'গ্র্যান্ড ডাচি অব্‌ ওয়ারসো' গঠন করিয়া নেপোলিয়ন ইতালিবাসী এবং পোলদের (Poles) মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনুরূপ জার্মানির রাজ্যগুলি জয় করিয়া এবং সেগুলিকে লইয়া কন্‌ফেডারেশন অব্‌ দি রাইন গঠন করিয়া জার্মান জাতির মধ্যেও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন রাজনৈতিক স্বাধীনতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐ সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইওরোপের কোন দেশের জনসাধারণই ভোগ করিত না।

(৪) ইতালি ও জার্মানির ঐক্য এবং বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা - বিপ্লবের প্রভাব-প্রসূত ফল

কিন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ফলে বিপ্লবের আদর্শ ইওরোপবাসীদের মনের অন্তঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াছিল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নীতিই ছিল বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই দুই নীতিকে ভিত্তি করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্য, বল্‌কান দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছিল।

(৫) মানুষের উপর প্রভাব ঃ নূতন এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ধারণা

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ব্যক্তিবিশেষের উপরও প্রতিফলিত হইল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ধারণার দিক দিয়া মানুষ অধিকতর প্রগতিশীল হইয়া উঠিল। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া মানুষ যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন ধারায় চিন্তা করিবার শক্তি সে লাভ করিল।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে জীবনযাত্রা (Life of the French During the Revolution) : ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাতের কালে বাস্তিল দুর্গ জনতা কর্তৃক আক্রমণ ও পতনের সময় হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক দ্বিতীয় বার সম্রাট-পদ ত্যাগ—এই ছাব্বিশ বৎসরকাল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার দিক হইতে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষাও অধিক স্মরণীয় হইয়া আছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক আলোড়ন, নূতন নূতন সাংবিধানিক পরীক্ষা, প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গের অভ্যুত্থান, শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতির উন্নয়ন, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন প্রভৃতি সকল দিক হইতে বিচার করিলে এই ছাব্বিশ বৎসর ইওরোপের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

বাস্তিলের পতন হইতে নেপোলিয়নের শেষবার পদত্যাগ—ছাব্বিশ বৎসর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ

কৃষি ও কৃষকদের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা (১৭৮৯) কালে যে-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চারি বৎসর পরই উহার এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কৃষকদের এক বিশাল অংশ ছিল কৃষি-মজুর অর্থাৎ অপরের কৃষি-জমিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত অথবা মালিকের কৃষি-জমি চাষ করিয়া ফসলের অংশ ভাগ-চাষী হিসাবে ভোগ করা। অথচ চারি বৎসর পর (১৭৯৩) ফ্রান্সের কৃষি-জমির অর্ধেক কৃষকদের মালিকানাধীন হইয়া গিয়াছিল। জাতীয় সভা "সিভিল কন্‌স্টিটিউশন অব্‌ দি ক্লার্জি" (Civil Constitution of the Clergy) পাস করিয়া ফরাসী চার্চের যে-ভূ-সম্পত্তি সরকারের মালিকানায় স্থাপন করিয়াছিল সেই জমি কৃষকরা ক্রয় করিয়া জমির মালিক হইতে পারিয়াছিল। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিগণ জাতীয় সভায় তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাফল্য লাভে কতক ভীত হইয়া, আবার কেহ কেহ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তাহাদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারসমূহ ত্যাগ করিবার ফলে ভূমিদাস-প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ভূমিদাসগণের অনেকেই জমির স্বত্ব ক্রয় করিয়া জমির মালিক হইতে সমর্থ হয়। ফ্রান্সের সর্বাধিক সংখ্যক লোক ছিল কৃষক সম্প্রদায়-ভুক্ত। তাহাদের এই স্বাধীনতালাভ ছিল বিপ্লবের সর্বাধিক স্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ ফল। এই সকল কৃষক স্বাধীনতার স্বাদ পাইবার ফলে তাহারাই বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণেই তাহারা নেপোলিয়নকে সমর্থন করিয়াছিল, কারণ নেপোলিয়ন সামন্ততন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে বা কৃষকদিগকে পুনরায় জমির মালিকানাচ্যুত করিতে চাহিবেন না, এই বিশ্বাস তাহাদের ছিল। জমির মালিকানা তাহাদের হস্তগত হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সমর্থক হইয়া পড়িল। উইল ও এ্যারিয়েল ডুরান্ট (Will and Ariel Durant)-এর মতে ফরাসী কৃষকদের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তাহারা ক্রমে কৃষিক্ষেত্রেই তাহাদের শ্রম সীমাবদ্ধ রাখিল। শহরে, নগরে মজুর হিসাবে শ্রম করিয়া অর্থ রোজগারের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের তেমন না থাকায় শিল্পক্ষেত্রে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও

কৃষকদের অবস্থার উন্নতি

শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ কৃষির উন্নতি

জার্মানির তুলনায় পশ্চাৎপদ রহিয়া গেল। যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও ঐ দুই দেশের তুলনায় ফ্রান্স অনগ্রসর রহিল।

ভূমিহীন কৃষক, শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, খনি শ্রমিক এই সকল বিভিন্ন কাজে লিপ্ত সকলকেই দরিদ্রতম শ্রেণী বা প্রোলিটারিয়েট আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। 'গিল্ড' (Guild) বা উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সংঘ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে যে-কোন কাজ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। গিল্ডের ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন বা ব্যবসায়ে শ্রমিককে কাজ করাইবার নীতি তখন নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শহরের দরিদ্র শ্রমজীবীদের তখন সাঁকুলাৎ (sansculottes) বলা হইত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের আর্থিক অবস্থার কোন তারতম্য হয় নাই। তাহারা পূর্বেকার মতই অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বে যে-ভাবে শোষিত ও নিপীড়িত হইত সেই ভাবেই বিপ্লবের পরও কয়েক বৎসর অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের উত্থানের পর তাহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিতে থাকে, তাহারাও নেপোলিয়নকে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিতে অগ্রসর হয়। বুর্জোজি (Bourgeoisie) বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিদ্যা-বুদ্ধি ও সম্পদ, সকল দিক হইতেই যাজক, অভিজাত এবং প্রোলিটারিয়েটদের অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। চার্চ হইতে রাষ্ট্র যে-সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি বুর্জোজি বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। এই শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোজিগণ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের ('Third Estate) উপরিভাগ। ইহাদের যেমন প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল তেমনি নগদ অর্থ ওধনদৌলতও ইহাদের ছিল প্রচুর পরিমাণ। সরকার, সেনাবাহিনী, জাতীয় সভার প্রতিনিধি, বিদ্রোহী জনতা যে-কোন পক্ষকেই প্রয়োজন-বোধে এবং নিজ স্বার্থে অর্থ সাহায্য করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল। সরকারকে ঋণদান করিয়া সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেও তাহারা দ্বিধাবোধ করিত না। বুর্জোজি সম্প্রদায় মনে করিত যে, দারিদ্র্য নির্বুদ্ধিতার ফলস্বরূপ, এবং বুদ্ধির ব্যবহারেই ধনবান হওয়া সম্ভব। জনতার বা সাঁকুলাৎদের দ্বারা কোন প্রাদেশিক বা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালিত হইলে সেই সকল প্রশাসনের সহিত তাহারা কোন প্রকার লেন-দেন করিত না। উচ্ছৃংখল জনতা কর্তৃক বিপ্লবের কালে একাধিকবার বিদ্রোহ বা কনভেনশন সভা আক্রমণ বুর্জোজি সম্প্রদায় তাহাদের ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে করিত।

ভূমিহীন কৃষক, শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, খনি শ্রমিকদের দুর্দশা —দুর্দশার লাঘব

সাঁকুলাৎ অর্থাৎ শহরের শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা —নেপোলিয়নের অধীনে অবস্থার উন্নতি

বুর্জোজি বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (Commercial bour-geoisie), শিল্পোৎপাদক বুর্জোজি নহে। বিপ্লবের কালে, একমাত্র জেকোবিনদের প্রাধান্যাধীনে সমাজতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা ভিন্ন অবাধ-বাণিজ্য-নীতিরই সমর্থন করা হইয়াছিল। ইহার সুফল বুর্জোজি সম্প্রদায় পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়াছিল এবং ফরাসী মূলধন ইহার ফলে অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ফ্রান্সে ব্যবসায়ী বুর্জোজি

বিপ্লবের যুগে অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত করিতে পারে নাই। ইহাদের অধিকাংশই দেশত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সীমান্তে বিদেশী সাহায্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সম্পত্তি ফ্রান্সের আইনসভা (Legislative Assembly) বাজেয়াপ্ত করিয়া দিবার ফলে ফ্রান্সে তাহাদের ভূস্বামী হিসাবে মর্যাদার অবসান ঘটিয়াছিল। বিদেশে তাহারা কোনপ্রকার আয়-হীন ভাবে শোচনীয় জীবন যাপন করিতেছিল। ডিরেক্টরির অধীনে তাহাদিগকে (emigres) ফ্রান্সে ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হইলে অনেকেই ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং কেহ কেহ তাদের সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইয়াছিল। তাহাদের ক্ষমতা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

অভিজাত সম্প্রদায় ক্ষমতাহীন

ধর্মের ক্ষেত্রে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান প্রোটেস্টান্টদিগকে ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিল। ঐ বৎসরেই ইহুদিগণের নাগরিক অধিকার এবং অপরাপর নাগরিকদের সহিত সর্ববিষয়ে সমতার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের চার্চগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবার ফলে বহু সংখ্যক চার্চ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক বিরাট সংখ্যক যাজক ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছিল। ফ্রান্সের জনসাধারণ, বিশেষভাবে পুরুষেরা চার্চের সহিত পূর্বের মত আর যোগাযোগ রাখিত না, তবে খ্রীষ্টমাস, ইস্টার প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় পার্বণের দিনে তাহারাও চার্চে যাইত। বিপ্লবের যুগে ফরাসী চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির অবসান ঘটিয়াছিল।

চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি নাশ

বিপ্লবী শাসনব্যবস্থায় এন্টোনাইন নিকোলাস কনডোরসেট (Antonine Nicholas Condorcet) শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হিসাবে শিক্ষার উপর এক সুযৌক্তিক রিপোর্ট আইনসভার নিকট পেশ করেন (এপ্রিল ২১, ১৭৭২)। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে দেশের লোকের আনন্দ, সমৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে, যাবতীয় অভাব-অভিযোগ-অসুবিধা প্রভৃতির অবসান ঘটানও সম্ভব হইবে—এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি শিক্ষা প্রসারের দাবি জানাইলেন। পর বৎসর (মে ৪, ১৭৯৩) তিনি শিক্ষা ফরাসী জাতির প্রত্যেকের জন্য সমান এবং একই ধরনের করিতে হইবে, এই দাবি উত্থাপন করিলেন এবং "জাতীয়তাবাদ" ফরাসী জাতির "ধর্ম" বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত—শিক্ষার ব্যাপারে এই নূতন কথা শুনাইলেন। ডিরেক্টরির শাসনকালে তাই দেখা যায় যে, যাজকদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় (ডিসেম্বর ১৯, ১৭৯৩)। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক তখনও হয় নাই। পর বৎসর (১৭৯৪) হাইস্কুল, খনি, পূর্তকার্য, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, শিল্প, হস্তশিল্প, পলিটেকনিক প্রভৃতি নানা প্রকার

বিপ্লবী ফ্রান্সে শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক

শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন্‌ ফ্রান্সের জাতীয় ইন্‌স্টিটিউট (Institute National de France), বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি এবং আরও নানাবিধ শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়।

হাইস্কুল ও নানাবিধ শিক্ষায়তন স্থাপন

বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী জাতি পত্র-পত্রিকা পাঠ করা খাদ্য গ্রহণের মতই অপরিহার্য মনে করিত (swallowed newsprint greedily every day)। মানুষ ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন ফ্রান্সের বিভিন্ন দলের প্রাধান্য পর পর স্থাপিত হইতে লাগিল তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও খর্ব করিবার আইন চালু করা আরম্ভ হইল। কৃষি সম্পত্তি বা ফ্রান্সের রাজ্য সীমার কোনপ্রকার পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা কন্‌ভেন্‌শন্‌ আইন করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিল। এই আইন ভঙ্গকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রোব্‌স্‌পিয়ার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে প্রথম দিকে খুবই সোচ্চার থাকিলেও দাঁতোঁ, ডেসমোলিনস্‌ প্রভৃতিকে গিলোটিনে হত্যা করাইয়া যে-সকল পত্র-পত্রিকায় দাঁতোঁ, ডেসমোলিনস্‌ প্রভৃতির সমর্থনে কোন কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ডিরেক্টরি প্রথম দিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেও পরে এই নীতি ত্যাগ করে এবং মোট ৪২টি পত্রিকার সম্পাদকদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন ক্ষমতায় আসীন হইলেন, তখন ফ্রান্সের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। নেপোলিয়ন নিজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন নাই।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপ্লবী ফ্রান্সের অন্যতম আদর্শ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত

বিপ্লবের যুগে রাষ্ট্রের স্বার্থে এক নূতন নৈতিকতার উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়। মিরাবো, কন্‌ডোরসেট, ভারনিও, বোলাঁ, সেন্ট্‌ জাস্ট্‌, রোব্‌স্‌পিয়ার প্রভৃতির নিকট রাষ্ট্রের স্বার্থে যে-কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ, এমন কি, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান হত্যা বা সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা হত্যা করাও নীতি-বহির্ভূত মনে হয় নাই। এই ব্যাপারে তাঁহারা প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ব্রুটাস, ক্যাটো, লিওনিডাস, এরিস্টাইডিস, ইপামিনন্‌ডাস্‌ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। বিপ্লবের প্রাক্কালে দার্শনিকদের রচনার প্রভাবে মানুষের মনে যে-মানবতাবোধ জন্মিয়াছিল বিপ্লবের কালে উহার স্থলে হত্যার রাজনীতির প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করি। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড, বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহবশে গিলোটিন যন্ত্রে শিরশ্ছেদ করিয়া, হত্যা বিপ্লবের অমানবিক দিককে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণতা, যথা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, সরকার ও সেনাবাহিনীকে ব্যবসায়িগণ কর্তৃক ঠকান প্রভৃতি তখন নির্বিবাদে চলিতেছিল। শুধু তাহাই নহে, মানুষের নৈতিক অধঃপতন নানাদিক দিয়া ঘটিয়াছিল। যেমন জুয়া, বারবনিতাদের সংখ্যা, শুঁড়িখানা প্রভৃতির অভাবনীয় বৃদ্ধি সেই যুগের নৈতিকতার মান যে অতি নিম্নপর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ্য।

নৈতিকতার মান নিম্নগামী

এইরূপে অবস্থায় মিরাবো গোপনে ষোড়শ লুই-এর উপদেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তিনি ষোড়শ লুইকে গোপনে যে-সকল সদুপদেশপূর্ণ পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মিরাবো'র রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মিরাবো ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ সুপরামর্শ রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে দিয়াছিলেন। তিনি ষোড়শ লুইকে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর না করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং দেশের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শ লুই বা তাঁহার মন্ত্রিগণ কেহই মিরাবো'র সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেন নাই। আবার জেকোবিনরা তাঁহাকে "বিশ্বাসঘাতক" (traitor) বলিত, কারণ তিনি জেকোবিন্‌ দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ্যাসেম্বলি তাঁহার ষোড়শ লুই-র উপদেষ্টা হিসাবে গোপনে কাজ করা সমর্থন করিত না। তিনি লুইকে প্যারিস হইতে রোয়েন (Rouen) নামক স্থানে তাঁহার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিয়া প্যারিসের জনতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনসাধারণের সাহায্য চাহিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বিপ্লব শুরু হইবার কালে মিরাবো যে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তাহা ষোড়শ লুই ভুলেন নাই, ইহা ভিন্ন, রাণী ম্যারি আঁতোয়ানেত অস্ট্রিয়ার সাহায্যের উপর অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন সেই কারণে, এবং সর্বোপরি লুইয়ের স্বভাব-সুলভ দীর্ঘসূত্রতার জন্য মিরাবো'র উপদেশ তিনি গ্রহণ করেন নাই।

মিরাবো গোপনে ষোড়শ লুই-এর উপদেষ্টা নিযুক্ত

বিপ্লব যখন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন দূরদর্শী মিরাবো মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ শনি দেবতার ন্যায়ই বিপ্লব উহার সন্তানদিগকে অর্থাৎ বিপ্লবী নেতাদিগকে গলাধঃকরণ করিবে; সন্ত্রাসের শাসনকালে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল।*

মিরাবো ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসী রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিতে পারেন এইরূপ আর কোন দূরদর্শী রাজনীতিক বিপ্লবী নেতা ফ্রান্সে রহিলেন না।

মিরাবো'র মৃত্যুতে দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতার অভাব

ম্যাক্সিমিলিয়েন ফ্রাঁসোয়া রোবস্পিয়ার (Maximilien Francois Robespierre)ঃ রোবস্পিয়ার প্রথম জীবনে ফ্রান্সের এক প্রাদেশিক বিচারালয়ে আইন-ব্যবসায় করিতেন। আইনজীবী হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সংকীর্ণতা, এক-দেশদর্শিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সততা ও নৈতিকতা ছিল সমসাময়িক বিপ্লবী নেতাদের প্রায় সকলেরই ঊর্ধ্বে। জীবনে কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এই সকল নীতির অতি সামান্য পরিবর্তনও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সংযম, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম

চরিত্র

জেকোবিন্‌ দলের অন্যতম প্রধান নেতা

* "In a moment of prophetic insight he (Mirabeau) had declared that the Revolution, like the god Saturn would be devouring its own offsprings." *Ibid*, p. 414.

তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি বহু পরিমাণে পূরণ করিয়াছিল। রুশোর দার্শনিক মতবাদে প্রভাবিত চরম গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী রোব্‌স্‌পিয়ার ছিলেন জেকোবিন্‌ দলের নেতৃবর্গের অন্যতম। জেকোবিন্‌ ক্লাবের মাধ্যমে তিনি চরম উদারনৈতিক মতবাদ প্রচার করিয়া উহাকে এক শক্তিশালী প্রভাবে পরিণত করিয়াছিলেন। দ'তো (Danton)* ও হেবার্টের পতনের পর স্বভাবতই তিনি এই দলের সর্বেসর্বা হইলেন।

সন্ত্রাসের শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

ষোড়শ লুই দেশ হইতে পলায়নের সময় ধরা পড়িলে প্যারিসবাসী যখন দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সমর্থক হইয়া পড়িল—একটি রাজতন্ত্র রক্ষা করিবার পক্ষে, অপরটি রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া প্রজাতন্ত্রের স্থাপনের পক্ষে—তখন রোব্‌স্‌পিয়ার দ'তোঁর সাহায্য লইয়া রাজ-তন্ত্রের অবসানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনে তিনি অপ্রতিহত

বিপ্লবকে রক্ষা

ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঐ সময়ে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে দারুণ সংকট দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দেশ রক্ষার জন্য জননিরাপত্তা কমিটি ও বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল গঠনে এবং পরে 'সন্ত্রাসের শাসনকাল' (Reign of Terror) স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কন্‌ভেন্‌শন্‌, জননিরাপত্তা কমিটি, বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল—এই তিনটির উপরই তিনি নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার কার্যের ফলে বহু সংখ্যক বিপ্লব-বিরোধী ব্যক্তির প্রাণনাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ-পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রোব্‌স্‌পিয়ার ছিলেন ধর্মভীরু ও ভগবানে বিশ্বাসী। তিনি ধর্মনৈতিক

ধর্মভীরুতা

পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার একক প্রাধান্য অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন গ্রেপ্তার এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত থাকিবার ফলে স্বভাবতই যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাহার সুযোগ লইয়া রোব্‌স্‌পিয়ারের অনুগামীরাই তাঁহাকে ধ্বংস করিতে সংঘবদ্ধ হইল। সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা যে শেষ হইয়া গিয়াছে,

সাময়িক স্বৈর-ক্ষমতা ভোগ-- পতন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

তিনি তাহা উপলব্ধি করিলেন না। এই প্রতিক্রিয়া রোব্‌স্‌-পিয়ারের পতন ঘটাইল। অপরাপর নেতাদের ন্যায় তাঁহারও পতন ঘটিল। কয়েক মাস অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগের পর তিনি কন্‌ভেন্‌শন্‌ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

দ'তোঁ (Danton)ঃ জেকোবিন্‌ নামক বিপ্লবী দলের নেতাদের অন্যতম ছিলেন দ'তোঁ। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য আইনজীবী।

জেকোবিন দলের নেতা ঃ আইনজীবী ও বিদ্বান

বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল গভীর। বিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিতে একতা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন—এই কথা তিনি উপলব্ধি

* ফরাসী উচ্চারণ দাঁতোঁ (Danton)।

করিয়াছিলেন। তিনি কোন উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না ; রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। রাজনীতি ক্ষেত্রে সংযম ও অপরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি প্রজাতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে কার্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা হিসাবে তিনি বিপ্লব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই কারণে তিনি তাঁহার সহিত মতের মিল না থাকা সত্ত্বেও রোবস্‌পিয়ার, ম্যারা, গিরন্ডিস্ট্‌ এবং রাজা, সকলের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রোবস্‌পিয়ার তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, ম্যারা তাঁহার সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, রাজা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেন এবং গিরন্ডিস্ট্‌গণ তাঁহাকে ভয় করিত। অস্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার যুগ্মবাহিনী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করিয়া পর পর কয়েকটি শহর দখল করিয়া লইয়াছিল তখন দাঁতোঁ তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত বক্তৃতায় দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি দেশ রক্ষার কাজে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃত হইবে অথবা অস্ত্রশস্ত্র দিতে অস্বীকার করিবে তাহাকে শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, জয়লাভ করিতে আমাদের সাহস লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে, আবার সকল সময় সাহস দেখাইতে হইবে, যতদিন না ফ্রান্স বিদেশী শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পায়।" ক্রমে তিনি তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা জনগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রশংসা অর্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও ঘুষখোর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে পর-বিদ্বেষ, হিংসাপরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতা মোটেই স্থান পায় নাই। তিনি ছিলেন উদাসীন, সহজ প্রকৃতির লোক। ডোমোরিজের রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে 'মধ্যপন্থী'

প্রজাতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা

তাঁহার দেশাত্মবোধ

স্বার্থপরতা

প্রাণদণ্ড

ল্যাফায়েৎ (**Lafayette**) : মার্কুইস-ডি-ল্যাফায়েৎ এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার বিপ্লবীদের সহিত তিনি সমভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতি ও প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের নিকট হইতে অন্যায়মূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শাসনব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা দান করা এবং জনস্বার্থ বৃদ্ধি করা—এই ধারণা ঐ সময়েই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ উদারনৈতিক শিক্ষা ও বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান

আমেরিকার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ ; জর্জ ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের বন্ধুত্ব লাভ

বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ল্যাফায়েৎ যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন সর্বপ্রথমেই তিনি ফরাসী জনসাধারণের উপর অন্যায়মূলক কর স্থাপনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ছিলেন যেমন নির্ভীক তেমনি উদারচেতা, কিন্তু তাঁহার আত্মম্ভরিতারও অভাব ছিল না।

জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লাভ

ফরাসী বিপ্লবের কালে যখন জাতীয় সেনাবাহিনী (National Guard) গঠন করা হইল তখন তাঁহাকে ঐ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করা হয়।

সংবিধান-সভার সভ্যগণের মন্ত্রিত্বলাভের পথ বন্ধ

ল্যাফায়েৎ কার্যনির্বাহক বিভাগের (Executive) ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারেই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইনসভার সদস্যগণের মন্ত্রিত্বলাভের পথ বন্ধ হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা হিসাবে বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার ঐ জনপ্রিয়তা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি ১০ই আগস্টের (১৭৯২) হত্যাকাণ্ডের সময় রাজার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন।

রাজতন্ত্র রক্ষার্থে সৈন্যগণের সাহায্য-লাভে অসমর্থ ; সেনাপতিত্বের অবসান

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করায় তিনি সফলকাম হন নাই। ঐ সময় হইতে তাঁহার সেনাপতিত্বের অবসান ঘটে। মিরাবো এবং ল্যাফায়েতের যুগ্ম চেষ্টায় ফরাসী রাজতন্ত্র হয়ত রক্ষা পাইত, কিন্তু তাঁহার আত্মম্ভরিতা তাঁহাকে মিরাবো'র সহিত একযোগে কার্য করিতে বাধা দিল। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের সময়, তিনি বিপ্লবীদিগকে অন্তর্যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় লুই ফিলিপ্পি সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

জুলাই বিপ্লব, ১৮৩০ তাঁহার চেষ্টায় শান্তি-স্থাপন

জেকোবিন্ ক্লাব (Jacobin Club): ফরাসী বিপ্লবের কালে যে-সকল রাজনৈতিক দল, সংঘ প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন দল ছিল জেকোবিন্ ক্লাব। ব্রিটানি নামক ফরাসী প্রদেশের কতিপয় প্রতিনিধি ভার্সাই শহরে সর্বপ্রথম 'ব্রেটন ক্লাব' (Breton Club) নামে একটি [illegible] সংঘ স্থাপন করেন। অল্পদিন পরেই এই ক্লাবের সদস্য-পদ সকলের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইমানুয়েল যোসেফ্ সায়েস (Emmanuai Joseph Sieyes), ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবস্পিয়ার (Maximilien Robespierre), কম্‌টে দ্য মিরাবো (Comte de Mirabeau) প্রভৃতি এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণই যে রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি, এবং ফ্রান্সের মোট ২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার ২৪ মিলিয়নই যে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত (Third Estate) এই ধারণা প্রচার করিতে ব্রেটন ক্লাবের অবদান ছিল সর্বাধিক।

জেকোবিন্ ক্লাবের উৎপত্তি : ব্রেটন ক্লাব

ভার্সাই শহর হইতে যখন ষোড়শ লুই ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্যারিস শহরে স্থানান্তরিত করা হইল এবং তাহার ফলে এ্যাসেম্বলিও প্যারিসে স্থানান্তরিত হইল সেই সময়ে ব্রেটন ক্লাব জেকোবিন্ চার্চের এক পরিত্যক্ত ভোজন কক্ষে তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিল। পরে এই চার্চের গ্রন্থাগার ও অন্যান্য কক্ষ তাহাদের দখলে আসে। এই সময় হইতে ব্রেটন ক্লাব 'জেকোবিন্ ক্লাব' নামে পরিচিত হয়। প্যারিসের টুইলারিস্ রাজপ্রাসাদ হইতে এই নূতন জেকোবিন্ কর্মকেন্দ্রটি অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। জেকোবিন্ ক্লাবের শাখা এবং সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৬৮০০ শাখা ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হয় এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় পাঁচ লক্ষেরও অধিক।*

'জেকোবিন্ ক্লাব' নামধারণ

জেকোবিন্ ক্লাব ও উহার সদস্য সংখ্যার প্রসার

বিপ্লবের উত্তেজনার পূর্ণমাত্রায় সুযোগ গ্রহণ এবং বিপ্লবী উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিজ স্বার্থে লাগাইবার ব্যাপারে জেকোবিন্ ক্লাবের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাহাদের পত্র-পত্রিকা, প্রচার অভিযান, বাগ্মিতা জন-সাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ প্রচার করিয়া ফ্রান্সের এবং বিশেষ-ভাবে প্যারিসের জনমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নির্বাচনে জয়লাভ, প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ, মারামারি কোন কিছুতেই জেকোবিন্ ক্লাব অপেক্ষা অপর কোন দল অধিক সংগঠিত বা শক্তিশালী ছিল না। নিজেরা বুর্জোয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও জনতার অর্থাৎ প্রোলিটারিয়েটের রাজনৈতিক মতবাদ তাহারা নিছক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই অনুসরণ করিত। তাহাদের মধ্যে আইনজীবী, অন্যান্য নানা পেশার, যেমন, সাংবাদিক, ধর্মযাজক প্রভৃতিও ছিল। রোবস্পিয়ার, সায়েস, মিরাবো ভিন্ন এই ক্লাবের সহিত সেণ্ট্ জাস্ট্, ডেস-মোলিনস্, ফ্রেরণ, ম্যারা, দাঁতোঁ প্রভৃতি আরও বহু নেতা যুক্ত ছিলেন।

জনমতের উপর জেকোবিন্ প্রভাব

সুসংগঠিত শক্তিশালী দল—রাজনৈতিক মতবাদে প্রোলিটারিয়েট, সামাজিক দিক দিয়া বুর্জোয়া

প্যারিস কম্যুনের উপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে ফ্রান্সের আঞ্চলিক কম্যুন-গুলির উপর আধিপত্য প্রসারিত করিয়া জেকোবিন্ ক্লাব অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে প্যারিসের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমগ্র ফ্রান্সের রাজনীতির উপর তাহারা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল।

প্যারিস কম্যুনের উপর আধিপত্য বিস্তার

জেকোবিন্ দল আইনসভায় এক বিপ্লবী, উদার মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে কাজ করিতে লাগিল। তাহারা ছিল রাজতন্ত্রের বিরোধী এবং প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইওরোপীয় শক্তিদ্বয়—প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য তাহাদের অত্যধিক চাপ সৃষ্টির পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রাজার পরাজয় ঘটিলে

জেকোবিন্ দল কর্তৃক রাজতন্ত্রের অবসান-কল্পে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য চাপ সৃষ্টি

---

* *The Jacobins*, pp. 39, 183, 251, Brinton, also *The Age of Napoleon*, p. 33.

প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা সহজেই সম্ভব হইবে। গিরন্ডিস্ট্‌দের সহিত তাহাদের মত-বিরোধ ছিল। কিন্তু গিরন্ডিস্ট্‌রা যুদ্ধ চাহিয়াছিল বিপরীত কারণে।

ফ্রান্স অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে এবং সেই দুই দেশ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ফরাসী জাতি দেশ রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার সুযোগ পাইল।

রাজা সপরিবারে পলায়নের বৃথা চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে এবং যুদ্ধে ফ্রান্স প্রথম দিকে পরাজিত হইতে থাকিলে উহার জন্য রাজ-পরিবার কর্তৃক গোপনে সামরিক তথ্য শত্রুপক্ষের নিকট সরবরাহ করিবার সন্দেহে রাজার বিচার করা হইল। বিচারে রাজার প্রাণদণ্ডের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জেকোবিন্‌ দলের ভীতি প্রদর্শন অনেকাংশে দায়ী ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

রাজার প্রাণদণ্ডে জেকোবিন্‌দের ভূমিকা

সন্ত্রাসের শাসনকালে জেকোবিন্‌ দলের কার্যকলাপে সততা, মানবতা প্রভৃতির কোন স্থান ছিল না। তাহাদের শক্তি এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা বলে তাহারা গিরন্ডিস্ট্‌দের শাসনের স্থলে নিজেদের শাসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিছক সন্দেহবশে এক বিশাল সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করা হয়। রাজতন্ত্রের সমর্থক সন্দেহে যাহাকে ধরা হইত এবং বিপ্লবী বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইত তাহাকেই গিলোটিন নামক শিরশ্ছেদ যন্ত্রে প্রাণ হারাইতে হইত। দ'তোঁ প্রথমে এই সন্ত্রাসের শাসনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন কিন্তু রোব্‌স্‌পিয়ারের সহিত তাঁহার সদ্ভাব না থাকায় তাঁহাকে এবং সেই সঙ্গে ডেসমোলিনস্‌ ও সেন্ট্‌ জাস্ট্‌কে গিলোটিনে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। বিদেশী আক্রমণকালে দেশের অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রের সপক্ষে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সন্ত্রাসের প্রয়োজন ছিল, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন সন্ত্রাসের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল তখনও সন্ত্রাস চালাইয়া যাইবার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক দুর্ধর্ষ জেকোবিন্‌ নেতা রোব্‌স্‌পিয়ারকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এইভাবে ২৮শে জুলাই ১৭৯৪ সন্ত্রাসের সর্বপ্রধান নেতার প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটিল। ইহার পর প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'শ্বেত সন্ত্রাস' শুরু হইল এবং জেকোবিন্‌ ও প্যারিস কমুনকে দমনের কাজ শুরু হইল।

গিরন্ডিস্ট্‌ দল ক্ষমতাচ্যুত

দ'তোঁ, ডেসমোলিনস্‌ ও সেন্ট্‌ জাস্ট্‌-এর গিলোটিন

রোব্‌স্‌পিয়ারের গিলোটিন, সন্ত্রাসের অবসান

গিরন্ডিস্ট্‌ দল (The Girondists or Girondins) : ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ইংরেজ প্যারিস শহরে গিয়া সেইখানে অসংখ্য রাজনৈতিক সংঘ দেখিতে পান। প্রতি রাস্তায়ই একাধিক ক্লাব তখন ছিল।* এইরূপ একটি ক্লাব ছিল গিরন্ডিন বা গিরন্ডিস্ট্‌ ক্লাব। এই ক্লাবের নেতৃবৃন্দের প্রধান সারির প্রায় সকলেই গিরন্ডি নামক ডিপার্টমেন্ট (Depart-

গিরন্ডি ডিপার্টমেন্ট নামানুকরণে 'গিরন্ডিস্ট্‌' দলের নাম

* "Clubs abound in every street." Vide *The Age of Napoleon*, p. 33, Will and Ariel Durant.

ment) অর্থাৎ প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ক্লাবের নাম দেওয়া হইয়াছিল গিরণ্ডিস্ট্ ক্লাব এবং তাঁহারা গিরণ্ডিন বা গিরণ্ডিস্ট্ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে নেতৃস্থানীয় সকল গিরণ্ডিস্ট্ই জেকোবিন্ ক্লাবের সদস্য ছিলেন, কিন্তু রাজতন্ত্রের এবং চার্চের বিরোধিতায় তাঁহারা জেকোবিন্দের সহিত সহ-মত হইলেও প্যারিসের জনতা ফ্রান্সের উপর আধিপত্য বিস্তার করুক ইহা তাঁহারা চাহেন নাই। ম্যানন রোলাঁ ছিলেন গিরণ্ডিস্ট্দের অন্যতম বিখ্যাত নেত্রী। কন্-ডোরসেট ছিলেন তাহাদের তাত্ত্বিক নেতা।

প্রথম আইনসভার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দল

বিপ্লবী সংবিধান অনুসারে যখন প্রথম আইনসভা নির্বাচিত হয় তাহাতে গিরণ্ডিস্ট্দের মধ্য হইতে যে-সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক।

গিরণ্ডিস্ট্দের মন্ত্রিত্ব

ষোড়শ লুই প্রথমে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা নিয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সেই মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতা-চ্যুত করিয়া গিরণ্ডিস্ট্দের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গিরণ্ডিস্ট্গণ জেকোবিন্দের ন্যায় রাজতন্ত্র-বিরোধী

রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় গিরণ্ডিস্ট্গণ জেকোবিন্দের সহিত একমত ছিল। কিন্তু প্যারিসের জনতার প্রাধান্য এবং সমগ্র ফ্রান্সের উপর প্যারিসের আধিপত্য স্থাপনের জেকোবিন্ প্রয়াস গিরণ্ডিস্ট্গণ সমর্থন করিত না। রাজার বিচারের ব্যাপারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দিবার পক্ষে গিরণ্ডিস্ট্দের অনেকেরই মত ছিল না, কিন্তু জনতার চাপে এবং প্রাণভয়ে অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজার প্রাণদণ্ডের সপক্ষে ভোট দিয়াছিল। এইভাবে কন্ভেন্শনে গিরণ্ডিস্ট্গণ জেকোবিন্ ও তাহাদের সমর্থক জনতার চাপের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

রাজার মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে গিরণ্ডিস্ট্দের মধ্যে মতভেদ

ইহার পর হইতে গিরণ্ডিস্ট্দের মধ্যে পূর্বেকার একতা, শক্তি ও কর্মক্ষমতা আর ছিল না বলিলেও চলে। গিরণ্ডিস্ট্গণ ফ্রান্সকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিয়া প্রদেশগুলিকে স্ব-শাসিত হইবার ক্ষমতা দিবার পক্ষপাতী ছিল। জেকোবিন্গণ এই প্রস্তাব প্যারিসের জনসাধারণ ও প্যারিস কম্যুনের নিকট গিরণ্ডিস্ট্গণ কর্তৃক প্যারিসের ক্ষমতা খর্ব করিবার ষড়যন্ত্র বলিয়া প্রচার করিল। ফলে গিরণ্ডিস্ট্ ও জেকোবিন্ তথা প্যারিস কম্যুন-এর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে জেকোবিন্ দল ক্ষমতায় আসিয়া বিদেশী আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের সমর্থনে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সন্ত্রাসের শাসন শুরু করিল।

গিরণ্ডিস্ট্গণ কর্তৃক ফ্রান্সে কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের

জেকোবিন্ বিরোধিতা—গিরণ্ডিস্ট্ হত্যা

১৭৯৩, ৩১শে মে, জেকোবিন্ ও প্যারিস কম্যুনের চাপে ২২ জন গিরণ্ডিস্ট্ নেতাকে গিলোটিন করা হইল; ম্যাডাম ম্যানন রোলাঁ ইহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই উক্তি করিয়া ছিলেন: "Liberty! what crimes are committed in thy name"!

অধ্যায় ৬

ভিয়েনা সম্মেলন

(The Congress of Vienna)

ভিয়েনা কংগ্রেস বা সম্মেলন, ১৮১৫ (Vienna Congress, 1815) : নেপোলিয়নের পতনের পর মহাসমারোহে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিগণ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে সমবেত হইলেন। ভিয়েনার এই কংগ্রেস* বা সম্মেলন ইওরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকৃত আন্তর্জাতিক সম্মেলন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বস্তুত, সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা অথবা সদস্যদের সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মেলন ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।†

অভূতপূর্ব সম্মেলন

সমসাময়িক শক্তিশালী রাজগণের মধ্যে অস্ট্রিয়ার প্রথম ফ্রান্সিস্, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, প্রাশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডারিক প্রভৃতি মোট ছয় জন ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে আসিলেন ইংলন্ডের ক্যাসার্লার ও ডিউক-অব্-ওয়েলিংটন, অস্ট্রিয়ার প্রধান-সচিব এবং পররাষ্ট্র-মন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিক্ (Metternich), রাশিয়ার নেসেলরোড, প্রাশিয়ার হাম্বল্ডাট্ ও হার্ডেন্বুর্গ এবং ফ্রান্সের ট্যালির্যাঁ।

সম্মেলনের প্রধান সদস্যগণ

একমাত্র তুরস্ক ও পোপের রাজ্য ভিন্ন ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। সমবেত সদস্যগণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ও উদারতা প্রভৃতি বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে ভিয়েনা সম্মেলনের আবহাওয়া ক্রমেই রহস্যাবৃত হইয়া উঠিল।

রহস্যাবৃত আবহাওয়া

---

* ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ভিয়েনা সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে বিজেতা শক্তিগুলির সহিত ফ্রান্সের যে-চুক্তি (Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ঐ সন্ধির শর্তের ভিত্তিতে আলোচনা চলে। এই সময় নেপোলিয়ন এল্বো দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় : ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিলে ভিয়েনা সম্মেলনের কাজ পুনরায় শুরু হয়। নেপোলিয়নের পুনরাগমনের শাস্তিস্বরূপ ২০শে নভেম্বর ভিয়েনা সম্মেলনে প্রথম প্যারিস চুক্তির কতক পরিবর্তন করা হয়।

† "The Congress of Vienna (Sept. 1814—June 1815) was one of the most important diplomatic gatherings in the history of Europe, by reason of the number, variety and gravity of the questions presented and settled." C. D. Hazen : *Europe Since 1815*, p. 9

"In brilliance of personnel and in magnitude of issues there has been no parallel to it in modern history." ***The Remaking of Modern Europe*** : **Marriot, p. 119.**

অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক্ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কূটকৌশল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে এক অপ্রতিহত প্রাধান্য দান করিল।* তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইংলন্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ নিজেদের শক্তির সুযোগ লইয়া সম্মেলনের কর্মপন্থা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব ট্যালিরাঁ-এর গভীর কূটনৈতিক চালে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত হইল। ট্যালিরাঁ এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে অবহেলিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের নেপথ্যে পূর্ব হইতেই কোন কর্মপন্থা যাহাতে স্থির না হইতে পারে এবং সকল বিষয়ই যাহাতে কংগ্রেস বা সম্মেলনের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তিনি সেই বিষয়ে সতর্ক রহিলেন। প্রধান শক্তিগুলির পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া তিনি ফ্রান্সের জন্য এই সম্মেলনে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান আদায় করিলেন। তিনি সমবেত প্রতিনিধিগণকে বুঝাইলেন যে, ইওরোপের শত্রুতা ফ্রান্স বা ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে নহে, ইহা কেবলমাত্র নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে; এইভাবে ট্যালিরাঁ ইওরোপের পুনর্বণ্টনের কার্যে ফ্রান্সের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিলেন। তিনি দুর্বল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সকে যে-শাস্তি স্বাভাবিক ভাবেই ভোগ করিতে হইত তাহা এড়াইতে সক্ষম হইলেন।†

প্রিন্স্ মেটারনিকের প্রাধান্য: ইংলন্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার আধিপত্য

ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব ট্যালিরাঁ-এর কূট-কৌশল

ফ্রান্সের মর্যাদা অক্ষুন্ন

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যা (Problems before the Congress of Vienna): নেপোলিয়নের উত্থানের ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলনে স্বভাবতই সেগুলির সমাধান করা প্রয়োজন হইল। এই সমস্যাগুলিকে সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা:

সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যা:

* "He could swim like a fish in the sparkling whirlpool of Vienna. Quoted by D. M. Ketelbey; *A History of Modern Times*, p. 144

† "His argument was that Europe had fought Napoleon and not France." ..."France became the arbiter in the chief question before the Congress." Morse Stephens; "*Revolutionary Europe*, p. 339.

"No longer was France a pariah among the nations. One wonders what might have happened if Germany had possessed a Talleyrand in 1919." Riker: ***A Short History of Modern Europe*, p. 383.**

(১) দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল উহার পুনর্গঠন ; (২) পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ; (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থা নিরূপণ ; (৪) রাইন সীমারেখা নির্ধারণ ; (৫) স্যাক্সনি সম্পর্কে শান্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, (৬) ফ্রান্সের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে ইতিপূর্বে যে-সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য সম্পাদন।

(১) ইওরোপের পুনর্গঠন, (২) পোল্যান্ড, (৩) জার্মানি, (৪) রাইন, (৫) স্যাক্সনি, (৬) ফ্রান্স, (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে চুক্তি প্রভৃতির সমাধান

ইওরোপের পুনর্বণ্টন (Territorial Redistribution) : ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ বাহ্যত সততা, ন্যায় ও আদর্শবাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ইওরোপীয় 'সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন', 'রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন', 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন', 'ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন' প্রভৃতি উচ্চ আদর্শবাদী বুলি আওড়াইতে তাঁহারা কার্পণ্য করিলেন না। বস্তুত এগুলি কেবলমাত্র সম্মেলনের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য বলা হইয়াছিল।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বিজিতের সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজয়ী দেশগুলি—ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার পারিশ্রমিক হিসাবে কতক কতক স্থান আত্মসাৎ করিল।

উচ্চ আদর্শের মৌলিক পরাকাষ্ঠা

কার্যত নীচ স্বার্থ-সিদ্ধির মনোবৃত্তি

রাশিয়াকে গ্র্যান্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো'র অধিকাংশ (পোজেন ও থর্ণ বাদে), ফিন্ল্যান্ড, বেসারাবিয়া ও অপর কয়েকটি তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্থান দেওয়া হইল। এই সকল স্থানলাভের ফলে ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, অধীন পোলগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেও রাশিয়া স্বীকৃত হইল।

রাশিয়া

প্রাশিয়া পোজেন, থর্ণ, ডানজিগ্ ও স্যাক্সনির উত্তরাংশ, পশ্চিম-পোমেরেনিয়া এবং রাইন নদীর তীরবর্তী প্রদেশগুলি লাভ করিল। স্যাক্সনির অবশিষ্টাংশ তথাকার রাজার অধীনেই রাখা হইল।

প্রাশিয়া ও স্যাক্সনি

অস্ট্রিয়া হল্যান্ডকে বেলজিয়াম ছাড়িয়া দিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভেনিস ও লোম্বার্ডি লাভ করিল। ইহা ভিন্ন, অস্ট্রিয়া ড্যালম্যাশিয়া, পূর্ব-গ্যালিসিয়া, এবং বেভেরিয়ার নিকট হইতে টাইরল, স্যাল্জবার্গ, ভোরারল্বার্গ প্রাপ্ত হইল। বেভেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যারিউথ্, আন্সপাক ও রাইন-প্যালাটিনেট্ দেওয়া হইল।

অস্ট্রিয়া ও বেভেরিয়া

ইংলণ্ড মাল্টা, হ্যালিগোল্যান্ড, সিংহল, কেপ্-কলোনি আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ

* "They (people) saw the unedifying scramble of the conquerors for the spoils of victory." C. D. Hazen : *Europe Since 1815*, p. 8.

প্রভৃতি লাভ করিল। ইংলন্ড ছিল নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শত্রু। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংলন্ডের ক্ষতির পরিমাণ যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, ক্ষতিপূরণের পরিমাণও তেমনি ইংলন্ড সর্বাধিক গ্রহণ করিয়াছিল।

ইংলন্ড

জার্মানি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা লইয়া প্রতিনিধিদলের মধ্যে দারুণ মতানৈক্য দেখা দিল। অস্ট্রিয়া চাহিল জার্মানির উপর পূর্বেকার আধিপত্য স্থাপন করিতে, অপর দিকে জার্মান রাষ্ট্রগুলি চাহিল স্বাধীনভাবে থাকিতে। শেষ পর্যন্ত জার্মানির ৩৮টি রাজ্য এবং স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রগুলি লইয়া এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Loose Confederation) গঠন করা হইল*; ইহার নাম হইল জার্মান কনফেডারেশন (German Confederation)। এই যুক্তরাষ্ট্রটিকে আইনত অস্ট্রিয়ার আধিপত্যাধীনে রাখা হইল। ফ্রাংকফুর্ট (Frankfurt) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হইল।

জার্মানি : কনফেডারেশন অব দি রাইন

ইতালির উত্তরভাগে ভেনিস ও লোম্বার্ডি অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। ভিক্টর ইমানুয়েলকে স্যাভয়, পাইডমন্ট ও জেনোয়া এবং ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীকে (নেপোলিয়নের পত্নী মেরী লুই) পার্মা দেওয়া হইল। টাস্কেনী ও মডেনা অস্ট্রিয়ার রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজগণকে দেওয়া হইল। ন্যাপলস ও সিসিলিতে বুর্বোঁ রাজা ফার্ডিনান্ডকে পুনঃস্থাপন করা হইল। পোপের রাজ্যগুলি পুনরায় গঠন করা হইল। ইতালির ক্ষেত্রে জার্মানির ন্যায় কোন অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা হইল না। সমগ্র ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ইতালি' নামটির কোন সার্থকতা রাখা হইল না। 'ইতালি' একটি ভৌগোলিক নামমাত্রে পরিণত হইল। বাস্তবে ইতালি নামে কোন ঐক্যবদ্ধ দেশ আর রহিল না।

ইতালি : ভৌগোলিক নামে পরিণত

সুইটজারল্যান্ড ভ্যালাইস, নিউচ্যাস্টেল ও জেনিভা এই তিনটি ক্যান্টন (প্রদেশ) লাভ করিল এবং সর্বকালের জন্য নিরপেক্ষ (neutral) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল।

সুইটজারল্যান্ড

ডেনমার্ক হইতে নরওয়ে কাড়িয়া লইয়া সুইডেনের সহিত যুক্ত করা হইল; এইভাবে সুইডেনকে ফিনল্যান্ড ত্যাগের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল।

সুইডেন

হল্যান্ডের সহিত বেলজিয়ামকে যুক্ত করিয়া অরেঞ্জ পরিবারের অধীনে স্থাপন করা হইল।

হল্যান্ড

ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য নীতি (Principles of Legitimacy, Compensation & Balance of Power): ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধি-

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হেসি হেমবর্গ সংযুক্ত হইলে উহার সংখ্যা হইল ৩৯।

গণ প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাততান্ত্রিক। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উদার-নীতি তাঁহাদের নিকট স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইওরোপের পুনর্গঠনের কাজে তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের দিকটাই বড় করিয়া দেখিলেন। ন্যায় ও সত্যতার ভিত্তিতে সামাজিক পুনরুজ্জীবন ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—ইত্যাদি আদর্শবাদী ঘোষণা নিছক মুখের কথায় পর্যবসিত হইল। নিজেদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করিয়া এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তিনটি নীতির অনুসরণ করিলেন: (১) ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy), (২) ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও (৩) শক্তি-সাম্য (Balance of Power)।

মৌখিক আদর্শবাদের পশ্চাতে মূলনীতি —ন্যায্য-অধিকার, শক্তি-সাম্য

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন। যে-স্থান যে-দেশের অথবা যে-রাজবংশের অধীনে ছিল, সেই স্থান সেই দেশ বা বংশের অধীনে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামোকে সঞ্জীবিত করিতে গিয়া তাঁহারা বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তার আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার নীতি (Legitimacy) Status Quo

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের দ্বারা তাঁহারা উত্তর-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করেন; দক্ষিণ-ইতালিকে পূর্বেকার সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত করেন, এমন কি, সিসিলি-ন্যাপল্‌সের সিংহাসনে কুখ্যাত ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করেন। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন। স্যাভয় ও সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবার, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ পরিবার (House of Orange) ও মধ্য-ইতালিতে পোপের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ফ্রান্স ও স্পেনে বুর্‌বোঁ পরিবার পুনঃস্থাপিত হয়।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ

বিজেতা রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের কার্যের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল 'ক্ষতিপূরণ' নীতির প্রয়োগ দ্বারা। ন্যায্য-অধিকার নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে বিজেতা রাষ্ট্রগুলির ভাগে কিছুই পড়ে না, সুতরাং ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগের দ্বারা সেগুলিকে কতক কতক স্থান অধিকার করিতে দেওয়া হইল। স্বভাবতই ন্যায্য-অধিকার নীতি ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগে বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল।

নেপোলিয়নের পরাজয়ে ইংলণ্ডের দান ছিল সর্বাধিক, ইংলণ্ডের ক্ষতিপূরণও মিলিল সর্বাপেক্ষা অধিক। সিংহল, কেপ-কলোনি, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে লাভ করিল। হল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল বেলজিয়াম। রাশিয়া পাইল গ্র্যাণ্ড ডাচি বা ওয়ারসো'র অধিকাংশ, ফিন্‌ল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ইত্যাদি। প্রাশিয়ার ভাগে পড়িল স্যাক্সনির উত্তরাংশ, ডানজিগ, থর্ণ, পোজেন, রাইন প্রদেশগুলি, পশ্চিম-পোমেরেনিয়া ইত্যাদি। আবার, শক্তি-সাম্য নীতি বজায় রাখিতে গিয়া এক দেশ হইতে একাংশ লইয়া অপর দেশকে দেওয়া হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া হইতে বেলজিয়াম হল্যাণ্ডকে

ক্ষতিপূরণ নীতি (Compensation)

দেওয়া হইয়াছিল, ইহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে ইতালিতে প্রাধান্য দান করা হইয়াছিল। সুইডেন হইতে ফিনল্যান্ড রাশিয়াকে এবং পশ্চিম-পোমেরেনিয়া প্রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য সুইডেন নরওয়ে লাভ করিয়াছিল।

ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য (Balance of power) নীতির প্রয়োগ পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ভিয়েনা সম্মেলন এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিতে সচেষ্ট ছিল। বেলজিয়াম-হল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন, প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি, ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন শক্তি-সাম্য নীতিরই পরিচায়ক।

শক্তি-সাম্য নীতি Balance of Power)

ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে ইওরোপীয় শক্তি সাম্য বিনষ্ট করিবার সুযোগ না দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে এরূপ করা হইয়াছিল। আবার প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারেও পরস্পর ভারসাম্য অর্থাৎ একটি অপরটি অপেক্ষা যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী না হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্সের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতার ফলেও ন্যায্য-নীতি ব্যাহত হইয়াছিল

সমালোচনা (Criticism) : ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভিয়েনার কংগ্রেস ছিল রক্ষণশীল ব্যক্তি-বর্গের সম্মেলন। স্বভাবতই ইহার কার্যকলাপে প্রতিক্রিয়াশীলতা পদে পদে পরিলক্ষিত

রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া

হয়। এই কংগ্রেসের প্রধান নেতা ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-পন্থী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। তিনি বিপ্লবের কালে ইওরোপীয় দেশসমূহের সীমারেখার পরিবর্তন এবং বিভিন্ন দেশের রাজতন্ত্রের বা রাজ-বংশের পরিবর্তন দারুণ ভীতির চক্ষে দেখিতেন। স্বভাবতই তিনি বিপ্লবের পূর্বতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুনরায় স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই ব্যাপারে কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন ফরাসী মন্ত্রী ট্যালিরাঁ কর্তৃক উদ্ভাবিত ন্যায্য-নীতির (Legitimacy) সাহায্য মেটারনিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ নীতি এবং শক্তি-সাম্য নীতির প্রয়োগ করিয়া এই নীতিকে ব্যাহত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা সম্মেলন নামেমাত্র-ই 'সম্মেলন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

নামেমাত্র-ই সম্মেলন : পাঁচটি শক্তির প্রাধান্য

প্রকৃত ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স—এই পাঁচটি শক্তিই সম্মেলনের কার্যাদি তাহাদের গোপন বৈঠকে স্থির করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে পূর্ণমাত্রায় সম-মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক নীতি ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া লীগ অব্

* "In fact, strictly speaking there was no Congress at all. A score or more of representatives from petty princes came to add their piping voices to this European chorus, but they were only allowed the privilege of forming the background. The foreign ministers of the five great powers were the Congress." Riker, *A Short History of Modern Europe*, p. 382.

"Everything was arranged outside in special committees, and in the intimate interviews of sovereigns and diplomats." C. D. Hazen, p. 4.

ন্যাশনস্ (League of Nations) বা বর্তমানে ইউ. এন. ও. (U. N. O.) প্রতিষ্ঠানেও স্বীকৃতি পায় নাই।

তৃতীয়ত, ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকদের স্বার্থ-পর নীতির সম্মুখে স্থান পায় নাই। জার্মানির ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিবেশী বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্রগুলির অধীনতা হইতে মুক্ত না করিয়া, জার্মানিতে এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন এবং সর্বোপরি অস্ট্রিয়াকে এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব দান করিবার ফলে জাতীয়তাবাদ নীতির অবমাননা করা হইয়াছিল। হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত। এই দুইটি দেশই বিপ্লবী যুদ্ধের কালে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ ফ্রান্সকে প্রতিরোধ করিবার উপায় হিসাবে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামকে একত্রিত করিয়া হল্যান্ডের অরেঞ্জ বংশের শাসনাধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় বেলজিয়ামের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল। বেলজিয়ামের জাতীয় দাবি যেমন ইহাতে উপেক্ষিত হইয়াছিল তেমনি ন্যায্য-নীতিরও অবমাননা করা হইয়াছিল। জাতি, ধর্ম ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাকে উপেক্ষা করিয়া নরওয়েকে সুইডেনের অধীনে স্থাপন, সম-দোষেই দুষ্ট ছিল। ইতালির প্রতি অবিচার আরও অধিকমাত্রায় করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যাধীন থাকিবার এবং ফরাসী বিপ্লবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে ইতালিবাসীদের মধ্যে যে-জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলন তাহার কোন গুরুত্ব দেয় নাই। পোপ, ন্যাপলস্-এর রাজা, টাস্কেনির ডিউক ইতালিতে তাঁহাদের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জেনোয়া ও ভেনিসের প্রজাতন্ত্র পুনর্গঠন না করিয়া ভিয়েনা সম্মেলন ন্যায্য-নীতির প্রয়োগ ব্যাহত করিয়াছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সার্ডিনিয়া রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে জেনোয়াকে সার্ডিনিয়ার অধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। বেলজিয়াম ছিল অস্ট্রিয়ার অধীন রাজ্য। বেলজিয়াম হল্যান্ডের সহিত যুক্ত হওয়ায় অস্ট্রিয়ার যে-ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার জন্য ভেনিস ও ড্যালম্যাশিয়া অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে জাতীয় দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল।

জাতীয়তাবাদ উপেক্ষিত

দৃষ্টান্ত—জার্মানি, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ইতালি প্রভৃতি

চতুর্থত, তাঁহারা ন্যায্য-অধিকার নীতিও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই। বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ। ইতালি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগও তাঁহারা করেন নাই।

ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy) নীতির আংশিক প্রয়োগ

পঞ্চমত, প্রতিনিধিগণ বিপ্লবের দান—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিয়া ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেই কাজ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পূর্বেকার ব্যবস্থা (Status Quo) স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

Status Quo স্থাপন: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

রাজনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা মৃতপ্রায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

বংশগত স্বার্থ ও অচল শক্তি-সাম্য (Balance of Power) নীতির প্রয়োগ

ষষ্ঠত, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া প্রতিনিধিগণ একদিকে যেমন নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অচল শক্তি-সাম্য (Balance of Power) নীতি এবং বংশগত স্বার্থরক্ষার নীতির উপর জোর দিয়া তাঁহারা যুগধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।* অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী রাজা ও রাজনীতিকগণ নিজ নিজ ধারণা ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভিয়েনা চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বভাবতই এই চুক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইল না। ইহার স্থায়িত্বও সেইহেতু স্বল্পকালীন হইল।†

ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি

সপ্তমত, প্রতিনিধিবর্গের ফরাসী-ভীতি তাঁহাদিগকে ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি অনুসরণে প্ররোচিত করিয়াছিল। ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহারা নানাবিধ অন্যায়মূলক, নৈতিকতা-বর্জিত, অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সেই হেতু তাঁহারা জনস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ পান নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা

স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের কাঠামোর মূল উৎপাটনে ব্যয়িত হইয়াছিল।

সর্বশেষে, ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের গতানুগতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।‡ ইওরোপের

* "It marked a reversion to the outworn ideas of the 18th century, to the doctrine of 'balance' and the supremacy of dynastic interests : the clock was set back by the repartition of Italy and the ineffective reconstitution of Germany." Marriot ; *The Remaking of Modern Europe*, p. 131.

† "It was a settlement formed by monarchs and aristocratic diplomats of the old order, and it was infused with the spirit of the eighteenth century. As such it could have only limited applicability and longevity in faster moving of the nineteenth century". David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p. 75.

‡ "Its work has been severely criticised, nor can it be denied, that many blunders were made, that little foresight was shown, that important principles were ignored, and that selfish interests were too much regarded." Marriot, p. 120.

জনগণের মধ্যে যে নূতন ভাবধারা, নূতন চেতনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করেন নাই। ডেভিড্ টম্‌সন (David Thomson)-এর মতে ভিয়েনা চুক্তি মোটামুটিভাবে যুক্তিসঙ্গত ও রাজনীতি-সমর্থিত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, জাতীয়তাবাদী প্রভাব ও অগ্রগতির শক্তি যে কত সুদূরপ্রসারী, তাহার উপযুক্ত বিবেচনা ইহাতে করা হয় নাই। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া এই সকল দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের প্রয়োজনে অপরাপর দেশের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক সুবিধা, রাজবংশের অধিকারকে ইওরোপীয় অর্থনৈতিক এবং জাতীয়তা-স্পৃহার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।*

প্রতিনিধিবর্গের স্বার্থপরতা

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ইওরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইওরোপে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইলে ইওরোপের সর্বত্র ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিল। ভিয়েনা সম্মেলন যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিল উহার অধীনে কোনপ্রকার বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধন করিয়া তদানীন্তন ইওরোপবাসীদের সমস্যাসমূহ—বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিবার সাহস বা মনোবৃত্তি কোন রাষ্ট্রের স্বভাবতই ছিল না। কারণ, এই ব্যবস্থা ছিল রক্ষণশীল তথা প্রতিক্রিয়াশীল ন্যায্য-অধিকার নীতির উপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইওরোপবাসীর আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব অসন্তোষ, সংস্কার-স্পৃহা, আন্দোলন ও বিপ্লব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর অসন্তোষ, সংস্কার-স্পৃহা, আন্দোলন ও বিপ্লবের কারণ

তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির সপক্ষেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। (১) প্রতিনিধিবর্গ জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ভিয়েনা সম্মেলনেই আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য প্রতিনিধিবর্গ যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ইওরোপের ইতিহাসে উহাই ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ (League of Nations) এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ (United Nations) ইহারই পশ্চাদনুসরণ বলা যাইতে পারে।

সপক্ষে যুক্তি আন্তর্জাতিকতা

---

* "It was on the whole, a reasonable and statesmanlike arrangement, of which the chief defect was that it under-estimated the dynamism of nationalism...," David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p. 75.

(২) ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিবিদ্‌গণের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ইওরোপের জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় কণ্টকিত ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য যেমন ছিল কঠিন, তেমনই ছিল অনিশ্চিত।* এই কারণে পূর্বের সব কিছুই উপেক্ষা করা প্রতিনিধিগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের সহিত যুগ্মভাবে যুঝিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেগুলির শর্তাদি ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের কর্মপন্থা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। আবো'র সন্ধি (Treaty of Abo, 1812) দ্বারা সুইডেনকে নরওয়ে দিবার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে কালিশ্‌ক (Kalisch)-এর চুক্তি, রাইশেনবেক (Reichenbach), টোপ্‌লিজ (Toplitz)-এর চুক্তি প্রভৃতি পূর্ব হইতেই ভিয়েনা প্রতিনিধি-বর্গের কর্মপন্থা অনেকখানি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রতিনিধিবর্গের অসুবিধা

জটিল সমস্যাসঙ্কুল ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য

পূর্বেকার পরস্পর চুক্তির শর্তপালনের দায়িত্ব

(৩) ইহা ভিন্ন, পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বৎসর† ভিয়েনার প্রতিনিধিবর্গ ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহামানব নিশ্চয়ই ছিলেন না। ফলে সুদূর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাঁহারা গঠন করিয়া যাইবেন, এরূপ আশা করাও অনুচিত। কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাই চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল টিকিয়াছিল, এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইওরোপ যদি পুনরায় কোন ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে ইওরোপের সর্বনাশ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ভিয়েনা প্রতিনিধিগণ সেইরূপ পরিস্থিতি হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাই ছিল এই চুক্তির প্রধান গুণ।‡

পরবর্তী চল্লিশ বৎসর শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম

(৪) ভিয়েনা সম্মেলন (১) কতিপয় রাজবংশের শাসন তাহাদের পূর্বেকার নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃস্থাপন করিয়াছিল, (২) কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিয়াছিল, (৩) জার্মানির রাজ্যগুলিকে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংগঠিত করিয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ড-এর ক্যান্টনগুলিকে সুদৃঢ়তর করিয়া, নরওয়ে ও সুইডেনকে একত্রিত করিয়া, হল্যাণ্ডের অধীনে বেলজিয়ামকে স্থাপন করিয়া পুনর্গঠিত ইওরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার

পুনর্গঠিত ইওরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধান: প্রকৃত শক্তি-সাম্য স্থাপন

---

* "...that though diplomatists were called on to rebuild, it was on old and encumbered sites." Marriot, p. 120.

† "It is, however, given to few Congresses to legislate for a century, while that of Vienna can at least claim to have inaugurated forty years of peace." Ketelbey, p. 147.

‡ Vienna had the practical merit of giving Europe nearly half a century of comparative peace, and this was what most Europeans most fervently wanted in 1815." David Thomson, p. 75.

নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং (৪) ইওরোপে ভিয়েনা কংগ্রেস এক সুষ্ঠু শক্তি-সাম্য ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া কোন একটি শক্তির পক্ষে ইওরোপের শান্তি বিঘ্নিত করিবার পথ বন্ধ করিয়াছিল। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে মোটামুটি ভাবে ভিয়েনা কংগ্রেস যে-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।*

সমালোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে অযথা রূঢ়

(৫) সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তী কালে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির সমালোচনা করা এবং তাহার ত্রুটি বাহির করা সহজ হইলেও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ যেরূপ পরিস্থিতিতে কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন সেই কথা স্মরণ করিলে তাঁহাদের কার্যাদির সমালোচনা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অহেতুক রূঢ় হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার সমাধান কিভাবে হইয়াছিল? (How were the problems before the Vienna Congress solved ?) :

(১) ইওরোপের পুনর্গঠন কার্যে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। (এই তিনটি নীতির বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

(২) পোল্যাণ্ডের সমস্যা জার আলেকজাণ্ডারের সপক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। তিনি পোজেন ও থর্ন ভিন্ন ওয়ারসো গ্র্যাণ্ড ডাচি'র সমগ্রটাই দখল করিয়াছিলেন।

(৩) স্যাক্সনির সমস্যা অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাশিয়ার সপক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছিল।

(৪) এক অসংবদ্ধ জার্মান জাতীয় সংঘ স্থাপন করিয়া জার্মানির শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত হইয়াছিল। সর্বোপরি ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্য।

(৫) রাইন প্রদেশগুলি প্রাশিয়াকে দান করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

(৬) ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট না করিতে পারে সেই জন্য ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করা হইল। রাইন সীমায় প্রাশিয়াকে আধিপত্য দান, হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের সংযুক্তি, দক্ষিণ-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন, স্যাভয় পরিবারের শক্তিবৃদ্ধি—ইত্যাদি ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতির প্রয়োগ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান

(৭) শক্তি-সাম্য নীতির দিক দিয়া লক্ষ্য রাখিয়া ইংলণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে পুরস্কারস্বরূপ অপরাপর দেশের অংশ দেওয়া হইল।

---

* "... On the whole (Vienna Congress) fairly met both the commission it had received and the demands that could reasonably be made upon its efforts." *The Cambridge Modern History*, vol. ix, p. 671.

(৮) ভিয়েনা চুক্তিতে পূর্বেকার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির শর্তাদিও পালন করা হইয়াছিল। সুইডেনকে নরওয়ে দান ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

এইভাবে সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা লোপ, জার্মান, বেলজিয়ামবাসী প্রভৃতি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইল না, উপরন্তু বহু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

অধ্যায় ৭

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়

(The Concert of Europe)

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (The Concert of Europe) : ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ তাঁহাদের কার্যাদি যাহাতে স্থায়ী হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? ইওরোপের শান্তি ব্যাহত হইতে পারে এমন কোন কিছু স্বভাবতই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইল না। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মনে এক দারুণ ফরাসী-ভীতি জাগিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবে, এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে স্বভাবতই ছিল। সুতরাং কেবলমাত্র শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রাক্-বিপ্লব যুগের যে-রাজনৈতিক কাঠামো তাঁহারা পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন উহাকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত না রাখিতে পারিলে ভিয়েনা চুক্তি ব্যর্থ হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা 'কন্সার্ট অব্ ইওরোপ' (Concert of Europe) বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। এই শক্তি-সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা ও উহার সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলি অব্যাহত রাখা। এইজন্য তাঁহারা আরও দুইটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন ; ইহাদের একটি হইল 'পবিত্র চুক্তি' (Holy Alliance), অপরটি হইল 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Quadruple Alliance)। এই দুই চুক্তির শর্তানুযায়ী ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যে এক ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত হইল, তাহাই কন্সার্ট অব্ ইওরোপ (ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়) নামে পরিচিত।

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)

(১) 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance), 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Quadruple Alliance)

'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance) : রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে 'পবিত্র চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। জার আলেকজাণ্ডার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী ব্যক্তি। বাস্তব বুদ্ধি বা রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান তাঁহার খুবই কম ছিল। তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণ মনের অলীক কল্পনা হইতেই 'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্ভব হয়। এই চুক্তি স্থাপনের ধারণা তাঁহার নিজস্ব নহে। দুই শতাব্দী পূর্বে ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরী 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' (Grand Design) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

জার আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে 'পবিত্র চুক্তি' স্বাক্ষরিত

স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ নাকি তাঁহাকে এ-বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। চতুর্থ হেনরীর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' অনুসারে ইওরোপীয় বিভিন্ন দেশের মোট ৬৬ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি সিনেট বা সাধারণ সভা (Senate or General Council) স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই সাধারণ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপ মহাদেশে অনাবিল শান্তি বজায় রাখা ও ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।* কিন্তু হেনরীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১৬১০) এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাও কার্যকরী হয় নাই। এই সকল পূর্ব-পরিকল্পনার ইতিহাস জার আলেকজান্ডারের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্ব-পরিকল্পনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার আলেকজান্ডার এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা কার্যকর করিতে উদ্যোগী হন। ভিয়েনা সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই তিনি মিত্র-শক্তিবর্গের—অর্থাৎ যে-সকল দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত-ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের সম্মুখে এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সহিত এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হন যে, যুদ্ধ শেষ হইলেই ইওরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুগ্মভাবে ইওরোপের শান্তিরক্ষার জন্য যথাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এভাবেই ভিয়েনা সম্মেলনে জার আলেকজান্ডার তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সুযোগ পাইলেন।

জার প্রথম আলেকজান্ডারের শান্তিরক্ষার পরিকল্পনা

ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি সম্পাদন

জার প্রথম আলেকজান্ডারের ঐকান্তিকতায় 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance) নামে এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, ন্যায়, দয়া ও শান্তি—খ্রীষ্টধর্মের এই তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপীয় রাজগণ তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণ করিবেন। চুক্তিবদ্ধ সকল রাজা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন; তাঁহারা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিবেন এবং নিজ নিজ প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন।† জার আলেকজান্ডার পরিকল্পিত 'পবিত্র-চুক্তি' প্রথমে রাশিয়া,

পবিত্র-চুক্তির শর্তাবলী

* "... to deliver them for ever from the fear of bloody catastrophes so common in Europe; to secure for them an unalterable repose, so that all the Princes might henceforth live together as brothers." Sully, Quoted by Lipson, *Europe in the 19th and the 20th Centuries,* p. 214.

†"The Holy Alliance seemed to imply nothing more than that severeigns were henceforth to regard each other as brothers 'united by the bonds of true and indissoluble fraternity, and their subjects as their children whom they were to rule 'as fathers of families'." *Ibid,* p. 215.

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইংলণ্ড ইহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইল, কারণ ব্রিটিশ সরকার 'পবিত্র-চুক্তি'র অস্পষ্ট, অবাস্তব শর্তাদি গ্রহণ করিয়া নিজ ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিতে চাহিলেন না।* ইংলণ্ড ছাড়া তুর্কী সুলতান এবং পোপও এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অপরাপর প্রতিনিধিবর্গ কেবলমাত্র জার আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টির জন্যই ইহা স্বাক্ষর করিলেন।

'পবিত্র-চুক্তি'তে স্বাক্ষর করিতে ইংলণ্ডের অস্বীকৃতি

'পবিত্র চুক্তি'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া—এই তিনটি স্বৈরাচারী দেশ, এই চুক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়াতে ইহা ইওরোপের জনগণের স্বাধীনতা বিনাশের এক রহস্যাবৃত যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইল। কিন্তু 'পবিত্র-চুক্তি'র পশ্চাতে এইরূপ উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। উপরন্তু জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় দেশগুলিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ 'পবিত্র-চুক্তি'র আদর্শ বহির্ভূত নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ

(১) 'পবিত্র-চুক্তি' নৈতিকতা, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালিত করিতে, এবং (২) ইওরোপীয় রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল। (৩) রাজগণ পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবেন এবং (৪) উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিবেন। আদর্শবাদিতা ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে 'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা ছিল সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতা-বর্জিত, স্বভাবতই বস্তুবাদী জগতে উহার স্থান ছিল না। এই চুক্তি সম্পর্কে সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য উল্লেখ করিলেই 'পবিত্র-চুক্তি'র স্বরূপ বুঝা যাইবে। অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিক্ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্দেশ্য (১) আন্তর্জাতিক কূটনীতি, সততা, ন্যায় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে স্থাপন, (২) নীতি-সম্মত রাজনীতি, (৩) পরস্পর সাহায্য ও সহায়তা, (৪) উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা

* "The English Government withheld its signature, declining to stultify its freedom of action by taking part in a vague and shadowy project which bound the contracting monarchs on all occasions and in all places to lend each other aid and assistance." *Ibid*, p. 215.

"The Holy Alliance was not a treaty; it was a solemn declaration initiated by Alexander and affirmed by the Sovereigns of Europe with varying degrees of seriousness." D. M. Ketelbey : *A History of Modern Europe*, p. 149.

তিনি নিজেই ইহাকে 'অর্থহীন বাগাড়ম্বর' (High-sounding nothing), 'নৈতিকতার বাহ্যাড়ম্বর' (Moral demonstration) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ক্যাসালরি (Castlereagh) ইহাকে 'আদর্শবাদী, অর্থহীন রহস্যাবৃত বাক্যবিন্যাস' (a piece of sublime mysticism and nonsense) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ট্যালিরাঁ পবিত্র-চুক্তিকে 'হাস্যাস্পদ চুক্তি' (Ludicrous contract) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।*

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য

প্রকৃতপক্ষে 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance)-কে 'চুক্তি' নামে অভিহিত করা যায় না। ইহাকে একটি 'পবিত্র ঘোষণা' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। কোন সন্ধি বা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারিগণ সাধারণত কতকগুলি নিশ্চিত দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ইহা ভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি মাত্রেরই উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট থাকে এবং কতকগুলি নিশ্চিত বাস্তব সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'পবিত্র-চুক্তি'র ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা বা বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কতকগুলি অবাস্তব আদর্শ-সংবলিত উচ্ছ্বাস এই চুক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একমাত্র প্রথম আলেকজাণ্ডারই নিষ্ঠার সহিত এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণের অকপট আনুগত্য ইহাতে ছিল না। কেবলমাত্র আলেকজাণ্ডারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাঁহারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। পবিত্র-চুক্তি না ছিল 'পবিত্র', না ছিল 'চুক্তি'। ইহা ছিল একটি ঘোষণাপত্র। স্বাক্ষরকারিগণ যাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন না তাহা আলেকজাণ্ডারের সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ইহার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। অপর দিকে 'চুক্তি' স্থাপনের জন্য যে-নিশ্চয়তা ও বাস্তবতার প্রয়োজন তাহাও এই চুক্তিতে ছিল না।

'পবিত্র-চুক্তি'র প্রকৃতি

'পবিত্র-চুক্তি' - পবিত্রও নহে, চুক্তিও নহে

'পবিত্র-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার মুহূর্ত হইতেই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলেকজাণ্ডার 'পবিত্র-চুক্তি'কে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলেন না।† 'পবিত্র-চুক্তি'র বিফলতার

'পবিত্র-চুক্তি'র বিফলতার কারণ :

* "Metternich dismissed it as a 'high-sounding nothing'; Telleyrand as 'a ludicrous contract'; Castlereagh as 'a piece of sublime mysticism and nonsense." David Thomson; *Europe Since Napoleon*, p. 76, Also vide, D. M. Ketelbey, *A History of Modern Times*, p. 150.

† "All Alexander's efforts were unavailing to provide the transparent soul of the Holy Alliance with a body." Lipson, p. 216.

প্রধান **কারণই ছিল** (১) ইহার অনিশ্চয়তা ও অবাস্তবতা। (২) **ইংলণ্ড ছিল সমসাময়িক** কালের সর্বপ্রধান শক্তি। ইংলণ্ড কর্তৃক এই চুক্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে ইহার বিফলতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। (৩) **আলেক**জাণ্ডার ভিন্ন অপর কেহই অকপটভাবে এই চুক্তি গ্রহণ করেন নাই; স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কাহারোই ইহার আদর্শ মানিয়া চলিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং জার আলেকজাণ্ডারের এই চুক্তি 'পবিত্র-চুক্তি' নামে ভিয়েনা সম্মেলনের পরবর্তী যুগে পরিচিতি লাভ করিলেও তৎকালীন রাজনীতিতে ইহা কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

(১) অবাস্তবতা ও অনিশ্চয়তা

(২) ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

(৩) অকপট আনুগত্যের অভাব

চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance): 'পবিত্র-চুক্তি'র অবাস্তবতার জন্য স্বভাবতই ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব অপর একটি শক্তিসংঘের উপর ন্যস্ত হইল। ইহা 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Quadruple Alliance) নামে পরিচিত। কনসার্ট অব্ ইওরোপ (Concert of Europe) বলিতে বস্তুত চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance)-কেই বুঝায়। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিকের চেষ্টায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'পবিত্র-চুক্তি'র ন্যায় অনিশ্চিত ও অবাস্তব চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেও ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি কার্যকর করিতে এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে ইংলণ্ড ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত যোগদানে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং মেটারনিকের চেষ্টায় ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই চারিটি দেশের মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পন্ন হইল। কনসার্ট অব্ ইওরোপ (Concert of Europe) বলিতে 'পবিত্র-চুক্তি' ও 'চতুঃশক্তি চুক্তি' উভয় সংগঠন বুঝাইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা চতুঃশক্তি চুক্তির কার্যকলাপই বুঝাইয়া থাকে। চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপই হইল ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)-এর উদ্দেশ্য ও কার্য।

চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তি

চতুঃশক্তি চুক্তিই প্রকৃত ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়

চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল: (১) ভিয়েনা ও সংশ্লিষ্ট সন্ধিগুলির শর্তাদি রক্ষা করা; (২) ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য বিপদ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করা; অর্থাৎ বিপ্লবের প্রভাব যাহাতে পুনরায় ফ্রান্সকে আলোড়িত করিতে না পারে এবং ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির স্বাধীনতা যাহাতে বিপন্ন না হয়, সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং ভিয়েনা কংগ্রেসের রক্ষণশীল বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও রক্ষা করা, (৩) এই চুক্তির ষষ্ঠ শর্তে স্থির হইয়াছিল যে, চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিগণ পরস্পর সৌহার্দ্য-বৃদ্ধি এবং ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উহার

চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য:
(১) ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা করা, (২) ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা, (৩) মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া পরিস্থিতি বিবেচনার ব্যবস্থা করা

যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছুকাল অন্তর অন্তর সম্মেলনে সমবেত হইবেন। এই-ভাবে চতুঃশক্তি চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের এক কার্যকর পরিকল্পনা গৃহীত হইল। ইহাই হইল ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি।

এই-লা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক, ভেরোনা ও সেন্ট্ পিটার্সবার্গ-এর কংগ্রেস (Congresses of Aix-la-Chapelle, Troppau, Laibach, Verona & St. Petersburg): চতুঃশক্তি চুক্তির ষষ্ঠ শর্তানুযায়ী* কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর চারিটি কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এই চারিটি শক্তির উপরই ইওরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল।

চতুঃশক্তি চুক্তি বা ইওরোপীয় কনসার্টের চারিটি অধিবেশন

এই-লা-স্যাপেল-এর কংগ্রেস, ১৮১৮ (Congress of Aix-la-Chapelle, 1818): ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেল নামক স্থানে চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারিগণ সমবেত হইলেন। ইহা ছিল ইওরোপীয় কনসার্টের সর্বপ্রথম কংগ্রেস। এই সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর তাঁহাদের আধিপত্য অত্যধিক প্রসারিত হইল এবং এই শক্তি-সমবায় (Concert) সর্বসম্মতিক্রমে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তার মর্যাদা প্রাপ্ত হইল। সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক এই কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাইল। হেসি (Hesse) নামক স্থানের 'ইলেক্টর' 'রাজা' উপাধিলাভের জন্য এই কংগ্রেসের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। জার্মানির রাজগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। মোনাকো (Monaco) নামক স্থানের জনসাধারণ তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারের দাবি করিল। ব্যাডেন (Baden) নামক স্থানের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদিদের নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন এই কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপিত হইল। কংগ্রেস বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় জার্মান রাজগণের অভিযোগের মীমাংসা করিল, এমন কি, সুইডেনের রাজাকে শাসাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। এইভাবে নানাবিধ

এই-লা-স্যাপেল-এর অধিবেশন (১৮১৮), বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান: কংগ্রেস ইওরোপের ভাগ্য-নিয়ন্তাস্বরূপ: (১) সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের আবেদন, (২) হেসি'র ইলেক্টরের 'রাজা' উপাধি প্রার্থনা, (৩) জার্মানির রাজগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা (৪) মোনাকো'র অধিবাসীদের অভিযোগ, (৫) ব্যাডেন ও ইহুদিদের প্রশ্ন

* "To assure and facilitate the execution of the present Treaty, and to consolidate the intimate relations which today unite the 4 sovereigns for the good of the world, the high contracting Parties have agreed to renew, at fixed periods, whether under the immediate auspices of the Sovereigns, or by their representative Ministers, re-unions devoted to the great common interests and to the examination of the measures which, at any of these periods, shall be judged most salutary for the repose and prosperity of the peoples and for the maintenance of peace of the State." *Article VI, 2nd Treaty of Paris*: Grant and Temperley, p.197.

সমস্যা সমাধান করিয়া কংগ্রেস ইওরোপের উপর এক নৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিল।

ফ্রান্সকে ইওরোপীয় কনসার্টের সদস্যরূপে গ্রহণ

ফ্রান্সকে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)-এর সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ফলে ইওরোপে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ফ্রান্সের উপরও আংশিকভাবে বর্তাইল। ফ্রান্স হইতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া ফ্রান্সে মোতায়েন মিত্রশক্তির সৈন্য অপসারণ করা হইল। এইভাবে ফ্রান্সকে বিপ্লবের পূর্বেকার পরিস্থিতিতে পুনঃস্থাপন করা হইল। কিন্তু এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিবর্গ পরস্পর সহযোগিতা

সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য

প্রদর্শন করিলেও এই সহযোগিতার পশ্চাতে মতানৈক্যও দেখা দিল। প্রতিনিধিবর্গ অপরাপর দেশের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তৎপরতা দেখাইলেও যখনই নিজ স্বার্থে আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনই তাঁহারা সেই সমস্যা এড়াইয়া গেলেন। দাস ব্যবসায়

দাস-ব্যবসায় নিবারণের প্রশ্ন

(Slave trade) বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের জাহাজ তল্লাসের প্রস্তাব করিলে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না। অপর দিকে ভূমধ্যসাগর হইতে জলদস্যুতা নিবারণের জন্য রাশিয়া নৌ-বহর দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও ইংলণ্ড তাহাতে স্বীকৃত হইল না,

জলদস্যু দমনের প্রশ্ন

কারণ জলদস্যুগণ ইংরেজ পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহা ভিন্ন, মেটার্নিক্ এবং ক্যাসলরী মৈত্রীর কাল্পনিক ভয়ে ভীত ছিলেন। তদুপরি, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) এবং আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রস্তাব করিলে লর্ড ক্যাসালরি ও মেটার্নিক্ এই দুই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলেন। প্রস্তাব দুইটি স্বভাবতই বাতিল হইয়া

পারস্পরিক সন্দেহ

গেল। এইভাবে পারস্পরিক সন্দেহের মধ্য দিয়া অদূর ভবিষ্যতে ইওরোপীয় কনসার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল ভিয়েনা-কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিকদের সন্দেহ। অপর দিকে জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কনসার্টের সংগঠনকে আরও ব্যাপক করিতে চাহিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, (১) পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমা ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলিবার এবং

জার আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ইওরোপীয় কনসার্টকে ব্যাপক করিবার প্রস্তাব

(২) প্রয়োজনবোধে এক দেশে বিপ্লবাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে অপরাপর দেশ উহা দমনে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি ইওরোপীয় শক্তিগুলির দেওয়া উচিত। একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি এই নীতি মানিয়া লইলে ইওরোপের শান্তিরক্ষা সহজ হইবে, এই ছিল তাঁহার ধারণা।

ইওরোপীয় কনসার্টের স্বৈরাচারী প্রকৃতি

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কনসার্ট ক্রমেই স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিলে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্র

প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কোন্ পথে চলিতেছে তাহার ইঙ্গিত এই ঘোষণাপত্র হইতেই অনুমান করা যায়।

ট্রপো'র কংগ্রেস, ১৮২০ (Congress of Troppau, 1820)ঃ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রপো (Troppau) নামক স্থানে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। এই-লা-স্যাপেল এর কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর সন্দেহ কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল, সে-কথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ট্রপো'র কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হইল। ট্রপো'র কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যা ছিল তিনটিঃ (১) স্পেনবাসী বুর্‌বোঁ বংশীয় রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উদার-নৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। ফলে ফার্ডিনাণ্ড ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। (২) ন্যাপল্‌স্-এর রাজা প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধেও অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। (৩) পোর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জনের বিরুদ্ধে তথাকার জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই প্রথম ফার্ডিনাণ্ড ও ষষ্ঠ জন উভয়েই ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পাইডমণ্ট্ রাজ্যেও অচিরে বিপ্লব সংঘটিত হইতে চলিয়াছিল।

ট্রপো'র কংগ্রেস (Congress of Troppau)

স্পেনীয় সমস্যা

ন্যাপল্‌স্-সমস্যা, পোর্তুগাল-সমস্যা

স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত স্পেনীয়দের বিপ্লব দমন করিবার উদ্দেশ্যে পনর হাজার রুশসৈন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ-ফ্রান্সের মধ্য দিয়া স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রুশ-শক্তির এইভাবে পশ্চিম-ইওরোপে প্রাধান্য অর্জন করা মেটারনিকের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তিনি স্পেনীয় বিদ্রোহ তেমন মারাত্মক নহে, এই অজুহাতে রুশসৈন্য প্রেরণ বা কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানে রাজী হইলেন না। কিন্তু ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ মেটারনিকেরও ভীতির সঞ্চার করিল। দক্ষিণ-ইতালিতে বিদ্রোহ শুরু হইলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধীন রাজ্যাংশেও বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় মেটারনিক্ ন্যাপল্‌স্‌কে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে-পরিস্থিতিতে তিনি স্পেনের বিদ্রোহে হস্তক্ষেপে রাজী হন নাই, ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতেই তিনি ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা তাঁহার সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। মেটারনিক্ নিজ স্বার্থেই ট্রপো'র কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে কট্‌জেবু (Kotzebue)-র হত্যাকাণ্ডের ফলে জার আলেকজাণ্ডারেরও উদার মতবাদের পরিবর্তন ঘটিল। ইওরোপের শান্তিরক্ষার জন্য বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমন করা প্রয়োজন এবং এইজন্য

জার আলেকজাণ্ডার ও মেটারনিকের মতৈক্য

শান্তিপূর্ণভাবে এমন কি, প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তির সাহায্যেও ইওরোপীয় কনসার্টের পক্ষে যে-কোন দেশের অভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করা উচিত, এ-বিষয়ে জার আলেকজান্ডার প্রিন্স মেটারনিকের মত মানিয়া লইলেন। 'প্রোটোকোল অব্ ট্রপো' (Protocol of Troppau) নামে এক ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, কোন দেশে যদি বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দেখা দেয়, কিংবা বিপ্লবাত্মক কার্যাদির ফলে সেই দেশের রাজা যদি উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করিতে বাধ্য হন এবং তাহার ফলে যদি অপর দেশের শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ঐ দেশ ইওরোপীয় কনসার্টের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের জন্য ইওরোপীয় কনসার্ট সামরিক ও বেসামরিক সাহায্য দান করিবে। ইংলন্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরি এইরূপ পন্থা অবলম্বনের বিরোধিতা করিলেন। কারণ গণতান্ত্রিক ইংলন্ডের পক্ষে বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। ঐ সময় হইতে ইংলন্ড ইওরোপীয় কনসার্ট সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করিলেও ইওরোপীয় কনসার্ট হইতে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ফ্রান্সও ট্রপো'র প্রোটোকোল গ্রহণ করিল না। কিন্তু স্পেনে পুনরায় বিপ্লবাত্মক গোলযোগ শুরু হইলে এবং স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে স্পেনের বুরবোঁ আধিপত্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হইল। এদিকে গ্রীকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিক্ ইহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না।

ট্রপো'র প্রোটোকোল (Protocol of Troppau)

ইংলন্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরি'র তীব্র প্রতিবাদ

ইংলন্ড ও ফ্রান্সের প্রোটোকোল গ্রহণে অসম্মতি

স্পেনের বিদ্রোহ : ফ্রান্সের মতের পরিবর্তন

লাইব্যাক-এর কংগ্রেস, ১৮২১ (Congress of Laibach, 1821) : ট্রপো'র কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধানের পূর্বেই উহার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। লাইব্যাক-এর কংগ্রেসের অধিবেশনে সেগুলির সমাধান করা হইল। ন্যাপলসের সিংহাসনে ফার্ডিনান্ডকে পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়াকে সামরিক সাহায্য দানের অনুমতি দেওয়া হইল। মেটারনিক্ কালবিলম্ব না করিয়া ফার্ডিনান্ডকে ন্যাপলসের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে পাইডমন্ট্-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিক্ সেখানে এক বিরাট অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া সেখানকার বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দমন করিয়া ইতালিকে পুনরায় রক্ষণশীল শাসনাধীনে আনিলেন। ফলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অব্যাহত রহিল। এইভাবে ইতালির উদারনৈতিক আন্দোলনের অবসান ঘটাইয়া মেটারনিক্ ইতালিকে বিপ্লবী প্রভাবমুক্ত করিলেন।

ন্যাপলসে মেটারনিকের হস্তক্ষেপ

ভেরোনা'র কংগ্রেস, ১৮২২ (Congress of Verona, 1822) : ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনা (Verona)-এর কংগ্রেসের গ্রীস ও স্পেনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। ইংলন্ড

গ্রীকদের স্বাধীনতার ব্যাপারে উৎসুক ছিল। এইজন্য ইংরেজ সরকার এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সের স্বার্থ স্পেনের রাজ-পরিবারের সহিত জড়িত থাকায় স্বভাবতই ফ্রান্স এই কংগ্রেসে যোগদান করিল, এমন কি, স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ভেরোনা'র অধিবেশনে স্পেন সম্পর্কে সংঘবদ্ধভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। স্পেনের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য দানের ভার ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করা হইল। স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে দমন করিবার জন্য কন্‌সার্ট কর্তৃক স্পেনকে সাহায্য করিবার এবং স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে হস্তক্ষেপের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ড আপত্তি জানাইল* এবং এককভাবে স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে ফ্রান্সের সাহায্যে স্পেনে পুনরায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যখন স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ মন্‌রো (President Monroe) প্রথমে (১৮২২) স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং পর বৎসর তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮২৩)। মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এক বাণী (Message) প্রেরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট মন্‌রো স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন যে, ইওরোপীয় কোন শক্তি কর্তৃক দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশে হস্তক্ষেপ অথবা ইওরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমেরিকা মহাদেশের কোন অংশে প্রয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করিবে না। এইরূপ কার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে।† মন্‌রো নীতি ব্রিটিশ সরকার সমর্থন করিলে মেটারনিক্ ও তাঁহার কন্‌সার্ট অব্ ইওরোপ আর স্পেনের দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির

ভেরোনা'র কংগ্রেস (Congress of verona)

ইংলণ্ড কর্তৃক কংগ্রেস ত্যাগ: আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত

'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine)

আমেরিকা কর্তৃক স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত

* "Canning who regarded Congresses with suspicion sent the instruction that, if that was a determined project to interfere by force or by menace. then, *come what may*, England will not be a party", Grant & Temperley, p. 185.

† "We should consider any attempt on the part of these absolute monarchies of Europe 'to extend their systems to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety', and we could not view any interposition for the purpose of oppressing the South American States or controlling in any other manner their destiny by any European power, in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States."—*Monroe Doctrine*, Vide, Hazen, p. 51.

স্বাধীনতা দমন করিতে সাহসী হইলেন না। মনরো নীতি ঘোষণার অন্যতম প্রধান ফলশ্রুতি ছিল দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার স্থায়িত্ব এবং পরোক্ষভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসাহদান।

সেন্ট্ পিটার্সবার্গের কংগ্রেস (Congress of St. Petersburg): ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং ভেরোনা'র কংগ্রেসে ইওরোপীয় কনসার্টের কর্মপন্থার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহে ইওরোপীয় কনসার্টের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে-নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইওরোপীয় কনসার্টের পতন ঘটিয়া গিয়াছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, ইতিমধ্যে স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহাত্মক গোলযোগের অবসান ঘটিলে স্পেনরাজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি এ-বিষয়ে ইওরোপীয় কংগ্রেস আহ্বান করিলে ক্যানিং উহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলেন (১৮২৩)। ফলে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন সম্ভব হইল না। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আর কোন কংগ্রেসে যোগদানে অস্বীকৃতি ইওরোপীয় কনসার্টের পতনের শেষ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার তুরস্ক ও গ্রীসের সমস্যার সমাধানকল্পে সেন্ট্ পিটার্সবার্গে কংগ্রেসের এক অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ইহাতেও ব্রিটেন যোগদান করিবে না, এ-কথা ক্যানিং জানাইলেন। যাহা হউক, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেন্ট্ পিটার্সবার্গে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন শুরু হইল, কিন্তু অপরাপর যোগদানকারী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। উপরন্তু তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিলে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস তথা ইওরোপীয় কনসার্ট ভাঙ্গিয়া গেল (মে, ১৮২৫)।

স্পেন কর্তৃক আহূত কংগ্রেস ইংলন্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

সেন্ট্ পিটার্সবার্গের কংগ্রেস—তথা ইওরোপীয় কনসার্টের পতন

ইওরোপীয় কনসার্টের প্রকৃতি (Cuaracter of the European Concert): ইওরোপীয় কনসার্ট ইওরোপের জনগণের প্রতিনিধির অথবা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সদস্যবর্গের সংগঠন ছিল না। ইহা ছিল ইওরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের একটি ঐক্যবন্ধন। একমাত্র ইংলন্ড ভিন্ন অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্র মাত্রই ছিল স্বৈরাচারে বিশ্বাসী। এই কনসার্ট বা শক্তি-সমবায়ের প্রকৃতির এক অদ্ভুত বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইওরোপীয় কনসার্ট যখন প্রথম সংগঠিত হয়, তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করা। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে কনসার্ট অব্ ইওরোপ ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু এই-লা-স্যাপেল-এর কংগ্রেস হইতে ইহা ক্রমেই প্রমাণিত হইল যে, যদিও এই

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের ঐক্যবন্ধন

এই-লা-স্যাপেল-এর কংগ্রেস হইতেই কনসার্টের স্বার্থপরতার নীতি গ্রহণ

শক্তি-সমবায় বা কন্‌সার্ট-এর সদস্যগণ সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা করিবেন বলিয়া ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি নিজ নিজ স্বার্থের বিরোধী কোন কিছুই তাঁহারা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; দাস-ব্যবসায় বন্ধ করা এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুতা নিবারণের প্রশ্ন লইয়া সদস্যবর্গের মতভেদ এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

ট্রপো'র কংগ্রেসের সময় হইতে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট এক আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণত হয়। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সর্বপ্রকার প্রকাশকে বলপূর্বক রুদ্ধ করিয়া ভিয়েনার ও তৎ-সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলির শর্তাদি পালন করা। ঐ সময় হইতেই গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে কন্‌সার্টের মত মানিয়া চলা সম্ভব হইল না। মেটারনিকের হস্তে এই সংগঠনটি সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের মূল উৎপাটনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করাই ছিল এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কন্‌সার্ট আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণত

কন্‌সার্ট গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল আশা ও আদর্শ দমনের যন্ত্র-বিশেষে পরিণত

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Concert of Europe): ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের বিফলতার কারণ উহার সংগঠন, প্রকৃতি ও কার্যকলাপের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। প্রথমত, ইহা ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির সংঘবিশেষ। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ছিল স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে এইরূপ রাষ্ট্রসংঘের প্রতি ঘৃণা উপজাত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

(১) স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসংঘ

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় কন্‌সার্টের মূল ভিত্তি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া যে শক্তি-সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত উহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবপ্রসূত জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ইতিহাসের ইঙ্গিত অমান্য করিতে চাহিয়াছিল। ফলে, প্রাক্‌ বিপ্লবের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় স্থাপন করিবার প্রয়াস স্বভাবতই সাফল্য লাভ করিল না। মূল-উৎপাটিত বৃক্ষকে কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে সজীব রাখা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা শুকাইয়া যাইবেই—ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থার পুনঃস্থাপনের চেষ্টাও ঐরূপে অবাস্তবতাহেতু শেষ পর্যন্ত বিফল হইয়াছিল।

(২) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার বিরোধী

তৃতীয়ত, ইওরোপীয় কন্সার্টের সদস্য-রাষ্ট্রের স্বার্থের বিভিন্নতা তাহাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থের ঐক্য তাহাদের মধ্যে ছিল না। বিপ্লবের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রভৃতি দমন করাই ছিল তাহাদের পরস্পর ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। এই কারণে ইংলণ্ডের সহযোগিতা তাহাতে ছিল না। ক্রমে ইওরোপীয় কন্সার্ট প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি রাষ্ট্রের—অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এক সংকীর্ণ স্বার্থপর সংঘে পরিণত হইয়াছিল।

(৩) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের অনৈক্য

চতুর্থত, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতার জন্যও এই শক্তি-সমবায় বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল—অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (Non-intervention), কিন্তু অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, এমন কি, স্পেনের বিদ্রোহের ব্যাপারে ফ্রান্সও অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রধান পন্থা ও নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ট্রপো'র প্রোটোকোল এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(৪) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতা

পঞ্চমত, ট্রপো'র প্রোটোকোল ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় হইতেই ইওরোপীয় কন্সার্টের পতন শুরু হয়। ভেরোনা'র কংগ্রেসে ইংলণ্ড কর্তৃক আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার স্বীকৃতিদান ও ইওরোপীয় কন্সার্ট ত্যাগ উহার পতনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 'মন্রো নীতি' ঘোষণার ফলে ইওরোপীয় কন্সার্টের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আরও কিছুকাল ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইওরোপীয় কন্সার্টের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

(৫) ইওরোপীয় কন্সার্টের পতনোন্মুখতা: ইংলণ্ড কর্তৃক ট্রপো'র প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যাত, ইংলণ্ড ও আমেরিকা কর্তৃক স্পেনের উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার, মন্রো নীতি

ষষ্ঠত, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-তুরস্কের সমস্যা সমাধানের জন্য জার আলেকজাণ্ডার সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে পর পর দুইটি ইওরোপীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সম্মেলনেই সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। জার আলেকজাণ্ডার ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় কন্সার্টের উপর বিশ্বাস হারাইয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ঘোষণা করেন যে, রুশ-তুর্কী সমস্যা—অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের সমস্যার (Eastern Question) সমাধানে রাশিয়া কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ ও বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইওরোপীয় কন্সার্ট হইতে রাশিয়ার অপসারণ কন্সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের শেষ অধ্যায় বলিয়া

(৬) সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক: ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মিলিত চেষ্টায় রাশিয়ার অনাস্থা

বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার পরেও অবশ্য হল্যান্ড-বেলজিয়ামের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'কন্‌ভেন্‌শন্‌ অব্‌ লণ্ডন' (Convention of London) নামে ইওরোপীয় শক্তি-বর্গের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ইহাতে হল্যান্ড কর্তৃক বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল।

হল্যান্ড-বেলজিয়াম সমস্যা ঃ লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শন্‌—বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত

(৭) রাজতন্ত্র দৃঢ়-ভিত্তিতে স্থাপনের অপচেষ্টা

সপ্তমত, ইওরোপীয় কন্‌সার্ট তথা কংগ্রেস-ব্যবস্থার মাধ্যমে ইওরোপীয় রাষ্ট্রনেতাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। তদানীন্তন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই চেষ্টার বিফলতা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

(৮) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং-এর বিরোধিতা

অষ্টমত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ইওরোপীয় কন্‌সার্ট উপেক্ষা করিয়াছিল। ব্রিটিশ উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং এই কারণেই কংগ্রেস-ব্যবস্থা তথা ইওরোপীয় কন্‌সার্টের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।*

সর্বশেষে, এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, অত্যাচার ও দমন-নীতির দ্বারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ ইওরোপীয় দেশগুলিকে দীর্ঘকাল পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে ইওরোপের সর্বত্র উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। মেটারনিক্‌ এই বিপ্লব দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারি) ফরাসী বিপ্লবের বন্যায় মেটারনিক্‌ও স্বয়ং ভাসিয়া গেলেন। ইওরোপীয় কন্‌সার্টের আন্তর্জাতিক পুলিশী দমন-নীতির প্রধান নিয়ন্তা মেটারনিকের পতন ঘটিল। এইভাবে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল প্রভাবকে দমন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

(৯) জুলাই বিপ্লব, ১৮৩০

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ১৮৪৮

---

* Grant & Temperley, pp. 183-85.

অধ্যায় ৮

ফরাসী-বিপ্লবোত্তর যুগে ইওরোপ (১৮১৫-'৪৮)
(Europe after the French Revolution 1815-'48)

১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ বা ১৮৫০ পর্যন্ত যে-যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল সেই যুগে ইওরোপের ইতিহাসে তেমন কোন প্রগতিশীল ধারা পরিলক্ষিত হয় নাই। শিল্প, কারিগরি এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে যদিও যথেষ্ট অগ্রগতি এই যুগে ঘটিয়াছিল, অপরাপর ক্ষেত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপ হইতে ১৮৪৮ বা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের পার্থক্য খুব বেশী ছিল বলা চলে না। এই সময়কালে বেলজিয়াম হল্যান্ড হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল; গ্রীস, তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল; কয়েকটি রাষ্ট্রের রাজপদের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল; ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল; গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মনে হতাশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কারণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র সেই সময়ে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের যাহা কিছু রাজনৈতিক প্রগতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। ইহার মূল কারণ ছিল এই যে,* ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৮১৫-'৪৮) যে-যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা প্রাধান্যলাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। একটি ধারা ছিল স্বৈরতন্ত্রের, অপরটি ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের। মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কন্সার্ট (Concert of Europe) চাহিয়াছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি উদারনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে, অপর দিকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ চাহিয়াছিল কৃত্রিম উপায়ে পুনরুজ্জীবিত স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতে। সম্মুখ সংগ্রামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ জয়ী না হইলেও আপাতদৃষ্টির অন্তরালে সেই যুগে উদারনৈতিক ধারা এক সর্বজয়ী শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল।

শিল্প, কারিগরি ও সাহিত্য ক্ষেত্র ভিন্ন প্রগতিশীলতার অভাব

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা: (১) স্বৈরতন্ত্র, (২) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

ফ্রান্স, ১৮১৫-৪৮ (France, 1815-48): বিপ্লবের উৎপাতস্থল ফ্রান্স ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী যুগেও ফ্রান্সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক ফ্রান্সে বুরবোঁ শাসনের পুনঃস্থাপন স্বভাবতই বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত ফরাসী জাতির মনঃপূত হইল না। অষ্টাদশ লুই-এর সিংহাসন-লাভে কায়েমী স্বার্থের (vested interest) পুনঃস্থাপন, নির্বাসিত রাজতান্ত্রিকদের (royalists) পুনরাগমন ও পূর্বেকার প্রাধান্যলাভের চেষ্টা তাহাদের মনে

বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা: ফরাসী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী

---

* Vide: *A History of Modern Times*, p. 145, C. D. M. Ketelbey.

স্বভাবতই ভীতির সৃষ্টি করিল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন ফরাসী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইল। ফলে, ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ চাহিল ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে এবং রাষ্ট্র ও চার্চের ঐক্যের ভিত্তিতে রাজতন্ত্র ও ধর্মকে পূর্ব-মর্যাদায় ফিরাইয়া আনিতে। ধর্ম-শিক্ষার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ফিরাইয়া আনিবার এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অনুকূলে গড়িয়া তুলিবার ভার পড়িল চার্চের উপর। উগ্র রাজতান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় পুনঃস্থাপিত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে চাহিল তাহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে।

ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী দলে বিভক্ত

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের চেষ্টা

বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন-লাভের পূর্বে মিত্রশক্তি, বিশেষত জার আলেকজাণ্ডারের সনির্বন্ধতায় তাঁহাকে এক সনন্দ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসনের ব্যবস্থা (Ancient Regime) ত্যাগ করিয়া নিয়মানুগ রাজতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল। এই সনন্দে মানুষের মধ্যে সমতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনমূলক আইনসভা প্রভৃতি উদারনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু অপর দিকে বিপ্লব-প্রভাবিত ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লবের আতিশয্য না চাহিলেও বিপ্লব-প্রসূত সুফলগুলিকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাহারা রাজতন্ত্রের সহিত বিপ্লবের এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

অষ্টাদশ লুই-এর সনন্দ

শর্ত ঃ সাম্য, ধর্ম-পালনের ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনমূলক আইন-সভা, সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার, উগ্র রাজতান্ত্রিকদের স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের ইচ্ছা ঃ জনসাধারণ বিপ্লবের সুফল রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

অষ্টাদশ লুই, ১৮১৫-২৪ (Louis, XVIII, 1815-24) ঃ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূচনা হইল। লুই তাঁহার সনন্দ অনুসারে নির্বাচনমূলক আইনসভা, ধর্মনৈতিক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। দুই কক্ষযুক্ত আইনসভার (Chamber of Peers and Chamber of Deputies) উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান করিয়া অষ্টাদশ লুই ফরাসী শাসনব্যবস্থাকে কতকাংশে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে, অন্তত দৃশ্যত ফরাসী শাসনব্যবস্থা

অষ্টাদশ লুই কর্তৃক সনন্দ অনুসারে শাসনব্যবস্থা স্থাপন

একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশ অপেক্ষা সর্বাধিক গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিল। ফরাসী জনসাধারণের নিকট তাঁহার শাসন জনপ্রিয় না হইলেও একেবারে অসহনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার উগ্র সমর্থক দল ও মন্ত্রিগণ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। প্রথমেই তাঁহারা বিপ্লবের কালে গৃহীত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী বুরবোঁ বংশের পতাকা গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের সহকারী মার্শাল নে (Ney)-কে তাঁহারা হত্যা করাইলেন। কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ন করা হইল। স্বভাবতই ইহাতে জাতির আনুগত্য দৃঢ় না হইয়া ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয়, অষ্টাদশ লুই ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবিহিত ছিলেন। বিপ্লবের পরে রাজপদের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ অপেক্ষা তাঁহার ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট। কাজেই তিনি তাঁহার উগ্র সমর্থকদের আত্মঘাতী পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথাও তিনি ভুলিয়া যান নাই। নির্বাসিত জীবন অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক রাজপদও তিনি শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে অষ্টাদশ লুই-এর মানসিক অবস্থা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী জাতীর সম্মুখীন সমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল ছিল। তথাপি নির্বাচিত আইনসভায় রাজতান্ত্রিকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় সরকারী নীতি স্বভাবতই বিপ্লব-বিরোধী হইল। ট্যালিরাঁর উদার নেতৃত্বের পরিবর্তে ডিউক ডি-রিশল্যু'র (Due-de-Richelieu) নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকদের মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কিন্তু রিশল্যু ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি উগ্রপন্থীদের অনেক দাবিই সাময়িক ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। তথাপি আইনসভায় উগ্র রাজতান্ত্রিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাঁহার পক্ষে বেশীদিন স্বাধীনভাবে চলা সম্ভব হইল না। তিনি উগ্রপন্থীদের চাপে নেপোলিয়নের আমলের জাতীয় ঋণের দুই-পঞ্চমাংশ অস্বীকার করিতে এবং বিপ্লবে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের উপর হইতে আইনের নিরাপত্তা অপসারণ করিতে অগ্রসর হইলে অষ্টাদশ লুই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ দিলেন (১৮১৬)। এইরূপে সাময়িকভাবে রাজতন্ত্রের বিপদ কাটিলে রিশল্যু নিজ নীতি সম্পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ লাভ করিলেন। কারণ, আইনসভায় উগ্র রাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য নাশ হইয়া তখন উদারনৈতিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। রিশল্যু পরবর্তী দুই বৎসর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেলের কংগ্রেসে তিনি ফ্রান্সকে

রাজতন্ত্রের সমর্থকদের উগ্রতা

অষ্টাদশ লুই-এর বিচক্ষণতা

আইনসভায় উগ্রপন্থীদের সংখ্যাধিক্য

ডিউক-ডি-রিশল্যুর মন্ত্রিত্ব

উগ্রপন্থীদের আত্মঘাতী নীতি: লুই কর্তৃক নূতন আইনসভা গঠন

উদারনৈতিক প্রাধান্য

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পঞ্চম সদস্য হিসাবে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অংশ দান করিলেন। ইতিমধ্যে উদারপন্থীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় রিশ্‌ল্যুকে পদত্যাগে বাধ্য করা হইল এবং ডেকাজে (Decazes) উদারপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।

রিশ্‌ল্যু'র স্থলে উদারপন্থী ডেকাজে'র মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

উগ্রপন্থীদের আমলে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার স্বাধীনতা নাশ করা হইয়াছিল, ডেকাজে তাহা পুনঃপ্রবর্তন করিলেন। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থার সুফল দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু এমন সময়ে লোভেল (Louvel) নামক এক উন্মত্ত ব্যক্তি আর্টোয়েস-এর ডিউক-পুত্র ডিউক-ডি-বেরি (Duc-de-Berri)-কে হত্যা করিলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ডিউক-ডি-বেরি ছিলেন ফরাসী সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে (১৮২০) ডেকাজে'র মন্ত্রিত্বের পতন ঘটিল। উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ এই সুযোগে অষ্টাদশ লুই-এর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল এবং রিশ্‌ল্যুকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইল। তিনি সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া ভোটদানের অধিকার দান প্রভৃতি গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু রিশ্‌ল্যু'র কর্মপন্থা তথাপি উগ্র রাজতান্ত্রিকদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইল।

ডেকাজে'র প্রজা-হিতৈষী শাসনব্যবস্থা

ডিউক-ডি বেরি'র হত্যার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়া

ডেকাজে'র পতন : রিশ্‌ল্যুর মন্ত্রিত্ব : প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা

রিশ্‌ল্যুর পর ভিলীল (Villele) উগ্রপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। উগ্রপন্থীদের উগ্রতা কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইলেও তিনি চার্চ অর্থাৎ ধর্মাধিষ্ঠান ও অর্থনীতি এই দুই অস্ত্রের ব্যবহারে ফরাসী জাতিকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত করিতে চাহিলেন। একদিকে তিনি চার্চকে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি জনগণের আনুগত্য সৃষ্টির কাজে লাগাইলেন, অপর দিকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জাতির মনকে বিপ্লবের পথ হইতে অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার কর্মপন্থা ছিল সূক্ষ্ম ও আপাতদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াবিহীন। এইভাবে অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে ফরাসী শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্‌ সিংহাসনে বসিলেন।

ভিলীল কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

ভিলীলের কর্মপন্থা : অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা

দশম চার্লস্‌, ১৮২৪—জুলাই, ১৮৩০ (Charles X, 1824—July, 1830) : অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উগ্র রাজতান্ত্রিকদের পক্ষে প্রতিক্রিয়ার সীমা লঙ্ঘনের

শেষ বাধাটুকুও অপসারিত হইল। অষ্টাদশ লুই রাজতন্ত্রের সংকট মুহূর্তে একাধিকবার গভীর বিবেচনা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্ সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এই ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের মনে আশার সৃষ্টি করিলেও অল্প-কালের মধ্যেই তিনি ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই-এর উদার-নীতির ঘোর বিরোধী।

দশম চার্লসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি : ফরাসী জাতির বিদ্বেষ

তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম তিন বৎসর ভিলীল (Villele) মন্ত্রিপদে আসীন ছিলেন। সেই সময়ে দশম চার্লস্ ফরাসী বিপ্লবে যে-সকল অভিজাত ব্যক্তি সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করিলেন। যাহারা বিপ্লবের কালে দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকেও উপযুক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। এই সকল বিষয়ে আইনসভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই দশম চার্লসের শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব্যাপক হইয়া উঠিল। বিপ্লবের যাবতীয় সুফল দশম চার্লস্ বিনষ্ট করিতে চাহিতেছেন, এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। দশম চার্লসের অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থায় ভিলীল বেশীদিন মন্ত্রিত্ব করিতে পারিলেন না। দশম চার্লস্ যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা চালাইতে শুরু করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আইনসভায় সরকারের বিরোধী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জাতীয় বাহিনীর (National Guard) আনুগত্য দিন-দিনই হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ভিলীল আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ জয়ী হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। দশম চার্লস্ এইবার মার্টিগ্‌নাক্ (Mortignac)-কে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলেন। মার্টিগ্‌নাক্ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্টিগ্‌নাক্-এর মধ্যপন্থা উদারপন্থী বা রক্ষণশীল কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ফলে, তিনি পদত্যাগ করিলেন। এইবার দশম চার্লস্ পোলিগ্‌নাক্ (Polignac) নামক এক কূটনৈতিক ধুরন্ধরকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। দশম চার্লস্ যেমন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, তেমনি ছিলেন যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন এবং আইনসভা বা পার্লামেন্ট-বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ইচ্ছাধীন। ইহাতে আইনসভার মতামতের কোন অবকাশ নাই।* ফলে, তাঁহার আমলে গোলযোগ সৃষ্টি হইতে

যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

পোলিগ্‌নাক্ মন্ত্রী নিযুক্ত

*"I would rather saw wood, than be a king of the English type." —*Charles X*, vide Hazen, p. 89.

অধিক সময় লাগিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিয়া জাতিকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই সুযোগে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া একক-অধিনায়কত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি আলজিয়ার্স (Algiers) নামক স্থানে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানের সাফল্যের ফলে আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। তারপর তিনি বেলজিয়াম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে পোলিগ্নাক্ ঘোষণা করিলেন যে, শাসন-ব্যাপারে যাজক সম্প্রদায়কে তাহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করাই তাঁহার নীতি হইবে। বিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল পরিবর্তন নাকচ করিয়া তিনি ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, উদ্ধত অভিজাত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মের নামে শোষণ পুনঃস্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।* পোলিগ্নাক্ ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-পদ্ধতি জাতীয় প্রতিনিধি-সভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের (Chamber of Deputies) উদারপন্থী সদস্যগণের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা পোলিগ্নাকের অপসারণ দাবি করিলেন। কিন্তু দশম চার্লস্ নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় পোলিগ্নাক্কে মন্ত্রিপদে বহাল রাখিলেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অপর কাহারো মতামতের ধার ধারিবেন না, এইরূপ ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্সের ভাগ্য-বিড়ম্বনার ইতিহাস হইতে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিলেন না।† তাঁহার পরামর্শে পোলিগ্নাক্ স্বৈরাচারী শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে চারিটি বিশেষ ঘোষণা জারি করিলেন।

আলজিয়ার্সে সামরিক অভিযান

অভিজাত ও যাজক প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা

পোলিগ্নাকের অপসারণ দাবি

পোলিগ্নাকের স্বৈরাচারী চারিটি ঘোষণা :

(১) ফরাসী জাতীয় সভা বা পার্লামেন্ট (Chamber of Deputies) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হইল; (৩) ভোটদাতাগণের সংখ্যা হ্রাস করিয়া সম্পত্তির ভিত্তিতে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত করা হইল; তিন-চতুর্থাংশ ভোটদাতার নাম ভোটদাতার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল। (৪) এই

*"He (Polignac) was chauvinist which was bad; ultra-clerical which was worse, an enemy of the Parliament which was fatal."—Grant & Temperley, *Europe in the 19th Century*, p. 192.

† "There is no such thing as political wisdom. With the warning of James II before him Charles X is setting up a government by priests, through priests and for priests". Duke of Wellington Quoted by Ketelbey, p. 159; Lipson, p. 14.

নূতন তালিকানুযায়ী অল্পসংখ্যক নাগরিকের ভোটে নূতন পার্লামেন্ট নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। এই ঘোষণা জারি হওয়ার পরের দিন প্যারিস নগরীতে বিদ্রোহ দেখা দিল (২৬শে জুলাই, ১৮৩০)। (অষ্টাদশ লুই-স্বাক্ষরিত) 'সনন্দ অক্ষয় হউক', 'মন্ত্রিসভার নিপাত চাই' ধ্বনিতে প্যারিস নগরীর রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। সরকার পক্ষের সৈন্যগণ অনেকেই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মত হইল। ২৮শে জুলাই ফ্রান্সে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। দশম চার্লস্ পরিস্থিতির চাপে উপরি-উক্ত ঘোষণা নাকচ করিতে এবং উদারপন্থীদের সহিত বিরোধ মিটাইতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তখন মিটমাটের আর অবকাশ ছিল না। অর্লিয়েন্সের ডিউক লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। দশম চার্লস্ ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন করিয়া ইংলন্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লুই ফিলিপ বুরবোঁ বংশসম্ভূত হইয়াও ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঘোষণার সরাসরি ফল: জুলাই বিপ্লব (১৮৩০)

দশম চার্লস্ কর্তৃক আপসের বৃথা চেষ্টা: লুই ফিলিপের সিংহাসন লাভ

জুলাই (১৮৩০) **বিপ্লবের গুরুত্ব** (**Importance of the July (1830) Revolution**): **ফ্রান্সে** (**Within France**): আপাতদৃষ্টিতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে নাই বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লব ফ্রান্স এবং ইওরোপের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছিল।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা

ফ্রান্সের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, (১) উদারপন্থিগণ দশম চার্লস্‌কে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনে সমর্থ হয় নাই। উদারপন্থীদের অনেকেই ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু যে-আশা লইয়া তাহারা প্যারিস নগরীর রাজপথে দশম চার্লসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহা সফল হইল না। কিন্তু ঐ সময়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, দশম চার্লসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হইলে ইওরোপের মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের বিরোধিতা শুরু করিবে আশঙ্কা ছিল। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হইত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের কথা স্মরণ করিয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গ হয়ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত। এই কারণে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লুই ফিলিপকে সিংহাসনে স্থাপন ভিন্ন অপর কোন পন্থা ছিল না। লুই ফিলিপ বুরবোঁ বংশ-সম্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের সপক্ষে কিছুকাল যুদ্ধও করিয়াছিলেন।*

অভ্যন্তরীণ ফলাফল: রাজা পরিবর্তিত হইলেও রাজতন্ত্র অটুট

* Louis Philippe ... who was a Bourbon but had fought in the ranks of the revolutionaries at Jammapes". *Europe in the Nineteenth Century*, Lipson, p. 16.

(২) রাজতন্ত্রের অবসান না হইলেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। জরুরী পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল; সর্বপ্রকার আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধি সভার (Chamber of Deputies) হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। সর্বসাধারণকে ভোটদানের অধিকার অবশ্য তখনও দেওয়া হইল না। লুই ফিলিপের প্রশাসন ছিল মধ্যবিত্তের উপর নির্ভরশীল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জনতার হাত হইতে জুলাই বিপ্লবের বিজয়ের ফলাফল নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ১৮৩০ হইতে ১৮৪৮ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় প্রাধান্য ভোগ করিয়াছিল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক অধিকার নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, কারণ ভোটদানে অধিকার বৎসরে ২০০ ফ্রাঁ যাহারা কর দিত তাহারাই ভোগ করিত এবং পার্লামেন্টে সদস্য হইতে হইলে বৎসরে অন্তত ৫০০ ফ্রাঁ কর দিতে হইত। ফলে জনতা অর্থাৎ কৃষক-মজুর যাহারা জুলাই বিপ্লবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিল এবং বিপ্লবকে কার্যকরী রূপদান করিয়াছিল তাহাদের হাত হইতে বিপ্লবের সাফল্যের ফল অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার মধ্যবিত্তের হাতে চলিয়া গেল।*

গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

মধ্যবিত্তের উপর নির্ভরশীল প্রশাসন

(৩) রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে না পারিলেও এবং জনসাধারণকে ভোটাধিকার না দিলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) ন্যায়ই ফরাসী শাসনব্যবস্থায় রাজগণের ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতানীতি (Divine Right of Kingship) চিরতরে লুপ্ত করিল। রাজার ক্ষমতা ভগবানপ্রদত্ত, এই নীতির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব নীতি গৃহীত হইল। লুই ফিলিপ জনমতের ভিত্তিতে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।† বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতাকার স্থলে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা গৃহীত হইল।

ভগবানপ্রদত্ত রাজশক্তির ধারণা বিলুপ্ত

ন্যায্য-অধিকার নীতির স্থলে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য স্বীকৃত

(৪) এই বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 'ন্যায্য-অধিকার' (legitimacy) নীতি ফ্রান্স কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। 'ন্যায্য-অধিকার'-এ শাসন-ক্ষমতার উপরে স্থান পাইল জনমত।

(৫) এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। এই অর্লিয়েন্স বংশ মোট অষ্টাদশ বৎসর ফ্রান্সে রাজত্ব করিয়া পরিস্থিতি বিবেচনায় জনসাধারণের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহা প্রমাণ করিয়াছিল। উগ্র রাজতান্ত্রিক এবং যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও তাহাদের প্রাক্-বিপ্লবযুগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা

ফ্রান্সে-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত

* *Ibid*, p. 17.

† "The king will respect our rights, for it is of us that he will hold his own." Quoted by Lipson, p. 17.

হইল। জুলাই বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল।* এখন হইতে সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন, শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। অষ্টাদশ লুই সিংহাসন-লাভের সময় যে-সনন্দ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা হইতে ফরাসী জাতির জন্মগত ও অপরিবর্তনীয় অধিকারে পরিণত হইল।

জুলাই বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপূরক

যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র রাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ

(৬) জুলাই বিপ্লবের ফলে যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র রাজতান্ত্রিকদের স্থলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। উদারপন্থী মধ্যবিত্ত সমজাই জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল। রক্ষণশীলরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, পক্ষান্তরে উদারপন্থীরা এই বিপ্লবের ফলে সাহস ও উদ্যম সঞ্চয় করিল।

ইওরোপে (**In Europe**): ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব দাবাগ্নির ন্যায় মুহূর্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। (ক) বেলজিয়ামে এই বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে এক গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করিল। বেলজিয়ামবাসিগণ ভিয়েনা সম্মেলনের অন্যায়মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল এবং হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ পরিবারের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ঐ বৎসরই লণ্ডন কনভেনশনে (Convention of London) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় দেশগুলি স্বীকার করিয়া লইল।

ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গভীর আগ্রহের সৃষ্টি

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা

(খ) জার্মানিতে জুলাই বিপ্লবের ফলে এক ব্যাপক গণজাগরণ শুরু হইল। কোন কোন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া খণ্ডযুদ্ধেরও সৃষ্টি হইল। স্যাক্সনি, হ্যানোভার, হেসি প্রভৃতি বিভিন্ন জার্মান রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কনসার্টের নেতা মেটারনিকের তৎপরতা ও সাহায্যে জার্মানির সর্বত্র পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া স্বৈরাচারের পুনঃপ্রবর্তন করা হইল। স্যাক্সনির উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করা হইল না সত্য, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে ইহার কোন মূল্য রহিল না।

সাময়িকভাবে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন: মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরাচারের পুনঃস্থাপন

* "In short, the Revolution of 1860 was the complement of the Revolution of 1789; for the future, the achievements of the revolutionary spirit—the principles of equality, secularism and constitutional liberty rested on secure foundation." *Ibid*, p. 18.

পোলদের স্বাধীনতা-স্পৃহা : রুশ দমন-নীতি

(গ) রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হইল। জার আলেকজাণ্ডার পোলগণকে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থাধীনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র পুনঃস্থাপন করিতে এবং পোল্যাণ্ডের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে চাহিল। দীর্ঘ ছয় বৎসর তাহারা রুশ-শক্তির বিরুদ্ধে যুঝিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল। ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া তাহাদিগকে সরাসরি রুশ সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল।

ইতালির পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্যে বিপ্লব—অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

(ঘ) ইতালির পার্মা, মোডেনা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি নানা অংশে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে অস্ট্রিয়া উহা কঠোর হস্তে দমন করিল।

(ঙ) সুইটজারল্যাণ্ডেও জুলাই বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হইল।

পোর্তুগাল ও স্পেনে বিপ্লবের প্রভাব : ইংলণ্ডের উপর প্রভাব : ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন

(চ) পোর্তুগাল ও স্পেনের জনসাধারণ জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ হইল। জুলাই বিপ্লবের পূর্ব হইতেই স্পেনে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চলিতেছিল। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগের ফলে স্পেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডেও জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পৌঁছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল বুঝিলেন যে, গণতান্ত্রিক প্রভাব হইতে ইংরেজ জনসাধারণকে দমন করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। জুলাই বিপ্লবের পরোক্ষ ফল হিসাবে ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন গৃহীত হইল।

জুলাই বিপ্লবের আংশিক সাফল্য

মোট ফলের দিক হইতে বিচার করিলে, জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে কেবলমাত্র ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি স্থানে এই বিপ্লবের প্রভাবে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনও জনসাধারণের দাবি পূরণ করে নাই। এমন কি, ফ্রান্সেও জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজকেই ক্ষমতা দান করিয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিকগণ ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই বিপ্লব-প্রসূত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হয় নাই। এই কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে পুনরায় এক বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এই বিপ্লব ভগবানপ্রদত্ত

ফ্রান্সের ইতিহাসে বিপ্লবের গুরুত্ব

ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং বিপ্লব-প্রসূত সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিল। ইওরোপের ইতিহাসেও গণতন্ত্র

ও জাতীয়তাবোধ যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যে-ব্যাপক জাগরণ ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই দুইটি ধারা স্বৈরাচারী শক্তিবর্গের অত্যাচারে অন্তর্মুখী হইয়াছিল মাত্র, নিশ্চিহ্ন হয় নাই এবং সুযোগ পাইলেই অত্যাচারের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়াও আত্মপ্রকাশ করিবে, এই সত্যই জুলাই বিপ্লব-প্রসূত জাগরণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তা অন্তর্মুখী

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, সে-আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই সকল বিপ্লব কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ সমধর্মী ছিল।*

বিভিন্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য

প্রথমত, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই সূত্রে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি সামরিক নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। জনসাধারণ বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সেই সকল বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণের কোন সুযোগ পায় নাই। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে যে-সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল সেগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। ফলে, এই সকল বিদ্রোহে গণতান্ত্রিকতার প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। জুলাই বিপ্লবের ব্যাপকতার ফলে মেটারনিক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমগ্র ইওরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(১) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব,—গণতান্ত্রিকতা

দ্বিতীয়ত, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা চুক্তিতে যে-রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করাই ছিল জুলাই বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল।

(২) রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধিতা

তৃতীয়ত, নেপোলিয়ন-উত্তর যুগে ইওরোপে যে-ব্যাপক অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল উহাও জুলাই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচ্য। এই অর্থনৈতিক কারণও তখন সকল দেশে বিদ্যমান ছিল।

(৩) অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও দুর্বলতা

চতুর্থত, জুলাই বিপ্লব-প্রসূত বিভিন্ন বিপ্লবের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঐক্য বা সমতা পরিলক্ষিত হয় বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে। এই সকল বিপ্লবের সর্বপ্রধান ও মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা—অর্থাৎ সরকারকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও সমাজকল্যাণকামী করিয়া তোলা।†

(৪) সমাজ ও সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা

* Vide : David Thomson : *Europe Since Napoleon*, p. 114.

† "What they had in common was a desire to bring Governments into closer relationship with society, as society had developed upto that date". *Ibid*, p. 114.

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ শাসন ও লুই ফিলিপের শাসনের পার্থক্য (Difference between the administration of the Restored Bourbons and that of Louis Philippe) : ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের ফলে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রথম কয়েক বৎসর চালু ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রজাবর্গের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থ-নৈতিক সুযোগ এবং আইনের চক্ষে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে একমাত্র ইংলন্ড ভিন্ন সমগ্র ইওরোপে ফ্রান্স-ই সর্বাধিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইয়াছিল। ডিউক-ডি-বেরি'র হত্যার পূর্বাবধি অষ্টাদশ লুই-এর শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট উদারপন্থী ছিল, সে-কথা অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ লুই নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া উদারপন্থা অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : প্রথম ভাগে উদারপন্থী শাসন

কিন্তু ডিউক-ডি-বেরি'র হত্যাকান্ডের ফলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে যে-ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, অষ্টাদশ লুই-এর শাসনকালের অবশিষ্টাংশে তাহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গকে দুইটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা দান প্রভৃতি এই প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ইহার পর বিপ্লবের প্রভাব হইতে ফরাসী জাতিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিল। এইভাবে অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর ফরাসী শাসনব্যবস্থা ক্রমেই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম অভিব্যক্তি ঘটে অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা দশম চার্লসের অধীনে। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া,

ডিউক-ডি-বেরি'র হত্যাকান্ড : প্রতিক্রিয়ার শুরু

রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তিবাদী করিয়া এবং অষ্টাদশ লুই কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনন্দ মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেও তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। ক্রমেই তাঁহার শাসনব্যবস্থা অধিকতর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত পোলিগনাক্ মন্ত্রিসভা জাতীয় আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সংকুচিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইনসভা গঠন করিতে চাহিলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিলে ও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দিবার ব্যবস্থা করিলে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

দশম চার্লসের আমলে প্রতিক্রিয়ার চরম পর্যায়

লুই ফিলিপ জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন। পুনঃস্থাপিত বুরবোঁ রাজগণের শাসন অপেক্ষা অর্লিয়েন্স বংশোদ্ভূত লুই ফিলিপের শাসন নানাদিক দিয়া উন্নত ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

প্রথমত, লুই ফিলিপের সিংহাসন-লাভে ন্যায্য-অধিকার নীতির পরাজয় এবং ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী বুরবোঁ শাসনের অবসান ঘটিয়া জনসাধারণের নির্বাচিত রাজার শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। **নীতির দিক দিয়া ইহা গণতন্ত্র ও উদার রাজনীতির জয়ের সূচনা করিয়াছিল।**

ভগবানপ্রদত্ত রাজক্ষমতার নীতির অবসান

দ্বিতীয়ত, কার্যকলাপের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও লুই ফিলিপের শাসনকাল বহুগুণে উদারপন্থী ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দশম চার্লস্ বিপ্লবের নীতি ও অবদানকে অগ্রাহ্য করিয়া অভিজাতবর্গকে তাহাদের সম্পত্তির জন্য বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলেন। বিপ্লবের কালে যে-সকল রাজতন্ত্রের সমর্থক দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকেও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। লুই ফিলিপের আমলে এই সকল বিপ্লবের নীতি-বিরোধী সুযোগ-সুবিধা নাকচ করা হইয়াছিল। দশম চার্লস্-প্রবর্তিত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভূ-সম্পত্তি দানের আইনের ফলে পুনরায় ভূ-সম্পত্তি একই হস্তে সঞ্চিত হইবার যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও নাকচ করা হইল। ফলে, বিরাট পরিমাণ ভূ-সম্পত্তির মালিক শ্রেণী আর গড়িয়া উঠিতে পারিল না। আইনসভার উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পত্তির ভিত্তিতে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারিল না।

উদারপন্থী কার্যকলাপ

বিপ্লব-বিরোধী আইন-কানুনের পরিবর্তন

তৃতীয়ত, পূর্বে যে-পরিমাণ সম্পত্তি থাকিলে ভোটাধিকার পাওয়া যাইত, তাহার প্রায় অর্ধেক সম্পত্তি থাকিলেই এখন ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল।

ভোটাধিকারের প্রসার

চতুর্থত, রাজার দেহরক্ষী এখন জাতীয় বাহিনী হইতে লইবার ব্যবস্থা করা হইল। পূর্বে রাজকীয় দেহরক্ষিগণকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নিয়োগ করা হইত। কিন্তু বিপ্লবের পর জাতীয় বাহিনীর একাংশের হস্তে রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইবার অর্থ ছিল এই যে, রাজা জনসাধারণেরই মনোনীত রাজা, তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব জনসাধারণের।*

রাজা জনসাধারণেরই মনোনীত রাজা

পঞ্চমত, ধর্মাধিষ্ঠান যাহাতে শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে সেজন্য 'ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম'—এই শর্তটি সংবিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

শাসনব্যবস্থায় ধর্মাধিষ্ঠানের প্রাধান্য নাশ

ষষ্ঠত, লুই ফিলিপের আমলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা কৃষক-মজুরদের শাসনক্ষমতা স্বীকৃত না হইলেও জমিদার ও যাজক শ্রেণীর হাত হইতে শাসনক্ষমতা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দিক দিয়া ইহাও অগ্রগতির পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মধ্যবিত্তের শাসন

লুই ফিলিপ, ১৮৩০—'৪৮ (Louis Philippe, 1830—'48): লুই ফিলিপ শাসক হিসাবে যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার সিংহাসন-লাভের পশ্চাতে যে জনগণের সমর্থন রহিয়াছে এবং এই সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখার উপরই যে তাঁহার নিজের এবং নিজ বংশের সিংহাসনে অধিকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, এই কথা তিনি কখনও ভুলেন নাই। ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার স্থলে তিনি যে জনসাধারণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজ পুত্রদিগকে সাধারণ স্কুলে ছাত্র হিসাবে ভর্তি করিলেন। সাধারণ নাগরিকদের

লুই ফিলিপের সাধারণ নাগরিক-সুলভ ব্যবহার

* Vide, *World History*, F. Fueter, pp. 67-68.

ন্যায় রাস্তায় তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং যে-কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার বক্তব্য শুনিতেন। এইভাবে তিনি 'নাগরিক রাজতন্ত্রের' (citizen monarchy) সূচনা করিলেন। বিপ্লবের মূল নীতির প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং এই কারণে তিনি বুরবোঁ রাজবংশের আমলে জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া বিপ্লব-যুগের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফিলিপ্পির আদেশেই সেন্ট্ হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ ফ্রান্সে আনীত হইয়াছিল এবং উহা উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে এক মনোরম সমাধি-সৌধে সমাহিত করা হইয়াছিল। লুই ফিলিপ্পির পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি রক্ষা করিয়া চলা এবং দেশের বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করা। এইরূপ উদারনৈতিক এবং জনকল্যাণকর শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতি কেন যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ ফ্রান্সের সমসাময়িক পরিস্থিতিতে খুঁজিতে হইবে। অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপ্প অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবার এবং প্রতিনিধিমূলক বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্কার, যথা পার্লামেন্টের কার্যকলাপের পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিকরণের সুযোগ ছিল। ভিলীল বা পোলিগ্নাকের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী কেহ তখন ছিলেন না। কিন্তু সেই সময়ে পার্লামেন্টের (Chamber of Deputies) বিভিন্ন দল কোন নীতি অনুসরণ অপেক্ষা ক্ষমতা হস্তগত করিবার পরস্পর-প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকিবার ফলে সেই সুযোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিপ্লবের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীলতা

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার

ফ্রান্সে গণতন্ত্র সুদৃঢ় করিবার সুযোগ নাশ

জাতীয় সভা পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলের নেতা গিজো (Guizot) যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্য লইয়া চলিতেছিলেন। পক্ষান্তরে উদারপন্থী নেতা থিয়ার্স (Thiers) চরম উদারপন্থী দলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ যাজক এবং চরম উদারপন্থী দল উভয়ই ছিল সেই সময়কার পরিস্থিতিতে স্থাপিত বুরবোঁরাজ লুই-এর নাগরিক রাজতন্ত্রের বিরোধী। ফলে গিজো এবং থিয়ার্স নিজেদের যেমন ক্ষমতা ও মর্যাদার নাশ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রেরও সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

গিজো ও থিয়ার্সের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ ও পরস্পর প্রতিযোগিতা

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও গিজো এবং থিয়ার্স একই ধরনের আপস মনোভাব লইয়া চলিয়াছিলেন। গিজো ইংলন্ডের সহিত 'আঁতাত কর্ডিয়েল' (Entente Cordiale) নামক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া আঁতাত কর্ডিয়েল ত্যাগ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে থিয়ার্স আঁতাত কর্ডিয়েলের বিরোধী ছিলেন।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে গিজো ও থিয়ার্সের বিরোধী নীতি

লুই ফিলিপের ব্যর্থতা ও পতনের মূলে ছিল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাঁহার গৌরব অর্জনের অক্ষমতা। প্রথমত, জুলাই বিপ্লব ফরাসী জাতির মনে যে-আশার সঞ্চার করিয়াছিল, লুই ফিলিপের শাসন সেই আশানুরূপ কার্য করিতে পারে নাই। (ক) ন্যায্য-অধিকার নীতিতে যাহারা বিশ্বাসী (Legitimists) ছিল তাহারা দশম চার্লসের বংশধরকে সিংহাসন দানের পক্ষপাতী এবং ভগবানপ্রদত্ত রাজশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং জনসাধারণের নির্বাচিত লুই ফিলিপের প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য ছিল না। (খ) উগ্র ক্যাথলিকরা ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা দশম চার্লসের আমলে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। (গ) প্রজাতান্ত্রিকগণ লুই ফিলিপের শাসন একক-অধিনায়কত্বের নামান্তর বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহারা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, লুই ফিলিপের শাসনকালে শ্রেণী-নির্বিশেষে ফরাসী জাতির উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ক্রমেই তাহারা দেখিতে পাইল যে, লুই ফিলিপ গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র কোনটিই মানিয়া চলেন না। তিনি এক মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা না-ছিল রক্ষণশীল, না-ছিল উদারপন্থী, না-ছিল নরমপন্থী। স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিকগণ লুই ফিলিপের শাসনব্যবস্থায় মোটেই খুশি হইল না। (ঘ) লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) নামক—একজন ফরাসী সমাজতান্ত্রিকের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সে সেই সময়ে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়। তাহারা লুই ফিলিপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল।* প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা, কারখানাগুলির জাতীয়করণ এবং ধনী পুঁজিপতিদের বিলোপ-সাধনের তাহারা পক্ষপাতী ছিল। (ঙ) নেপোলিয়নের অধীনে সৈনিকের কাজ করিয়াছে এমন এক শ্রেণীর লোক এবং নেপোলিয়নের প্রতি শ্রদ্ধাবান সাধারণ লোক লইয়া 'বোনাপার্টিস্ট' (Bonapartist) দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা নেপোলিয়নের পরিবার-সম্ভূত লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সিংহাসন-প্রাপ্তির পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন কারণে লুই ফিলিপের সিংহাসন লাভে ও শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না।

ফিলিপের পতনের কারণ : অভ্যন্তরীণ

(ক) ন্যায্য-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট, আশানুরূপ কার্যসম্পাদনের অক্ষমতা

(খ) উগ্র-ক্যাথলিকদের অসন্তোষ

(গ) প্রজাতান্ত্রিকদের আশাভঙ্গ

(ঘ) সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যবিত্ত-প্রাধান্যের বিরোধিতা

(ঙ) নেপোলিয়ন-ভক্তদের নেপোলিয়নের বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপনের ইচ্ছা

এই সময় হইতেই সমাজতন্ত্রের সূচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। লুই ব্লাঁ কাজ করিবার অধিকার (Right to work) দাবি করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের

* "Louis Philippe committed a fatal mistake in not broadening the basis of his rule". Lipson, p. 26.

ফ্রান্সের অনেক ব্যক্তি এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, "ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগ শেষ হইয়াছে, পরবর্তী বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব হইতে বাধ্য।"*

দ্বিতীয়ত, লুই ফিলিপ্পের আমলে ফরাসী জাতির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে কোন শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুল বুরবোঁ পরিবারের সপক্ষে লা ভেণ্ডি (La Vendee) ও প্রভেন্স্ নামক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। স্ট্রাস্‌বার্গ ও বোলোন নামক স্থানে ১৮৩৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন। ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাধারণ লোকেরাও বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। এই সকল কারণে স্বভাবতই লুই ফিলিপ্পের শাসন দৃঢ় হইতে পারিল না।

অভ্যন্তরীণ শান্তির অভাব

তৃতীয়ত, জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসন্তোষের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল লুই ফিলিপ্প ততই অসহায় হইয়া পড়িতেছিলেন। নির্বাচিত জাতীয় সভার অধিকাংশ সভ্য ছিলেন গিজো (Guizot) নামক নেতার অধীনে। কিন্তু ক্রমেই সেই সভায় এক সংস্কারপন্থী দলের উদ্ভব হইল। এই দলের নেতা ছিলেন থিয়ার্স (Thiers)। থিয়ার্স ও তাঁহার সমর্থকগণ ভোটদানের ক্ষমতার প্রসার দাবি করিলেন। তাঁহাদের দাবির কোন মূল্যই দেওয়া হইল না। ক্রমে থিয়ার্সের দলের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র সংস্কারের দাবি উত্থিত হইল। 'গিজোর মন্ত্রিসভার পতন', 'ভোটাধিকারের প্রসার' প্রভৃতি দাবি ফ্রান্সের সর্বত্র ধ্বনিত হইল। লুই ফিলিপ্প ও তাঁহার পরিবারের সকলকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করা হইল। ইহাতে লুই ফিলিপ্প ভীত হইলেন। তিনি সংস্কার-সাধনে রাজি হইলেন, কিন্তু গিজো তখনও সংস্কারের পরিপন্থী রহিলেন। লুই গিজোকে পদচ্যুত করিলেন; কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। গিজোর পদচ্যুতি এবং লুই ফিলিপ্পের উদারনৈতিক সংস্কার-সাধনে সম্মতি সংস্কারপন্থীদের নিরস্ত করিল বটে, কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক দল জনসাধারণকে সেই সুযোগে রাজতন্ত্রের তথা লুই ফিলিপ্পের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। পদচ্যুত মন্ত্রী গিজোর বাসস্থানের সম্মুখে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে উচ্ছৃংখল জনতা রক্ষীদের উপর গুলিবর্ষণ করিলে রক্ষিদল পাল্টা গুলিবর্ষণ করিয়া জনতার কয়েক জনকে হত্যা করিল (২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮)। এই সূত্রে প্যারিসের সর্বত্র মারামারি শুরু হইল। পরদিন (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮) লুই ফিলিপ্প তাঁহার পৌত্রের সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইভাবে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিকদের চেষ্টায় রাজতন্ত্রের পতন ঘটিল।

লুই ফিলিপ্পের অসহায় অবস্থা

গিজো'র নিয়োগ ও পদচ্যুতি

বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে গুলি-চালনা

প্যারিসের সর্বত্র উচ্ছৃংখলতা: ফিলিপ্পের সিংহাসন ত্যাগ

---

† "The time for purely political revolution is past, the coming revolution cannot but be a social revolution". *Ibid*, p. 23.

আড়ম্বরপ্রিয় ফরাসী জাতি লুই ফিলিপের শান্তিবাদী পররাষ্ট্র-নীতির মধ্যে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির তথা উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মত কোন কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা ক্রমেই কোনরূপ উত্তেজনার অভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রজাতান্ত্রিক নেতা লা মার্টিন বলিয়াছিলেন, 'ফ্রান্সের বৈচিত্র্যহীন শাসনজনিত অবসাদ' (la France's ennuie) ফিলিপের পতনের প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে লুই ফিলিপ গৌরব-লোভী ফরাসী জাতিকে সম্মোহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ শান্তিবাদী নীতিতে উন্মাদনার অভাব

দুর্বল পররাষ্ট্র-নীতি

(ক) জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া ইতালি ও পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসী জাতি আশা করিয়াছিল যে, লুই ফিলিপ সেই দুই দেশে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্য ও সমর্থন করিবেন, কিন্তু লুই ফিলিপ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিলেন। (খ) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার শীর্ষে স্থাপিত ফরাসীরাজ নিজেকে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-অন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্থাপন করিতে পারিলেন না। বেলজিয়ামবাসীরা লুই ফিলিপের পুত্রকে বেলজিয়ামের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে বেলজিয়াম ফ্রান্সের অধীনে আসিত। কিন্তু পামারস্টোনের কূটকৌশলে তাহা কার্যকরী হইল না। এই অকৃতকার্যতার জন্য লুই ফিলিপ ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইলেন।

ইতালি ও পোল্যাণ্ড

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলন

(গ) মিশরের পাশা মহম্মদ আলি তুরস্ক আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ তুরস্কের পক্ষ গ্রহণ করিল। ফ্রান্স কিন্তু মহম্মদ আলিকে সমর্থন করিল। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় তুরস্ক-মিশর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। এ-ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের নেতৃত্বই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, ফ্রান্স মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ মর্যাদা নাশ করিয়াছিল। (ঘ) স্পেনের রাজকন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া লুই ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তারপর অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাবে সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট অধিবাসীদের দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা উদারপন্থী ফ্রান্সের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। (ঙ) আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আলজিয়ার্স ছিল ফরাসী-অধিকৃত স্থান। সেই সময়ে আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিস্তার ব্যাপারে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু লুই ফিলিপ ইংলণ্ডের ভয়ে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদালোভী ফরাসী জাতির সম্মুখে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলে ফ্রান্সের প্রাধান্যের স্মৃতি তখনও ম্লান হয় নাই। সেইজন্য লুই

মিশর-তুরস্ক আন্দোলন

ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা নাশ

আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের অকৃতকার্যতা

ফিলিপ্পের শান্তিবাদী, উন্মাদনাহীন পররাষ্ট্র-নীতি তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। তাঁহার পতনের ইহাও ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

ঐতিহাসিক লিপ্‌সন (Lipson) একটি প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপন করিয়াছেন যে, লুই ফিলিপ্প যদি ইওরোপে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব-প্রসূত বিপ্লবে সাহায্য করিতে গিয়া যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতেন তাহা হইলে তিনি কি তাঁহার রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিতেন? ফল নিশ্চয়ই সর্বনাশাত্মক হইত। পুনরায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের পাশা মহম্মদ আলি তুর্কী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে যেখানে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ তুরস্কের সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময়ে ফরাসী জনসাধারণের ইচ্ছানুক্রমে থিয়ার্স মন্ত্রিসভা মহম্মদ আলির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল ইওরোপের সহিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ফ্রান্সকে জড়াইয়া ফেলা। লুই ফিলিপ্প পর-রাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণ নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। তিনি থিয়ার্সের মতের বিরুদ্ধে মিশরের পাশা মহম্মদ আলিকে তুর্কী সাম্রাজ্য গ্রাস হইতে বিরত হইতে জানাইলেন। কিছুকাল পর ফরাসী জনমত সাম্রাজ্যবাদী তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে মহম্মদ আলির আক্রমণকে সমর্থন করিয়া যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমশ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলে লুই থিয়ার্সকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। গিজো পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ফ্রান্সকে ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে গিয়া এইভাবে পররাষ্ট্র-নীতিতে ফরাসী জাতিকে মাতাইয়া রাখিবার সুযোগ লুই গ্রহণ করেন নাই। পররাষ্ট্র-নীতির এই ব্যর্থতার প্রভাব তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতিকে পূর্ণমাত্রায় প্রভাবিত করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক লিপ্‌সনের মন্তব্য

সমালোচনা

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে দশম চার্লসের পতন এবং লুই ফিলিপ্পকে সিংহাসনে স্থাপনের মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধ বাদিতা ছিল উহা লুইয়ের পতনের পথ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। লুই ফিলিপ্প কেবল নামে-মাত্র রাজা হইতে মানসিক দিক দিয়া প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিক হইতে গিজো'র রক্ষণশীল দল রাজার উপর পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চাহিলেন, রাজাও সেই চেষ্টা প্রতিহত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। লুই ফিলিপ্পের শাসন আপাতদৃষ্টিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যায় দেখাইলেও এবং মন্ত্রি-সভা পার্লামেন্টের নিকট দায়ী এই নীতি মৌখিকভাবে স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে লুই নিজে ক্ষমতাহীন শাসক হিসাবে নিজেকে পরিণত করিতে চাহেন নাই। ক্ষমতাহীন রাজা হইবার ইচ্ছা তাঁহার কখনই ছিল না।* ফলে রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হইত। গিজোকে পদচ্যুত করিবার পর মোলিকে, তারপর থিয়ার্সকে, এইভাবে প্রায় সকল মন্ত্রীকে তিনি

মন্ত্রীদের সহিত লুই ফিলিপ্পের মতানৈক্য : লুই-এর রাজ-ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা

* "...he had no intention of being a *rois fainéant*" *Ibid*, p. 24.

পদচ্যুত করিয়াছিলেন। থিয়ার্সের পদচ্যুতির পর গিজোকে মন্ত্রী নিয়োগ করিলে তিনি অবশ্য ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন। শেষবারের মত গিজোকে পদচ্যুত করিয়া থিয়ার্সকে পুনর্নিয়োগের ব্যর্থ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে লুইকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলাফল ও গুরুত্ব (Effects & Importance of the February Revolution, 1848) : **ফ্রান্সে (In France) :** ফেব্রুয়ারি

সমাজতন্ত্রী, প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের মিলিতভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন

বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদী প্রজাতান্ত্রিকগণ এবং সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকগণ মিলিতভাবে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করিল। লা মার্টিন (La Martine) হইলেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান নেতা। ফ্রান্সের জাতীয় সভার (Chamber of Deputies) সদস্যদের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া এই অস্থায়ী সরকারের কার্যনির্বাহক (Executive) সমিতি গঠিত হইল। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী লুই ব্লাঁ (Blanc) এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন। প্রথমেই লুই

ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত

ফিলিপের পৌত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইল। জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যে-কোন শ্রেণীর লোক যোগদান করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইল।

উদারনৈতিক ব্যবস্থা

সকলের জন্যই আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা, মজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা এবং প্রজাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা, এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা

বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফরাসী দেশে ঐ সময়ে একবার করা হইয়াছিল। শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণকর করিয়া তোলাই ছিল এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্য। লুই ব্লাঁ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা

অজ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য হইতে জনগণকে উদ্ধারের চেষ্টা

করা, দারিদ্র্য হইতে মানুষকে রক্ষা করা ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অজ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য—দুই প্রকার 'দাসত্ব' হইতে জনগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মর্যাদায় স্থাপন করা সরকার-মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন।" বলা বাহুল্য, প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিবিধানে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

সরকারী কারখানা স্থাপন : বিফলতা

সরকারের তত্ত্বাবধানে কারখানা স্থাপন করিয়া দরিদ্র শ্রমিকদের উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সুনিশ্চিত পরিকল্পনার অভাব হেতু এই পরীক্ষা সফল হইল না। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার বিফলতার পশ্চাতে সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের একনিষ্ঠ সহযোগিতার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

অস্থায়ী সরকার অতঃপর প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শাসনপদ্ধতি স্থির করিতে মনো নিবেশ করিলেন। (১) প্রথমেই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের "নাগরিক অধিকারের ঘোষণা'র (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) অনুকরণে একটি অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Rights) প্রকাশিত হইল। (২) প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ৭৫০ জন সদস্যের এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। (৩) জনগণের ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা স্থির হইল। এই রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন : নাগরিক অধিকারের ঘোষণা

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা

জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিল এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য নাশ করিয়া জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। এই দিক হইতে বিচারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছিল। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এই সময়ই সমাজতন্ত্রের বাস্তব পরীক্ষা শুরু হইয়াছিল। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রধান দাবিই ছিল "কাজের অধিকার" (Right to Work)।

মধ্যবিত্ত প্রাধান্য নাশ, জনগণের প্রাধান্য স্থাপন

ইওরোপে (In Europe): ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব এক প্রবল ঝটিকার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ মহাদেশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপীয় কন্‌সার্টের অত্যাচারে বিনষ্ট না হইয়া বরঞ্চ প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইওরোপের পনরটি বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র ইওরোপে এক মানসিক প্রস্তুতি পূর্ববর্তী অষ্টাদশ বৎসর (১৮৩০-১৮৪৮) যাবৎ চলিতেছিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যেন একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইঙ্গিতে সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইওরোপের উপর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ

জার্মানির প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, বেভেরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt) নামক স্থানে এক বিপ্লবী পার্লামেন্ট জার্মানির রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃত্ব হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিয়া সেই স্থানে প্রাশিয়াকে স্থাপন করিতে এবং প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মকে জার্মানির সিংহাসন দান করিতে চাহিয়াছিল। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নাই। প্রাশিয়ার রাজা

জার্মানি

ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজে ছিলেন উদারপন্থী। তিনি নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। জার্মানির অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে—যথা ভিয়েনা, মিলান, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিক্ স্বয়ং আত্মরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মেটারনিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় কন্সার্ট বা মেটারনিক্-ব্যবস্থার (Metternich System) অবসান ঘটিল।

অস্ট্রিয়া

ইতালির সিসিলি, টাস্কেনি, ন্যাপল্‌স্, মোডেনা পার্মা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেক স্থানের শাসক-ই আত্মরক্ষার্থ উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ দেশ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

ইতালি

সুতরাং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র ফ্রান্সের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এমন নহে। ঐ বৎসর ইওরোপে এমন ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে "বিপ্লবের বৎসর" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সর্বত্র বিপ্লব শুরু হওয়া তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছিল। এজন্য মেটারনিক্ বলিয়াছিলেন, "ফ্রান্সের সর্দি হইলে সমগ্র ইওরোপ হাঁচে।"* ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এই বিপ্লবের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে স্বৈরাচারী শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং ইতালিতেও বিপ্লবিগণ পরাজিত হয়। এই দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজগণকে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে উৎসাহিত করে। সুতরাং গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব খুব কার্যকরী হইয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু এইজন্য এই বিপ্লবের গুরুত্ব কোন প্রকারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত

প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা গুরুত্ব বেশী

প্রথমত, এই বিপ্লবের ফলে 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich System) অর্থাৎ মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কন্সার্ট কর্তৃক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দমনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, প্রগতিশীল ভাবধারাকে বলপূর্বক নির্মূল করা সম্ভব নহে।

(১) 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা'র পতন

* "When France catches cold Europe sneezes."—Metternich, vide, Ketelbey, p. 176.

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় কনসার্ট ভিয়েনা চুক্তিকে কার্যকরী করিবার এবং প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিবার যে-চেষ্টা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বিফল হইল। যুগধর্মের ও ঐতিহাসিক গতির বিরুদ্ধে কোন পূর্বতন ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নহে, এই সত্যই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রমাণিত করিল।

(২) প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল

তৃতীয়ত, এই বিপ্লব-প্রসূত জাগরণের ফলে জার্মানি ও ইতালির সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইল। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই পরবর্তী কালে জার্মানি ও ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল।

(৩) জার্মানি ও ইতালিতে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

চতুর্থত, গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিপ্লবের দান নেহাত কম ছিল না। এই বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং ইহার প্রভাব ক্রমে সমগ্র ইওরোপে বিস্তারলাভ করে।

(৪) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার

পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতেই প্রথম শুরু হয়। পরবর্তী যুগে এই সমাজতান্ত্রিক প্রভাব সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা কার্যকরী করিবার চেষ্টা এই বিপ্লব হইতেই শুরু হয়। ইও-রোপের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না।

(৫) সমাজতান্ত্রিক শাসনের সর্বপ্রথম চেষ্টা

ষষ্ঠত, এই বিপ্লবের ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর কৃষকগণ ভূমি-দাসত্ব (serfdom) হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। স্বৈরাচারী শাসন পুনঃস্থাপিত হওয়ার পরও কৃষকদের এই স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় নাই।

(৬) কৃষকদের ভূমি-দাসত্বের অবসান

সপ্তমত, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মশক্তির তৎপরতায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব দমন করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, তথাপি জার্মানির রাজগণের অনেকেই কতক পরিমাণ শাসনতান্ত্রিক উদারতা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিপ্লবের ফলে রাজগণের ক্ষমতা ভগবানপ্রদত্ত, এই ধারণা জার্মানির জনসাধারণের মন হইতে দূরীভূত হইয়াছিল।

(৭) আংশিক সাফল্য

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত আন্দোলনের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Revolutionary Movements following the February Revolution) : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল উহার সূত্র ধরিয়া ইওরোপের অন্তত পনরটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব সর্বত্রই বিফল হইয়াছিল। ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ১৭৮৯

খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সহিত তুলনীয়। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক দিয়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিল। এজন্য ইহাকে ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক বলা উচিত হইবে। কিন্তু এই বিপ্লব ইওরোপীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ হইল না। এই বিফলতার নানাবিধ কারণ ছিল।

বিফলতার বিভিন্ন কারণ

আদর্শ, কার্যকলাপ প্রভৃতির অনৈক্য

প্রথমত, ইওরোপের বিভিন্ন অংশের বিপ্লবিগণের উদার জাতীয়তাবাদী আদর্শে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও তাহাদের এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। ইহা ভিন্ন তাহাদের বিপ্লবী ধারা, কার্য-কলাপ প্রভৃতির কোন একতা, ঐক্যমূলক সংগঠন বা যোগাযোগ ছিল না।*

শহরাঞ্চলে বুদ্ধি-জীবীদের নেতৃত্বের দুর্বলতা

দ্বিতীয়ত, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রায় সর্বত্রই ইহা শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইয়াছিল। প্যারিস, ব্রুসেলস, রোম, বার্লিন, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, লণ্ডন, বার্মিংহাম এই সকল শহর ছিল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। শহরাঞ্চলে স্বভাবতই বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র-সমাজ, কবি, সাংবাদিক প্রভৃতির হস্তে। রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য এই ধরনের বুদ্ধিজীবী নেতৃবর্গের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার করিলেও তাঁহাদের নেতৃত্ব কার্যকরী ভাবে বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। ইহাই ছিল এই ধরনের নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটি।†

ভূস্বামী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লব-বিরোধিতা

তৃতীয়ত, জমির মালিকরাও উদারনৈতিক বিপ্লবের বিরোধী ছিল। এমন কি, যে-সকল দেশে পূর্বেকার বিপ্লবের ফলে অভিজাত সম্প্রদায় হইতে কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তরিত হইয়াছিল, সেই সকল দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ বিপ্লবের নেতৃত্ব শহর-বাসীর হস্তে থাকিলেও এবং শহরাঞ্চলে বিপ্লব প্রথম শুরু হইলেও বিপ্লবের সাফল্য কৃষক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ভূস্বামিগণ ও কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করা দূরে থাকুক, তাহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধী ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।‡

* "...they were deeply divided as to the most desirable procedures, methods and aims of liberal nationalism. That was one reason why they failed." David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p. 203.

† "It is their (intellectuals') leadership that gave the revolutions their fragility and bitterness, if also their brilliance and heroism." *Ibid* pp. 206-210.

‡ *Ibid*, p. 207, also vide Hayes : *Political & Cultural History of Modern Europe*, vol. iii, pp. 101-102.

চতুর্থত, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা পার্লামেণ্ট-এর সাহায্যে শাসন পরিচালনার বিরোধী ছিল। কিন্তু উগ্র গণতান্ত্রিকগণ রুশোর জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জেকোবিন্ (Jacobin) সম্প্রদায়ের উগ্র বামপন্থী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার, এমন কি, রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক ধারা এই দুই পক্ষের কাহারও মনঃপূত ছিল না।

প্রতিক্রিয়া ও উগ্র গণতন্ত্রের বিপ্লব-বিরোধিতা

পঞ্চমত, শহরাঞ্চলে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ কতক পরিমাণে প্রসারলাভ করিয়াছিল। তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার সহিত অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতার (Economic liberalism or Socialism) সংমিশ্রণ দাবি করিয়াছিল।*

সমাজতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত শিল্প-শ্রমিকদের দাবি

ষষ্ঠত, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট্ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ধর্ম' ও 'উদারতা' এই দুইয়ের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহার পাশাপাশি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট্ উভয় সম্প্রদায়ের একাংশ রাজনীতি ক্ষেত্রে উদারতার বিরোধী ছিল। এমন কি, এই উদারতাকে তাহারা 'খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী' (Un-Christian) বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না। পোপ ষোড়শ গ্রেগরী (Pope Gregory XVI, 1830-46) রাজনীতি ক্ষেত্রে উদারতার বিরুদ্ধে একাধিক আদেশপত্র (Encyclicals) জারি করিয়াছিলেন।†

ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধিতা

সপ্তমত, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের সমর্থক উদার-নীতি-বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। উদার-নীতির চরম ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা স্বভাবতই ইওরোপীয় জাতিবর্গের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of self-determination) স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাষ্ট্র গঠন করিয়া এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করুক, ইহাও তাঁহারা চাহিতেন। এই সকল স্বাধীন জাতীয়-রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এক উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হউক, ইহাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। কিন্তু ইওরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তখনও আমলা ও সামরিক কর্মচারিবর্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অধিক। গণতন্ত্রভিত্তিক জাতীয়-রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায়, সেই ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপনে তাঁহারা স্বভাবতই সম্মত ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Status

উদারপন্থীদের নেতৃত্বের ত্রুটি—সংগঠন শক্তির অভাব: আমলা ও সামরিক কর্মচারিবর্গের প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখিবার ইচ্ছা

* David Thomson, pp. 207-208 ; Hayes, vol. iii, p. 103.

† "To some Christians 'liberal state' was not a 'Christian state'." Hayes, vol. iii, p. 102.

Quo) বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। এমতাবস্থায় বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলিকে উদারনৈতিক জাতীয়-রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে প্রয়োজন ছিল অক্লান্ত ও অবিচ্ছিন্ন বিপ্লব—প্রয়োজন ছিল প্রত্যেক জাতির লোকের মধ্যে এক সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধতা এবং ক্রমাগত বিপ্লব তথা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার শক্তি ও আগ্রহ। কিন্তু উদার-নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মূলত শান্তিকামী। এমতাবস্থায় উদারপন্থিগণ গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগাইতে সমর্থ হইলেও এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার শক্তি বা সমর্থন গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। ফলে, তাঁহারাই উদার-নীতির বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।* সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের পশ্চাতে রাজগণের সমর্থন ছিল না। ইহাও ছিল এই আন্দোলনের অসাফল্যের অন্যতম কারণ। পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যখন রাজগণ গ্রহণ করিলেন, তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সহজেই সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইল। ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের জাতীয় আন্দোলন ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতেই বোহেমিয়া, ইতালি, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এক বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।†

রাজগণের সমর্থনের অভাব

উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত উদারনৈতিক আন্দোলন সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই।

বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের সমতা (Common elements in the Revolutionary movements following the February Revolution): ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিলে উহার সূত্র ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই সকল আন্দোলনের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ধারা ছিল মোটামুটি একই। ইহা ভিন্ন এই সকল আন্দোলন ছিল একই সামগ্রিক ধারার বিভিন্ন প্রকাশস্বরূপ। এদিক দিয়া বিচার করিলে এগুলি ছিল পরস্পরের পরিপূরক।‡

একই ধারার বিভিন্ন প্রকাশ

* "....liberals themselves helped to create a situation which tended to modify if not to destroy liberalism." Hayes, vol. iii, p. 104.

† Vide Hayes, vol. iii, pp. 91-96.

‡ "Although the revolutions of 1848 and their sequels in 1849, 1850 are so diversified, they are also of one piece : and their origins and aims, their course and their outcomes have certain common features...Yet there is no simple or unitary pattern but rather several interwoven designs." David Thomson, pp. 202-203.

তাই এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পরস্পরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঐক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, এই বিপ্লব সর্বত্রই ভিয়েনা চুক্তির প্রতিবাদে সংঘটিত হইয়াছিল। ভিয়েনা চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাই ছিল এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরিপূরক। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ফরাসী জনসাধারণ রাজতন্ত্রের সহিত সকল প্রকার আপস-মীমাংসার মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিল। জার্মানি ও ইতালিতেও ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে স্থাপিত অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য এবং রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ভিয়েনা চুক্তি দ্বারা বিচ্ছিন্নীকৃত জার্মানি ও ইতালির রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঐক্যসাধনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে—যেমন হাঙ্গেরীতে ম্যাগিয়ার, স্লাভ প্রভৃতি, জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে স্বৈরাচার-বিরোধী, প্রতিক্রিয়া-বিরোধী, অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য-বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। এইভাবে ইওরোপের বিভিন্নাংশে বিপ্লবের স্বরূপ কতক পরিমাণে বিভিন্ন হইলেও এগুলির মধ্যে ভিয়েনা চুক্তির বিরোধিতা এবং জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ভিয়েনা চুক্তির বিরোধিতা—জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতা

দ্বিতীয়ত, এই সকল আন্দোলনের ইঙ্গিত আসিয়াছিল প্রধানত ইতালি ও ফ্রান্স হইতে। প্যারিসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হইবার পূর্বেই ইতালির প্যালারমো (Palermo) ও অপরাপর ইতালীয় শহরে বিপ্লব দেখা দিল। কিন্তু ইতালি এ-বিষয়ে অগ্রণী হইলেও বিপ্লবের প্রকৃত ইঙ্গিত ও প্রেরণা আসিয়াছিল ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতে। ইওরোপের অপরাপর স্থানের বিপ্লবের অনুপ্রেরণার দিক হইতে বিচার করিলেও বলা যাইতে পারে যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত ইওরোপীয় বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ইতালি এবং বিশেষভাবে ফ্রান্স কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল।

একই প্রকার অনুপ্রেরণা

তৃতীয়ত, এই সকল বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এগুলি মধ্য-ইওরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইওরোপের অপরাপর অংশ যেমন, পোল্যান্ড বা রাশিয়ায়, এমন কি, বেলজিয়াম বা ইংলণ্ডেও এই বিপ্লবের কোন কার্যকরী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল বিপ্লবকে মধ্য ইওরোপীয় ঘটনা হিসাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

মধ্য-ইওরোপীয় ঘটনা

চতুর্থত, এই সকল বিপ্লবে নূতন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের প্রভাব ভিন্ন উদারনৈতিক গোপন সমিতিগুলির প্রচারকার্য ও কৃষি-আশ্রয়ী দেশগুলিতে জনসংখ্যাধিক্য এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এই সকল রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সর্বত্রই সমানভাবে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের সমতা

পঞ্চমত, এই সকল বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল কবি, অধ্যাপক, ছাত্র-সমাজ, সাংবাদিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল নগর ও শহরাঞ্চল। কৃষক সম্প্রদায় বা ভূস্বামিগণ এই বিপ্লবের সমর্থন করা দূরের কথা, বিপ্লবের বিরোধিতা করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, উহা বিপ্লবের প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম হইলেও বিপ্লবকে সাফল্যের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ও উহার প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। এই বৈশিষ্ট্যও ইওরোপের নানা অংশের বিপ্লবে সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

শহর ও নগর-কেন্দ্রিক এবং বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব পরিচালিত বিপ্লব

ষষ্ঠত, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনসমূহের বিফলতার কারণ আলোচনা করিলেও এই সকল বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যের ঐক্য বুঝিতে পারা যায়। জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত বিপ্লব বিভিন্ন জাতির লোক-অধ্যুষিত দেশে —যেমন অস্ট্রিয়া—যে-জাতীয় ঐক্যের স্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা পরিতৃপ্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কারণ, যে-সুদৃঢ় সংঘবদ্ধতা থাকিলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন সম্ভব সেই পরিমাণ দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধতা বা শক্তি অস্ট্রিয়ার অধীনে বিভিন্ন জাতি এমন কি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভক্ত জার্মান জাতি বা ইতালীয়দের মধ্যেও তখন ছিল না। সুতরাং জাতীয়তাবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল।*

জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের অসাফল্যের কারণ

সর্বশেষে, এই সকল বিপ্লবের অসাফল্যের অপরাপর কারণ, যথা—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের একাংশের উদার-নীতির বিরোধিতা, শিল্প-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতার (Economic liberalism or socialism) দাবি, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংগঠনের অভাব প্রভৃতিতেও এগুলি যে মোটামুটি সমধর্মী ছিল, তাহা উপলব্ধি করা যায়। এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সর্বত্রই শহরকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইয়াছিল। বিপ্লবী জনতাকে সর্বত্রই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর চলাচলের পথ রোধ করিবার জন্য এবং শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে অচল করিবার উদ্দেশ্যে রাস্তার স্থানে স্থানে অবরোধের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৮৪৬ ও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে যে-অজন্মা হইয়াছিল, তাহার ফলে বিশেষভাবে শহরাঞ্চলে যে-দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা শহরাঞ্চলের জনসাধারণকে সর্বত্র বিপ্লবাত্মক কার্যে অনুপ্রাণিত

অপরাপর ক্ষেত্রে ঐক্য

* "The dreams of fraternal rose water revolutions cherished by western nationalists like La Martine 'and Mazzini were rudley dispelled." David Thomson, p. 202.

Also *Ibid*, pp. 202-208 Hayes : *Political & Cultural History of Modern Europe*, vol. iii, pp. 103-105.

করিয়াছিল। এই সকল দিক দিয়া ইওরোপের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সমতা বিদ্যমান ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা অর্জন (Independence of Belgium) : জুলাই বিপ্লবের (১৮৩০) ফলস্বরূপ বেলজিয়ামে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হইল। বেলজিয়ামবাসী হল্যান্ড হইতে পৃথক হইবার দাবি হল্যান্ডরাজের নিকট জানাইল। তাহারা হল্যান্ড রাজ-পরিবারের অধীনে থাকিতে রাজী ছিল বটে, কিন্তু শাসন-ব্যাপারে তাহারা হল্যান্ড হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে পৃথক হইতে চাহিল। হল্যান্ডরাজ এই দাবি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিনদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হল্যান্ডবাসী এই সেনাদলকে ব্রাসেলস্ হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক জাতীয় সভা আহবান করা হইল। এই সভা বেলজিয়ামকে হল্যান্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। হল্যান্ডরাজ ইওরোপীয় কনসার্টের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পোল্যান্ডে বিপ্লব দেখা দিলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত স্থানের পোলগণ সেই বিপ্লবের সমর্থন করায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া বেলজিয়াম-সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারিল না। কেবলমাত্র ফ্রান্স ও ইংলন্ড এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইল। ফরাসী জাতির উদ্দেশ্য ছিল বেলজিয়াম দখল করা। বেলজিয়ামবাসীরাও ফরাসীরাজের বা তাঁহার প্রতিনিধির অধীনে থাকিতে রাজী ছিল। এমন কি, তাহারা ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের পুত্রকে (Duc-de-Nemours) বেলজিয়ামের রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল (১৮৩১)। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সেক্সকোবার্গের লিওপোল্ডকে (Leopold of Saxe-Coburg) বেলজিয়ামবাসীরা তাহাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে গ্রহণ করে। পামারস্টোনের উদারতার ফলে বেলজিয়ামবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কূট-কৌশলের ফলে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের পুত্রের স্থলে লিওপোল্ড বেলজিয়ামের সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিওপোল্ড ছিলেন ইংলন্ডের রাজকন্যা (তৃতীয় জর্জের পৌত্রী) শারলটির স্বামী এবং ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাত। অবশ্য হল্যান্ড বেলজিয়ামের সহিত সংযুক্ত থাকাহেতু সরকারী ঋণের একাংশের ভার বেলজিয়ামকে গ্রহণ করিতে হইল। উপরন্তু লাক্সেমবার্গের একাংশ হল্যান্ডকে ফিরাইয়া দিতে হইল। এইভাবে বেলজিয়াম সমস্যার সমাধান করা হইল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল ইওরোপীয় কনসার্ট এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ইহাই ছিল ভিয়েনা চুক্তির অকার্যকারিতার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত। ইওরোপীয় কনসার্টের পতনের ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব : স্বাধীনতা দাবি

হল্যান্ডরাজের দমন-নীতি

ফ্রান্স ও ইংলন্ডের হস্তক্ষেপ

লিওপোল্ডকে রাজা হিসাবে গ্রহণ

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় কনসার্ট কর্তৃক স্বীকৃত

ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গের এবং ইওরোপীয় কনসার্টের পতনের প্রথম পদক্ষেপ

পামারস্টোনের চেষ্টায় লিওপোল্ডের সিংহাসন লাভে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জয় হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে বেলজিয়ামবাসীরা তাহাদের জাতীয় জীবনকে দেশপ্রেম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সকল কিছুর উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গড়িয়া তোলে।

মেটারনিক্ ঃ 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' ও অস্ট্রিয়া (Metternich ঃ 'Metternich-System' & Austria) ঃ ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা ছিল বহুগুণে জটিলতর। পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় অস্ট্রিয়ার সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদুপরি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল অসংহত, অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ ছিল জার্মান, ম্যাগিয়ার, চেক, স্লোভাক, পোল, রুথেন, ক্রোট, সার্বিয়ান প্রভৃতি বারটি বিভিন্ন জাতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা ছিল যেমন জটিল তেমনি বিপদ-সংকুল।

অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যার জটিলতা

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত উদারতা-নীতি ও জাতীয়তাবোধ ইতালি ও জার্মানিতে এক গভীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু বহু জাতি অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াতে সেই প্রভাবের ফল বিপরীত হইবার আশংকা ছিল। বহু জাতির লোক লইয়া গঠিত জনসমাজের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব স্বভাবতই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—এই আশংকা অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিকের নীতিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের প্রভাব মিশ্রিত জনসমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা

মেটারনিক্ ১৮০৮ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় মিত্রশক্তির যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মেটারনিক্ তাঁহার কূটকৌশল ও দূরদৃষ্টির দ্বারা অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-নীতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার দান নেহাত কম ছিল না। তিনি এইজন্য নিজেকে 'নেপোলিয়ন-বিজেতা' বলিয়া সগর্বে ঘোষণা করিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনের তিনিই ছিলেন নিয়ন্তা। তাঁহার কূটকৌশল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভিয়েনা সম্মেলনে তাঁহাকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছিল।

মেটারনিক্ অস্ট্রিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা ঃ 'নেপোলিয়ন-বিজেতা' মেটারনিক্

মেটারনিক্ ছিলেন মার্জিত রুচি-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন, সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার কূটনৈতিক জ্ঞান ছিল অপরিসীম। নিজ চরিত্রের দোষ-ত্রুটি ভিন্ন অপর সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের দোষ-ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। লোক-চরিত্র উপলব্ধি করিবার অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার ব্যবহারিক ভদ্রতা, সামাজিকতা তাঁহার চরিত্রকে আরও সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা,

মেটারনিকের চরিত্র

তাঁহার সূক্ষ্ম কূটনৈতিক জ্ঞান, জটিল প্রশ্ন সমাধানের অসামান্য ক্ষমতা তাঁহাকে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য সমসাময়িক রাজনীতিক-দের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন নিছক চক্রান্তকারী ও সুবিধাবাদী। জার আলেক-জাণ্ডার তাঁহাকে স্পষ্টভাষায় 'মিথ্যাবাদী' বলিয়াছেন। উদারপন্থীরা তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণমনা, প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞানহীন কুচক্রী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন জনগণের শত্রুস্বরূপ।

মেটারনিকের সমস্যা (১) জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য রক্ষা, (২) অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা

মেটারনিক্ ছিলেন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী, স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা করাই ছিল তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। তিনি যখন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্বার্গ (**Habsburg**) রাজ-তন্ত্রের সম্মুখে দুইটি প্রধান সমস্যা ছিল: (১) জার্মানির উপর প্রাধান্য বজায় রাখা এবং এইজন্য প্রাশিয়ার প্রতিযোগিতা নষ্ট করা। (২) বিচ্ছিন্ন এবং অসংহত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা। মেটারনিকের অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার গ্রহণকালে অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় উভয় দিক দিয়াই অস্ট্রিয়ার পতনোন্মুখতা দেখা দিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল প্রগতিহীন, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সামন্ত-প্রথাজনিত ত্রুটির ফলে কৃষকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না, কৃষি স্বভাবতই দিন-দিন অবনতির দিকে যাইতেছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছিল, সমগ্র দেশে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমি বড় অদ্ভুত সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি; এক যুগ আগে বা পরে আমার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। এক যুগ আগে আসিলে আমি জীবন উপভোগের সুযোগ পাইতাম, এক যুগ পরে আসিলে নূতন যুগ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমার সমগ্র জীবনই এক পতনোন্মুখী রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কোনও ক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় ব্যয়িত হইতেছে।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াই তিনি তাঁহার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন—ব্যক্তিগত আদর্শের দ্বারা নহে।

মেটারনিকের আমলে পরিস্থিতির গুরুত্ব

অস্ট্রিয়ার স্বার্থ দ্বারা মেটারনিকের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রিত

সুতরাং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র নীতি ছিল বর্তমানে যাহা আছে তাহাই রক্ষা করিয়া চলা। অস্ট্রিয়ার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপেই মেটারনিক্ সর্বপ্রকার প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব অস্ট্রিয়ায় বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কাঠামো বিপর্যস্ত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার আশঙ্কা।

প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখা

অস্ট্রিয়ার জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবার কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ বংশীয় সাম্রাজ্য আদর্শ এবং সংগঠনের দিক দিয়া ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। ইহাতে না-ছিল শক্তিশালী কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, না-ছিল বণিক বা শিল্পোৎপাদক শ্রেণী। সমাজ প্রধানত অভিজাত ও কৃষক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তদুপরি অস্ট্রিয়া ছিল হাঙ্গেরীয়, চেক, স্লোভাক, ক্রোট্, পোল, রুমানিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত দেশ। স্বাদেশিকতা বা জাতীয় ঐক্যবোধ স্বভাবতই অস্ট্রিয়ায় জাগ্রত হইলে দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার আশংকা ছিল। এই কারণে অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক সংহতি টিকাইয়া রাখিতে হইলে স্বৈরাচারী ও রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা ভিন্ন কোন উপায় মেটারনিক্ স্বভাবতই দেখিতে পান নাই।

মেটারনিক্-ব্যবস্থা (Metternich-System): অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া জার্মানি এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের উদারপন্থী পরিবর্তন মানিয়া লওয়া অবাস্তব হইবে বিবেচনা করিয়া মেটারনিক্ সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি উদার-নীতি-বিরোধী ব্যবস্থা যাহা "মেটারনিক্-ব্যবস্থা" (Metternich-System) নামে পরিচিত উহার উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নানা জাতির লোক অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী ঐক্যসাধন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া এই সকল বিভিন্ন জাতির পরস্পর অনৈক্যের সুযোগ লইয়া তাহাদের বিচ্ছিন্ন রাখিতে এবং তাহাদের উপর রাজত্ব কায়েম রাখিতে সচেষ্ট হইলেন।* এই কারণে তিনি জার্মান জাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাদলকে বোহেমিয়ায় এবং হাঙ্গেরীয় সেনাদলকে লোম্বার্ডিতে মোতায়েন করিলেন। জার্মান কনুফেডারেশনের উপর অস্ট্রিয়ার আধিপত্য বজায়

চিরাচরিত শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা : গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব দমন,—'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich System)

* "The Austrian chancellor, Prince Metternich, devised his famous "system" as the master plan for the preservation of Habsburg dominion. His system was no attempt to bring the motley territories of Austria into greater unity. That was accepted as being impossible, it rested rather, on the exploitation of their disunity, on the time-honoured Habsburg principle of "divide and rule". It meant stationing of German regiments in Bohemia and Hungarian troops in Lombardy. It meant keeping the German Confederation (*bund*) a loose organisation of princes such as Austria could dominate." *Europe Since Napoleon*, **David Thomson, pp. 220-21.**

রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি জার্মান কনফেডারেশনকে কতকটা অবিন্যস্ত রাখিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জার্মানির ডায়েট্ (Diet) বা পার্লামেণ্ট সমবেত হইয়াছিল তাহাতে এ-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই সভায় জাতীয় ঐক্যের কোন চেষ্টা করা সম্ভব নহে। তিন বৎসর পর জার্মান ডায়েট্ মেটারনিকের চাপে কার্লস্‌বাড্ ডিক্রি পুনরায় সমর্থন করিয়া জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে-কোন প্রকার স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধের প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশাত্ম-বোধক ছাত্র সংঘগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল কাজ যাহাতে না হয় সেজন্য একজন করিয়া পরিদর্শক নিয়োগ করা হইল, সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশের পূর্বে তাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লওয়া বাধ্যতামূলক হইল।

রাশিয়ার রাজ্য বিস্তারে বাধাদান

১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ইওরোপে আন্তর্জাতিক পুলিশের কাজ করিয়াছিল। মেটারনিকের হস্তে ইওরোপীয় কনসার্ট এক প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মেটারনিক্ রাশিয়ার রাজ্য-বিস্তৃতির বিরোধী ছিলেন। কারণ রাশিয়ার রাজ্য-বিস্তৃতি ছিল অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী। অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিক বিচার করিলে মেটারনিকের নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না।

অভ্যন্তরীণ কার্যপন্থা

অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই মেটারনিক্ উদার-নীতির শত্রুতা সাধন করিয়া চলিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার জাতীয় জীবন তখনও চিরাচরিত গতিপথ ধরিয়াই চলিতেছিল। উদারনৈতিক প্রভাবে এই গতি যাহাতে বিভ্রান্ত না হইতে পারে, সেইজন্য মেটারনিক্ অভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া কেবলমাত্র স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন।

ইওরোপীয় কনসার্টের কার্যকলাপ

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিক্ ইওরোপীয় কনসার্টকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া ইতালি, জার্মানি ও ইওরোপের অন্যান্য স্থানের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিয়াছিলেন। কার্লস্‌বাড্ ডিক্রি (Carlsbad Decrees) ও ট্রপোর প্রোটোকোল (Protocol of Troppau) তাঁহার দমন-নীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

দূরদৃষ্টির অভাব : সংকীর্ণ, ধ্বংস-প্রবণ নীতি

মেটারনিকের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির মধ্যে কোন দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। সংকীর্ণতা, ধ্বংস-প্রবণতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় তিনি প্রতি পদে-পদে দিয়াছিলেন। সমসাময়িক ভাবধারার সহিত 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich System)-এর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি যে-যুগে বাস করিতেছিলেন, সে-যুগের

মানুষের মানসিক চেতনায় যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিতেছিল, তাহা উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নীতি বা 'সিস্টেম' (System)-এর মূল ত্রুটি ছিল এই যে, উহা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাব-প্রসূত সমস্যাগুলিকে শক্তিবলে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেগুলির উপযুক্ত সমাধানের চেষ্টা করে নাই।* উদার চিন্তাধারা সংবলিত বিদেশী পুস্তক অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিতে না দিলেই অস্ট্রিয়াবাসী উদারনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকিবে, এইরূপ অবাস্তব ধারণা তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি যখন দমন-নীতি দ্বারা অস্ট্রিয়া এবং ইওরোপের কৃত্রিম দৃষ্টিতে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তার প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনার ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মেটারনিক্-ব্যবস্থার মূল-ত্রুটি : উদার-নীতি প্রসূত সমস্যার সমাধান না করিয়া দমনের চেষ্টা

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ফল্গুধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত

অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে শাসনব্যবস্থাকে যুগধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রগতিশীল না করিয়া এবং কৃষকদিগকে সামন্ত-প্রথাজনিত অত্যাচার হইতে রক্ষা না করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ার বিপ্লব দেখা দিলে মেটারনিক্ ও তাঁহার 'সিস্টেম'-এর সম্পূর্ণ পতন ঘটিল।

কৃষকদিগের রক্ষা না করিবার কুফল

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে মেটারনিকের কার্য-নীতির আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকার করিতে হয়। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুঝিয়া ইওরোপের শান্তি স্থাপিত হইবার পর উদারনৈতিক প্রভাব বশত আবার কোন ব্যাপক অশান্তি দেখা দিলে ইওরোপের অপূরণীয় ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই। মেটারনিক্ বা তাঁহার 'সিস্টেম' (System)-এর সপক্ষে এইটুকু বলা উচিত যে, তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ইওরোপে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন শান্তিরক্ষা

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী (**Austria-Hungary**) **:** অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম-ইওরোপ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যস্থলে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানস্বরূপ ছিল। ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ড, বলকান অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্ট্রিয়ার উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন, অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ বারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত ছিল, যথা : জার্মান, ম্যাগিয়ার, স্লোভাক, পোল, রুথেনস্, ক্রোটস্, ইতালিয়ান, রুমানিয়ান, চেক, স্লোভেনস্ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন জাতির লোক অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া-

বিভিন্ন জাতির লোক অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া

---

* "The fundamental weakness of Metternich's famous 'system' was that it only retarded, it could not avert the day of reckoning." Lipson, p. 128.

হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাবে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশংকা ছিল। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জনগণকে একই মৌলিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার সুযোগ স্বভাবতই ছিল না। এক জাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাবাহিনী অন্য জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য প্রেরণ করিয়া কোনরকমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর শাসনব্যবস্থাকে সংহত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অগ্রগতির পথ ত্যাগ করিয়া প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগের উপরই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ঐক্য নির্ভরশীল ছিল। বিদেশী প্রভাব বিস্তারের ফলে অস্ট্রিয়ায় যাহাতে বিপ্লবী ধারা প্রবাহিত হইতে না পারে সেজন্য বিপ্লববাদের উপর লিখিত বিদেশী পুস্তকাদি পাঠ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ত-প্রথাভিত্তিক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যধিক দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত। ভিয়েনা কংগ্রেসে অস্ট্রিয়া যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সেই সুবাদেই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকার নিজ দক্ষতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মেটারনিক্ তাঁহার অনুদার দমন-নীতির প্রয়োগ দ্বারা অন্তত জুলাই বিপ্লবের প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে গিয়া ইওরোপের সর্বত্র উদার-নীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশকে দমন করা তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দমন-নীতি যতই কঠোরভাবে প্রযুক্ত হউক-না-কেন, উহার মধ্যেই উদার-নীতির বীজ নিহিত থাকে। অস্ট্রিয়ায় দমন-নীতি যতই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল জনসাধারণের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার গোপন প্রস্তুতিও তেমনি অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিসিয়া অঞ্চলের বিদ্রোহ ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠোর আঘাত আসিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতে। প্রথমেই অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিক্ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মিলান, ভেনিস, পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার বিদ্রোহ ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকার প্রায় বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিল। প্র্যাগ, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সর্বাধিক ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিল হাঙ্গেরীতে। উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লুই কসুথ্ (Louis Kosuth) হাঙ্গেরীর জাতীয়তাবাদী দলকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি অস্ট্রিয়া হইতে হাঙ্গেরীর স্বাতন্ত্র্য ক্রোটস্, স্লোভেন্স্, রুমানিয়ান প্রভৃতি জাতির লোককেও এই স্বাধীন হাঙ্গেরীর অধীনে লইয়া যাইতে চাহিলেন। লুই কসুথ্ হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ার জাতিকে স্বাধীন করিতে গিয়া ক্রোটস্, স্লোভেন্স্ প্রভৃতি জাতিকে ম্যাগিয়ারদের অধীনে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হইল। এইভাবে অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অংশে

দমন-নীতির উপর অস্ট্রিয়া নির্ভরশীল

লোকচক্ষুর অন্তরালে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক প্রস্তুতি

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব

উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং পরস্পর যোগাযোগের অভাব হেতু অস্ট্রিয়ার পক্ষে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইল। একে একে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। রুশ সামরিক সাহায্যেই হাঙ্গেরীর এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। লুই কসুথ্ পরাজিত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর অস্ট্রিয়ায় আর কোন গোলযোগ দেখা দিল না।

লুই কসুথ্

বিদ্রোহ দমন

১৮১৫ **হইতে** ১৮৪৮ **খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবোত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the period from 1815-1848)**: ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা 'মেটারনিকের যুগ' নামে পরিচিত। বস্তুত, এ-যুগে মেটারনিক্ ছিলেন ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামক। (১) দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘর্ষ ঐ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই ধারার একটি ছিল প্রতিক্রিয়ার এবং অপরটি ছিল উদার-নীতির। বিপ্লবী যুগের অবসানে নেপোলিয়নকে নির্বাসিত করা সম্ভব হইলেও উদারনৈতিক প্রভাব—গণতন্ত্র, জাতীয়তা, শাসনতান্ত্রিকতা, স্বাধীনতা ও সমতা—প্রভৃতিকে নির্বাসিত করা গেল না। অথচ ভিয়েনা সম্মেলনে স্থির হইল যে, এই সকল বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া বিপ্লবের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থার পুনঃস্থাপন করা হইবে। এই কারণে সমবেত রাজনীতিকগণ প্রাক্-বিপ্লব যুগের স্বৈরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিলেন। স্বভাবতই এই দুই বিপরীতমুখী ধারার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। (২) এই যুগে ইওরোপীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ইওরোপীয় কন্সার্টের দমন-নীতির ফলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ফলবতী না হইলেও দিন-দিনই বিপ্লবী প্রভাব তাহাদের মনে এক গভীর চেতনার সৃষ্টি করিতেছিল। যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাহাদের দাবি আদায় করিতে না পারিল ততদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া গেল। মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। আশা-আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সাফল্যের পরিমাণ ছিল খুবই কম। এইজন্য কেটেল্‌বি (Ketelbey)-এর মতে এই যুগ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী 'আকাঙ্ক্ষার যুগ' (period of aspirations), সাফল্যের যুগ নহে।* এই যুগেঃ (ক) বেলজিয়াম হল্যান্ডের

প্রতিক্রিয়া ও উদার-নীতির সংঘর্ষ

স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা

মোট সাফল্য নগণ্য

এই যুগে অবশ্য (১) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা (২) গ্রীসের স্বাধীনতা

* "In the realm of politics the period from 1815-1850 was one rather of aspirations than of achievements." Ketelbey, p 156.

আধিপত্য হইতে মুক্ত হইয়াছিল। (খ) গ্রীস দেশ তুরস্কের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* (গ) জার্মানির বিভিন্ন অংশে কতক পরিমাণ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল; অন্তত নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইওরোপীয় স্বৈরাচারী শাসকগণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। (ঘ) ইহা ভিন্ন, রাজার শক্তি ভগবান-প্রদত্ত এই কুসংস্কার হইতেও জনগণ নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াছিল।

(৩) জার্মানির স্থানে স্থানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন
(৪) রাজশক্তি ভগবান-প্রদত্ত—এই কুসংস্কার হইতে মুক্তি

মোট সাফল্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া কেটেল্‌বি ১৮১৫—'৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগকে সাফল্যের অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার যুগ বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন (a period rather of aspirations than of achievements)। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যুগে মানসিক প্রস্তুতির ফলেই পরবর্তী কালে উদার-নীতির সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

মানসিক প্রস্তুতির যুগ

১৮১৫ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের যে কয়টি অধিবেশন বসিয়াছিল তাহাতে মেটারনিকের নেতৃত্বে সর্বপ্রকার উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। ন্যাপল্‌স্‌, পোর্তুগাল, পাইড্‌মণ্ট্‌ এবং অপরাপর স্থান হইতে ফরাসী বিপ্লবের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলা হইল। কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি (Carlsbad Decrees) দ্বারা জার্মানিকে কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল। ট্রপো'র প্রোটোকোল দ্বারা ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যে-কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের অধিকার অর্জন করিল। ১৮২২ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত পরবর্তী আট বৎসর মেটারনিক্‌ নিছক দমন-নীতির দ্বারা ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অষ্টাদশ বৎসরে (১৮৩০-'৪৮) উদারনৈতিক প্রভাব এত বেশী বিস্তারলাভ করিয়াছিল যে, ক্রমে ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের স্বৈরাচারী কাঠামো ও ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অধিক সাফল্য সম্ভব না হইলেও এই যুগে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপের জনগণের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিয়াছিল। তাহার ফলে পরবর্তী কালে ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা প্রভৃতি সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

১৮১৫-'৩০ পর্যন্ত ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক দমন-নীতির অনুসরণ

১৮৩০-'৪৮ পর্যন্ত উদার-নীতির প্রভাব বিস্তার—ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতন

১৮১৫-'৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ফল—ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা

* পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রীসের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পার্থক্য (Difference between the French Revolutions of 1830 and 1848) ঃ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণ এবং ফলাফলের দিক হইতে বিচার করিলে এই দুই বিপ্লবের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণগুলির পার্থক্য সম্পর্কে এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ লুইয়ের মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পর দশম চার্লসের স্বৈরাচারী শাসন ফরাসী জনসাধারণের মনে গভীর অসন্তোষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করিয়াছিল। পোলিগনাক্ দশম চার্লসের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে ফরাসী জাতির দশম চার্লস্-বিরোধিতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাইল। দশম চার্লস্ পোলিগনাকের সাহায্যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বকালে ফ্রান্সে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র চালু ছিল তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই উদ্দেশ্যে দশম চার্লস্ পোলিগনাকের মাধ্যমে চারিটি আদেশ জারি করিলেন ঃ (১) ফরাসী জাতীয় সভা বা পার্লামেন্ট Chamber of Deputies উঠাইয়া দেওয়া হইল, (২) সম্পত্তির ভিত্তিতে নূতন ভোটার তালিকা তৈয়ার করা হইল, ফলে ভোটার সংখ্যা হ্রাস পাইল, (৩) এই অল্প সংখ্যক ভোটারদের ভোটে পার্লামেন্ট নির্বাচনের আদেশ জারি করা হইল, এবং (৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হইল। এই স্বৈরাচারী ঘোষণাগুলির বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হইল।

কারণ ও ফলাফলের—উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য

কারণসমূহের মৌলিক পার্থক্য

পক্ষান্তরে লুই ফিলিপ্পির শাসন ছিল যথেষ্ট নিমতান্ত্রিক এবং জনগণের সমর্থন তাঁহার পশ্চাতে ছিল। তিনি বিপ্লবের মূল নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সাধারণ নাগরিকের মত রাস্তায় চলাফেরা করিতেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকে "নাগরিক রাজতন্ত্র" (Citizen Monarchy) বলা হইত। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে লুই ফিলিপ্পির উদ্দেশ্য ছিল শান্তি রক্ষা করিয়া চলা। স্বভাবতই এ-কথা মনে হইবে যে, ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল নস্যাৎ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যেখানে দশম চার্লস্ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিকামী নাগরিক রাজার জনকল্যাণকর রাজত্বে পুনরায় বিপ্লব (১৮৪৮) দেখা দিয়াছিল কেন ? ইহার কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে খুঁজিতে হইবে। ন্যায্য-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা লুই ফিলিপ্পির স্থলে দশম চার্লসের বংশধরকে সিংহাসনে বসাইবার পক্ষপাতী ছিল, উগ্র ক্যাথলিকগণ ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনের পক্ষপাতী ছিল না, তাহারা দশম চার্লসের আমলের ধর্মযাজক শ্রেণীর প্রাধান্য ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। অন্য দিকে প্রজাতান্ত্রিকরা রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল না। তাহারা লুই ফিলিপ্পির শাসন এক-অধিনায়কত্বেরই নামান্তর বলিয়া মনে করিত। লুই ব্লাঁ (Blanc)-র সমাজতান্ত্রিক প্রচারের ফলে সেই সময়ে সমাজতান্ত্রিক দলের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, রাজতন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সমর্থকরা নেপোলিয়নের পরিবারের লুই বোনাপার্টির

সিংহাসনারোহণের পক্ষপাতী ছিল। আড়ম্বরপ্রিয় ফরাসী জনসাধারণ দ্বন্দ্ব-বিগ্রহহীন শান্তিবাদী নীতির সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল না। লুই ফিলিপের শাসন তাহাদের নিকট বৈচিত্র্যহীন অবসাদ (la France's ennuie) বলিয়া মনে হইতেছিল।

সুতরাং ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণের মধ্যেই মৌলিক পার্থক্য ছিল। ১৮৩০-এর বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল দশম চার্লসের স্বৈরাচারী শাসন, পক্ষান্তরে লুই ফিলিপের আমলে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল সমসাময়িক পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত।

১৮৩০-এর বিপ্লবের কারণ দশম চার্লস্— ১৮৪৮-এর বিপ্লবের কারণ সমসাময়িক পরিস্থিতি

বিপ্লবের বিস্তার ও ফলাফলের দিক হইতে বিচারে দেখা যায় যে, জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া জার্মানি, রুশ অধিকৃত পোল্যান্ড, ইতালির মডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্য, পোর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতিতে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সাফল্যের বিচারে জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী নীতির জয় সূচিত করিয়াছিল। জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে বিপ্লব-প্রসূত আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই। এমন কি, ফ্রান্সেও জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজকেই ক্ষমতায় স্থাপন করিয়াছিল। অবশ্য জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে ভগবানপ্রদত্ত রাজ-ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও 'নাগরিক রাজতন্ত্রের' (Citizen Monarchy) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিক ও শ্রমিকশ্রেণী ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। এই কারণেই ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৮৩০-এর বিপ্লব মেটারনিকের সহায়তায় দমন করিয়া স্বৈরাচারী শাসনের পুনঃস্থাপন ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সম্ভব হইয়াছিল।

বিস্তার ও ফলাফলের পার্থক্য— জুলাই বিপ্লব

ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন —সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

পক্ষান্তরে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রসার সমগ্র ফ্রান্স ও ইওরোপে এক প্রবল ঝটিকার ন্যায় আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশে বিপ্লব বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং সেই সকল দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। জার্মানির উপর হইতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্মানির সিংহাসন দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রেডারিকের আপত্তিতে তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। তবে প্রাশিয়া ও জার্মানির বিভিন্নাংশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। মেটারনিকের নিজ দেশ অস্ট্রিয়া হইতে স্বয়ং মেটারনিক্‌কে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ফলে "মেটারনিক্‌-পদ্ধতি" বা Metternich System নামে যে-স্বৈরাচারী নীতি ইওরোপে চালু হইয়াছিল, তাহার অবসান ঘটিয়াছিল। ইতালির সিসিলি, টাস্কেনি, ন্যাপল্‌স্‌, মডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্য

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

সর্বত্র উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। বিস্তৃতির দিক দিয়া বিচারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে বিপ্লবের বৎসর বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

ফলাফলের দিক দিয়াও এই দুই বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য নাশ করিয়া জনগণের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। আরও পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বলা যায় যে, ১৭৮৯-এর বিপ্লব যেখানে মানুষের মধ্যে আইনের চক্ষে সমতা (equality) স্থাপন করিয়াছিল, ১৮৩০-এর বিপ্লব স্থাপন করিয়াছিল সামাজিক সমতা এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লব সাধারণ মানুষের হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছিল।

ফলাফলের পার্থক্য

১৮৩০-এ আইনের চক্ষে সমতা এবং ১৮৪৮-এ সামাজিক সমতা স্থাপন

জুলাই রাজতন্ত্র প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লব, অভিজাততন্ত্রের ঔদ্ধত্য এবং গণতন্ত্রের অমিতাচারের একটা মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এই মধ্যপন্থার স্থিতিশীলতা আনা উহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই রাজতন্ত্রের প্রধান শক্তি ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর কোন নৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ ছিল না। পক্ষান্তরে ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ভোটাধিকার প্রসারিত করিয়াছিল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের সূচনা করিয়াছিল।

জুলাই বিপ্লবে প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লব, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের আতিশয্যের মধ্যপন্থা অনুসরণ

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ভোটাধিকারের প্রসার ও সমাজতন্ত্রের সূচনা

প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূর-প্রসারী। প্রত্যক্ষ ফলের দিক দিয়া বিচার করিলে এ-কথা বলিতে হয় যে, স্বৈরাচারী শক্তি ক্রমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালিতে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু পরোক্ষ ফলের দিক হইতে বিচার করিলে এ-কথা উল্লেখ করিতে হয় যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১) মেটারনিক্ ও তাঁহার স্বৈরাচারী মেটারনিক্ পদ্ধতির বিলোপ সাধন করিয়া গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। (২) এই বিপ্লব প্রাক্-ফরাসী বিপ্লব কালের স্বৈরাচারী শাসন পুনঃস্থাপন যে অসম্ভব তাহা প্রমাণিত করিয়াছিল। (৩) জার্মানি ও ইতালিতে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলই ইতালি ও জার্মানির জাতীয় ঐক্যে পরিলক্ষিত হয়। (৪) ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলেই ফ্রান্সে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ক্রমে ইওরোপের সর্বত্র ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। (৫) ফ্রান্সে এই বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা শুরু হয় এবং ক্রমে ইওরোপের অপরাপর অংশেও বিস্তৃত হয়। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা

১৮৪৮-এর বিপ্লবের যুগান্তকারী ফলাফল

কার্যকরী করিবার চেষ্টা ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতেই শুরু হয়। ইওরোপের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার গভীর গুরুত্ব ছিল, বলা বাহুল্য। (৬) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লবের ফলে ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘটিয়া স্বাধীন কৃষক সমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব ১৭৮৯-এর বিপ্লবের পরিপূরক

সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ ফলের বিচারে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের ফল ছিল যুগান্তকারী। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দুইটি বিপ্লবই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক ছিল।

অধ্যায় ৯

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা
(Eastern or Near-Eastern Question)

গ্রীসের স্বাধীনতালাভ (Independence of Greece): রাশিয়ার জার পিটারের আমল হইতে (১৬৮২—১৭২৫) তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে (১৭৬২—৯৬) এই নীতি বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করে এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের প্রাধান্য, ইউক্রেণ ও ক্রিমিয়ার আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া কনস্টান্টিনোপল্ দখল করা, বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা এবং সেই অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুখারেস্ট্-এর সন্ধি এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সন্ধি দ্বারা বেসারাবিয়া প্রভৃতি স্থান লাভের ফলে রাশিয়ার সীমা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্দেশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্য তখন দুর্বলতার চরমে পেঁীছিয়াছিল।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল। এই কারণে একাধিকবার এই সকল ইওরোপীয় দেশ রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দান করিয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হইলেও তুরস্কের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশত সাম্রাজ্যের পতন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি রোধ করিতে পারিল না। দুইটি বিশেষ কারণে এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইলেও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশত পতন-রোধ অসম্ভব

প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশাগণ (Pashas) সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নামে-মাত্রই তাঁহারা সুলতানের অধীন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ধত পাশাদের মধ্যে আলবেনিয়ার আলি এবং মিশরের মেহেমেৎ আলির নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনই স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

পাশাদের প্রাধান্য

দ্বিতীয়ত, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পশ্চাতে জাতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি প্রভৃতির পার্থক্য ছিল সর্বপ্রধান কারণ। তুরস্ক সাম্রাজ্য কোনপ্রকার স্বাভাবিক আনুগত্যের বন্ধন, শাসনব্যবস্থার ঐক্য ও কৃষ্টি-মূলক সংহতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা, ধর্মনৈতিক বিভেদ, ভাষা ও আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য দিন-দিনই তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বলতর করিতেছিল।

প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সারবিয়া (Serbia) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়া লইল। কিন্তু গ্রীসই সর্বপ্রথম তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সারবিয়ার স্বায়ত্ত-শাসন লাভ

গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম (Struggle for Independence by the Greeks) : সারবিয়ার কৃষকসম্প্রদায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নেতা কারা জর্জের নেতৃত্বে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের বিরোধিতা শুরু করিল এবং বহু অত্যাচার-অবিচার সহ্য করিয়া স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু তখনও পশ্চিম-ইওরোপের শক্তিবর্গ সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না। কিন্তু ১৮২০-'২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক দ্বীপ মোরিয়া (Morea) এবং গ্রীসদেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র ইওরোপে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দেও মোরিয়া একবার তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

গ্রীসের বিদ্রোহে ইওরোপে চাঞ্চল্য

প্রধানত, দুইটি কারণে গ্রীকদের মনে স্বাধীনতার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। (১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকগণ অত্যাচারিত হইতেছিল বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল— এরূপ মনে করা ভুল। গ্রীকগণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন যে-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ও ধর্মপালনের সুযোগ ভোগ করিত তাহা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশ আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকগণ বা অস্ট্রিয়ার প্রোটেস্টাণ্ট্‌গণও ভোগ করিত না।* ধর্মপালন,

বিদ্রোহের কারণ

* "The Christian *(in Turkey)* was allowed a greater measure of liberty than that he enjoyed in any other country in Europe. Catholics in Ireland and protestants in Austria might envy him his privileges. He was free to exercise his religion, to educate himself as he pleased to accumulate wealth; however humble his origin, in a system which accounted nothing of birth, he could hold high office in the Government." Lipson, p. 185.

সম্পত্তি সঞ্চয়, জন্ম ও শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সরকারী পদ লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার স্বাধীনতা তাহারা ভোগ করিত। এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবার ফলেই গ্রীকদের মনে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ক্রমেই জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। গ্রীক চার্চ মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পোষণে এবং গ্রীক জাতিকে ধর্মের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা : স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি

ঐ সময়ে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গ্রীকদের মধ্যে এক গভীর শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে গ্রীকগণ তাহাদের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল হইতে লাগিল তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের এক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে গ্রীসকে প্রাচীন গৌরবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার এক আগ্রহ তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণ বা চেতনার পশ্চাতে কোরায়েস (Koraes) নামক একজন গ্রীক মনীষীর দান ছিল অপরিসীম।

(২) প্রাচীন গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের আলোচনা : প্রাচীন গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রীকদের আগ্রহ

গ্রীকদের স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। তুরস্ক-সুলতান ঐ সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশা আলির (Pasha Ali) বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (Moldavia and Wallachia) নামক দুইটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রিন্স্ আলেকজাণ্ডার ইপ্সিলাণ্টি (Prince Alexander Ypsilanti) ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা। ইপ্সিলাণ্টি রাশিয়ার সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেটারনিকের চেষ্টায় জার আলেকজাণ্ডার গ্রীকদিগকে সাহায্য দানে নিরস্ত হইলেন। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা হইল। ইতিমধ্যে মোরিয়া নামক গ্রীক দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্রোহ এক বিরাট স্বাধীনতা-যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল।

বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ : মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ (১৮২৩)

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ দমন

ন্যায্য-অধিকার নীতিতে (Legitimacy) বিশ্বাসী ভিয়েনা সম্মেলন গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সাহায্যই করিবে না এই কথা উপলব্ধি করিয়া গ্রীকগণ 'হিটাইরিয়া ফিলিকি' (Hetairia Philike) বা 'ভ্রাতৃসংঘ' নামে এক গোপন সংঘ স্থাপন করে। ১৮১৪ হইতে ১৮২০ এই কয়েক বৎসরের ভিতর এই সংঘের শাখা গ্রীসের সর্বত্র স্থাপিত হয়। প্রত্যেক স্থানের গণ্যমান্য গ্রীক-মাত্রেই এই সংঘে যোগদান করেন। এই সংঘের নেতৃস্থানীয় বহু সভ্যের সহিত রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের যোগাযোগ ছিল এবং গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধে রুশ সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে, সে-বিষয়ে

'হিটাইরিয়া ফিলিকি' নামে গোপন সংঘ স্থাপন

গ্রীকগণ নিশ্চিত ছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মোরিয়ার বিদ্রোহের পূর্বেই গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রস্তুতি একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার কৃষকগণ গ্রীক ভূম্যধিকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। সুতরাং সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহারা তেমন সাহায্য করে নাই। প্রধানত, এই কারণেই মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু মোরিয়ার বিদ্রোহে এক স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা দেখা দিল। সমগ্র দক্ষিণ-গ্রীসের দেশগুলিতে বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইল। ক্রমে উত্তর-গ্রীসের থেসালি, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অসংখ্য মুসলমানের রক্তে এই বিদ্রোহ অভিশপ্ত হইয়া উঠিল। তুরস্ক সরকার নৃশংস অত্যাচারের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে চাহিলেন। তুরস্কের সুলতান কনস্টান্টিনোপলের চার্চের অধিকর্তা পেট্রিয়ার্ক (Patriarch)-কে হত্যা করিয়া গ্রীক-বিদ্রোহিগণ কর্তৃক মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৮২১-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সমানভাবে চলিল।

রুশ সাহায্যের আশা

মোরিয়ার বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি

উভয়পক্ষের নৃশংসতা পেট্রিয়ার্কের হত্যা

এদিকে তুরস্কের সুলতান মিশর প্রদেশের পাশা মেহেমেৎ আলির সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মেহেমেৎ, অর্থাৎ, মহম্মদ আলি ছিলেন তুরস্কের সুলতানের অবাধ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় মোরিয়া, সিরিয়া ও দামাস্কাস, এই কয়টি স্থান পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে নিজ সাহায্যার্থে আমন্ত্রণ করিলেন। মেহেমেৎ আলি যুদ্ধে যোগদান করিলে যুদ্ধের গতি তুরস্কের অনুকূলে পরিবর্তিত হইল। এমতাবস্থায় রাশিয়া অত্যাচারিত গ্রীকদের রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদানে প্রস্তুত হইল। মেটারনিকের প্রভাবে গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার চিরাচরিত নীতিই ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্যাংশ গ্রাস করিয়া রুশ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করা। উপরন্তু বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া এক বিশাল স্লাভ্ সাম্রাজ্য গঠনের ইচ্ছাও রাশিয়ার ছিল। সুতরাং মেহেমেৎ আলির সাহায্য দান এবং পেট্রিয়ার্ক (Patriarch)-এর হত্যা রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কার করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাশিয়াকে গ্রাস করিতে দেওয়া কাম্য ছিল না।

মেহেমেৎ আলির সাহায্য গ্রহণ

গ্রীকদের পক্ষে রাশিয়ার যোগদানের প্রস্তুতি

সুতরাং গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগদানের সুযোগে রাশিয়া যাহাতে গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন না করিতে পারে সেজন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং (Canning) রাশিয়ার সহিত যুগ্ম-ভাবে তুরস্কের যুদ্ধ-বিরতির জন্য চাপ দিতে মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রথম জার আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইয়াছিল। তখন

ইংলণ্ড কর্তৃক রাশিয়ার যুদ্ধ-নীতিতে বাধার সৃষ্টি

প্রথম নিকোলাস ছিলেন রাশিয়ার জার। ক্যানিং প্রথম নিকোলাসের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন (এপ্রিল ৪, ১৮২৬)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, তুরস্কের সুলতান যাহাতে গ্রীকদিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করেন সেইজন্য ইংলণ্ড ও রাশিয়া যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হইবে—এইরূপ কোন শর্ত স্বীকৃত হইল না। পর বৎসর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত মিলিত হইলে এই তিন দেশ যুগ্মভাবে তুরস্কের উপর চাপ দিতে প্রস্তুত হইল। এমন কি, তাহারা প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে তুরস্ককে গ্রীকদের স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিতে বাধ্য করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল।* এই সূত্রে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের এক সম্মিলিত নৌবাহিনী ন্যাভারিনোর (Navarino) জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের নৌবহর ধ্বংস করিল (১৮২৭)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুরস্ক দুর্বল হইয়া পড়িলে স্বভাবতই গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের সাফল্যের আশা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তুরস্ক সরকার তখনও গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে প্রস্তুত হইলেন না।

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার যুগ্মভাবে তুরস্কের উপর চাপ

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স—প্রয়োজনবোধে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগে প্রতিশ্রুত

ন্যাভারিনোর যুদ্ধ (১৮২৭)

পর বৎসর (১৮২৮) রাশিয়ার জার নিকোলাস এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। এক বৎসরের মধ্যে তিনি তুরস্ককে আড্রিয়ানোপ্‌ল (Adrianople)-এর সন্ধি (১৮২৯) স্থাপনে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ীঃ (১) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া আইনত তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন রহিলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে রাশিয়ার আধিপত্যাধীনে আসিল; (২) বস্‌ফোরাস্‌ ও দার্দানেলিস প্রণালীর অবাধ ব্যবহারের অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হইল। (৩) রাশিয়া গ্রীসকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান করিয়া নিজ আধিপত্যাধীনে রাখিতে চাহিলে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া তাহাতে বাধা দিল। ইতিমধ্যে পামারস্টোন (Palmerston) ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইলে তাঁহার চেষ্টায় গ্রীস দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। বেভেরিয়ার রাজা লুই-এর পুত্র (Otho) গ্রীসের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ

আড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধি (১৮২৯)

গ্রীসের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত

* Treaty of London, 1827.

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (Crimean War): পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের* সমস্যা প্রধানত দুইটি কারণ হইতে উৎপত্তি লাভ করে। প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা; দ্বিতীয়ত, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কৃষ্ণসাগর, বস্‌ফোরাস্‌ ও দার্দানেলিস প্রণালীর উপর রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা।

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মূলে কারণ: (১) তুরস্কের পতনোন্মুখতা, (২) রাশিয়ার বিস্তার-নীতি

এই সমস্যা আরও কয়েকটি কারণে অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বলকান দেশগুলি স্বাধীন হইতে সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন, বলকান দেশগুলির জনসংখ্যার প্রায় সকলেই ছিল খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী, অথচ তুরস্ক ছিল মুসলমান দেশ। ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যও বলকান দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের প্রতি এক বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি তুরস্ক সরকারের শাসন পরিচালনার অক্ষমতা, অত্যাচারী ও প্রগতিহীন, প্রাচীনপন্থী শাসন-পদ্ধতি এই সকল সমস্যার জটিলতা আরও বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি কারণে সমস্যা জটিলতর

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির—বিশেষত ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, অর্থাৎ তুরস্কের দিকে রাজ্য বিস্তার মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তারনীতি রোধ করিতে না পারিলে ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে ইংলণ্ডের নীতি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাশিয়ার বিস্তার নীতির বাধাদানের প্রয়োজন ছিল ততোধিক। কারণ বলকান দেশগুলিতে বা দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত ছিল অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী। দানিউব নদী অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। দানিউব নদীর মোহনায় রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে অস্ট্রিয়ার জলপথের বাণিজ্য, তথা অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইবার আশংকা ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের ধর্মগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের নীতির বাধাদান করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ: ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার ভয়, অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়, ফ্রান্সের ধর্ম-সংক্রান্ত বাণিজ্যিক স্বার্থ-হানির ভয়

সুতরাং অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা ইওরোপের এক অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। বস্তুত রাশিয়ার জার পিটারের আমল (১৬৮২-১৭২৫) হইতেই তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়ার

* পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য বলিতে ইওরোপের পূর্বাঞ্চল বুঝায়। সুদূর বা দূরপ্রাচ্য বলিতে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ (আমাদের নিকট-প্রাচ্য) বুঝায়।

সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি শুরু হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের রাজত্বকালে এই নীতি সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কুস্‌কে-কেইনারজি (Kutchuk Kainardji)-এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ডন ও নিপার নদীর মোহনায় রুশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাশিয়া দানিউব ও কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যপোত চালনার অধিকার লাভ করিল। সর্বোপরি তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক খ্রীষ্টানদের ধর্মাধিষ্ঠানের উপর অভিভাবকত্ব করিবার অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলেই জাসির সন্ধি (Treaty of Jassy) দ্বারা (১৭৯২) রাশিয়া ওচাকভ্ (Ochakov) অধিকার করিয়াছিল। ইহার পূর্বেই (১৭৮৩) ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

পিটার ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের নীতি: কুস্‌কে-কেইনারজি (১৭৭৪) ও জাসির সন্ধি (১৭৯২), ক্রিমিয়া দখল (১৭৮৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা অত্যধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। লর্ড মোরলে (Lord Morley) ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে "পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে ক্রম-পরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা"* বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা: লর্ড মোরলের বর্ণনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তুরস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে টিল্‌জিট্ (Tilsit)-এর সন্ধির পর জার আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে এবং রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক গ্রাস নেপোলিয়ন কর্তৃক সমর্থিত হইবে, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইলে জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের দিকে পুনরায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেপোলিয়নের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তদুপরি ইওরোপে রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হেতু রাশিয়া তুরস্ক-গ্রাস নীতিতে কোন সাফল্য লাভে সমর্থ হইল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুখারেস্ট (Bukharcst)-এর সন্ধি দ্বারা জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিলেন এবং তাহার পরিবর্তে বেসারাবিয়া (Bessarabia) নামক স্থানটি লাভ করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা প্রুথ্ (Pruth) নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

টিল্‌জিট্-এর সন্ধির পর হইতে রাশিয়ার তুরস্ক-গ্রাসের নীতি পুনরায় গ্রহণ

বুখারেস্ট্-এর সন্ধি (১৮১২)

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার তুরস্ক

* "...intractable and interwoven tangle of conflicting interests rival peoples and antagonistic faiths."—*Lord Morley,* Quoted by Ketelbey, p. 192.

ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির তুরস্ক নীতির পরিবর্তন

নীতির এক আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই দুই দেশই রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক্ "ন্যায্য-অধিকার" (Legitimacy) নীতির দোহাই দিয়া রাশিয়ার বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার রোধ করিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডের ক্যাসালার্রি, ক্যানিং, পামারস্টোন প্রভৃতি সকলেই রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিলেন।

রাশিয়ার বিস্তার-নীতির ফলে ইওরোপে ভীতির সঞ্চার

ফ্রান্স ধর্ম-সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের পক্ষপাতী ছিল। রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি ইওরোপে এক ভীতির সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার এক নূতন পর্যায় শুরু হইল। নিজেদের

তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ দ্বারা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অক্ষমতা

স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার নীতির প্রতি আর অমনোযোগী থাকিতে পারিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আক্রমণ ইওরোপের শক্তিবর্গের চেষ্টায় প্রতিহত হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না বটে, কিন্তু তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আড্রিয়ানোপলের সন্ধি দ্বারা (১৮২৯ গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ : মেহেমেৎ আলির সহায়তা

গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধ দমন করিবার উদ্দেশ্যে তুরস্কের সুলতান মিশরের পাশা মেহেমেৎ (মহম্মদ) আলি ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলির সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কার-স্বরূপ সুলতান ক্রীট্ দ্বীপটির শাসনভার মেহেমেৎ আলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মেহেমেৎ আলি বা ইব্রাহিম তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। নিজ বলে উপযুক্ত পুরস্কার

মেহেমেৎ আলির অসন্তুষ্টি ও যুদ্ধ

আদায় করিবার জন্য ইব্রাহিম প্যালেস্টাইন আক্রমণ করিলেন এবং এ্যাকার ও দামাস্কাস দখল করিলেন; এমন কি, তিনি কন্স্টান্টিনোপ্ল্ দখল করিতে উদ্যত হইলেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তখন বেলজিয়ামের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া বিব্রত। সুতরাং

রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে সাহায্যদান : ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চমক ভঙ্গ

সুলতানের আবেদন অনুযায়ী তাহারা সাহায্য পাঠাইতে সমর্থ হইল না। পরিস্থিতির চাপে তুরস্কের সুলতান তাঁহার প্রধান শত্রু রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইলেন। রাশিয়া যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের শক্তিগুলির চমক ভাঙ্গিল। রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ না দেওয়ার

জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া তুরস্কের সুলতানকে মেহেমেৎ আলির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য করিল। এইজন্য তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে সিরিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাশিয়া তুরস্ককে বিপদে সাহায্যদানের পুরস্কারস্বরূপ উন্‌কিয়ার স্কেলোস (Unkiar Skelessi) নামক সন্ধি (১৮৩৩) দ্বারা (১) প্রয়োজনবোধে সামরিক সাহায্য দ্বারা রাশিয়া তুরস্ককে রক্ষা করিবার অধিকার লাভ করিল; (২) দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ-জাহাজ চলাচলের অধিকার স্বীকৃত হইল; (৩) যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশের জাহাজ দার্দানেলিস প্রণালীতে চলাচল নিষিদ্ধ হইল।

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের চাপে যুদ্ধের অবসান : মেহেমেৎ আলির সিরিয়া লাভ

রাশিয়ার পুরস্কার—উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

এই সন্ধির শর্তাবলী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন এই সন্ধিপত্র নাকচ করিতে এবং রাশিয়ার বিস্তার-নীতি বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) মেহেমেৎ আলির দখল হইতে সিরিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্কের সুলতান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মেহেমেৎ আলির শক্তি খর্ব করিবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু ফ্রান্স এই যুদ্ধে গোপনে মেহেমেৎ আলিকে সাহায্য দিতে লাগিল। কিন্তু পামারস্টোনের কূটনৈতিক চেষ্টার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনে (Convention of London) এই সমস্যার মীমাংসা হইল। মেহেমেৎ আলি সিরিয়া ত্যাগ করিলেন; উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধির শর্তাদির সামান্য পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধের সময় দার্দানেলিস প্রণালী সকল ইওরোপীয় শক্তির নিকটই সমভাবে বন্ধ থাকিবে স্থির হইল। এইভাবে ফরাসী কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ করা হইল এবং রাশিয়ার ক্ষমতা কতক পরিমাণে খর্ব করা হইল।

মেহেমেৎ আলির বিরুদ্ধে সুলতানের যুদ্ধ ঘোষণা

লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শন (১৮৪০)

পরবর্তী কয়েক বৎসর (১৮৪১-৫৩) পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোনপ্রকার নূতন জটিলতা দেখা দিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার প্রথম নিকোলাস পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি গ্রহণ করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল।

ইওরোপে শান্তি (১৮৪১-৫৩)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ—১৮৫৩-৫৬ (Causes of Crimean War) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনের পর কয়েক বৎসর পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার দ্বারা ইওরোপের শান্তি কোনপ্রকার ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া ইংলণ্ডের সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডের অমতে

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব (১৮৫৩)

তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ অসম্ভব হইবে বিবেচনা করিয়া নিকোলাস প্রস্তাবটি ইংলণ্ডের নিকটই প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন। তুরস্ককে তিনি অত্যন্ত 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (sick man) বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং এই দুর্বল 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি'র মৃত্যুর পূর্বেই—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই উহা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন।* ইংলণ্ড মিশর ও ক্রীট্ দ্বীপ দখল করিয়া ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ নিরাপদ রাখিতে পারিবে এই ইঙ্গিতও তিনি দিলেন। কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা (Integrity of Turkey) ছিল ইংলণ্ডের চিরাচরিত নীতি। স্বভাবতই জার নিকোলাসের প্রস্তাব ইংলণ্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, উপরন্তু রাশিয়ার অভিপ্রায় সম্পর্কে ইংলণ্ডে এক গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইল।

ইংলণ্ডকে মিশর ও ক্রীট্ দ্বীপ দিবার প্রস্তাব

ইংলণ্ড কর্তৃক নিকোলাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

ঐ সময়ে রাশিয়া, ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানের আধিপত্য লইয়া এক বিবাদ চলিতেছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও জীবনের স্মৃতিজড়িত সকল স্থানই খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কুস্কুক্-কেইনার্জির (Kutchuk-Kainardji) সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত গ্রীক খ্রীষ্টানা† অর্থাৎ গোঁড়া খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থানগুলির এবং গ্রীক খ্রীষ্টান যাজকদের অভিভাবকত্ব রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। অপর দিকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি‡ দ্বারা ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের অভিভাবকত্ব দেওয়া হইয়াছিল ফ্রান্সকে। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধের সময় এই সকল অধিকার কোন পক্ষই ভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের শর্তানুযায়ী পূর্বেকার অধিকার পুনরায় তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল। রাশিয়ার জার নিকোলাস ফ্রান্সের এই সকল অধিকার নাকচ করিবার জন্য তুরস্কের সুলতানকে চাপ দিলেন। সুলতান উভয় সংকটে পড়িলেন। নিকোলাস কালক্ষেপ না করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন সকল গোঁড়া ক্যাথলিক ও তাহাদের ধর্মস্থানের উপর অভিভাবকত্ব

গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি ঃ রাশিয়া কর্তৃক গ্রীক খ্রীষ্টান যাজক ও ধর্ম-স্থানের অভিভাবকত্ব দাবি

* "When we have agreed, I am quite without anxiety as to the rest of Europe ; it is immaterial what others may think or do." Czar Nicholas I to the English Ambassador to Russia, Quoted by C. D. Hazen, p. 560.

† "গ্রীক খ্রীষ্টান বা গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিতে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মাধিষ্ঠান হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বুঝায়। রোম হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ল্যাটিন খ্রীষ্টান বলা হয়।

‡ Capitulations of 1740.

দাবি করিলেন। তুরস্কের সুলতান ধর্মস্থানের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার নিজ প্রজাবর্গের উপর রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। জার নিকোলাস সঙ্গে সঙ্গে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করিয়া লইলেন। এই দুইটি স্থান আইনত তুরস্ক সুলতানের অধীন হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিল। এখন রাশিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দুইটি স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইল। তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর অপসারণ দাবি করিলেন, কিন্তু রাশিয়া সে-বিষয়ে কর্ণপাত না করিলে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (অক্টোবর, ১৮৫৩)।

রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল

তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ রহিল না। ইংলণ্ড রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ছিল। ইহা ভিন্ন, রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলতা উদারনৈতিক ইংরেজ জাতির নিকট সমর্থনযোগ্য ছিল না। ১৮৪৮—'৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইওরোপে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে যখন ব্যাপকভাবে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তখন একমাত্র রাশিয়াই অনায়াসে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, এমন কি, হাঙ্গেরীর উদারনৈতিক বিদ্রোহ-দমনে রাশিয়া যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্রই বিপ্লবের প্রভাবে কোন-না-কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র রাশিয়ার প্রজাবর্গই সর্বপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকায় ইংরেজ জাতির অধিকাংশই তখন কোনপ্রকারে একটি যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড পামারস্টোন রাশিয়ার বিস্তার-নীতিতে বাধাদানের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ রাশিয়ার বিস্তার-নীতির ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে এই আশঙ্কা ছিল ব্রিটিশ সরকারের তুরস্ক-নীতির মূলসূত্র। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এজন্য ইংলণ্ড তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।* অপর দিকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইহার পশ্চাতেও কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, তৃতীয় নেপোলিয়ন জার নিকোলাসের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যক্ত

ইংরেজ জাতির যুদ্ধ-স্পৃহা

পামারস্টোনের যুদ্ধ-নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধাইবার প্রয়োজনীয়তা

* "...the British Government needed an independent Turkey for the security of the eastern Mediterranean." *The Struggle for Mastery in Europe*, A J P. Taylor, p. 69.

না, কারণ নিকোলাস তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেও চিঠিপত্রাদিতে তিনি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরাজয়ের অপমান দূর করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইহা ভিন্ন, নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিয়া এবং যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করিয়া প্রথম নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়া কৌশলে স্বয়ং ফরাসী সম্রাট-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি যাহাতে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির উম্মাদনায় মাতিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে তিনি বিনাশ করিয়াছেন সেদিকে মনোযোগ দিতে না পারে সেজন্য নেপোলিয়নের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।* এই সকল কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইল। রুশ-তুরস্কের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ারও শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাশিয়া এবং তুরস্ক উভয় দেশই ছিল অস্ট্রিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এই কারণে এই দুই দেশের পরস্পর যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল। ইহা ভিন্ন, অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিস্তার-নীতি ভীতির চক্ষে দেখিত। অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় ভিয়েনা নগরীতে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে 'ভিয়েনা নোট' (Vienna Note) নামে এক প্রস্তাবপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই প্রস্তাবে কুসুক্-কেইনারজি (Kutchuk-Kainardji) ও আড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধির শর্তানুযায়ী তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের উপর রাশিয়াকে যে-অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা হইল, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু যাহাতে রাশিয়া না করে সেদিকে জার নিকোলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। নিকোলাস কিন্তু নিজের সুবিধানুযায়ী এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিলেন। এ-বিষয় লইয়া রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। রাশিয়া

জার নিকোলাসের প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের অসন্তুষ্টি

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির প্রয়োজনীয়তা

অস্ট্রিয়ার ভীতি

'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র'

নিকোলাস কর্তৃক সুবিধানুযায়ী 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্রের' ব্যাখ্যা

* Nicholas needed a subservient Turkey for the sake of Russian security; Napoleon needed success for the sake of his domestic position; the British Government needed an independent Turkey for the security of the eastern Mediterranean. Vide, *The Struggle for Mastery in Europe*, Taylor, pp. 65-66.

শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। ফলে ইংলন্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া যুদ্ধের মূল কারণ দূর করিল। যদিও ইহাতে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার আর কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, তথাপি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির তখনও কৃষ্ণসাগরে রুশ প্রাধান্য নাশ, দানিউব নদীতে নৌচলাচলের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও তুর্কী খ্রীষ্টানদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব এই তিনটি শর্ত রাশিয়ার উপর চাপাইবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

রাশিয়া কর্তৃক ভিয়েনা প্রস্তাব অগ্রাহ্য : ইংলন্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

এ. জে. পি. টেইলর-এর মতে এই যুদ্ধ পূর্ব-নির্ধারিত ও অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ রাশিয়া, ফ্রান্স বা ব্রিটেন কোন দেশের পক্ষেই এই বিবাদ হইতে সরিয়া যাইবার উপায় ছিল না। নিকোলাস চাহিয়াছিলেন এই যুদ্ধের সূত্রে রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য তুরস্ককে রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করিতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী জাতির নিকট নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে এবং ফরাসী জাতিকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির গৌরব উপভোগের সুযোগ দান করিতে। আর গ্রেট ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখা।

রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধ চালাইবার পশ্চাতে মূল কারণ

অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে যোগদান না করিলেও সর্বদা রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার অলমুজ্ (Olmutz) নামক স্থান-সংক্রান্ত কূটনৈতিক বিবাদে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করিয়াছিল। তথাপি অস্ট্রিয়া শত্রুভাবাপন্ন থাকায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পথ সহজ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া রাশিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল।

অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিলেও পরোক্ষভাবে শত্রুতা সাধন

প্রাশিয়া বিস্‌মার্কের পরামর্শে এই যুদ্ধ হইতে বিরত রহিল। ইহার ফলে পরবর্তী কালে জার্মান ঐক্য সাধনের যুদ্ধে প্রাশিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রাশিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত

পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোনপ্রকার স্বার্থ জড়িত না থাকা সত্ত্বেও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া পনর হাজার সৈন্যসহ মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। এই যুদ্ধে যোগদানে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালীয় ঐক্যের সমস্যাকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহানুভূতি, বিশেষত ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভ করা এবং ফ্রান্সের সহায়তায় ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদান

যুদ্ধের ঘটনা (Events of the War) ঃ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রাশিয়া সিলিস্ট্রিয়া (Silistria) নামক স্থানটি আক্রমণ করিল। কিন্তু এই স্থানটি অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই চরমপত্রে রাশিয়াকে অনতিবিলম্বে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে বলা হইল। সিলিস্ট্রিয়ার অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ-ক্ষমতা তদুপরি অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিকোলাসকে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগে বাধ্য করিল। যে-কারণে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা রাশিয়ার এই দুইটি স্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হইল। কিন্তু মিত্রশক্তি তখন যুদ্ধ অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এইভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। এই পর্যায়ে ক্রিমিয়া ও সিবাস্তোপোল (Sebastopol) আক্রমণ হইল প্রধান ঘটনা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রশক্তি আলমা (Alma)-র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রিমিয়া দখল করিল। বালাক্লাভা ও ইঙ্কারম্যান (Balaclava and Inkerman) এই দুই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইলে সিবাস্তো-পোলের পতন ঘটিল।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়

সিলিস্ট্রিয়া আক্রমণে অস্ট্রিয়ার চরমপত্র ঃ রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়

আলমা, বালাক্লাভা ও ইঙ্কারম্যান-এর যুদ্ধ ঃ রুশ পরাজয়

যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পরবর্তী জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অধিককাল যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হইল না। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কারস (Kars) নামক স্থানটি জয় করিয়া পরাজয়ের অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে পুনরায় যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য কতকগুলি শর্ত সংবলিত এক চরমপত্র দিলে রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্যারিসের শান্তি চুক্তি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিল।*

নিকোলাসের মৃত্যু ঃ দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সিংহাসন লাভ ; রাশিয়া কর্তৃক কারস দখল

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় চরমপত্র ঃ যুদ্ধাবসান

প্যারিসের শান্তি-চুক্তি, মার্চ, ১৮৫৬ (Peace of Paris, March, 1856) ঃ প্যারিসের শান্তি-চুক্তি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হইল। এই চুক্তির শর্তগুলিকে

* ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ত্রুটির ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে দারুণ অসুস্থতা দেখা দেয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার সেবাকার্য দ্বারা মিত্র ও শত্রুপক্ষের রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

তিন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শর্ত দ্বারাঃ (১) যুদ্ধের সময় কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিস প্রণালী সকলের নিকট সমভাবে বন্ধ থাকিবে স্থির হইল; (২) সকল দেশের বাণিজ্যপোত কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিস প্রণালীতে চলাচলের সমান অধিকার পাইল; (৩) দানিউব নদীতে নৌচালনার অবাধ অধিকার সকল দেশকে সমানভাবে দেওয়া হইল; (৪) কৃষ্ণসাগর বা দার্দানেলিস উপকূলে রাশিয়া বা তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্ত দ্বারাঃ (১) রাশিয়া তুরস্কের গোঁড়া খ্রীষ্টানদের উপর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিল; (২) রাশিয়া দক্ষিণ-বেসারাবিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দিল, ফলে রুশ রাজ্যসীমা দানিউব অঞ্চল হইতে অপসৃত হইল। তৃতীয় পর্যায়ের শর্ত দ্বারাঃ (১) তুরস্ককে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের অধীনে আসিতে এবং ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ে যোগদান করিতে দেওয়া হইল; (২) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল; (৩) সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসন তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মনোযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল।

প্রথম পর্যায়ের শর্তাবলী

দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তাবলী

তৃতীয় পর্যায়ের শর্তাবলী

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তথা প্যারিসের শান্তি-চুক্তির গুরুত্ব (Importance of the Crimean War & Peace of Paris)ঃ প্রথমত, ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের প্রস্তাবক্রমে স্থির হইল যে, কোন ইওরোপীয় শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা অবশ্যই করিবে। এই সদিচ্ছা প্রকাশের মধ্যে কাহারও আন্তরিকতা ছিল না বটে, তথাপি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি রক্ষার প্রয়োজন যে অনুভূত হইতেছিল তাহা এই প্রস্তাব হইতে বুঝা যায়।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নীতি স্বীকৃত

দ্বিতীয়ত, নৌযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের একটি নূতন আন্তর্জাতিক নীতি প্যারিস সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়। নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ হইতে শত্রুপক্ষের কোন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ করা হইল। যুদ্ধ সামগ্রীর (Contraband of war) ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না।

নৌযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার নীতি রুদ্ধ হইল এবং রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুরস্ককে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখিবার যে-ক্ষমতা রাশিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা অন্তত সাময়িকভাবে রোধ করা সম্ভব হইল। তুরস্ক আরও কিছুকাল

নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিবার অর্থাৎ একটি সাম্রাজ্য হিসাবে টিঁকিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করিল।

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস, ক্রম-বিজয় প্রতিহত: তৃতীয় নেপোলিয়নের গৌরব বৃদ্ধি

চতুর্থত, ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক বোনাপার্টির আমলের ফরাসী সাম্রাজ্যের মর্যাদা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা অতি সামান্যভাবে সফল হইল। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য তৃতীয় নেপোলিয়নের গৌরব এই যুদ্ধের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পঞ্চমত, ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। উপরন্তু ইওরোপীয় মহাদেশে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার মত সামরিক শক্তি ইংলণ্ডের আর নাই এ-কথাও এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইল। সমুদ্রবক্ষে প্রাধান্য এবং নিজ দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য থাকিলেও ইওরোপীয় মহাদেশের স্থলযুদ্ধে তেমন তৎপরতা বা শক্তি দেখাইবার মত ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই, এ-কথাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হইল।*

ইংলণ্ডের ঋণগ্রস্ততা

ষষ্ঠত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত এবং কন্‌সার্ট অব্‌ ইওরোপ কর্তৃক সংরক্ষিত ইওরোপীয় শান্তির যুগের অবসান ঘটাইয়া এক নূতন যুদ্ধের যুগের সূচনা করিল।† ইংরেজদের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকেই ইংলণ্ডের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়াছেন, কিন্তু ইওরোপের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধে যোগদান করা ইংলণ্ডের পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না।

ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি

সপ্তমত, ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াই পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্যাভুর (Cavour) ইতালির ঐক্যের প্রশ্নকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত করিতে এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতালির ঐক্যের সূত্রপাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই হইয়াছিল।‡ ইহা ভিন্ন, ইতালির ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ: ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

* "One of the first and most important of these general results was the putting an end to Great Britain as a military factor in European politics.' *World History*, Fueter, p. 220.

† "The Crimean War also opend an era of great wars on Europe." *Idem.*

‡ "Out of the mud of Crimea a new Italy was made and less obviously a new Germany." Ketelbey, p. 210.

অষ্টমত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পশ্চাতে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী ছিল সেই কথা উপলব্ধি করিয়া জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপে রুশ অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হওয়ায় রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি এক নূতন পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে, মধ্য-এশিয়ার পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তারলাভ করিল। দক্ষিণে ককেশাস পর্বতের পাদদেশ রুশ রাজ্যভুক্ত হইল। ইহা ভিন্ন, এই সময় হইতেই রুশ পররাষ্ট্র-নীতি বিশেষভাবে ফ্রান্স-বিরোধী হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফল হিসাবেই ফরাসী দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (Second French Empire)-এর পতন ঘটান রুশ পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

পারস্য ও আফগানিস্তানের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি

নবমত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পূর্ব-সহানুভূতি ও সাহায্যের কথা বিস্মৃত হইয়া রাশিয়ার বিরোধিতা করায় পরবর্তী বহু বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়া রাশিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।* এই কারণেই অস্ট্রিয়াকে ইতালি ও জার্মানির হস্তে বার বার পরাজিত হইতে হইয়াছিল। ফলে, ইতালি ও জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য চিরতরে লোপ পাইয়াছিল এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি ও জার্মান রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে দীর্ঘ চাল্লিশ বৎসরের শান্তি ভঙ্গ করিয়া পরবর্তী কালের কয়েকটি যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার শত্রুতা : জার্মানি ও ইতালির প্রাধান্য নাশ

ইওরোপের শান্তিভঙ্গ

সমালোচনা (Criticism): অনেকের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যেমন অতি সামান্য কারণে শুরু হইয়াছিল, উহার প্রকৃতিও ছিল তেমনি সংকীর্ণ ও গৌরবহীন, আর উহার ফলাফল ছিল ততোধিক নগণ্য। এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক ও মন্ত্রী এ্যাডলফি থিয়ার্স (Adolphe Thiers) ইহাকে 'কবরের চাবিকাঠি লইয়া নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন

কারণ অতি সামান্য, প্রকৃতি সংকীর্ণ, ফলাফল নগণ্য

* "The Crimean War checked and humiliated Russia, gave a new lease of life to Turkey under the joint protection of the powers. Napoleon III gained a great advertisement, England a heavy National Debt. Austria an enemy for a generation." Ketelbey, p. 210.

যাজকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-প্রসূত যুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* কিংলেক (Kinglake), সার রবার্ট মোরিয়ার (Sir Robert Morier) প্রমুখ অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) প্রমুখ লেখকগণ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ না ঘটিলে বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইত না এবং কনস্টান্টিনোপল্ রাশিয়ার দখলে চলিয়া যাইত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলেই ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা প্রভৃতি ইওরোপীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল।

থিয়ার্স, কিংলেক ও সার রবার্ট মোরিয়ার-এর অভিমতঃ আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যকীয় যুদ্ধ

লর্ড ক্রোমার-এর মত ঃ বলকান স্বাধীনতা ও তুরস্কের নিরাপত্তা যুদ্ধের ফলস্বরূপ

আধুনিক ঐতিহাসিক টেলর (A. J. P. Taylor)-এর মতে, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ হইতেই এই যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল, পরস্পর আক্রমণ হইতে নহে। তথাপি এই যুদ্ধের যে প্রয়োজন ছিল না, এ-কথা বলা চলে না।† তাঁহার মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের স্বার্থের জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল তুরস্কের স্বার্থে নহে। এই যুদ্ধ রাশিয়ার-বিরুদ্ধে চালান হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া উহা তুরস্কের স্বার্থ রক্ষার যুদ্ধ এ-কথা বলা চলে না।‡ টেলর এ-কথাও বলেন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিয়া রাশিয়া অস্ট্রিয়ার উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই সূত্রে ইতালি ও জার্মানির উপর রাশিয়ার প্রাধান্যমূলক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার আশংকা ছিল। কারণ ইতালি ও জার্মানি ছিল তখন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যাধীন। এদিক দিয়া বিচার করিলে মধ্য-ইওরোপকে রুশ প্রাধান্য হইতে মুক্ত রাখাই ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

টেলর (A. J. P. Taylor)-এর মত

* "A war to give a few wretched monks the key of Grotto"—*Thiers*, Ketelbey, p. 191.

† "Mutual fear, not mutual aggression, caused the Crimean War, nevertheless it was not a war without a purpose.' *The Struggle for Mastery in Europe*, A. J. P. Taylor, p. 61.

‡ "......it was fought against Russia not in favour of Turkey," *Idem*, also vide, *Europe Since Napoleon*, David Thomson, p. 227.

"The real stake in the Crimean war was not Turkey. It was Central Europe, that is to say Germany and Italy." *The Struggle for Mastery in Europe*, A. J. P. Taylor, pp. 60-61.

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে বলকান অঞ্চল এবং কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। দানিউব অঞ্চলেও মোলডাভিয়াকে বেসারাবিয়া হস্তান্তর করিবার ফলে রাশিয়ার আধিপত্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার সামরিক শক্তি অন্তত কিছু কালের জন্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তুরস্ক ইওরোপীয় শক্তিবর্গের রক্ষণাধীনে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (Sick man of Europe) পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিজ পায়ে দাঁড়াইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

প্রত্যক্ষ ফলাফল

প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে কোন দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপিত হয় নাই; এই যুদ্ধের ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যারও কোন উপযুক্ত সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিল। সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে রাশিয়া অপসারিত হইলেও ঐ সময়ে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এই লোকক্ষয়কারী বিশাল যুদ্ধের হয়ত কোন প্রয়োজনই ছিল না। তথাপি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফলের গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক যুদ্ধও বলা চলে না। এই যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফল ও প্রভাব-ই ছিল ইহার প্রধান গুরুত্ব।*

প্রত্যক্ষ ফল নগণ্য

ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন, ভিয়েনা ব্যবস্থার লোপ—ইত্যাদি সব কিছুই ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া ঘটিয়াছিল। এজন্য বলা হয় "Out of the mud of the Crimea a new Italy was made, and less obviously a new Germany" (Ketelbey)। এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার ইওরোপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভিয়েনা সম্মেলনে যে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ভিত্তি পর্যন্ত এই যুদ্ধের ফলে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুইটি স্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৮৫৯) এই দুইটি স্থান ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এক বিরাট স্রোতস্বতীর ন্যায় দুই কূল ছাপাইয়া

ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ইত্যাদি ইহার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল

* "It was a fumbling war, probably unnecessary, largely futile and certainly extravagant, yet rich in unintended consequences···It therefore cleared the way for remodelling of Germany and Italy by means of war." David Thomson, p. 227.

সমগ্র ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের এক প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ইওরোপীয় ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না।

ম্যারিয়টের মত

ঐতিহাসিক ম্যারিয়টের (J. A. R. Marriott) মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে যদি অপরাধ বলিয়া অভিহিত নাও করা হয় তবুও ইহা যে একটি বিরাট ভুল হইয়াছিল এবং চেষ্টা করিলেই এই যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনৈক কূটনীতিকের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটেন ভুল ঘোড়ার উপর বাজি রাখিয়াছিল (England put her money on its wrong horse)।

উপসংহার

উপসংহারে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত আলোচনায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতানৈক্য থাকিলেও ইহার সুফল যে যথেষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে এই যুদ্ধের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল ছিল এই যে, রাশিয়ার শাসকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের দেশগুলির সহিত যুঝিবার ক্ষমতা ভূমিদাস-ভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল রাশিয়ার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হইবে না। ইহার ফলশ্রুতিই ছিল জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভূমিদাসদের 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancepation) দ্বারা ভূমিদাস-প্রথার অবসান (১৮৬১)। এদিক দিয়া বিচার করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা দূর করিয়া রাশিয়াকে সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইওরোপীয় দেশগুলির সম-মর্যাদাসম্পন্ন করিয়াছিল।*

---

* Vide, *A short History of Modern Europe*, Riker, p. 763.

অধ্যায় ১০

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য
(Napoleon III & the Second French Empire)

তৃতীয় নেপোলিয়ন * (**Napoleon III**)ঃ বিপ্লবের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, উহার গতি কোন পথ ধরিবে তাহা পূর্বে হইতে বলা সম্ভব হয় না। বস্তুত, ১৭৮৯-এর বিপ্লব বা ১৮৪৮-এর বিপ্লব যাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাদের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য ছিল একরূপ, কিন্তু ফলাফল হইয়াছিল অন্যরূপ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার শেষ পরিণতি ঘটিল তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপনে। ঠিক এইরূপ পরিস্থিতি ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলেও উদ্ভূত হইয়াছিল প্রথম নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঃ লুই নেপোলিয়ন-এর উত্থান

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলে ফ্রান্স এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবও তেমনি তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

প্রথম জীবন (**Early life**)ঃ লুই নেপোলিয়ন (৩য় নেপোলিয়ন) ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হল্যাণ্ডরাজ লুই বোনাপার্টির পুত্র।

লুই নেপোলিয়ন-এর জন্ম (১৮০৮)

তিনি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াটারলু'র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে নেপোলিয়ন সাত বৎসরের বালক লুই বোনাপার্টিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "কে বলিতে পারে—এই শিশুর মধ্যেই হয়ত আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিহিত রহিয়াছে।"† নেপোলিয়ন-এর পতনের পর বোনাপার্টির পরিবার নির্বাসিত হইলে লুই নেপোলিয়ন তাঁহার মাতার সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে

সাত বৎসর বয়সে নির্বাসিত (১৮১৫)

---

* প্রথম নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পুত্রকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন বলা হয়। ইঁনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে অল্পবয়সে মারা গেলে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন আখ্যায়িত হন।

† "Who knows that the future of my race may not lie with this boy"—*Napoleon*, Vide, Ketelbey, p. 162.

লাগিলেন। মাতার নিকট হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অনন্যসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে নেপোলিয়ন সম্পর্কে এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। নির্বাসিত অবস্থায়ও লুই নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন যে, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইবেন। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজসদৃশ সম্মানে সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি ও ইংলণ্ড ভ্রমণ

ইতালিতে অবস্থানকালে তিনি নেপোলিয়ন-এর বৃদ্ধা মাতা লেটিজিয়া বোনাপার্টির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ইতালির 'কার্বোনারি' (Carbonary) নামক সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হন। পরে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে আন্দোলনের (Chartist Movement) বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে স্পেশ্যাল কন্‌স্টেবল (Special Constable) হিসাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এই সকল ভাগ্য-বিবর্তনের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ট্রাসবুর্গ নামক স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য যোগাড় করিয়া ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি অকৃতকার্য হন এবং ফরাসী সৈন্য কর্তৃক ধৃত হন। ফলে তিনি আমেরিকায় নির্বাসিত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই লুই নেপোলিয়ন আমেরিকা হইতে পলাইয়া আসিতে সমর্থ হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ্প (১৮৩০-৪৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দেহাবশেষ সেন্ট্ হেলেনা হইতে প্যারিসে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলে ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি এক অতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। সেই সুযোগে লুই নেপোলিয়ন বোলোন্ (Boulogne) নামক স্থানে সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন; এবারও তিনি অকৃতকার্য হন এবং হ্যাম (Ham) নামক দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এখান হইতেও তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

ইতালিতে কার্বোনারি-এর সদস্য

তিনি 'চার্টিস্ট'

ইংলণ্ডে স্পেশ্যাল কন্‌স্টেবল

স্ট্রাসবুর্গের ক্ষমতা-লাভের চেষ্টা (১৮৩৬)

আমেরিকায় নির্বাসিত

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বোলোন্ নামক স্থানে ক্ষমতালাভের বৃথা চেষ্টা : হ্যাম দুর্গে বন্দী

হ্যাম দুর্গ হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের উত্থান (Rise of the Second French Empire) : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লুই নেপোলিয়ন-এর ভাগ্যরবি উদিত হয়। লুই ফিলিপ্পের পতনের ফলে তাঁহার ফ্রান্সে ফিরিয়া

আসিবার কোন বাধা রহিল না। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীনে কার্য-গ্রহণের আগ্রহ জানাইলে তাঁহাকে প্রথমে আইনসভা বা গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। এই সভার সদস্য হিসাবে লুই নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে সক্ষম না হইলেও তাঁহার সুমধুর ব্যবহার, বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি তাঁহার গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা ফরাসী জাতির মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। ঐ সময় 'নেপোলিয়ন' নামের মোহ জনসাধারণকে পাইয়া বসিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ন-এর নামের মধ্যে 'নেপোলিয়ন' শব্দটি থাকায় তিনিও ফরাসী জাতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামধারী যে-কোন ব্যক্তিই তখন ফরাসী জাতির সমর্থন লাভের যোগ্য ছিল। ব্যক্তিত্বের প্রভাব কিভাবে ইতিহাসের গতি প্রভাবিত করে তাহা তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে প্রথম নেপোলিয়নের প্রভাব হইতেই অনুমান করা যায়। জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফরাসী জাতি দৃঢ় শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তিতে বাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। লুই নেপোলিয়ন-এর পক্ষে দৃঢ় এবং স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইবে এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইল। "নেপোলিয়ন" নাম অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জাতীয় মর্যাদা এই দুইয়ের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বভাবতই লুই নেপোলিয়ন যখন নূতন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইলেন তখন পঞ্চান্ন লক্ষেরও অধিক ভোটে তিনি নির্বাচিত হইলেন।* ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি-পদ গ্রহণ করিলেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত

'নেপোলিয়ন' নামের মোহ

ফরাসী জাতির শান্তি-পূর্ণ জীবনের জন্য ব্যাকুলতা

লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে লুই নেপোলিয়নকে আইনসভার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। পররাষ্ট্র-নীতি লইয়া আইনসভার সহিত তাঁহার মতানৈক্য দেখা দিল। আইনসভার অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ও রাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু তাঁহারা চাহিয়াছিলেন বুরবোঁ, অন্তত অর্লিয়েন্স পরিবারের কোন বংশধরকে সিংহাসনে বসাইতে। ইহা ভিন্ন, তাঁহারা বিপ্লবের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। লেদ্রু-রোলিং (Ledru-Rolling) নামক উগ্র বামপন্থী নেতার নেতৃত্বে এক বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা সহজেই দমন করা হইল বটে, কিন্তু ইহার ফলে যে ভীতির সৃষ্টি হইল তাহাতে আইনসভার বামপন্থী অনেক সদস্যকে সভার সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত করা হইল। ইহা ভিন্ন, বামপন্থীদের প্রভাব কমাইবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের ভোটাধিকারও

রাষ্ট্রপতি ও আইন-সভার মধ্যে মতানৈক্য

আইনসভার বামপন্থী প্রভাব দমনের চেষ্টা

---

* Louis Napoleon five and half million votes (55,00,000); Cavaignac a million and a half (15,00,000); Ledru-Rolling three hundred and seventy thousand (3,70,000); Lamartine seventeen thousand (17,000) only.

হ্রাস করা হইল। ভোটদাতাকে ভোট দিবার পূর্ববর্তী তিন বৎসর একই স্থানে বাস করিতে হইবে—এই আইন গৃহীত হওয়ার ফলে এক বিশাল সংখ্যক ভোটদাতার ভোটাধিকার নাকচ হইয়া গেল। যে-সকল শ্রমজীবী একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে বাধ্য হইত তাহাদের অনেকেই ভোটাধিকার হারাইল। এইভাবে আইনসভা পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজতান্ত্রিক হইয়া উঠিল এবং রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার মতানৈক্য দিন-দিন বাড়িয়া চলিল। কিন্তু আইনসভার সদস্যদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হইলেও জনসাধারণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার হ্রাস : তিন বৎসর একই স্থানে বসবাসের আইন

লুই নেপোলিয়ন দেখিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহার রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার চারি বৎসর কাল প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি পুনরায় যাহাতে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন সেইজন্য প্রজাতান্ত্রিক শাসনবিধির পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু করিলেন। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই শাসনবিধির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব ছিল, কিন্তু লুই-এর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া গেল না। তখন লুই জনসাধারণের সহায়তা লাভের আশায় কূটনৈতিক চাল চালিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। একই স্থানে তিন বৎসর বাস করিবার পর ভোটাধিকার লাভের যে-নীতি কিছুদিন পূর্বে আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি নাকচ করিবার চেষ্টা করিলেন। আইনসভা ইহার বিরোধিতা করিলে লুই নেপোলিয়ন আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। থিয়ার্স, ক্যাভাইগ্নাক্ প্রমুখ কয়েকজন বিরোধী সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইল। লুই-এর বিরোধী পক্ষ প্যারিস নগরীতে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে অতি সহজেই তাহা দমন করা হইল।

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের চেষ্টা

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক আইনসভা বাতিল

লুই নেপোলিয়ন এক নূতন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দশ বৎসর পর্যন্ত নিজপদে বহাল থাকিবেন। আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে। ঊর্ধ্বকক্ষের নাম হইবে কাউন্সিল অব্ স্টেট্ (Council of State)। এই কাউন্সিলের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সভার দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় আইনের প্রস্তাব বা খসড়া প্রস্তুত করা। নিম্নকক্ষ বা 'লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী' (Legislative Assembly) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি-মাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবে। আইন পাস ইত্যাদি যাবতীয় কাজের দায়িত্ব থাকিবে এই সভার উপর। জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার

নূতন শাসনতন্ত্র

দুই-কক্ষযুক্ত আইন-সভা : কাউন্সিল অব্ স্টেট্ ও এ্যাসেম্বলী

ইত্যাদি নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হইল সিনেট নামে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একটি ক্ষুদ্র সমিতির উপর। বিপুল ভোটাধিক্যে এই নূতন শাসনতন্ত্র ফরাসী জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইল।* ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে লুই নেপোলিয়ন এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন। এই ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে (১৮৫২) লুই নেপোলিয়ন 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' উপাধি ধারণ করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের মত গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। সিনেটের প্রস্তাবক্রমে তিনি সম্রাট-পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া এই বিষয়ে জনসাধারণের মতের জন্য গণভোট গ্রহণ করিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামের সম্মোহনী শক্তি এবারও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিল।† বিপুল ভোটাধিক্যে ফরাসী জাতি লুই নেপোলিয়নকে তাহাদের সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। এইভাবে ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার সম্রাট-পদ ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

সিনেট

জনসাধারণের মতানুক্রমে সম্রাট-পদ গ্রহণ

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রকৃতি (Character of the Second French Empire): সম্রাট-পদ গ্রহণের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার খুল্লতাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শাসনব্যবস্থার অনুকরণে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি বলপূর্বক ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং, এই অবৈধ কার্যকে বৈধতার রূপদান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাহ্যত (১) পার্লামেন্টারি শাসন, (২) গণভোট দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও (৩) জনকল্যাণকর সংস্কার সাধন—এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। তিনি স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন। সিনেট, কাউন্সিল অব্ স্টেট্, এ্যাসেম্বলী প্রভৃতি সভা-সমিতিগুলি তখনও রহিল। কিন্তু সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যমাত্রই ছিলেন সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি। বিচারপতি, বড় বড় শহর ও নগরের মেয়র প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সম্রাট কর্তৃক মনোনীত। এ্যাসেম্বলীর কোনপ্রকার আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমতা রহিল না, এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচনে সম্রাটের সপক্ষে সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত রহিলেন। এইভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে সম্রাটের স্বৈরাচারী শাসন স্থাপিত হইল।

সম্রাট শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী

তাঁহার উদ্দেশ্য

সিনেট, কাউন্সিল ও এ্যাসেম্বলী

---

* "There were 7,439,000 who voted *ayes*, and only 640,000 *noes*." Grant & Temperley, p. 269.

† It was submitted to a plebiscite and 7,824,000 were returned as saying *yes* while only 253,000 said *no*." *Ibid*, p. 219.

দৃশ্যত তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর শাসনব্যবস্থা প্রজাহিতৈষী বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ধারণাই ছিল এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। নেপোলিয়ন জনগণের মতানুক্রমে যেমন সম্রাট-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি শাসনব্যাপারেও জনসাধারণের মতামতের মূল্য দেওয়ার বাহ্যিক ইচ্ছার তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এই বাহ্যিক গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অন্তরালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা, নির্বাচন প্রভাবিত করা, বিদ্যালয়গুলিতে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া, এ্যাসেম্বলী বা গণপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি একক প্রাধান্য স্থাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অধীনে 'কনসালেট্' (consulate) শাসনব্যবস্থায় যেরূপ একক প্রাধান্যের ব্যবস্থা ছিল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর অধীনেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

দৃশ্যত প্রজাহিতৈষী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বস্তুত স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কনসালেট্-এর অনুকরণ

একক প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির উন্নতির কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করিলেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে গভীর ছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধনে সর্বপ্রথমই প্রয়োজন ছিল অপ্রতিহত একক প্রাধান্যের এবং এই একক প্রাধান্যের ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। সুতরাং তাঁহার শাসন-নীতিই ছিল স্বৈরাচারী ক্ষমতার সহিত দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান এবং জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া একক প্রাধান্য স্থাপন।*

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর দেশ ও দেশবাসী প্রীতি

স্বৈরাচারী শাসনের সহিত দেশবাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of Napoleon III): দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যাধীন অর্থাৎ তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও কার্য-নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি "নেপোলিয়ন-এর কল্পনা" (Napoleonic Ideas) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শাসন-নীতির মূল কথার উল্লেখ করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর নীতি, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গৃহীত

* "Technically his power was based upon the will of the people as expressed in the plebiscite : actually it rested upon the army. In short, the fundamental idea underlying the Napoleonic regime was that of inverted democracy—Caesarism founded upon popular basis." Lipson, p. 32.

তাঁহার মতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী-বিপ্লবের মূল্যবান দানগুলিকে স্থায়ী করা এবং এই উদ্দেশ্যে অপ্রতিহত একক ক্ষমতা গ্রহণ করা ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্থাপন করা। তৃতীয় নেপোলিয়নও এই দুইটি নীতি অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ হিসাবে তিনি শৃঙ্খলার সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধানের অর্থাৎ জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের উপর নজর দিলেন। দেশের শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব আনিতে হইলে জাতিকে দেশের আইন-কানুন এবং শাসন মানিয়া চলিতে হইবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিবার পূর্ব-শর্তই হইল আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলা। ইহা ভিন্ন ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছ ব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতা নহে, ইহা নাগরিক মাত্রকেই উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সমসাময়িক কালের জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু উহাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার খুল্লতাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন।

দুইটি মূল নীতি : (১) স্বৈরাচারী শাসনাধীনে ফরাসী বিপ্লবের সুফলগুলি সংরক্ষণ, (২) স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ

(১) তিনি গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যগণ, বিচারপতিগণ, শহর ও নগরের মেয়রগণ সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইলেন। এ্যাসেম্বলী বা গণপরিষদের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটেই সম্পন্ন হইবে স্বীকৃত হইল, কিন্তু নির্বাচন প্রভাবিত করা এবং এ্যাসেম্বলীর আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া এ্যাসেম্বলীকে সম্রাটের ইচ্ছানুয়ায়ী চলিতে বাধ্য করা হইল।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক প্রাধান্য স্থাপন

(২) স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফরাসী জাতি শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য যাহাতে শিক্ষা করিতে পারে সেইজন্য শিক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলেন।

শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

(৩) সংবাদপত্রগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল। সরকারী অনুমতি ভিন্ন কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ করা বা সরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ নিষিদ্ধ হইল। সামান্য ত্রুটির জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইত। সাধারণ পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল।

সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ

(৪) সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার আইনত অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার নিয়ন্ত্রণ

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক উন্নতি সাধন করিয়া ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে চাহিলেন। তাঁহার স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের ফলে ফরাসী জাতি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, তাহার ক্ষতি তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিলেন। জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যাদি সরকারী পরিকল্পনার সর্বাগ্রে স্থান লাভ করিল। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তিনি যে আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত "দারিদ্র্যের অবসান" (*Extinction of Pauperism*) নামক পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার উৎসাহে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইল। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শিল্পপতিগণ যাহাতে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, সেইজন্য 'ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার' (*Credit foncier*) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল। বৃহৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ-মেয়াদী প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইল। 'ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার' (*Credit mobilier*) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স'-এর শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন করা হইল। দেশের সর্বত্র এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। রেলপথের প্রসার ও উন্নতি বিধান করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধি করা হইল। ডাকবিভাগও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ করিল। নূতন নূতন প্রয়োজনের তাগিদে নূতন নূতন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের মোট শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ হইল।

কল্যাণকর কার্যের দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা

দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি

শিল্প ও বাণিজ্যের উৎসাহ : শিল্প-ঋণের ব্যবস্থা—ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার, ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার

ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স-এর শাখা স্থাপন

রেলপথ ও ডাকবিভাগের উন্নতি, শিল্প ও বাণিজ্যের আশাতীত উন্নতি : নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, দ্বিগুণ শিল্পোৎপাদন

(৬) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শ্রমজীবীদের মজুরীও শতকরা প্রায় চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু মোট আয়ের অধিকাংশই মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হস্তে সঞ্চিত হওয়ায় এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবিগণের দুর্দশার তেমন লাঘব হইল না। কসাইদের একচেটিয়া কারবারের অধিকার নাকচ করিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাংসের দাম কমাইবার ব্যবস্থা করা

শ্রমজীবীদের উন্নতি, দরিদ্রের জন্য সস্তায় রুটির ব্যবস্থা

হইল। দরিদ্রের নিকট বাজার-দর অপেক্ষা সস্তায় রুটি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। কোন প্রকার অজন্মা বা অন্য কোন দৈব-দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত লোকদের জন্য সাহায্যভান্ডার, সরকারী সাহায্যদান, বেকার-সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কারখানা স্থাপন ইত্যাদি নানাপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আমলে অবলম্বিত হইল।

দৈব-দুর্ঘটনার সময় সরকারী সাহায্যদান, বেকার-সমস্যা দূরীকরণ, সরকারী কারখানা স্থাপন

(৭) প্যারিস ও অন্যান্য শহরগুলিতে নূতন নূতন প্রাসাদ ও অন্যান্য আধুনিক রুচিসম্মত হর্ম্যাদি নির্মাণ করা হইল। প্যারিস তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আমলেই উহার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ, লুভরে মিউজিয়াম (Louvere Museum)-এর প্রসার প্রভৃতি নানাবিধ কাজ সেই সময়ে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

প্যারিস ও অন্যান্য শহরে প্রাসাদ ও হর্ম্যাদি নির্মাণ

(৮) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরাচারী একক-অধিনায়কত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়া উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করেন। এজন্য ১৮৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর ফ্রান্স 'উদারনৈতিক সাম্রাজ্য' (Liberal Empire) নামে পরিচিত ছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শুরু করেন। কিন্তু ইতালির যুদ্ধে যোগদান করিয়া (১৮৫৯ খ্রীঃ) তিনি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি ছিলেন অবাধ-বাণিজ্য-নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি ইংলন্ডের সহিত এক বাণিজ্যিক চুক্তি (Cobden Treaty) স্বাক্ষর করিয়া ইংলন্ড হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক কমাইয়া দিলেন। ইহাতে শিল্পপতিগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, অবাধ-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আদান-প্রদান শুরু হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি আপনা হইতেই স্থাপিত হইবে। শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিক শ্রেণী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। সুতরাং যাজক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জাতির সমর্থন লাভ করিতে চাহিলেন। এইজন্য তিনি সিনেট ও এ্যাসেম্বলীকে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমালোচনা করিবার অধিকার দিলেন। বাজেট পাস করিবার ক্ষমতাও এ্যাসেম্বলীকে দেওয়া হইল। ক্রমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,

উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

ইতালির যুদ্ধ : যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি

অবাধ-বাণিজ্য-নীতি : ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসন্তুষ্টি

সিনেট ও এ্যাসেম্বলীকে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমালোচনার অধিকার দান

সভা-সমিতিতে সমবেত হইবার অবাধ অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। তথাপি সম্রাট-বিরোধী জনমত দিন-দিনই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর বিরোধী দলগুলি এই সুযোগ ছাড়িল না। প্রজাতান্ত্রিক দল, ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়, বুরবোঁ রাজবংশের সমর্থকগণ, লুই ফিলিপ্পির পরিবারের (অর্লিয়েন্স পরিবার) সমর্থকগণ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমবেতভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতন ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইল।

বাজেট পাসের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপন

বিরোধী দলের সমবেত আক্রমণ

লুই নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতি (Louis Napoleon's Foreign Policy): তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতির একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর তাঁহার আন্তর্জাতিক মর্যাদাই কেবল নির্ভর করিত না, তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্যও সম্পূর্ণভাবে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর অভ্যন্তরীণ-নীতির সাফল্য নির্ভরশীল

ব্যক্তিগত ইচ্ছার দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৃতীয় নেপোলিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন।* কিন্তু গৌরব-লিপ্সু ফরাসী জাতির সম্রাট হিসাবে আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জন করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন ছিল; আর যুদ্ধ জয় করাই ছিল সেই গৌরব অর্জনের একমাত্র পন্থা। ইহা ভিন্ন, তৃতীয় নেপোলিয়ন এ-কথাও জানিতেন যে, লুই ফিলিপ্পির পতনের একমাত্র কারণই ছিল তাঁহার শান্তি-বাদী পররাষ্ট্র-নীতি। এই কারণে নিজের সম্রাট-পদ রক্ষার জন্যই তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ব্যক্তিগতভাবে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী

ভাবপ্রবণ, গৌরব-লিপ্সু ফরাসী জাতির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতালাভের পশ্চাতে জনগণের যে সমর্থন ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জনগণকে তাহাদের বিপ্লব-প্রসূত গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া একক প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণের দৃষ্টি ও চিন্তাধারা দেশের অভ্যন্তর হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। তাহাদের দীর্ঘকালের কষ্টার্জিত সুযোগ-সুবিধা যে নাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সে-বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ না দেওয়াই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন ছিল খুব চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণ।

জনগণকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা

* "He declared when he became Emperor that the Empire did not mean war—" "*The Empire is peace*"—'La Empire, C'est La Paix', Louis Napoleon III's Bordeaux-speech; Vide, Lipson, p. 208; Riker, p. 256.

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার পক্ষে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ফরাসী গৌরব পুনরুদ্ধার করা সমীচীন ছিল। স্বভাবতই তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতিকে এক চমকপ্রদ গৌরবোজ্জ্বল পররাষ্ট্র-নীতির দ্বারা চমৎকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন সাফল্য অর্জন করিলেন বটে কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি তথা তাঁহার রাজত্বের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল।

নেপোলিয়ন বোনা-পার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য

প্রথম দিকে সাফল্য : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট পরিবর্তন

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক-খ্রীষ্টান ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টান যাজকদের মধ্যে জেরুজালেম-এর পবিত্র স্থানগুলির আধিপত্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই প্রধানত তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। অপর দিকে রাশিয়া গ্রীক-খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সূত্রে ক্রমে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সৃষ্টি হইল। ব্যক্তিগতভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্রীক ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের ধর্ম-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ফরাসী ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জনের সম্ভাবনা ছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগও ছিল। প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে এবং ফরাসী জাতির সম্মুখে এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রীয় সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন।

গ্রীক ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব : ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের পক্ষে ফ্রান্স, গ্রীক-খ্রীষ্টানদের পক্ষে রাশিয়া

ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছাপূরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন ও মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ

(২) তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে উদারপন্থী ছিলেন। তিনি জাতীয়তা-বাদের দাবি স্বীকার করিতেন। একই জাতীয় এবং একই ভাষাভাষী জনসমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের দাবি তিনি স্বীকার করিতেন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি যখন ইতালিতে গিয়াছিলেন, তখন হইতেই তিনি ইতালীবাসীদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। তিনি ইতালীয়দের কার্বোনারি (Carbonari) নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র শক্তির পক্ষে যোগদান করে। এই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর উদার-নীতি

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি

প্যারিসের সন্ধির অল্পকাল পরেই প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি (Pact of Plombieres) স্বাক্ষর করিয়া তিনি পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে সমগ্র ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধনের যুদ্ধে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অবসানের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগদান করিলেন। ফরাসী সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য আশাতীতভাবে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যাজেন্টা (Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Solferino)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল। এই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন এবং পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত কোনপ্রকার পরামর্শ না করিয়াই অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কার (Villafranca) সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর এইরূপ আচরণের পশ্চাতে যে কোন যুক্তি ছিল না, এমন নহে।

প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি

ম্যাজেন্টা ও সোল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে জয়লাভ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

প্রথমত, ভেনিশিয়া নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার দেড়লক্ষ সৈন্য ছিল, ইহাদের সাহায্যে আরও একলক্ষ সৈন্য অস্ট্রিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। নেপোলিয়নের মোট সৈন্য অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়া গেলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না, এই আশঙ্কাও ছিল। তদুপরি প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে, সেই ভয়ও ছিল।

কারণ : (১) অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার অগ্রগতি ও প্রচারকার্যে উৎসাহিত হইয়া রোমাগ্না বা রোমানা (Romagna) নামক স্থানটি পোপের অধীনতা অস্বীকার করিল। রোমানা, পার্মা ও মোডেনা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইতে চাহিল। পোপের আধিপত্য বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ফরাসী যাজক সম্প্রদায় তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

(২) রোমানা নামক স্থানের বিদ্রোহ : ফরাসী ক্যাথলিকদের অসন্তুষ্টি

তৃতীয়ত, ফরাসী জাতির দূরদর্শী ব্যক্তি-মাত্রেই এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেও ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলেন। এই সকল কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির ঐক্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি অনুসারে ইতালীয় ঐক্যে সাহায্যদানের বিনিময়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটি পাওয়ার কথা ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে আর রাজী ছিলেন না বলিয়াই ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিতে ঐ স্থান দুইটি

(৩) ফ্রান্সের নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফরাসী প্রাধান্য ও নিরাপত্তার পরিপন্থী

দাবি করিলেন না। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, তিনি ইতালীয় ঐক্যের প্রথম এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সাহায্য করিয়াছিলেন। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ও লোম্বার্ডি তাঁহার সাহায্যেই ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

নেপোলিয়ন-এর সহায়তায় ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ ইতালীয়দের, বিশেষত পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্যাভুরের মনে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিল। সুতরাং তাঁহার ইতালীয় নীতি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, ফরাসী জাতির মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই ভীতি ও বিদ্বেষ এবং সর্বোপরি ইতালীয়দের ঘৃণার সৃষ্টি করিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তৃতীয় নেপোলিয়ন স্যাভয় ও নিস্ নামক স্থান দুইটির বিনিময়ে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করিলেন। ইহার ফলে তিনি ইংলণ্ডেরও বিরাগ-ভাজন হইলেন। তাঁহার ইতালীয় নীতির বিফলতা যতই প্রকট হইতে লাগিল তিনি ফরাসী জাতিকে ততই শাসনতান্ত্রিক উদারতা দেখাইতে লাগিলেন। এইভাবে পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাজনিত বিদ্বেষ তিনি হ্রাস করিতে চাহিলেন।

ইতালীয় নীতির ফল: ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, জাতির ভীতি ও বিদ্বেষ, ইতালীয়দের ঘৃণা

স্যাভয় ও নিস্ দখল: মধ্য-ইতালি পাইড্-মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত, পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা: শাসন-তান্ত্রিক উদারতা

(৩) তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্যের সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অধীন পোলগণ জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর মর্যাদা হ্রাস পাইতে লাগিল।

পোল বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান

(৪) পররাষ্ট্র-নীতির এইরূপ ক্রম-বিফলতার পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না। ইওরোপ মহাদেশে তাঁহার বিফলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মেক্সিকো নামক স্থানে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে সেখানকার প্রজাতান্ত্রিক সরকার দুই বৎসরের জন্য বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের বণিকদের বহু অর্থ মেক্সিকো সরকারের নিকট প্রাপ্য ছিল। ফলে এই তিনটি দেশ মেক্সিকো সবকারের নিকট প্রাপ্য অর্থ আদায় দিতে বাধ্য করিবার জন্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করিল। মেক্সিকো সরকার বাধ্য হইয়া বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য মিটাইতে রাজী হইলেন। কিন্তু এই সুযোগে নেপোলিয়ন মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থলে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতাকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলেন। তাঁহার সৈন্য প্রথম দিকে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার চাপে নেপোলিয়ন মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

সিরিয়ার ক্যাথলিক স্বার্থ রক্ষা: কোচিন-চীনে ফরাসী উপ-নিবেশ বিস্তার

(১৮৬৭)। এই অভিযানে বিফলতার ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। সিরিয়ার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, আলজিরিয়ায় সুদক্ষ ও স্থায়ী ফরাসী শাসন স্থাপন, কোচিন-চীনে (Cochin-China) ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি সাফল্য কোন কিছুই এই বিদ্বেষ হ্রাস করিতে সমর্থ হইল না।

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের সাহায্য করিতে গিয়া নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি-সম্পর্কে তাঁহার অযথা ভয় ছিল। এই কারণে তিনি কেবলমাত্র প্রাশিয়ার মিত্রতাই কামনা করিতেন না, প্রাশিয়া উত্তর-জার্মানির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধ-শক্তি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করুক, ইহাই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তিনি নিরপেক্ষ রহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি মধ্যস্থতা করিবেন। কিন্তু স্যাডোয়ার (Sadowa) যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে তাঁহার ভ্রম দূর হইল। প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর-জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে, এই কথা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার পরও তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হইলেন না। ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া দক্ষিণ-জার্মানির দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং নির্বান্ধব ফরাসী শক্তিকে সহজেই সেডান (Sedan)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন শত্রুসৈন্যের হস্তে বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসী জাতি তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিল।

নেপোলিয়ন-এর জার্মান নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬), নেপোলিয়ন-এর ভ্রম দূরীভূত

সেডানের যুদ্ধ (১৮৭০), নেপোলিয়ন-এর পতন

ফ্রান্সে তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার (Character and Estimate of Napoleon III): তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর চরিত্রে নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী জাতি বা ইওরোপের কেহই তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন নাই। ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের নিকটও তৃতীয় নেপোলিয়ন ন্যায়-বিচার পান নাই। তাঁহার অসাফল্যের দিকটি অধিকতর মাত্রায় প্রকট করা হইয়াছে। বস্তুত ফ্রান্সের ইতিহাসে তাঁহার অবদান যে-কোন শাসকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁহার

চরিত্র

দুর্জ্ঞেয় চরিত্র

চরিত্রের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া অনেকেই নানাপ্রকার মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজনীতিক, নির্বোধ, দুরাত্মা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি ম্যাকিয়াভেলি-সুলভ (Machiavellian) রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার সদ্‌গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দয়া, উদারতা, অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং নিজস্ব দুর্বলতা তাঁহার চরিত্রকে এক কৃত্রিম রূপদান করিয়াছিল। তাঁহার পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ক্ষমতার অনুপাতে ছিল অত্যধিক উচ্চ; তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ, অবাস্তব আদর্শবাদী। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা।* তিনি ফরাসী জনগণের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি অত্যধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন বলিয়াই বাস্তবতার সহিত অনেক ক্ষেত্রেই যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য

তাঁহার সদ্‌গুণ: পরিস্থিতির ফলে চরিত্রের কৃত্রিম রূপ

ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তবতা

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নেহাত কম ছিল না। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সহিত স্বৈরাচারী একক-অধিনায়কত্বের এক অভিনব সংমিশ্রণ তিনি সাধন করিয়াছিলেন। স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন প্রভাবিতকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি ফরাসী জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের বিনিময়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, রেলপথ, শিল্পপতিগণকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের ও শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিপদকালে জনসাধারণের সাহায্যার্থে সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন, দরিদ্রদের জন্য অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি অবাধ-বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করেন।

অভ্যন্তরীণ সাফল্য: স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন

দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর

* "Always a dreamer and intriguer rather than a practical statesman." David Thomson, p. 241.

প্যারিস নগরী ও অন্যান্য বহু শহর তাঁহার আমলেই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তিনি প্রথম দিকে নিজ এবং ফরাসী দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেন বটে, কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে থাকে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গৌরব অর্জন

তাঁহার উদার মনোবৃত্তির ফলেই ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। ফরাসী স্বার্থের এবং নিজ সম্রাট-পদের অনিশ্চয়তার কথা না ভাবিয়াই তিনি ইতালির ঐক্যের যুদ্ধে পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে সাহায্যদানে অগ্রসর হন। ইহার ফলে তিনি ফরাসী জাতির মধ্যে যাহাদের ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফরাসী স্বার্থের প্রতিকূলে বলিয়া বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি ছিল—তাহাদের সকলের বিরাগভাজন হইলেন। অপর দিকে আকস্মিকভাবে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি ইতালি-বাসীদের ঘৃণার পাত্র হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্যাভয় ও নিস্ দখল করিয়া তিনি ইংলণ্ডের বিরাগভাজন হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির প্রতি পদক্ষেপই তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে লাগিল। পোলদের বিদ্রোহে সাহায্যদান করিয়া তিনি অযথা রাশিয়ার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। প্রাশিয়ার প্রতি মিত্রতার নীতি তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেরই যে সমূহ ক্ষতির কারণ ছিল, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

তাঁহার অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা, জনপ্রিয়তা হ্রাস

ভ্রান্ত জার্মান-নীতি

তিনি মেক্সিকোর সিংহাসনে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ম্যাক্সিমিলিয়ানকে স্থাপনের জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বিফল হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি যখন মেক্সিকো অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে প্রাশিয়া স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া উত্তর-জার্মানির রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিরপেক্ষ থাকিয়া তাঁহার জীবনের বৃহত্তম রাজনৈতিক ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরও তিনি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোন দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হন নাই। ফলে সেডানের যুদ্ধে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের ফলে তাঁহাকে সম্রাট-পদ ত্যাগ করিতে হয়।

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বৃহত্তম রাজনৈতিক ভুল

সেডানের যুদ্ধে পরাজয় (১৮৭০)

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাই ছিল তাঁহার পতনের কারণ। ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির নিকট চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যই ছিল আনুগত্যের একমাত্র শর্ত। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যই ছিল এমন যে, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পরিস্থিতির উপর সরকারের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নির্ভর করিত।

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি ফরাসী জাতির-আনুগত্যের শর্ত

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার আন্তর্জাতিক নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নিজ মনে গঠন করিতে পারিয়াছিলেন কি না সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।* প্রথম নেপোলিয়ন বোনাপার্টির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা ইওরোপবাসী তখনও ভুলিয়া যায় নাই। এমতাবস্থায় তৃতীয় নেপোলিয়নের পক্ষে সেই সময়ে ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা-ই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ফরাসী জাতির মনস্তুষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল জমকাল পররাষ্ট্র-নীতির। এই স্বয়ং-বিরোধী পরিস্থিতির ফলেই তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা অনিবার্য ছিল। আর পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার পতন ঘটাইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় (Fire brand) ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনি না-ছিলেন বিপ্লববাদী, না-ছিলেন যুদ্ধ-নীতির সমর্থক। "বিপ্লবের নীতিকে অস্বীকার করিয়া তিনি বিপ্লব-কালীন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আর যুদ্ধ না করিয়াও ইওরোপের পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।"† কারণ ভিয়েনার সন্ধির শর্তাদি বোনাপার্টি নামধারী কোন ব্যক্তির পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না।

Fire brand'

কিন্তু তাঁহার উপরি-উক্ত নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহাকে বারবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। বস্তুত, তাঁহার রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বৈদেশিক নীতির পুনঃপ্রবর্তন করিতে গিয়া এবং ফরাসী জাতিকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোল-বিদ্রোহে সামরিক সাহায্যদান, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রভৃতিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নীতির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" (Little Napoleon)‡ নাম অর্জন করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্র-

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ইতালির ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোলদের সামরিক সাহায্যদান, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর দান

---

* Vide, *Europe in the 19th & 20th centuries*, Lipson, pp. 35-36.

† "He wished to accomplish a revolutionary foreign policy without calling on the spirit of revolution, and to remodel Europe without a war." Taylor, p. 25.

‡ *Napoleon d' petit*; Victor Hugo scornfully dubbed him. Vide, L. Thomson, p. 246.

নীতিতে তিনি কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই, তথাপি ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের দান নেহাত কম নহে। ফরাসী জাতির অভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান, ইতালির ঐক্যসাধনে সহায়তা ও পরাধীন পোলগণের জাতীয়তা আন্দোলনে সাহায্যদান প্রভৃতি তাঁহার কীর্তি হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবে।

সুয়েজ ও পানামা খালের পরিকল্পনা

সুয়েজ ও পানামা খাল খননের পরিকল্পনা তাঁহারই মনে সর্বপ্রথম স্থান পাইয়াছিল।* এই দুইটি খাল খননের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যাপারেও তাঁহার দান কম ছিল না। ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবার মত বহু কিছু তিনি করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদার-নীতির প্রসারে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার অপরাপর সাফল্যের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার সাফল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই

তাঁহার কৃতিত্ব বিচারে এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহাকে বিসমার্কের ন্যায় দূরদর্শী, কূটকৌশলী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। বিসমার্ক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। কূটচালে তাঁহার নিকট নেপোলিয়ন কেন, সেই সময়কার অপর যে-কোন রাজনীতিকেরই পরাজয় স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ইহা ভিন্ন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির (Napoleon I) মৌলিকতা ও সামরিক কৃতিত্বের সহিত তুলনায় তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর কৃতিত্ব অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক-উন্নয়নে এবং আধুনিক ইওরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান ছিল।† উদাহরণস্বরূপ ইতালির জাতীয় ঐক্যসাধনে তাঁহার কার্যকরী সাহায্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর কৃতিত্ব আলোচনায় তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে।‡

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতনের কারণ (Causes of the failure of Napoleon III): তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতনের কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অক্ষমতা এবং সমসাময়িক কালের ফরাসী ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

ব্যক্তিগত অক্ষমতা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি

* "The Suez and the Panama canals were foreseen by him, and he contributed to the ultimate completion of both." Grant & Temperley, p. 215.

† "The Second Empire, judged in terms of military glory or original achievement, was indeed only a pale shadow of the First. But it has considerable importance for the material development of France and for shaping of Modern Europe." David Thomson, p. 247.

‡ "Louis Napoleon Bonaparte, otherwise known as Napoleon III, emperor of the French, is a man to whom both history and historians have done scant justice." Riker, pp. 454-456.

প্রথমত, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার অবাস্তব আদর্শবাদিতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার ভাবপ্রবণতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আমলের মর্যাদায় ফ্রান্সকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-আশা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা তিনি পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া তিনি নিজের চরিত্র ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক কৃত্রিম রূপ দান করিয়াছিলেন।

(১) অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তিনি তাঁহার উদার-নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া বিচারে ঐক্যবদ্ধ এবং সেই হেতু শক্তিশালী ইতালি গঠনে সাহায্য দান করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সে-কথা তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

(২) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

তৃতীয়ত, মেক্সিকো অভিযানের অদূরদর্শিতার এবং প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে (স্যাডোয়ার যুদ্ধ) নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি সর্বনাশাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন মিত্রশক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার কোন কার্যকরী চেষ্টা করেন নাই। এইসব অদূরদর্শিতার ফলে তিনি যে-ভুল করিয়াছিলেন তাহা-ই তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।*

(৩) ইওরোপে মিত্রশক্তির সাহায্য লাভে অক্ষমতা

চতুর্থত, তৃতীয় নেপোলিয়ন অন্তরে যুদ্ধ-নীতির বিরোধী ছিলেন। নিজে সম্রাট-পদ গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'সাম্রাজ্য' অর্থ হইল 'শান্তি'—অর্থাৎ তাঁহার সম্রাট-পদ গ্রহণ যুদ্ধ-নীতি অনুসরণের ইঙ্গিত নহে। 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন' তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী প্রজাতন্ত্রের স্থলে সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি ফরাসী জাতির স্বাধীনতা যেমন হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আমলে ফ্রান্স যে-গৌরব অর্জন করিয়াছিল অনুরূপ গৌরবে ফ্রান্সকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রথম সাম্রাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে,

(৪) পরস্পর-বিরোধী শান্তি ও যুদ্ধ-নীতি

* "He lacked the foresight that would have saved him from some of his blunders, and he lacked the insight that would have enabled him to discern the merits and failings of others." Riker, p. 455.

সে-আশা স্বভাবতই ফরাসী জাতির মনে জাগিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ফরাসী জাতিকে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে গৌরবের আসনে স্থাপন করিতে পারিলেই গৌরবলোভী ফরাসী জাতির সম্রাট হওয়া সম্ভব ছিল। এজন্য অন্তরে শান্তিবাদী হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্য যুদ্ধ-নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। ইহাই ছিল নেপোলিয়ন-এর পরিস্থিতির ট্রাজেডি (Tragedy)।

(৫) চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গের শক্তিশালী বিরোধিতা

পঞ্চমত, প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সের সম্রাট-পদ গ্রহণের ফলে ফরাসী জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ঘৃণা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইলেও এই চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শাসন বরদাস্ত করিতে রাজি ছিলেন না। বৈদেশিক যুদ্ধ-নীতি তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারে নাই বা পারিত না, বলা বাহুল্য। এই শ্রেণীর বিরোধিতাও তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতনের অন্যতম কারণ।*

(৬) রাশিয়ার সহানুভূতি বিনষ্ট

ষষ্ঠত, পোল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার উদার-নীতির বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্যারিসের সন্ধির পর (১৮৫৬) হইতে রাশিয়ার সহিত তিনি যে মিত্রতা-নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, উহার মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। অপর দিকে বিসমার্ক পোল্যাণ্ড-বাসীদের বিদ্রোহে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়া রাশিয়াকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইভাবে প্রয়োজনবোধে রাশিয়াকে মিত্র হিসাবে পাইবার পথ তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্ধ করিয়াছিলেন।

(৭) বিসমার্কের তুলনায় তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষুদ্রত্ব

সর্বশেষে, নেপোলিয়ন-এর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সেই সময়ের ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও কূটকৌশলী ছিলেন বিসমার্ক। তাঁহার কূটকৌশলের সহিত আঁটিয়া উঠিবার মত শক্তি তৃতীয় নেপোলিয়ন বা অপর কোন রাষ্ট্রের রাজনীতিকের ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে বিসমার্কের সর্বাধিক প্রাধান্য ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতনের জন্য তাঁহার নিজ দায়িত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস পাইবে, এ-কথা বলা বাহুল্য। সুতরাং তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পতনের কারণ ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

---

* 'The conflict between the intellectual and influential classes and the *coup d' etat* government still continued, and doubtless contributed eventually to the fall of the Second Empire." Fueter, p. 207.

অধ্যায় ১১

ইতালির ঐক্য
(Italian Unification)

ভিয়েনা কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ইতালি (Italy before and after the Congress of Vienna): ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইতালি বহুসংখ্যক পরস্পর-বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের আত্মকলহে প্রায়ই বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইত। স্বভাবতই ইতালি উপদ্বীপে কোনপ্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বা জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে নাই।

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইতালি পরস্পর-বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন (১ম) বোনাপার্টির সাম্রাজ্যভুক্ত অবস্থায় ইতালিতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপিত হয়; সমগ্র ইতালিতে একই প্রকার আইন-কানুন, একই প্রকার শাসন স্থাপিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস "ন্যায্য-অধিকার নীতির" (Principle of Legitimacy) প্রয়োগ করিয়া উত্তর-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে। টাস্কেনি, পার্মা ও মোডেনায় অস্ট্রিয়ার রাজ-পরিবার-সম্ভূত রাজগণ রাজত্ব করিতেন, ফলে এই স্থানেও অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। দক্ষিণ-ইতালির সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্ রাজ্য বুরবোঁ রাজবংশের অধীনে পুনঃস্থাপন করা হইয়াছিল। মধ্য-ইতালি ছিল পোপের অধীন। মধ্য-ইতালিতে অবস্থিত পোপের রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ-ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল দেশের প্রত্যেকটির স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমগ্র ইতালীয় জাতির ঐক্যবন্ধ হওয়ার পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এবং নেপোলিয়ন-এর অধীনে থাকাকালীন শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা মানুষ মাত্রেরই সমতা, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধিকার প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনা কংগ্রেস তাহাদের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিলে তাহাদের মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। 'ন্যায্য-

নেপোলিয়ন-এর অধীনে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগে ইতালি পুনরায় শতধা-বিভক্ত

স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন-এর প্রভাবে ইতালীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তা-বোধ ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি

অধিকার' নীতি প্রয়োগ করিতে গিয়া ভিয়েনা কংগ্রেস ইতালিকে শতধা-বিচ্ছিন্ন দেশে পরিণত করিল; 'ইতালি' নামটি নিছক ভৌগোলিক নামে (Geographical expression) পর্যবসিত হইল। প্রকৃত ক্ষেত্রে ইতালি বলিতে কোন একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ বুঝাইত না। ইতালি তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালির লোম্বার্ডি, পার্মা, টাস্কেনি, মোডেনা, লুক্কা, পোপের রাজ্য, পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ও সিসিলি-ন্যাপলস্—এই আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।* এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোনপ্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষার চেষ্টা করা হইত না। এক দেশ হইতে অপর দেশে কোনপ্রকার সামগ্রী রপ্তানি করিতে গেলে অতি উচ্চ হারে শুল্ক দিতে হইত। শিল্প বা বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে স্বভাবতই এই সকল ব্যবস্থা বাধাস্বরূপ ছিল। এইরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমগ্র ইতালির ঐক্যের আশা সুদূর-পরাহত ছিল সন্দেহ নাই। প্রত্যেক অংশের সরকারই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এই গভীর হতাশা সত্ত্বেও উত্তর এবং দক্ষিণ-ইতালির রাজ্যগুলির মধ্যে 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামে গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি হইল। এই গোপন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ন্যাপলস্। 'কার্বোনারি' নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী সমিতির উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান ঘটান, মধ্য-ইতালিকে পোপের শাসন হইতে মুক্ত করা এবং সিসিলি ও ন্যাপলস্ হইতে বুরবোঁ রাজত্বের অবসান সাধন করা।

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত: 'ইতালি' ভৌগোলিক নামে পর্যবসিত

আটটি প্রধান অংশে ইতালি বিভক্ত

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের অভাব

'কার্বোনারি' নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে ন্যাপলস্-এ উহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। 'কার্বোনারি'র সভ্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং বুরবোঁ বংশের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হইতে এক উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। কিন্তু দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ড (১৮১৬-৪৮) নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্য লইয়া তিনি স্যাডোয়ার বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া পুনরায় স্বৈরাচারের প্রবর্তন করিলেন। ন্যাপলসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাইডমণ্টবাসীরাও প্রথম ভিক্টর ইমানুয়েল-এর নিকট হইতে এক শাসনতন্ত্র

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ন্যাপলসে বিদ্রোহ: অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

পাইডমণ্ট-এর বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

* "We have no flag, no political name, no rank, among European nations. We have no common centre, no common fact, no common market. We are dismembered into eight states..." Lipson, p. 163.

আদায় করিল। শেষ পর্যন্ত এখানেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইতালির মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল বিদ্রোহীরা ফ্রান্স হইতে সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের ভয়ে ফারাসীরাজ লুই ফিলিপ্পি সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে ইতালির বিদ্রোহ সহজেই দমন করা সম্ভব হইল। আপাতদৃষ্টিতে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ফলপ্রসূ না হইলেও এগুলির গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ঃ মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

এই দুই বিদ্রোহে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে ইতালিবাসী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইতালিকে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ইতালির জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। সুতরাং ঐ সময় হইতেই ইতালির জনগণ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। একই শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলেই ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিদ্রোহ বিফল হইলেও গুরুত্বপূর্ণ ঃ অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যনাশে ইতালি-বাসী ঐক্যবদ্ধ

সি. ডি. এম. কেটেলবি (C. D. M. Ketelbey) মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দেশাত্মবোধ, পারস্পরিক ব্যক্তিগত মতবাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশের পক্ষে কতদূর সহায়ক হইতে পারে তাহা ইতালির ম্যাৎসিনি, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি প্রমাণ করিয়াছেন। অপর কোন আন্দোলনই এইভাবে নেতৃত্বের আশীর্বাদ-ধন্য ছিল না। ম্যাৎসিনির ঐকান্তিক দেশাত্মবোধ এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, গ্যারিবল্ডির সমরকুশলতা হয়ত সম্পূর্ণ বিফল হইত যদি-না ক্যাভুরের বাস্তববাদী কূটনীতি এবং কর্মদক্ষতা তাহাদের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইতালির ঐক্যবন্ধ বাস্তব রূপায়ন করিত।* ইতালির ঐক্য সম্পর্কে নানা ধরনের পরিকল্পনা ইতালিবাসীদের মধ্যে আলোচিত হইতেছিল। একটি পরিকল্পনায় রোমের পোপকে প্রেসিডেন্ট করিয়া সমগ্র ইতালিকে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনাধীনে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাৎসিনি ইহার বিরোধিতা করেন এবং সমগ্র ইতালি হইতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া এক ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক ইতালি গঠনের পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হন। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাইড্মণ্ট্ বা পিয়েমো-সার্ডিনিয়ার অধীনে সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যুক্তি দেখান হইয়াছিল।

ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও ক্যাভুরের অবদানে ইতালির ঐক্য আন্দোলন আশীর্বাদ-ধন্য

ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের মানসিক প্রস্তুতির কার্যে যোসেফ্ ম্যাৎসিনির (Giuseppe Mazzini) দান ইতালির ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।

যোসেফ্ ম্যাৎসিনির অমরদান

* Vide, *A History of Modern Europe*, C. D. M. Ketelbey, p. 228.

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার ফলে ম্যাৎসিনিকে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। ঐ সময় হইতে তিনি 'ইয়ং ইতালি' (Young Italy) নামে এক নূতন সমিতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ, একনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির আদর্শে ইতালির যুব-সমাজকে তিনি স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যসাধনের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ইতালির বহুসংখ্যক যুবক দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে অগ্রসর হইল। সমগ্র ইতালিতে ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কর্মপন্থা যেমন ছিল সুস্পষ্ট তেমনি ছিল প্রেরণাদায়ক। তিনি দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন: প্রথমত, ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, অস্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু এই যুদ্ধে ইতালিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একমাত্র নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিলেই তবে জয়যুক্ত হইতে পারিবে। ইতালিকে অস্ট্রিয়া, পোপ এবং বুরবোঁ শাসন মুক্ত করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে ইতালিবাসীদের পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে একাই চলিতে হইবে। "*Italia fara da se i e.,* Italy will go it aolne." তিনি বলিলেন যে, কেবলমাত্র একনিষ্ঠতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও সততার সহিত ইতালিবাসী যদি তাহাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলেই অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে—কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যে ইহা সম্ভব নহে। তিনি বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ বা কুটকৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না। দুই কোটি ইতালিবাসী যদি তাহাদের ন্যায্য-অধিকারের জন্য আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠার সহিত যে-কোন ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণে প্রস্তুত হয় তাহা হইলেই অস্ট্রিয়ার পক্ষে ইতালিতে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না —এই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিতে যখন জাতীয় ঐক্যের আশা একপ্রকার নির্মূল হইয়া গিয়াছিল সেই-সময়ে সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং প্রধানত ইংলণ্ডে নির্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া তিনি সমগ্র ইতালির জনসাধারণের মধ্যে ইতালির ঐক্য যে অবাস্তব কল্পনা নহে, সেই ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হন। 'সমগ্র ইতালি ও সকল ইতালিবাসীর নামে আন্দোলন করিও, অন্য কোন নামে নহে'—এই কথা তিনি ইতালিবাসীদের সর্বদা বলিতেন। এইভাবে সমগ্র ইতালি এবং সকল ইতালিবাসীদের মধ্যে তিনি এক জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ম্যাৎসিনির একনিষ্ঠ আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। বিপ্লবী চেতনার সহিত

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ: ম্যাৎসিনির কারাদণ্ড ও নির্বাসন

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

ম্যাৎসিনির কর্মপন্থা: (১) অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করা, (২) আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া সাফল্য অর্জন করা—বিদেশী সাহায্য নহে

ইতালির ঐক্য অলীক কল্পনা নহে—এই ধারণার সৃষ্টি

ইতালীয় ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

আদর্শবাদী কল্পনার সামঞ্জস্য সাধনের এক অসাধারণ কাজে সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন একমাত্র ম্যাৎসিনি।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইতালিতে ব্যাপক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইল। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংগঠনের অভাব হেতু অস্ট্রিয়া সহজেই উহা দমন করিতে সমর্থ হইল। এই বিপ্লবের ফলে ইতালিবাসী এই সত্যটি উপলব্ধি করিল যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা সম্ভব হইবে না। পিয়েমো বা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট ক্যাভুরই সর্বপ্রথম এই কথা বুঝিতে পারিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতা: বিদেশী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন—এই শিক্ষা লাভ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতালীয় বিদ্রোহের অপর একটি গুরুত্ব ছিল। এই বিদ্রোহে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার স্যাভয়বংশীয় রাজা চার্লস্‌ এল্‌বার্ট নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ইতালীয়দের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কাস্টোজ্জা (Custozza) এবং নোভারা (Novara)-র যুদ্ধে চার্লস্‌ এল্‌বার্ট অস্ট্রিয়ার হস্তে পরাজিত হন। তিনি পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ায় এক উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। ইতালিবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের ফলে স্যাভয় রাজ-পরিবার ইতালীয় ঐক্যের নেতৃত্বলাভে সমর্থ হয়। স্যাভয় রাজ-পরিবারের জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত সমগ্র ইতালীয় জাতিকে এক নিঃস্বার্থ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। নোভারা-এর যুদ্ধের পর (১৮৪৯) চার্লস্‌ এল্‌বার্টকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া এল্‌বার্টের পুত্র ভিক্টর ইমানুয়েলকে নিজ পক্ষে রাখিবার উদ্দেশ্যে খুব সহজ শর্তেই সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই সুযোগে ভিক্টর ইমানুয়েলকে চার্লস্‌ এল্‌বার্ট কর্তৃক প্রবর্তিত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে জানাইলে তিনি এই প্রস্তাব ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা এবং জাতীয়তাবোধ তাঁহাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। ইতালিবাসী ভিক্টর ইমানুয়েলকে 'সাধু রাজা' (Honest King) উপাধিতে ভূষিত করিল। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার রাজ-পরিবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল এবং পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকারীদের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল।

চার্লস্‌ এল্‌বার্ট কর্তৃক ইতালির জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

কাস্টোজ্জা ও নোভারা-এর যুদ্ধে এল্‌বার্টের পরাজয়

চার্লস্‌ এল্‌বার্টের দৃষ্টান্তে ইতালীয়দের মনে নিঃস্বার্থ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

ভিক্টর ইমানুয়েলের দৃঢ় জাতীয়তাবোধ: 'সাধু রাজা' উপাধি, পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া আশ্রয়স্থল

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল কাউণ্ট ক্যাভুরকে প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়া যদি ইতালিবাসীর জাতীয় জাগরণকে কার্যকরী করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে অনায়াসেই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হইবে। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির ন্যায় অবাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বমতপোষক বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনিও ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন ইতালির ঐক্যসাধন বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নহে। এই বিষয়ে তাঁহার মত ছিল ম্যাৎসিনির মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাউন্ট ক্যাভুর প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত (১৮৫২)

ক্যাভুরের মতবাদ ও কর্মপন্থা

ক্যাভুর পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালিকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়া রাজ্য যাহাতে এই আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের উপযোগী হইতে পারে সেইজন্য তিনি তথায় এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি ইতালিবাসীদের মনে স্যাভয় পরিবারের শাসনের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন: স্যাভয় পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি

বিদেশী সাহায্যলাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল ইতালির সমস্যা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির সহানুভূতি সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে ক্যাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক) যোগদান করেন। তিনি ছিলেন অসামান্য কূটকৌশলী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগে তিনি অতি ক্ষুদ্র দেশের প্রতিনিধি হইয়াও প্যারিসের শান্তি বৈঠকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানলাভে সমর্থ হন। এই বৈঠকে তিনি ইতালির স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ইতালির সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান না করিতে পারিলে ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না, এই কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ইংলণ্ড সহানুভূতিশীল, এই কথা ইংরেজ প্রতিনিধি ক্ল্যারেণ্ডনের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। ক্যাভুর উদারচেতা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর সহানুভূতি অর্জনেও সমর্থ হন। এখন হইতে ইতালির স্বাধীনতা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইল।

ক্যাভুর কর্তৃক ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ: ইতালীয় সমস্যা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

ইহার অল্পকালের মধ্যে ম্যাৎসিনির সমর্থনে ওরসিনি (Orsini) নামক জনৈক ব্যক্তি তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার রাণীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার রাণী রক্ষা পাইলেও তাঁহাদের অনুচরবর্গের কয়েকজন হতাহত হন। এই ঘটনা লইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ও পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মিটিয়া

ওর্সিনি বোমা

যায়।* অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর প্লোম্বিয়ারিস্ নামক স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে, আল্পস্ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালি স্বাধীন হইবে এবং এইজন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিশিয়া ও পোপের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিবে এবং ফ্রান্স সামরিক সাহায্যদানের পুরস্কারস্বরূপ স্যাভয় ও নিস্ পাইবে। এই সকল শর্ত-সংবলিত 'প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি' (Pact of Plombieres) নামে এক চুক্তিপত্র উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল (২১শে জুলাই, ১৮৫৮)।

প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি (১৮৫৮

ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ামাত্রই ক্যাভুর সামরিক প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলেন। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার এই সামরিক প্রস্তুতিতে অস্ট্রিয়া বাধা দিল। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অস্ট্রিয়া দাবি জানাইলে ক্যাভুর উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৫৯)। ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া ম্যাজেণ্টা (Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Soiferino)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল। ফলে, লোম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তি অর্থাৎ পাইড্‌মণ্ট্ ও ফ্রান্সের যুগ্ম বাহিনীর অধিকারে আসিল। মিত্রশক্তি যখন এইভাবে উত্তরোত্তর বিজয়লাভ করিতেছিল, তখন আকস্মিক-ভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কা (Villafranca) নামক সন্ধি স্থাপন করেন। মিত্রশক্তি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত এ-বিষয়ে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা না করিয়াই তিনি এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি ফরাসী ক্যাথলিক যাজকদের মনঃপূত ছিল না, ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের অতি নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী হইবে—এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি দখল করিল, ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনেই রহিল, ইতালির রাজ্যগুলি লইয়া পোপের সভাপতিত্বে একটি রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইল; মোডেনা ও টাস্কেনির ডিউকগণ, যাঁহারা জনগণের বিদ্রোহের ফলে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবেন স্থির হইল।

অস্ট্রিয়া ও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৯)

ম্যাজেণ্টা ও সোল্-ফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ: ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ভিল্লাফ্রাঙ্কা সন্ধির শর্ত: পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ

Vide, David Thomson, p. 276.

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ইতালিবাসীদের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি হইল ; ক্যাভুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্যাভুর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমানুয়েল ক্যাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষেত্রে ক্যাভুর অপেক্ষা অধিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়াই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব হইবে। ভিক্টর ইমানুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি অনুমোদন করিলে ক্যাভুর বিরক্তিবশত পদত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়ন এর বিশ্বাসঘাতকতা : ইতালিবাসীর ঘৃণা ক্যাভুরের পদত্যাগ

এদিকে টাস্কেনি, মোডেনা, পার্মা, রোমানা প্রভৃতি স্থান ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিল। তাহারা তাহাদের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসকগণকে পুনরায় গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। এই সকল স্থানের জনসাধারণ এক গণভোটের দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া কিন্তু এই গণভোট অনুসারে এই সকল স্থান অধিকার করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল, কারণ এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু গোপনে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া হইতে ঐ সকল স্থানের জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। ফরাসী-রাজ তৃতীয় নেপোলিয়নও বুঝিলেন যে, জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসকদের পুনঃস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ইংলণ্ডও ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার সৈন্যের সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্যাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রিপদে ফিরিয়া আসিলেন (১৮৬০)। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস্—এই দুইটি স্থান উৎকোচ-স্বরূপ দান করিতে রাজী হইলেন। নেপোলিয়নও মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানের জনগণের ইচ্ছানুসারে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির নীতি মানিয়া লইলেন। গণভোটের দ্বারা মধ্য-ইতালিস্থ টাস্কেনি, পার্মা, মোডেনা, রোমানা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া তখন লোম্বার্ডি, মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি, রোমানা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলে ইতালি ঐক্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল।

টাস্কেনি, মোডেনা, পার্মা, রোমানা কর্তৃক ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য : পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির আগ্রহ

ইংলণ্ড কর্তৃক সামরিক সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের বিরোধিতা

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর স্যাভয় ও নিস্ প্রাপ্তি : মধ্য-ইতালীর রাজ্যগুলির পাইড্-মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে সিসিলিতে তথাকার স্বৈরাচারী রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের (১৮৪৮-৬০) বিরুদ্ধে এক গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্যারিবল্ডি নামক স্বনামধন্য জনপ্রিয় নেতা বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে সৈন্যসহ সিসিলিতে গমন করেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ সামরিক নেতা। তাঁহার নামে ইতালিবাসীদের মনে এক

সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ

ইতালির ঐক্য
১৮৫৯-১৮৭০
পাইড মণ্ট সার্ডিনিয়া
(মূল রাজ্য)
নূতন অংশের সংযুক্তি :
১৮৫৯ খ্রীঃ
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৬০ খ্রীঃ
১৮৭০ খ্রীঃ
ফ্রান্সকে প্রদত্ত
(১৮৬০ খ্রীঃ)
সুইজারল্যাণ্ড
লোম্বার্ডি
১৮৫৯
ভেনেসিয়া
১৮৬৬
ভেনিস
ট্রিয়েস্ট
পাইড্‌মণ্ট
পার্মা
১৮৬০
রোমানা
ফ্লোরেন্স
টাস্‌ক্যানি
১৮৬০
নিস্
কর্সিকা
(ফরাসী)
রোম
১৮৭০
ন্যাপলস্
১৮৬০
সার্ডিনিয়া
পালের্মো
মেসিনা
১৮৬০
সিসিলি
আফ্রিকা
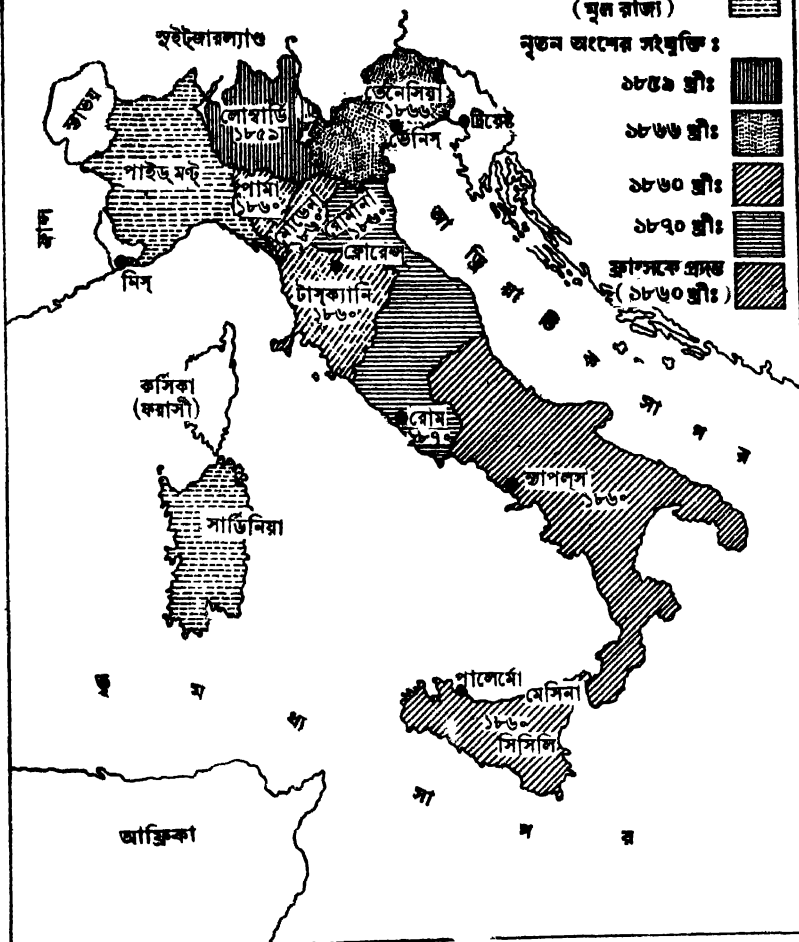
গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইত। গ্যারিবল্ডি তাঁহার সহস্র অনুচরসহ অনায়াসে সিসিলি অধিকার করিলেন। সিসিলি জয় করিয়া তিনি ন্যাপলসে গমন করেন। সেখানে একপ্রকার বিনা-যুদ্ধেই তিনি ন্যাপলস্ অধিকার করিলেন। সিসিলি-ন্যাপলসের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্ ন্যাপলস্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডি অতঃপর রোমনগরী দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। রোমনগরীতে তখন পোপের সাহায্যার্থে একদল ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। রোমনগরী আক্রমণ করিলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে কূটকৌশলী ক্যাভুর দেখিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডির অভিযান যেভাবেই হউক রোধ করিতে হইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রোমনগরী এবং পোপের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপের রাজ্যের অন্যান্য অংশ পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করিবেন না। তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ধারণাই সত্য। কালক্ষেপ না করিয়া ক্যাভুর পোপের রাজ্যাংশ দখল করিলেন। পোপের রাজ্য দখল করিয়া ক্যাভুর কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ন্যাপলসে প্রবেশ করিল। সেখানে এবং সিসিলিতে এক গণভোট গ্রহণ করা হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুইটি স্থান পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল। রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন সমগ্র ইতালি স্যাভয় পরিবারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইল। এইভাবে ক্যাভুর তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশল দ্বারা ম্যাৎসিনি ইতালিবাসীর মনে ইতালীয় ঐক্য সম্পর্কে যে এক গভীর আগ্রহ ও সচেতনতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহার সহিত গ্যারিবল্ডির সামরিক সাফল্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এবং সমসাময়িক ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ইতালির স্বার্থে কাজে লাগাইয়া ইতালির ঐক্য সাধন করিয়াছিলেন*।

গ্যারিবল্ডির সিসিলি অধিকার

ন্যাপলস্ অধিকার

ক্যাভুরের কূটকৌশল

ক্যাভুর কর্তৃক পোপের রাজ্যাংশ দখল

সিসিলি ও ন্যাপলসে গণভোট : পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি

পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে রোম ও ভেনিশিয়া পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। ভেনিশিয়ায় অস্ট্রিয়ার এক সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল; রোমে ছিল এক ফরাসী বাহিনী। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত

স্যাডোয়ার যুদ্ধ : ভেনিশিয়া লাভ (১৮৬৬)

* "His was the master-brain which mobilised the inspiration of Mazzini into a diplomatic force, which beat the sword of Garibaldi into a national weapon." *A History of Modern times*, C. D. M. Ketelbey, p. 223.

হইলে একদিকে যেমন জার্মানি ঐক্য আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়, তেমনি অপর দিকে অস্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করে। ঐ যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার মিত্রশক্তি ইতালি রোমনগরী লাভ করে এবং ফ্রান্স রোম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। এইভাবে জার্মানি ঐক্যের জন্য সংঘটিত দুইটি যুদ্ধের ফলে ইতালি ভেনিশিয়া ও রোম—এই দুইটি স্থান লাভ করে। এই সঙ্গে ইতালিবাসীদের বহু কালের অভিপ্রেত জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা-স্পৃহা সাফল্যলাভ করিল।

সেডানের যুদ্ধ ঃ রোম-নগরী লাভ (১৮৭০)

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ

যোসেফ্ ম্যাৎসিনি (Giuseppe Mazzini) ঃ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়া নামক স্থানে যোসেফ্ ম্যাৎসিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক। বাল্যকাল হইতেই ম্যাৎসিনি নিজ দেশ ও দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবিয়া আকুল হইতেন। অন্যান্য ছাত্রেরা যখন বালক-সুলভ আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত, ম্যাৎসিনি তখন সেই আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ছিল অপরিসীম। বালক-সুলভ মনোবৃত্তির জন্যই তিনি একবার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজ দেশের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীক হিসাবে সর্বদা শোক-ব্যঞ্জক কালো পোশাক পরিধান করিবেন।*

ম্যাৎসিনির বাল্য-জীবন

তাঁহার স্বদেশ প্রীতি

প্রথম জীবনে সাহিত্যের প্রতি ম্যাৎসিনির বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এই গভীর সাহিত্যানুরাগও স্বদেশসেবার কার্যে আহুতি দিয়াছিলেন। কল্পনাবাদের সহিত বিপ্লবের সামঞ্জস্য বিধানের দৃষ্টান্ত ম্যাৎসিনির জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক ইতালীয়, ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মান রোমান্টিক সাহিত্য তিনি গভীরভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং বাস্তব জীবনে উহার প্রভাব স্বভাবতই তাঁহার ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ১৮২০-'২১ খ্রীষ্টাব্দে কার্বোনারির সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাহাদের এবং পিয়েমো'র (Piedmont) উদারপন্থীদের উপর যে-নির্মম অত্যাচার করিয়া দমন করা হইয়াছিল, যুবক ম্যাৎসিনির উপর উহার গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। তিনি 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামক বিপ্লবী সংঘের সভ্য হইলেন। 'কার্বোনারি'র কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তথাপি এই সংঘ দেশ-

কার্বোনারিতে যোগদান

* "In the midst of the noisy, tumultuous life of the students around me, I was sombre and absorbed and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country." *Mazzini's Autobiography*, Quoted by Hazen, p. 145.

সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিল, কেবলমাত্র সেইজন্যই তিনি এই সংঘের সভ্য হইয়াছিলেন। এই সংঘের সভ্য হওয়ার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। স্যাভোনা (Savona) নামক দুর্গে ছয় মাস বন্দী থাকিবার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ম্যাৎসিনি তাঁহার নির্বাসিত জীবন সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। তিনি এই সকল দেশ হইতে স্বদেশের কল্যাণার্থে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থায় ম্যাৎসিনি বিশ্বাস করিতেন না। এইজন্য তিনি 'ইয়ং ইতালি' (Young Italy) নামে এক নূতন সংঘ বা সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতিতে চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়সের ইতালীয়দের গ্রহণ করা হইত।

স্যাভোনার দুর্গে বন্দী: মুক্তিলাভের পর নির্বাসিত

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His Aims & Policy): ম্যাৎসিনির উদ্দেশ্য ছিল শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা। তিনি ইতালিতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যসাধন ম্যাৎসিনির নিকট এক ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি এই উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নীতি ছিল 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্থির করিলেন যে, (১) ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইবে; ইতালির ঐক্য বা উন্নতির প্রথম শর্তই ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান করা। (২) অস্ট্রিয়াকে ইতালির আধিপত্য হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ইতালিবাসী-দিগকে নিজেদের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই এই যুদ্ধে অবতরণ করিতে হইবে। কূটনীতির বা বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। (৩) ইহা ভিন্ন ইতালি-বাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে না। নিজ শক্তিতে এবং নিজ আদর্শে বিশ্বাস থাকিলেই তাহারা সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমগ্র ইতালিবাসী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এবং একাগ্রতা সহকারে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতালির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করিতে ইতালিকে একাই চেষ্টা করিতে হইবে।*

তাঁহার উদ্দেশ্য: ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যস্থাপন

তাঁহার নীতি: (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নাশ, (২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, (৩) আত্ম-নির্ভরশীলতা ও নিজ আদর্শে বিশ্বাস

---

* *Italia fara da se*: 'Italy will go it alone', quoted by David Thomson, p. 275.

ম্যাৎসিনি ইতালির যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য যে আহ্বান জানাইলেন, তাহাতে সমগ্র ইতালির যুবসমাজ অত্যাচার, অবিচার, কারাবাস প্রভৃতির ভয়ে ভীত না হইয়া দলে দলে তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' সংঘে যোগদান করিল। অল্পকালের মধ্যেই ইতালি উপদ্বীপের সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নবচেতনা—এক ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হইল। তিনি শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি জাতিকে সমগ্র ইতালি এবং সমগ্র ইতালীয় জাতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই কথা-ই বুঝাইলেন যে, দুই কোটি ইতালিবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের দাবি কার্যকরী করিতে চাহিলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে তাহা দমন করা সম্ভব হইবে না। এইভাবে এক গভীর হতাশার মধ্যে ম্যাৎসিনি আশার সঞ্চার করিলেন।

'ইয়ং ইতালি আন্দোলন

ইতালিবাসীদের মনে এক নবচেতনার সৃষ্টি

ইতালীয় ঐক্য-আন্দোলনে ম্যাৎসিনির দান (Mazzini's contributions to Italian unity): প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি বা চেতনার প্রয়োজন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এইরূপ জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিকগণ। ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে-জাগরণের প্রয়োজন ছিল তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যোসেফ্ ম্যাৎসিনি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বার্থান্বেষী ও ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া কার্বোনারি ইতালিবাসীকে তাহাদের আদর্শে পেঁছাইতে সমর্থ হইবে না। জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শে পেঁছাইতে হইলে গঠনমূলক কর্ম-পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই কারণে তিনি 'ইয়ং ইতালি' নামে এক যুবসংঘ স্থাপন করেন। দেশপ্রেমিক, ভবিষ্যৎদর্শী ম্যাৎসিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনের দ্বারা ইতালিবাসীদের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রতি এক গভীর অনুরাগের সৃষ্টি করেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আদর্শ ইতালীয়দের এক নূতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাৎসিনি নিজে হইলেন এই গভীর জাতীয় অনুভূতির প্রতীকস্বরূপ। তাঁহার আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রেরণা ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করিল। ম্যাৎসিনির কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে ইতালি হয়ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইত না। তথাপি তাঁহার আদর্শ ও সংগঠন-শক্তির ফলে সমগ্র ইতালীয় জাতির মধ্যে স্বাধীনতা ও ঐক্যের যে চেতনা ও স্পৃহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা না হইলে ইতালীয় জাতীয় ঐক্যসাধন সম্ভব হইত না। তিনি ইতালির ঐক্যসাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য—ইতালিবাসীদের এক নূতন ধর্মস্বরূপ

ম্যাৎসিনির কার্যের ফলেই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য বাস্তবে পরিণত

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ম্যাৎসিনির মতবাদ অত্যন্ত চরমপন্থী ও অবাস্তব বলিয়া মনে করিতেন। অপর একদল তাঁহার স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা সমর্থন করিতেন, কিন্তু ইতালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা নিছক বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকিবার ফলে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ইতালিবাসীর এক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইলেও সমগ্র ইতালির ঐক্যসাধন মোটেই সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন, ঐ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল। কোন কোন দল ছিল রাজতান্ত্রিক ; অপর এক দল সমগ্র ইতালিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। ম্যাৎসিনি নিজে ছিলেন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। যাহা হউক, এইরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন আদর্শ যখন ইতালিবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন ম্যাৎসিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং সর্বোপরি তাঁহার সংগঠনী-শক্তির সাহায্যে সমগ্র ইতালিতে এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির চেতনা সৃষ্টি করেন। এই চেতনার চরম পরিণতি ঘটিল ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল : ইতালীয়দের মতামত বিভ্রান্ত

ম্যাৎসিনির প্রেরণার পরিণতি - ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য

কাউণ্ট ক্যামিলো ক্যাভুর (Count Camillo Cavour) : কাউণ্ট ক্যামিলো ক্যাভুর ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পাইডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সামরিক বিভাগে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। উদার মতবাদ ও রাজনীতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে সামরিক চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তিনি সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতির প্রতি অনুরাগ মোটেই কমিল না। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার এই দুই দেশে ভ্রমণ করিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি তাঁহার মনোগ্রাহী ছিল বলিয়া তিনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে শ্রোতা হিসাবে বসিয়া থাকিয়া তথাকার গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিলেন। ফলে, ইংরেজ শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার এক অতি উচ্চ ধারণা জন্মিল এবং নিজ দেশেও অনুরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিল। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইলে তিনি বিপ্লবী পন্থায় আস্থা হারাইলেন। তিনি সাংবিধানিক স্বাধীনতা, সংবিধানসম্মত

প্রথম জীবন : সামরিক বিভাগে যোগদান

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ

নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, জনসাধারণের অধিকার প্রভৃতিতে বিশ্বাসী এবং দেশের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি সবকিছুর এক সুসমঞ্জস উন্নয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্র, বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর পাইডমণ্টে একটি উদার শাসনতন্ত্র ও পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইলে ক্যাভুর অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়ম-তান্ত্রিকতার মাধ্যমেই ইতালির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে—এই বিশ্বাস তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইডমণ্ট্ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। দুই বৎসর পর (১৮৫০) তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। ইহার আরও দুই বৎসর পর তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইডমণ্ট্ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত : ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত : ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী

ক্যাভুরের চরিত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, সুবিবেচনা, নির্ভীকতা ও দৃঢ় সংকল্পের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল অতুলনীয়। কূটনৈতিক চালে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চরিত্র

ক্যাভুরের উদ্দেশ্য ও নীতি (Cavour's aims and principles) : ম্যাৎসিনির ন্যায় ক্যাভুরেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালির স্বাধীনতা-অর্জন ও ঐক্যসাধন। কিন্তু তাঁহার কার্যপন্থা ছিল ম্যাৎসিনির কার্যপন্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার নীতি ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনি আত্মশক্তির ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর জোর দিতেন; বিদেশী সাহায্য গ্রহণের তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র বিদেশী শক্তির সাহায্য-সহায়তা লাভ করিতে পারিলেই ইতালির স্বাধীনতালাভ ও ঐক্যসাধন সম্ভব হইবে। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন না। এই কারণে তিনি ইতালির সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়া ইওরোপীয় অপরাপর শক্তির সহানুভূতিলাভে সচেষ্ট হন। ক্যাভুরের নীতি ও কর্মপন্থাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য হইতে ইতালিকে মুক্ত করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, ইতালির স্বাধীনতা ও

উদ্দেশ্য : স্বাধীনতা লাভ ও ঐক্যসাধন

বিদেশী সাহায্য

ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুর

তাঁহার নীতি (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নাশ, (২) পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য-আন্দোলনের নেতৃপদে স্থাপন

ঐক্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে ; তৃতীয়ত, ব্যবসায়-বাণিজ্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে এক আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে হইবে ; চতুর্থত, বিদেশী সাহায্য লাভ করিয়া অস্ট্রিয়াকে ইতালি হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে এবং এইজন্য ইতালির সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে।

(৩) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে আদর্শ রাজ্যে পরিণতকরণ, (৪) আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভ

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ক্যাভুর পিয়েমো বা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, জাহাজ-চলাচলের সুবিধার জন্য বন্দর প্রভৃতি নির্মাণ করিলেন। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই সকল দেশের সহিত অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সুযোগ গ্রহণ করিলেন। অপরাপর পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতি প্রভৃতি এবং সেনাবাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন সব কিছুর সংস্কার সাধন করিলেন। এই সকল পদক্ষেপের ফলে দেশের এবং সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটিল এবং পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ইতালির নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ইওরোপীয় দেশগুলির সহানুভূতিলাভের উদ্দেশ্যে উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেরই নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ক্যাভুর প্রচারকার্য শুরু করিলেন। সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় দেশসমূহের উদারনৈতিক চেতনাকে ইতালির সপক্ষে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের 'মর্ণিং পোস্ট' (Morning Post), 'দি টাইমস্‌' (The Times) এবং ফ্রান্সের 'লা ম্যাটিন' (La Matin), 'লা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বেলগি' (L' Independence Belge), নামক সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া ইতালির সমস্যাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। অতি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চালের দ্বারা এই যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি ইতালির সমস্যা সমাধানের পথ প্রস্তুত করিলেন।

ক্যাভুরের প্রচারকার্য

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ক্যাভুর ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে যোগদান করিলেন এবং যুদ্ধ শেষে পুরস্কারস্বরূপ প্যারিসের সন্ধির আন্তর্জাতিক বৈঠকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির সহিত পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকেও সম-মর্যাদার আসনে স্থাপন করিলেন। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাভুর স্বয়ং এই আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সম-মর্যাদাপূর্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইতালির সমস্যার প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাহাদের সাহায্য লাভ করা। কালক্রমে ক্যাভুরের কূটকৌশল সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের—

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে অংশ গ্রহণ

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

বিশেষত উদারচেতা ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেন। ইংলণ্ড অবশ্য ইতালিকে কোন সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল না, কারণ পামারস্টোনের পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল সূত্র ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে সঞ্জীবিত রাখিয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তি-সাম্য বজায় রাখা। কিন্তু নীতিগতভাবে ইংলণ্ড ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের সমর্থন করিত।* ইহার অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লোম্বিয়ারিস-এর চুক্তি (Pact of Plombieres) সম্পাদন করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্যাভয় ও নিস্ নামক দুইটি স্থান লাভের বিনিময়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালীয় দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনে এবং পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে লোম্বার্ডি নামক স্থানটি দখল করিতে সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অপর দিকে ক্যাভুর ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলেন। পামারস্টোন ও রাসেলের মন্ত্রিত্বকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতিও ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

প্লোম্বিয়ারিস-এর চুক্তিঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

প্লোম্বিয়ারিস-এর চুক্তির পর ক্যাভুর পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সামরিক সংগঠনে মন দিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়ার সহিত পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। তৃতীয় নেপোলিয়নের সামরিক সাহায্যে পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়া উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন এককভাবে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি দ্বারা পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিল বটে, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্যাভুর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি গ্রহণ করিলে ক্যাভুর পদত্যাগ করিলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ক্যাভুরের পদত্যাগ

কয়েকমাস পর (১৮৬০) ক্যাভুর দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণে রাজী হইলেন। ইতিমধ্যে মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি ও রোমানা পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্যাভুর দেখিলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের অমতে ঐ সকল স্থান অধিকার করিলে অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স উভয় শক্তিরই বিরাগভাজন হইতে হইবে। ইহা ভিন্ন কূটকৌশলী ক্যাভুর ইহাও বুঝিলেন যে, স্যাভয় ও নিস্ স্থান

ক্যাভুরের পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ

---

*"It was an axiom of Palmerston's foreign policy that survival of the Austrian Empire was necessary for the maintenance as between France and Russia, of balance of power in Europe." David Thomson, p. 275.

দুইটি তৃতীয় নেপোলিয়নকে উৎকোচস্বরূপ না দিলে মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির সহিত ঐক্যবন্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে এই দুইটি স্থান ছাড়িয়া দিলেন এবং বিনা-বাধায় মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি রাজ্য পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে ইতালির ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হইল।

মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি ও রোমানা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবন্ধ

অপর দিকে সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে গ্যারিবল্ডি তাঁহার সহস্র সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বুরবোঁ বংশের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের নিকট হইতে সিসিলি দখল করিলেন। সিসিলি হইতে তিনি ন্যাপল্‌সে উপস্থিত হইলেন। ন্যাপল্‌স্‌ও অনায়াসে তাঁহার করতলগত হইল। ফার্ডিন্যাণ্ড দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। ক্যাভুর গ্যারিবল্ডিকে সিসিলি পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির পক্ষে সম্মতি দিতে অনুরোধ করিয়া বিফল হইলেন। তদুপরি গ্যারিবল্ডি রোম এবং পোপের অন্যান্য রাজ্যাংশ দখল করিতে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ক্যাভুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, রোম ও ভেনিশিয়া আক্রমণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। ইহা ভিন্ন রোম ও পোপের রাজ্য যদি ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলির সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার পক্ষে সমগ্র ইতালি ঐক্যবন্ধ করা হয়ত সম্ভব হইবে না। এইজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা করিয়া রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন পোপের অন্যান্য রাজ্যগুলি দখল করিয়া লইলেন। রোম নগরী আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না। ইহার পর ক্যাভুর ন্যাপল্‌স্‌-এ পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডি শেষ পর্যন্ত কোন বাধা দিলেন না।

গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্‌ জয়

পোপের রাজ্যাংশ দখল

ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলিতে গণভোট গ্রহণ করা হইল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুইটি স্থান পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবন্ধ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমগ্র ইতালি ঐক্যবন্ধ হইল। কেবলমাত্র রোম নগরী ও ভেনিশিয়া তখনও বিচ্ছিন্ন রহিল রোমে ফরাসী সৈন্য পোপের সাহায্যার্থে মোতায়েন ছিল এবং ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবার ফলে ইতালি ভেনিশিয়া, এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের পর রোম নগরী লাভ করে।

ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলির সংযুক্তি

ক্যাভুরের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Cavour) : আধুনিক ইতালির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ছিলেন কাউণ্ট ক্যাভুর। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাঁহার দান ছিল সর্বাধিক। কেটেল্‌বি (Ketelbey)-র মতে ক্যাভুর তাঁহার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির চেষ্টা ও অবদানকে ইতালির প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছিলেন। ম্যাৎসিনির প্রেরণা ও গ্যারিবল্ডির সামরিক শক্তি—এই দুইয়ের

আধুনিক ইতালির জনক

সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন ক্যাভুর। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির আদর্শকে যদি বাস্তবে রূপদান না করিতেন, বা গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়কে যদি তিনি সমগ্র ইতালির স্বার্থে নিয়োজিত না করিতেন, তাহা হইলে ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। ইতালির সমস্যা সমাধানে ক্যাভুরকে অনেক সময়েই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি এবং কূটকৌশলের দ্বারা তিনি সেই সকল বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইতালির প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অতি স্পষ্ট। সূক্ষ্ম কূটকৌশলের দ্বারা তিনি ইতালীয় সমস্যাগুলিকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ফ্রান্সের সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ইওরোপীয় দেশগুলির উদারনৈতিক চেতনা, বিশেষত তৃতীয় নেপোলিয়নের উদারতার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক তীক্ষ্ন দৃষ্টিসম্পন্ন কূটকৌশলী রাজনীতিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র জার্মান রাজনীতিক ও প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে।

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কার্যের সামঞ্জস্য বিধান

বাস্তববাদী দেশসেবক

ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একমাত্র বিসমার্কের সহিত তুলনীয়

রাষ্ট্রপরিচালক ও সংস্কারক হিসাবেও ক্যাভুর উদারতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেলপথ প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ইতালিবাসীদের মধ্যে এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সামরিক সংস্কারের দিক দিয়াও তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তিনি ইতালির সামরিক শক্তিকে আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করিয়াছিলেন।

সুদক্ষ পরিচালক ও সংস্কারক

যোসেফ্ গ্যারিবল্ডি (Giuseppe Garibaldi) : যোসেফ্ গ্যারিবল্ডি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিস্ (Nice) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষা খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ব্যপদেশে তিনি নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এমন কি, তিনবার জলদস্যুদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি ইতালির প্রধান প্রধান দেশপ্রেমিকদের সান্নিধ্যে আসিয়া ইতালির স্বাধীনতা লাভ তাঁহার জীবনের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতালির প্রতি তাঁহার ভালবাসা সাধুসজ্জনের নিকট ভগবৎ-প্রেমের ন্যায় গভীর ছিল।* ১৮৩৬ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ-আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের ন্যায় কাটাইয়া যে যুদ্ধবিদ্যা, বিশেষভাবে "গেরিলা যুদ্ধ" রীতি

জন্ম ও শিক্ষা

দেশাত্মবোধ ও ইতালির ঐক্য-স্পৃহা

* "He believed in Italy as Saints believed in God" Vide, Ketelbey, p. 232.

শিক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে সেই অভিজ্ঞতা তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনের সহায়ক হইয়াছিল। ইতালিতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পোপের অধীনে সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস্ এলবার্টের অধীনে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কাস্টোজা'র যুদ্ধে চার্লস্ এলবার্ট পরাজিত হইলে ম্যাৎসিনির অনুরোধে ফরাসী আক্রমণ হইতে রোম রক্ষা করিবার জন্য গ্যারিবল্ডি তাঁহার নিজ সেনাবাহিনী লইয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হন।

প্রথম জীবনে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের অভিজ্ঞতা অর্জন

তাঁহার অনুচরদের অনেকেই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাভুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষ সমর্থন করিতে রাজী হন। তিনি অবশ্য মনেপ্রাণে প্রজাতন্ত্রে-বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ক্যাভুরের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ক্যাভুরের সহিত গ্যারিবল্ডির মতবিরোধ ঘটিলেও ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রতি তাঁহার আনুগত্য অটল ছিল। গ্যারিবল্ডির চেষ্টায়ই সার্ডিনিয়ার অধিবাসীরা ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মানিয়া লইয়াছিল (১৮৫৯)। ইহার পূর্বে তাহারা ছিল ফ্রান্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্যারিবল্ডি-সার্ডিনিয়ার এক সৈন্যদলের সেনানায়ক হিসাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির ফলে সেই যুদ্ধে তিনি অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

গ্যারিবল্ডির দেশাত্মবোধ এবং সমরকুশলতা বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে তাঁহার অধীনে সৈনিকের কাজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এদিকে সিসিলিতে নেপোলিয়নের বংশধরের রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিদ্রোহীরা গ্যারিবল্ডিকে তাঁহার বাহিনী লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। বিদ্রোহীরা ক্যাভুরের সাহায্যও চাহিয়াছিল। ক্যাভুর ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিতে যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য হইয়া মনে মনে তৃতীয় নেপোলিয়নের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ভিক্টর ইমানুয়েল সেই সন্ধি গ্রহণ করিলে তাঁহার উপরও ক্যাভুর বিরক্ত হন। ক্যাভুর মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, উত্তর দিক হইতে কুটকৌশলে ইতালির ঐক্য বাধা পাইলেও তিনি দক্ষিণ দিকে বিপ্লবের মাধ্যমে ঐক্য সম্পন্ন করিবেন। সেই সুযোগ এখন উপস্থিত হইলে তিনি বাহ্যত নিরপেক্ষ থাকিলেও গোপনে সিসিলির বিদ্রোহীদিগকে সমর্থন জানাইলেন।

সিসিলিবাসীর বিদ্রোহে গ্যারিবল্ডির সাহায্য প্রার্থনা

গ্যারিবল্ডি তাঁহার সহস্র সৈনিকের বাহিনী লইয়া সিসিলির পশ্চিমে মাসালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে পালেরমো (Palermo প্রবেশ করিয়া সিসিলির সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং উহা দখল করেন। সেই সময় হইতে গ্যারিবল্ডির সেনাদল লাল রঙের পোশাক ব্যবহার করিতে শুরু করে এবং 'রেড্ শার্ট' (Red Shirt) নামে পরিচিতি

গ্যারিবল্ডি ও তাঁহার সহস্র সৈন্যের বাহিনী

লাভ করে। পালেরমোতে গ্যারিবল্ডি নিজেকে সেইখানের 'ডিক্টেটর' (Dictator) বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মিজো নামক যুদ্ধে পুনরায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া সমগ্র সিসিলি নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। একমাত্র ম্যাসিনা দুর্গ ও ক্ষুদ্র দুই-একটি বন্দর তখনও তাঁহার দখলে আসে নাই। এদিকে ক্যাভুর গ্যারিবল্ডিকে সিসিলি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির প্রস্তাব দিয়া ব্যর্থ হইলেন। তিনি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির জন্য ন্যাপল্‌সের জনমত গড়িয়া তুলিতে গোপন চেষ্টা চালাইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডি সিসিলি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট বাহিনী লইয়া ন্যাপল্‌স্ অধিকার করিয়া লইলেন। বুরবোঁ বংশীয় রাজার সেনাবাহিনী দেশরক্ষার জন্য তেমন চেষ্টা করিল না। ন্যাপল্‌স্ অধিকার করিয়া গ্যারিবল্ডি সেখানকারও ডিক্টেটর বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। ম্যাৎসিনির জনৈক সমর্থক বার্টানি (Bertani)-কে 'সেক্রেটারি অব্ স্টেট্' (Secretary of State) নিযুক্ত করিলেন।

গ্যারিবল্ডির জয়লাভ

ন্যাপল্‌স্ অধিকার

এমতাবস্থায় ক্যাভুর এক কূটনৈতিক চালের দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতি আদায় করিয়া পোপের রাজ্য দখল করিলেন এবং সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্-এ এক গণভোটের মাধ্যমে এই দুই স্থান ইতালির সহিত ঐক্যবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, দেশপ্রেমিক, ইতালির জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী গ্যারিবল্ডি উহার বিরোধিতা করিলেন না। রোম এবং ভেনিস বা ভেনিশিয়া ভিন্ন সমগ্র ইতালি ঐক্যবদ্ধ হইল। কিছুকাল পর এই দুই স্থান—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রোম ইতালির সহিত ঐক্যবদ্ধ হইল।

গণভোটে সিসিলি ও ন্যাপল্‌সের অধিবাসীদের ইতালির সহিত সংযুক্তির সিদ্ধান্ত

ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য

অধ্যায় ১২

জার্মানির ঐক্য

(German Unification)

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি কেবল নামেই পবিত্র রোমান সম্রাটের অধীন ছিল, কিন্তু প্রকৃত-ক্ষেত্রে এগুলি ছিল স্বাধীন। নেপোলিয়ন যখন জার্মানি জয় করেন তখন তিনি জার্মানির অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্তে উনচল্লিশটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপসাধন করিয়া জার্মানির ৩৯টি রাজ্য লইয়া 'কন্‌ফেডারেশন অব্‌ দি রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করেন। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের সংগঠন, এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর একতার ভাব জাগিয়া উঠে। সর্বোপরি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে (War of Liberation) জার্মানির জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র জার্মানির মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মান জাতির ঐক্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির রাজ্যগুলিকে এক অসংবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘে পুনর্গঠিত করে এবং অস্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রসংঘের উপর প্রাধান্য দান করে। 'ন্যায্য-অধিকার' (Legitimacy) নীতির প্রয়োগ দ্বারাই ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জার্মানির রাজ্যগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় 'ডায়েট্' (Diet) বা সভা স্থাপিত হয়। এই ডায়েট্-এর দুইটি কক্ষ ছিল—ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা। ক্ষুদ্রসভার মোট ১৭ জন সদস্যের মধ্যে এগারটি বৃহৎ রাজ্য হইতে এগার জন, বাকী ২৮টি রাজ্য হইতে মোট ছয় জন সদস্য গ্রহণ করা হইত। সাধারণ-সভায় বৃহৎ রাজ্যগুলি দুই অথবা তিনটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা লইয়া গঠিত ডায়েট্ কন্‌ফেডারেশন অব্‌ দি রাইন নামক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। ডায়েট্-এর সদস্যগণের মধ্যে মতৈক্যের কোন-

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত

নেপোলিয়নের অধীন ৩৯টি রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন

ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ন ও মুক্তি-সংগ্রামের প্রভাব : জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জার্মানিকে পুনরায় অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন

ডায়েট্-এর গঠন-পদ্ধতি

অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্ব

প্রকার সম্ভাবনা না থাকায় কোনপ্রকারের পরিবর্তনও ডায়েট্ হইতে আশা করা বৃথা ছিল। অস্ট্রিয়াকে এই ডায়েট্-এর সভাপতিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপিত হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে সমগ্র জার্মানির উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যের সৃষ্টি হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত উদারনৈতিক আন্দোলন দমন করা। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জার্মান জাতির জনগণ যাহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনাধীনে থাকা আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হইলেও ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে তাহাদের পক্ষে ঐ সময়ে কোনপ্রকার সংগঠনকার্যে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ ও বিদ্বেষভাব থাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে কোনপ্রকার সংস্কারের পরিকল্পনা কার্যকরী করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপ করিয়া জার্মানিকে প্রাশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিল; অপর কয়েকটি অস্ট্রিয়ার অধীনে অধুনাবিলুপ্ত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিল, আবার আরও কয়েকটি এক ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিতে জার্মানির সাহিত্যিক ও মনীষিগণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টির চেষ্টা করিলে বলপূর্বক সেগুলিকে দমন করা হইল। বিশেষত, জেনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ্-এর যুদ্ধজয়ের স্মারক অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়ার কুশপুত্তলিকা (effigy) পোড়াইয়াছিল। এই যুবক-সুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশকে মেটারনিক্ তথা প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পর (১৮১৯) ফন্ কট্‌জেবু (Von Kotzebue) নামে জনৈক প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারকে হত্যা করা হইলে মেটারনিক্, রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার এবং প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানিতে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাশিয়ার রাজা যে

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন আধিপত্য

জার্মান জাতির প্রতিক্রিয়াশীল শাসন মানিয়া চলার কারণঃ

(১) জার্মান জাতির শ্রান্তি

(২) জার্মান রাজ্যগুলির পরস্পর বিদ্বেষভাব

(৩) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের
(ক) লিপ্‌জিগ্ স্মৃতি অনুষ্ঠান

(খ) কট্‌জেবু হত্যা

শাসনতান্ত্রিক সুযোগ জনসাধারণকে দিয়াছিলেন তাহা তিনি নাকচ করিলেন।

কার্লসবাড ডিক্রি

জার্মানির প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজগণ কর্তৃক 'কার্লসবাড ডিক্রি' (Carlsbad Decrees) নামে কতকগুলি আইন পাস করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা জার্মানির সর্বত্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। অতঃপর ডায়েট্-এর অধিবেশনে 'কার্লসবাড ডিক্রি' একপ্রকার জোর করিয়াই পাস করা হইল। এই আইন সমষ্টির দ্বারা ছাত্রদের সংঘ, ব্যায়াম সমিতিগুলি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র—এই সন্দেহে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সংবাদপত্রগুলিকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কার্যকলাপের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'কিউরেটর' নামে এক শ্রেণীর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে জার্মানির সর্বত্র এক ভয়াবহ স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হইল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন

এমতাবস্থায় জার্মানির জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হইল। উইমার (Weimar), বেভেরিয়া, উর্‌টেমবার্গ, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে সামান্য পরিমাণ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরোধিতায় জার্মানিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী রহিল না। জার্মানির রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়াই ছিল প্রধান। স্বভাবতই প্রাশিয়ার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া কোন রাজ্যই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হইল না।

উইমার, বেভেরিয়া, উর্‌টেমবার্গ ব্যাডেন প্রভৃতি রাজ্যে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি

প্রাশিয়ার বিরোধিতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির স্যাক্সনি, হেসি, হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের সহায়তায় এই সকল স্থানে পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী আঠার বৎসর জার্মানির কোন স্থানেই উদার-নীতির সাফল্য না ঘটিলেও পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। দুইটি ভিন্নমুখী ধারা জার্মান জাতিকে ঐক্যের পথে লইয়া যাইতেছিল: একটি হইল প্রাশিয়ার 'জোল্‌ভারেন্' (Zollverein) নামক শুল্ক-সংঘ, অপরটি 'প্যান-জার্মানিজম্' (Pan Germanism) বা জার্মান জাতির লোক-মাত্রেরই একতাবদ্ধতা হওয়ার ইচ্ছা।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব: মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরতন্ত্রের পুনঃস্থাপন

পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত

(১) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অপরাপর কয়েকটি ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যের মধ্যে এক শুল্ক (customs)-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা ছিল অসংহত। শুল্ক স্থাপন করিয়া ভিন্ন রাজ্য হইতে দ্রব্যাদি আমদানির পথ রুদ্ধ করা হইলেও ঐরূপ অসংহত ও অবিন্যস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে মাল আমদানি করা

চালিতেছিল। এই কারণে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে প্রাশিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে "জোল্‌ভারেন্‌" (Zollverein) নামে এক শুল্ক-সংঘ (custom union) স্থাপন করে। এই সংঘের সদস্য-রাজ্যগুলির মধ্যে এক অবাধ-বাণিজ্য-নীতির অনুসরণ করা হয়। ক্রমে এই সংঘ জার্মানির অপরাপর রাজ্য-গুলিও যোগদান করে. ১৮৩৩* খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সব জার্মান রাজ্যগুলিই জোল্‌ভারেন্‌ শুল্ক-সংঘের সদস্য হয় এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির প্রত্যেক রাজ্যই এই শুল্ক-সংঘের সদস্য হয়। এই সংঘের নেতৃত্ব ছিল প্রাশিয়ার উপর।

জোল্‌ভারেন্‌ (১৮১৯)

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব

জোল্‌ভারেন্‌-এর গুরুত্ব † ছিল প্রধানত তিন প্রকারের : প্রথমত, এই শুল্ক-সংঘের মাধ্যমে জার্মানির কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জোল্‌ভারেন্‌-এর গুরুত্ব : পরস্পর যোগা-যোগের মাধ্যমে একাত্মবোধ বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, জোল্‌ভারেন্‌ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। ইহার ফলে এই শুল্ক-সংঘের সদস্যদেশ-গুলি অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শুল্ক-সংঘের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের অর্থনৈতিক শক্তি ও স্থায়িত্ব

তৃতীয়ত, ইহার অর্থনৈতিক একতা রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এই সংঘে যোগদানের ফলে জার্মান রাষ্ট্রগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রাশিয়া জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। জার্মানির অপরাপর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রাজনৈতিক ঐক্যের

অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব ছাড়াও জার্মানির আত্মরক্ষা করিবার শক্তি আছে, এই আত্মপ্রত্যয় জোল্‌ভারেন্‌-এর সাফল্যের মধ্য দিয়াই জন্মিতে লাগিল। বস্তুত, জার্মান জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত হইয়াছিল এই জোল্‌ভারেন্‌ বা শুল্ক-সংঘ স্থাপনের মাধ্যমে।

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে আস্থা

---

* "*The Zollverein* in 1833 embraced all German states except Austria, Hanover, Oldenburg, and the three Hanseatic "free cities" of Hamburg Lubeck and Bremen." *Modern Europe to 1870*, p, 661, Hayes.

† "Race, religion, language, whatever their binding power, would not alone suffice to keep a nation together or to bind it together if disunited. It was the happy idea of the Zollverein (customs union) that made the unity of Germany under Prussian leadership inevitable." Phillips, p. 6.

"General feeling in Germany towards Zollverein is that it is the first step towards wha t is called Germanisation of the people." *History of Europe*, J. A. R. Marriott, p. 97.

(২) জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবর্তন যখন মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে ব্যাহত হইয়াছিল ঐ সময়ে জার্মান জাতির মধ্যে এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবোত্তর জার্মানিতে সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনের এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। ফিস্টি (Fichte), হেগেল (Hegel), স্টাইন (Stein), হ্যসার (Hausser), বোহ্‌মার (Bohmer), ডাহ্‌লম্যান (Dahlman) প্রভৃতি মনীষিগণ জার্মানিতে এক জাগৃতির সৃষ্টি করেন। বন্‌, বার্লিন, মিউনিক্‌, লিপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল এই নব-জাগৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেন। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার স্থলে জার্মান জাতির মধ্যে এক স্বাদেশিকতার ভাব জাগরিত হয়।

জার্মানির নব-জাগৃতি

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির সর্বত্র এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বেভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমন কি, অস্ট্রিয়াও এই বিপ্লবের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই। হ্যানোভার, স্যাক্সনি প্রভৃতি স্থানের রাজগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে বাধ্য হন। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামও এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব : বেভেরিয়া, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারিগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এক প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করেন। এই প্রতিনিধি-সভা ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট (Frankfurt Parliament) নামে পরিচিত। এই পার্লামেণ্টে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের প্রধান কাজ ছিল সমগ্র জার্মানির জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট (১৮৪৮-৪৯)

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট জার্মান গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরম প্রকাশ বলিয়া বিবেচ্য। জার্মানির রাজনৈতিক ইতিহাস নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার এক অপূর্ব সুযোগ এই পার্লামেণ্টের নিকট উন্মুক্ত ছিল। জার্মানির প্রধান শত্রু অস্ট্রিয়া তখন অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমনে ব্যস্ত, প্রাশিয়া ও অপরাপর জার্মান রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকগণ তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ এড়াইয়া চলিতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় সমগ্র জার্মানির জন্য একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া শতধা-বিচ্ছিন্ন জার্মানির রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যসাধন সহজ ছিল, সন্দেহ নাই। এইরূপ করিতে পারিলে জার্মানির ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হইত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা জার্মানির

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট জার্মান জাতীয়তা-বোধের চরম অভিব্যক্তি

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের সুযোগ

ঐক্যসাধনের প্রয়োজন আর থাকিত না। প্রথমেই ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) স্থাপন করে। সমগ্র জার্মানির জন্য একজন ভাইকার (Vicar) বা প্রতিনিধি ও একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করা হয়। জার্মানির রাজগণ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। আর্কডিউক জন প্রথম ভাইকার পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের আইনজীবী ও অধ্যাপক সদস্যগণ জার্মান জাতির মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), জার্মানির রাজ্যসীমা প্রভৃতির উপর দীর্ঘ বক্তৃতায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রুত কার্য সম্পাদনের উপরই যখন তাঁহাদের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল তখন তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ও হল্‌স্টাইন নামে জার্মান-অধ্যুষিত ডেনমার্কের দুইটি ডাচি (Duchy) জার্মানির সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। ডেনমার্ক ইহাতে বাধা দিলে প্রাশিয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সহিত আপস-মীমাংসা করিতে বাধ্য হইল। ফলে এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের অধীনেই রহিয়া গেল। ম্যাল্‌মোর চুক্তি (Convention of Malmoe) দ্বারা ডেনমার্ক ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌স্টাইন ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের নিকট জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আবেদন জানাইলে পার্লামেণ্ট ম্যাল্‌মো চুক্তির প্রতিবাদ করিল। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে এই চুক্তি নাকচ করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বাধ্য হইয়াই ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ম্যাল্‌মো চুক্তি অনুমোদন করিল। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মারমারি শুরু হইল। পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্যও প্রাণ হারাইলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মিলিত ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ক্রমেই জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য হারাইল। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল।

সদস্যদের দীর্ঘ বক্তৃতায় অযথা কালক্ষেপ

ম্যাল্‌মো চুক্তি

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহায়তায় বিদ্রোহ দমন: ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিদ্রোহ দমনকালে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই পার্লামেণ্টের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং তাহারা এই সুযোগ গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইল না। দ্রুতগতিতে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ দেশের বিপ্লবাত্মক সর্বপ্রকার আন্দোলন বলপূর্বক দমন করিতে লাগিল।

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের কার্যকলাপ (Work of the Frankfurt Parliament): এদিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে এবং জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিরূপ শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে—এই দুই সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হইল। অস্ট্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির অংশ হিসাবে রাখা হইবে অথবা জার্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা চলিল। অবশেষে স্থির হইল যে, জার্মানির কোন অংশই অ-জার্মান রাজ্যের অংশ হিসাবে থাকিতে পারিবে না, অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার অধীন জার্মান অংশগুলির উপর অস্ট্রিয়ার কোনরূপ প্রাধান্য থাকিবে না। জার্মানির অনেক স্থান তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ পরিবারের অধীনে ছিল। অস্ট্রিয়া এইরূপ মীমাংসায় স্বভাবতই রাজী হইল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই আপত্তির প্রত্যুত্তর দিল। এইভাবে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান করা হইল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের কার্যাদি :

(১) অস্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন হইতে বিতাড়নের প্রস্তাব গৃহীত

সমগ্র জার্মানির যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেই সমস্যার সমাধান করা হইল প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদ দান করিয়া। জার্মানিতে প্রাশিয়ার রাজা তথা প্রাশিয়ার প্রাধান্য দানের পশ্চাতে প্রধান যুক্তি ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাশিয়ার কৃতিত্ব ও ক্ষতি স্বীকার।

(২) প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে সমগ্র জার্মানির সম্রাট-পদ দানের প্রস্তাব

এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে যে দীর্ঘ এক বৎসর ব্যয়িত হইল ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' প্রসূত বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়। রাশিয়া হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করে। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকৃত স্থানগুলিতে বিদ্রোহ দমন করা হয়। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার সাফল্যে এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট যখন তাঁহাকে জার্মানির সম্রাট-পদ দানের প্রস্তাব করিল, তখন তিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজগণের আপত্তির ভয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মান রাজগণের আপত্তির প্রশ্ন ভিন্ন স্বৈরাচারী পন্থায় বিশ্বাসী ফ্রেডারিক নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট-পদ গ্রহণে নিজেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিলেন

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অযথা কালক্ষেপ : প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ইত্যবসরে বিপ্লব দমন

ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক জার্মানির সম্রাট-পদ প্রত্যাখ্যান

না। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বেভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও উর্‌টেমবার্গ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গও এই শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ত্যাগের আদেশ দিলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপও বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লা-মেণ্টের বিফলতা

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতার জন্য প্রধানত চতুর্থ ফ্রেডারিকই দায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও জার্মান ঐক্য সম্পর্কে তিনি তখনও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি হ্যানোভার, স্যাক্সনি, বেভেরিয়া ও উর্‌টেমবার্গ এই কয়েকটি রাজ্যের সহযোগে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আরফুর্ট (Erfurt) নামক স্থানে জার্মান পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়া এই পরিকল্পনার বিরোধিতা শুরু করে। অস্ট্রিয়ার বিরোধিতার ফলে জার্মানির বেভেরিয়া, স্যাক্সনি প্রভৃতি অপরাপর রাজ্য যেগুলি ফ্রেডারিকের সহিত প্রথমে সহযোগিতা করিতেছিল সেগুলি পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস পাইল না। ভিয়েনা সম্মেলনের অব্যবহিত পরে জার্মানিতে যে-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, অস্ট্রিয়া সেই পুরাতন শাসনব্যবস্থাই জার্মানির উপর পুনঃস্থাপন করিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ওলমুজ-এর চুক্তি (Covention of Olmutz) দ্বারা প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সাময়িক কালের জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদের এইভাবে অপমৃত্যু ঘটিল।*

আরফুর্ট সম্মেলন (১৮৫০)

অস্ট্রিয়া কর্তৃক আরফুর্ট সম্মেলনের বিরোধিতা : সম্মেলনের বিফলতা

ওলমুজ-এর চুক্তি : জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত

ওলমুজের চুক্তি প্রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এই অপমানের জন্য দায়ী ছিল প্রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতা। সুতরাং পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানির ঐক্যসাধনে অকৃতকার্য হইয়া প্রাশিয়া সামরিক সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য : সামরিক শক্তিবৃদ্ধি

প্রথম উইলিয়াম (William I) : চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হইলেন (১৮৬১)। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী, বাস্তববাদী ও বীরত্বপূর্ণ, তেমনি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দেশপ্রেমিক।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ

---

* "Federal Diet had been restored under Habsburg patronage, the policy of *Status Quo*, which was the embodiment of Austrian statesmanship, had prevailed; Austria had triumphed, and behind was the armed and reactionary Russia", Ketelbey, p. 282.

উইলিয়াম উদার-নীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। প্রাশিয়ার স্বার্থবৃদ্ধি কিভাবে হইতে পারে, সেই সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।* তিনি কখনও অবাস্তব আদর্শ অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। লোক-চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাজকীয় কর্মচারীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেককেই তিনি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের স্বাধীনতা দিতেন। বিসমার্কের সহিত নানা বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে নিজ মত অনুসরণে বাধাদান করেন নাই। তাঁহার আমল হইতেই প্রাশিয়ার প্রকৃত পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়াছিল।

প্রথম উইলিয়ামের চরিত্র

প্রথম উইলিয়াম সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ। সুতরাং সামরিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হইল। কিন্তু উদারপন্থীরা সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানির ঐক্য সাধনের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা জাতীয়তাবাদী জনমত গঠন করিয়া জার্মানির বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধি-সভার (Chamber of Deputies) উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তাহারা রাজা প্রথম উইলিয়ামের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ সাহায্যদানে অস্বীকার করিল। উইলিয়াম জাতীয় প্রতিনিধি-সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ জারি করিলেন। নূতন নির্বাচনে উদারপন্থী সদস্যদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইল। প্রথম উইলিয়াম অনন্যোপায় হইয়া পদত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, এমন কি, পদত্যাগ-পত্র স্বাক্ষরও করিলেন। কিন্তু শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি অটো ফন্ বিসমার্ক নামক এক অসাধারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বিসমার্কের প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ঐক্যের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল।

প্রথম উইলিয়ামের সহিত প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধি-সভার বিরোধ

উইলিয়ামের পদত্যাগের অভিপ্রায়

বিসমার্কের নিয়োগ

বিসমার্ক ও জার্মান ঐক্য (Bismarck & German Unification): ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিসমার্ক প্রাশিয়ার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ

* "He had a natural gift of perceiving what was attainable and an unembarrassed clearness of view, which was shown, above all, in his almost unerring judgment of men." Vide, Ketelbey, p. 234.

করিলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসের তখন এক সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্পর্কে বিস্‌মার্কের নিজস্ব ধারণা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি দৃঢ়। তিনি প্রথমেই রাজা প্রথম উইলিয়ামকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, পার্লামেন্টের সহিত দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিবেন এবং পরাজয় যদি ঘটেই তবে তিনি তাহা রাজার সহিত একসঙ্গেই বরণ করিবেন। বিস্‌মার্কের দৃঢ় সংকল্প রাজা উইলিয়ামের মনে সাহসের সঞ্চার করিল। নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া তিনি পুনরায় রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

প্রাশিয়ার ইতিহাসের সঙ্কট মুহূর্তে বিস্‌মার্ক কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ (১৮৬২)

বিস্‌মার্কের দৃঢ় সংকল্প

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ এবং নীতি প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব। প্রাশিয়ার যাহা কিছু উন্নতি, রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়াই সাধিত হইয়াছে।* সুতরাং রাজার ক্ষমতা কোনভাবে ক্ষুন্ন করা প্রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা-ই ছিল বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রি-পদ গ্রহণের বহু পূর্বেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা-ই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার কোন স্থান নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্‌মার্ক তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অস্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে সরাইতে হইলে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। সুতরাং পূর্বাহ্নেই শক্তি সঞ্চয় করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আইনসভায় বক্তৃতা, বিতর্ক অথবা ভোটের দ্বারা—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নহে। একমাত্র সামরিক শক্তি ও দৃঢ়তার (Policy of blood and iron) দ্বারাই ইহা সম্ভব।

বিস্‌মার্কের রাজনীতি

অস্ট্রিয়াকে জার্মানি হইতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শক্তি-সঞ্চয়

সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস

প্রাশিয়ার প্রতিনিধি-সভার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাশিয়ার ডায়েট্ বা প্রতিনিধি-সভার নিম্নকক্ষ প্রতি বৎসর সরকারী বাজেট প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিল। উর্ধ্বকক্ষ অবশ্য বাজেট পাস করিয়া চলিল। উর্ধ্বকক্ষের বাজেট পাসকেই আইনত গ্রাহ্য করিয়া লইয়া

ডায়েট্-এর সহিত বিরোধ : ডায়েট্-এর মতামত উপেক্ষিত

* "Germany was made by an autocratic, not by a liberal Government.' Hazen, p. 213.

বিস্মার্ক কর আদায় করিয়া চলিলেন। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র এইভাবে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইল। আইনবহির্ভূত উপায়ে আদায়িকৃত অর্থের দ্বারা প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হইল। সামরিক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ হইলে বিস্মার্ক তাঁহার "Blood and iron" নীতি প্রয়োগে অগ্রসর হইলেন। সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি ডেনমার্ক (১৮৬৪), অস্ট্রিয়া (১৮৬৬) ও ফ্রান্সকে (১৮৭০) পরাজিত করিয়া জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করিলেন।

বিস্মার্কের 'Blood and iron' নীতির প্রয়োগ

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যা (Schleswig-Holstein Question): জার্মানির ঐক্যসাধনে বিস্মার্কের সর্বপ্রথম সুযোগ আসিল শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যার জটিলতার মাধ্যমে। শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ও হল্‌স্টাইন্‌ নামক দুইটি ডাচি (Duchy) আইনত ডেনমার্কের অধীন ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি দেশ স্বাধীন-ই ছিল। হল্‌স্টাইনের অধিবাসীমাত্রেই ছিল জার্মান। শ্লেজ্‌ভিগের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল জার্মান ও অপর এক তৃতীয়াংশ ছিল ডেন্‌। ডেনমার্কের রাজা ছিলেন এই দুই স্থানের ডিউক। হল্‌স্টাইন্‌ জার্মান কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সূত্রে হল্‌স্টাইনের ডিউক হিসাবে ডেনমার্কের রাজা ছিলেন ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্য। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্‌স্টাইন্‌ ও শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিল। প্রাশিয়া এই বিদ্রোহে হল্‌স্টাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চাপে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন প্রোটোকোল (London Protocol) দ্বারা এই দুইটি ডাচির উপর ডেনমার্কের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইল। অবশ্য এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল; কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক পার্লামেন্টের জাতীয়তাবাদী দল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনে এক নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপন করিল। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ফলে এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ ডেনমার্কের রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল। বিস্মার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাবে ডেনমার্কের রাজা নবম খ্রীষ্টানকে (Christian IX) লণ্ডন প্রোটোকোলের (১৮৫২) শর্ত মানিয়া চলিতে এবং এই দুইটি ডাচিকে ডেনমার্কের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রাখিতে জানাইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতির ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত অস্ট্রিয়া তখন প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিল। স্বভাবতই অস্ট্রিয়া বিস্মার্কের সহিত সামরিক চুক্তির প্রস্তাবে রাজী হইল। বিস্মার্ক মনে মনে জানিতেন যে, ডেনমার্ক

ডেনমার্কের রাজার শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ দখলের চেষ্টা

ডেনমার্ক কর্তৃক শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনে নূতন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন

বিস্মার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে। ডেনমার্ক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেই তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, কারণ এই সূত্রে তিনি ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন, উপরন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যুদ্ধ-সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন। ডেনমার্ক শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৬৪, ফেব্রুয়ারি)। ফলে, ঐ বৎসরই ডেনমার্ক ভিয়েনার চুক্তি দ্বারা (১৮৬৪, অক্টোবর) শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর অধিকার ত্যাগ করিল। বিস্‌মার্কের পক্ষে এত সহজে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যা সমাধানে সমর্থ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, ঐ সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না এবং রাশিয়া পোল্যান্ডের বিদ্রোহ (১৮৬৩) দমনে প্রাশিয়ার সাহায্য পাইয়াছিল বলিয়া প্রাশিয়ার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। এই সুযোগেই বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্য লইয়া ডেনমার্ক হইতে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ নামক ডাচি দুইটি জয় করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমে এই দুই স্থানের উপর অস্ট্রিয়ার ও প্রাশিয়ার যুগ্ম অধিকার স্থাপিত হইল। কিন্তু এই দুই স্থানের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে শীঘ্রই মতভেদ দেখা দিল। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল এই দুইটি স্থান প্রাশিয়ার রাজাভুক্ত করা, অপর পক্ষে অস্ট্রিয়া এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের অধিবাসিগণ চাহিয়াছিল এই দুইটি স্থান লইয়া রাইন কন্‌-ফেডারেশনের অধীনে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করা। এই ব্যাপার লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার চেষ্টায় অবশেষে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গেস্টিনের চুক্তি (Convention of Gastein) দ্বারা প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এ-বিষয়ে আপস-মীমাংসা হইল। এই দুই স্থানের উপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয় দেশেরই অধিকার স্বীকৃত হইল, তবে এগুলির শাসনভার অস্ট্রিয়ার উপরই দেওয়া হইল। ল্যায়েনবার্গ (Lauenburg) নামক স্থানটি অবশ্য প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইল।

বিস্‌মার্কের সুযোগ

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া

ডেনমার্কের পরাজয়: ভিয়েনা চুক্তি

প্রথমে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর প্রাশিয়া ও অস্টিয়ার যুগ্ম প্রাধান্য স্থাপন

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌-স্টাইনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্টিয়ার মধ্যে মতভেদ

গেস্টিনের চুক্তি (১৮৬৫)

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌-স্টাইনের উপর প্রাশিয়া ও অস্টিয়ার অধিকার স্বীকৃত

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ১৮৬৬ (Austro-Prussian War, 1866): বিস্‌মার্ক কিন্তু গেস্টিনের চুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি এই চুক্তিকে "কাগজ দিয়া ফাটল বন্ধ করা" (Papering the crack) বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং গেস্টিন-ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী হইবে মনে করিয়া লইয়াই বিস্‌মার্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কূট-নৈতিক চালের দ্বারা তিনি প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্বে ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখিতে

গেস্টিনের চুক্তিতে বিস্‌মার্কের অসন্তুষ্টি

সচেষ্ট হইলেন। ইতালিকে ভেনিশিয়া প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়া তিনি নিজপক্ষে আনিলেন। এইভাবে অস্ট্রিয়াকে **সম্পূর্ণভাবে** বিচ্ছিন্ন করিয়া বিসমার্ক যুদ্ধ শুরু করিবার সুযোগ **খুঁজিতে** লাগিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া শ্লেজভিগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি জার্মান কনফেডারেশনের (Diet) বা প্রতিনিধি-সভার নিকট উপস্থিত করিল। বিসমার্ক এই আচরণকে গেস্টিনের চুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অস্ট্রিয়া গেস্টিনের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই এই অজুহাতে হলস্টাইন-এ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অস্ট্রিয়া কনফেডারেশন অব্ দি রাইনের প্রতিনিধি-সভা বা ডায়েট্-এ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রাশিয়ার সেনানায়ক মোল্ট্‌কির (Moltke) সমরকৌশলে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস (Sadowa or Koniggratz) নামক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধকে এজন্য 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' (Seven Weeks' War) বলা হয়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অপরাপর ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রগুলিও প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল। স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলির অন্যতম।

বিসমার্ক কর্তৃক কূট-কৌশলে অস্ট্রিয়াকে নির্বান্ধবকরণ

অস্ট্রিয়া কর্তৃক গেস্টিনের চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে যুদ্ধ

স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস-এর যুদ্ধ (১৮৬৬)

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিসমার্ক **তাঁহার দূরদর্শি**তার চরম পরিচয় দান করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের **ইচ্ছা ছিল** অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ দখল করা, কিন্তু বিসমার্ক ইহাতে **রাজী হন** নাই। তাঁহার নীতি ছিল অস্ট্রিয়াকে বন্ধুভাবাপন্ন রাখা যাহাতে ভবিষ্যতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ করিতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন, এখনই সময় আসিয়াছে যখন অস্ট্রিয়ার সহিত পুরাতন বন্ধুত্ব আবার পুনঃস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।* তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রধান চিন্তাই হইল এমন কিছু না করা যাহাতে অস্ট্রিয়ার সহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিঘ্নিত হইতে পারে।† ফলে, প্র্যাগের সন্ধি (Treaty of Prague, 1866) দ্বারা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা (১) অস্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া দান করিল। ভেনিশিয়া ভিন্ন অস্ট্রিয়াকে অপর কোন রাজ্যাংশ হারাইতে হইল না। (২) অস্ট্রিয়া জার্মান কনফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করিল। জার্মান কনফেডারেশন সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। (৩) প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে উত্তর-

বিসমার্কের দূরদর্শিতা

প্র্যাগের সন্ধি (আগস্ট ২৩, ১৮৬৬) (Treaty of Prague)

সন্ধি দ্বারা শর্তাদি

---

* "Now is the time to restore the old friendship with Austria." *A History of Modern Times*, C. D. M. Ketelbey p. 272.

† "My chief concern was to avoid anything which would impair our future relationship with Austria." *Idem.*

জার্মান রাজ্যগুলি লইয়া উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মেইন নদীর উত্তরের সকল জার্মান রাজ্য* প্রাশিয়ার অধীনে আসিল। এইভাবে জার্মান ঐক্য সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। (৪) অস্ট্রিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ না দিয়া অনুদান (Contribution) হিসাবে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রাশিয়াকে দিল।

স্যাডোয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the Battle of Sadowa): ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ইওরোপীয় ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স এমন কি, ইওরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। (১) এই যুদ্ধ মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য (Balance) সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যকে এক অভূতপূর্ব সম্মান ও শক্তির অধিকারী করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্য সমগ্র ইওরোপের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক অতি উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়। (২) স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয় এবং বার্লিন মধ্য-ইওরোপীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৩) এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য ছিল না। ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ফরাসী স্বার্থের ও প্রাধান্যের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রাশিয়াকে জার্মান ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফরাসী জাতি স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলিয়াই মনে করে। শুধু তৃতীয় নেপোলিয়নের-ই নহে ফরাসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তিও এই যুদ্ধের ফলে অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের এক ব্যাপক মনোবৃত্তি ফরাসী জাতির মধ্যে জাগিয়া উঠে। (৪) স্যাডোয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষে ছিল; এই কারণে প্র্যাগের সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ভেনিশিয়া লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে ইতালির ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র রোম ও ট্রেনটিনো (Trentino) তখনও ইতালীয় রাজ্যের বাহিরে ছিল। (৫) প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও এই যুদ্ধের গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। এই যুদ্ধে জয়লাভ বিসমার্কের নীতির সাফল্যের এক অতি চমৎকার নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়।

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন: প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত

ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্বুদ্ধিতা

ইতালির ভেনিশিয়া লাভ

বিসমার্কের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

* "Duchies of Schleswig-Holstein, Kingdom of Hanover, Electorate of Hese-Cassel, part of Darmstadt and the city of Frankfurt." Lipson, p. 74.

বিসমার্কের প্রতি জার্মানির সর্বত্র এক অতি গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। বিসমার্কের ক্ষমতা প্রাশিয়া তথা জার্মান রাজ্যগুলির উপর অপ্রতিহত হইয়া উঠে বিসমার্ক জার্মান জাতির নিকট এক অতি উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর

(৬) এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সামরিক শক্তির দিক দিয়া সমান, এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে এবং প্রাশিয়া সামরিক শক্তি হিসাবে অস্ট্রিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ইহা ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। (৭) স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে। প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ঐ সময় হইতে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। দুর্বল অস্ট্রিয়া সরকার এক নূতন ভাবধারাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে স্যাডোয়ার যুদ্ধ তথা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ অধিকার না করিয়া এবং অস্ট্রিয়ার উপর অযথা অপমানজনক কোন শর্ত আরোপ না করিয়া অস্ট্রিয়ার যে কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন উহা পরবর্তী কালে সেডানের যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বিসমার্কের পক্ষে থাকিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধ, ১৮৭০ (Franco-Prussian War): প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রাশিয়ার উত্তর-জার্মান কনফেডারেশনের উপর প্রাধান্য এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মধ্য-ইওরোপের শক্তি সাম্য বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এই কারণে ফরাসী জাতির মধ্যে এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয়ের সামিল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।* ফলে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়াছিল তাহাই ছিল ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই ক্রমে জন্মিতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবেই। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের-ই পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা ফরাসী জাতির মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানগণ ফরাসী জাতির পক্ষে এইরূপ মনে করা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানিরও যে কোন

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি

* "It was France who was defeated at Sadowa."—*Thiers*, Vide, Ketelbey, p. 271.

অভিযোগ ছিল না এমন নহে। ফরাসী রাজগণ নিজ স্বার্থের খাতিরেই জার্মানিকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া জার্মানি ফরাসী জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিদ্বেষভাব ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

বিসমার্ক এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, জার্মান ঐক্যসাধনে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য।* কারণ প্রাশিয়ার সহিত তথা উত্তর-জার্মান কনফেডারেশনের সহিত দক্ষিণ-জার্মানির অংশগুলির সংযুক্তি ফ্রান্স কখনও সহজে ঘটিতে দিবে না। সুতরাং বিসমার্ক যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কেবলমাত্র যুদ্ধটি যাহাতে উপযুক্ত সময়ে শুরু হইতে পারে সে-বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহিলেন যাহাতে ফ্রান্স নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইরূপ ঘটিলে ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে প্রাশিয়া আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, এই ধারণার সৃষ্টি হইবে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি উত্তর-জার্মানির সহিত যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। এই সকল রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার উদ্দেশ্যেও প্রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া বিসমার্ক কর্তৃক বিবেচিত

ফ্রান্সকে আক্রমণকারী দেশ হিসাবে প্রমাণ করিয়া বিসমার্কের ইওরোপীয় জনমতের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা : দক্ষিণ জার্মানিতে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার প্রয়োজনীয়তা

ঐ সময়ে ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলেন ডিউক অব্ গ্র্যামোঁ (Duke of Gramont)। ইনি প্রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন রাজনৈতিক হিসাবেও তাঁহার দূরদৃষ্টি বা বিচক্ষণতা যে খুব বেশী ছিল, এমন নহে। ফলে, বিসমার্কের অভীষ্টসিদ্ধির অসুবিধা হইল না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের ফলে স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল। লিওপোল্ড ছিলেন দক্ষিণ-জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ। তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। লিওপোল্ড হোহেনজোলার্ণ পরিবার ভিন্ন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরিবারের সহিতও আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত ছিলেন। স্বভাবত প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁহার সিংহাসনলাভে কোনপ্রকার বিরোধিতা করিবে না

ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব গ্র্যামোঁর প্রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব

স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ড হোহেনজোলার্ণের দাবি : ফ্রান্সের বিরোধিতা

* "A war with France lay in the logic of history."—*Bismarck*. Vide, Ketelbey, p. 270.

জার্মানির ঐক্য
ইওরোপ (১৮১৫-১৮৭১)
হলস্টাইন
মেকলেনবার্গ
হামবুর্গ
বার্লিন
স্যাক্সন
বেলজিয়াম
ফ্রাঙ্কফুর্ট
বোহেমিয়া
উরটেমবার্গ
বেভেরিয়া
ভিয়েনা
আলসেস লোরেন
রা শি য়া
অ স্ট্রি য়া
সা ম্রা জ্য
মূলরাজ্য (১৮৬৪ খ্রীঃ)
পরবর্তী সংযুক্তি
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৭১ খ্রীঃ
ফ্রান্স হইতে (১৮৭১ খ্রীঃ)
অস্ট্রিয়ার অধীন (১৮৬৬ খ্রীঃ)

বলিয়া স্পেনবাসীরা ভাবিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স ইহার বিরোধিতা করিল। প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না এবং এই কারণেই স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেনজোলার্ণ পরিবারের কেহ স্থাপিত হউক, ইহা ফ্রান্স চাহিত না। এইরূপ পরিস্থিতিতে লিওপোল্ড নিজ দাবি প্রত্যাহার করিলেন। ফলে, সাময়িকভাবে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। বিসমার্ক কিন্তু এই পরিস্থিতি সহজ মনে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের দ্বারা জার্মানি ঐক্য সম্পূর্ণ করা। সেইজন্য তিনি স্পেনের সরকারকে পুনরায় লিওপোল্ডের সিংহাসন অধিকার সম্পর্কে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার ফলে স্পেনের সরকার পুনরায় লিওপোল্ডকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবার বিসমার্কের কূট পরামর্শে লিওপোল্ড স্পেনীয় সিংহাসন গ্রহণে রাজী হইলেন। কিন্তু ফ্রান্স এই ব্যবস্থা নাকচ করাইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল। স্পেনের সিংহাসনে হোহেনজোলার্ণ পরিবারের যুবরাজকে স্থাপন করিলে প্রাশিয়ার শক্তি অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইবে; ইহা ভিন্ন, ফরাসী নিরাপত্তার দিক দিয়াও এই ব্যবস্থা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ফরাসী সরকার হোহেনজোলার্ণ উত্তরাধিকার প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইলেন। ফরাসী জাতির মধ্যে এই বিষয় লইয়া এক ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিউক অব গ্র্যামোঁ হোহেনজোলার্ণ লিওপোল্ডের স্পেনের সিংহাসনলাভে বাধাদানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং এই সূত্রে প্রয়োজনবোধে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমগ্র ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধের এক উন্মাদনার সৃষ্টি হইল।

স্পেনীয় সিংহাসনে লিওপোল্ডের দাবি প্রত্যাহার

বিসমার্কের চেষ্টায় লিওপোল্ডকে পুনরায় স্পেনের সিংহাসন গ্রহণে আমন্ত্রণ

ফরাসী বিরোধিতা

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্র্যামোঁ লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন-লাভে বাধাদানে কৃতসংকল্প

ফরাসী সরকার বার্লিনে অবস্থিত ফরাসী দূতকে হোহেনজোলার্ণ উত্তরাধিকার প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। ফরাসী দূত কাউন্ট বেনিদিতি (Count Beneditti) বিসমার্কের নিকট হইতে এ-বিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া 'এমস্' (Ems) নামক স্থানে রাজা প্রথম উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঐ সময়ে প্রথম ফ্রেডারিক এমস্ নামক স্থানে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন। বেনিদিতি লিওপোল্ড হোহেনজোলার্ণের স্পেনীয় সিংহাসন দাবি প্রত্যাহারের জন্য ফ্রেডারিককে অনুরোধ জানাইলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্র্যামোঁ এক বক্তৃতায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে

কাউন্ট বেনিদিতির দৌত্য

এমস্ নামক স্থানে প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ামের সহিত বেনিদিতির সাক্ষাৎকার

বিষোদ্গার করিয়াছিলেন। বেনিদিতির নিকট এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম তাঁহার আত্মীয় লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন অধিকার প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণে করিতে অক্ষমতা জানাইলেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দূত বেনিদিতিকে উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের অবশ্য কোন ত্রুটি করিলেন না। ফ্রেডারিক নিজে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই উত্তরাধিকার প্রশ্নের সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী এই কথাও জানাইয়াছিলেন। বস্তুত, উইলিয়াম যে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসন গ্রহণ না করিতে উপদেশ দিয়া টেলিগ্রামও করিয়াছিলেন। এই টেলিগ্রামের নকল তিনি স্পেনীয় ও ফরাসী সরকারের নিকটও পাঠাইয়াছিলেন। ফলে, প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক ও ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের মনে যুদ্ধের সম্ভাবনা অন্তত সাময়িকভাবে দূর হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই দুই দেশেরই মন্ত্রিগণ যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্র্যামোঁ ও জার্মান মন্ত্রী বিসমার্ক—উভয়েই যুদ্ধ-সৃষ্টির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। গ্র্যামোঁ বেনিদিতিকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কখনও স্পেনের সিংহাসনে হোহেন্-জোলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন করিবেন না, এরূপ এক গ্যারাণ্টিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লন। এমন কি, প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের নিকট ফ্রান্স হইতে এক গ্যারাণ্টিপত্রের খসড়াও প্রেরণ করা হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই এমস্ নামক স্থানে বেনিদিতি পুনরায় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গ্যারাণ্টি-পত্রের উল্লেখ করিলে ফ্রেডারিক উইলিয়াম দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ ফ্রান্স হইতে প্রেরিত গ্যারাণ্টিপত্র স্বাক্ষর করা তাঁহার পক্ষে অপমানসূচক ছিল, বলা বাহুল্য। অবশ্য বেনিদিতির প্রতি তিনি ভদ্রতার কোন ত্রুটি করেন নাই। ফ্রেডারিক বেনিদিতির সহিত এই সাক্ষাতের কথা তারযোগে বিসমার্ককে ঐ দিনই জানাইয়া দেন। ঐ দিন রাত্রিতে বিসমার্ক যখন প্রাশিয়ার সেনানায়ক মোল্ট্‌কি ও রুন্ (Moltke and Roon)-এর সহিত ভোজসভায় বসিয়াছেন, এমন সময় রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট পেঁৗছিল। বিসমার্ক মোল্ট্‌কি ও রুন্-এর সহিত পরামর্শক্রমে এমস্ হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন। বিসমার্ক ও প্রাশিয়ার সামরিক নেতাগণ যে-কোন উপায়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

লিওপোল্ডের দাবি-ত্যাগ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণে উইলিয়ামের অস্বীকৃতি

উইলিয়াম শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী : লিওপোল্ডকে স্পেনীয় সিংহাসনের উপর দাবি ত্যাগের উপদেশ দান

বিসমার্ক ও গ্র্যামোঁর যুদ্ধ-সৃষ্টির আগ্রহ

ভবিষ্যতে স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেন্-জোলার্ণ দাবি ত্যাগের গ্যারাণ্টিপত্র গ্রহণের জন্য বেনিদিতিকে প্রেরণ

এমস্-এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার : ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যাত

এমস্ টেলিগ্রাম

প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন। এমস্-এর টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিলে ফ্রান্সের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিবে এবং অভিপ্রেত যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে, এইরূপ আশা বিস্মার্কের ছিল।* পরের দিন এমস্ টেলিগ্রাম (Ems Telegram)-এর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রাশিয়ার সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। মূল টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে উহার অর্থের অনেক তারতম্য ঘটিল।† ইহার এইরূপ অর্থ হইল যে, বেনিদিতি প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেনজোলার্ণ পরিবার কোনকালেই স্পেনীয় সিংহাসনের দাবিদার হইবে না—এই প্রতিশ্রুতি লইতে গিয়া একপ্রকার অপমানিতই হইয়াছেন।

বিস্মার্কের সুযোগ: এমস্ টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ

এই টেলিগ্রাম প্রকাশের অভিপ্রেত ফল দেখা দিল। ফ্রান্সের সর্বত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। জনসাধারণের যুদ্ধোন্মত্ততা ও গ্র্যামোঁর যুদ্ধ ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল।" ১৫ই জুলাই,

ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (১৫ই জুলাই, ১৮৭০)

* "If I do this it will have the effect of the red rag upon the Gallic bull." *Bismarck*, Vide, Ketelbey, p. 275.

† Ems telegram despatched by Abeken, king William's Secretary :

"His Majesty writes to me : Count Beneditti spoke to me on the Promenade in order to demand from me finally, in a very importunate manner, that I should authorise him to telegraph at once that I had bound myself for all future time never again to give my consent if the Hohenzollerns should renew their candidature. *I refused at last somewhat sternly as it is neither right nor possible to undertake engagements of this kind a tout jamais. Naturally I told him that I had as yet received no news, and as he was earlier informed about Paris and Madrid than myself he could clearly see that my Government once more had no hand in the matter. His Majesty has since received a letter from the Prince.* His Majesty *having told Count Beneditti that he was awating news from the Prince,* has decided *with reference to the above demand. upon the representation of Count Eulenburg and myself* not to receive Count Beneditti again, *but only to* (and) let him be informed through an ai-de-camp that his Majesty *had now received confirmation of the news which Beneditti had received from Paris, and* had nothing further to say to the ambassador. *His Majesty leaves it to your Excellency whether Beneditti's fresh demand and its rejection should not at once be communicated both to our ambassadors and to the Press.*"

Italics-এ লেখা কথাগুলি বিস্মার্ক বাদ দিয়াছিলেন। Vide, Ketelbey, pp. 275-76.

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্মানিতেও এই যুদ্ধ এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানগণও এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে সমর্থন করিল না। ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেনজোলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টাকে তাহারা অন্যায় আচরণ বলিয়া বিবেচনা করিল। এই সূত্রে দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধের উদ্রেক হইল। বিসমার্ক দক্ষিণ-জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—একই কূটনৈতিক চালের সাহায্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন।

দক্ষিণ-জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি

বিসমার্কের সাফল্য

একাধিক কারণে ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ ঘোষণা করা অনুচিত হইয়াছিল। প্রথমত, ফরাসী সৈন্য যুদ্ধের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধে রওনা হইবার মুহূর্তেও তাহাদের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার অযৌক্তিকতা

দ্বিতীয়ত, স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে রাজী হইবে বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশ আত্মরক্ষার জন্য যাহাতে চুক্তিবদ্ধ হয় সেই চেষ্টা করিয়াও তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যর্থ হন। ব্রিটেনের সহিতও কোন চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হইল না, কারণ ব্রিটেন ও প্রাশিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মিত্রতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। বস্তুত, প্রাশিয়া অপেক্ষা ব্রিটেন ফ্রান্সকেই অধিক সন্দেহের চক্ষে দেখিত। ফলে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন মিত্রশক্তি যোগাড় করিতে পারিল না। তদুপরি বিসমার্কের কূটকৌশলে ফ্রান্স তখন ইওরোপ মহাদেশে একেবারে নির্বান্ধব হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ শুরু করায় সহজেই ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইতে লাগিল। উইসেনবুর্গ (Weissenburg), স্পিকেরেন (Spicheren), ওয়ার্থ (Worth), গ্র্যাভেল্যোৎ (Gravelotte)-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল।

ফরাসী পরাজয়: উইসেনবুর্গ, স্পিকেরেন, ওয়ার্থ, গ্র্যাভেল্যোৎ-এর যুদ্ধ

প্রাশিয়ার সেনাপতি মোল্টকির সমরকৌশলের নিকট ফরাসী সেনাপতি ম্যাকম্যাহন (MacMahon) পুনঃপুনঃ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের (Sedan) যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। পরদিন ফরাসী সৈন্য জার্মান সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং বন্দী হইলেন। এই সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হইল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ফরাসী জাতি পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৭০)। এই নবপ্রতিষ্ঠিত

সেডানের যুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)

তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্দী

প্রজাতান্ত্রিক সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ভার্সাই-এর সন্ধি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। অবশেষে ঐ বৎসর মে মাসে ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সন্ধি (Treaty of Frankfurt) দ্বারা দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স আলসেস-লোরেন (Alsace-Lorraine), মেৎস দুর্গটি ও ষ্ট্রাসবার্গ প্রাশিয়ার নিকট হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইল, ইহা ভিন্ন, পাঁচশত কোটি ফ্রাঙ্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে স্থির হইল এবং ততদিন পর্যন্ত প্রাশিয়ার এক সামরিক বাহিনী ফরাসী সরকারের খরচে ফ্রান্সে অবস্থান করিবে, এই ব্যবস্থাও করা হইল। ফ্রান্স পোপের সাহায্যার্থে রোমে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-জার্মানি উত্তর-জার্মান কনফেডারেশনের সহিত যুক্ত হইল।

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান ঃ ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত

ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি (মে ১০, ১৮৭১)

শর্তাদি

সেডানের যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Battle of Sedan) ঃ সেডানের যুদ্ধের ফলাফল বিচার করিতে গিয়া সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর যেখানে বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে কোনভাবে শাস্তিদান করিতে বা অপদস্থ করিতে চাহেন নাই, সেডানের যুদ্ধের পর কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিনি উভয় ই অর্থাৎ, শাস্তি দান ও অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথমত, এই যুদ্ধের ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল এবং দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান হইয়া প্রজাতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হইল। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর সেডানের পরাজয় ছিল ফ্রান্সের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বনাশাত্মক পরাজয়।

ফলাফল ঃ (১) দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রোম হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলে ইতালি রোম দখল করিল। ফলে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হইল।

(২) ইতালি কর্তৃক রোম লাভ ; ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল জার্মানির ঐক্য। জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে বিসমার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন. এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি—বেভেরিয়া, উর্টেমবুর্গ প্রভৃতি উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংযুক্ত হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি জার্মানির সেনানায়ক ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানির সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

(৩) জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ ঃ দক্ষিণ-জার্মানির উত্তর-জার্মান ফেডারেশনে যোগদান

চতুর্থত, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ইওরোপের ইতিহাসে এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জার্মানি ইওরোপের কর্ত্রী (Mistress) এবং বিসমার্ক জার্মানির কর্তা (Master)-এর মর্যাদায় আসীন হইলেন।*

(৪) জার্মানি এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

পঞ্চমত, সেডানের যুদ্ধ ইওরোপীয় কূটনীতির এক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্বাবধি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাইন অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রাশিয়ার পূর্ববর্তী বিজয়ের অর্থাৎ স্যাডোয়ার যুদ্ধে বিজয়ের সুফল যথাসম্ভব বিনাশ করা। কিন্তু সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণে বাধ্য হইল। ফরাসী রাজ্যসীমার নিরাপত্তা বিধান করাই তখন ফ্রান্সের প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হয়।†

(৫) ইওরোপীয় কূট-নীতির পরিবর্তন

ষষ্ঠত, এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং প্রাশিয়ার জয়লাভের সুযোগ লইয়া রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং প্যারিসের সন্ধি নাকচ করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিল।

(৬) ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে রাশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ্য যে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কফুর্ট চুক্তির ফলে ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা লাভ ও ঐক্য সম্পন্ন হইলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের নেতাগণ গণতন্ত্র ও উদার-নীতির প্রয়োগে ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা ও ঐক্য সম্পন্ন হউক এই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেন। কিন্তু ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা ও ঐক্য কোন উদারপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে না হইলেও এবং গণতন্ত্রের বাহ্যিক আবরণে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও জার্মানির স্বাধীনতা ও ঐক্য যুদ্ধের ফলে সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এদিক দিয়া বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।‡

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত

* "The Franco-German War made Germany mistress of Europe and Bismarck master of Germany." *A History of Modern Times*, Ketelbey, p. 294.

† "European diplomacy took a new character after the battle of Sedan Until 2 September, 1870, the object of the French policy (so far as it had one) was to undo the earlier Prussian victories and to establish French influence on the Rhine, after 2 September the French accepted the fact of German unity and were only concerned to defend the integrity of their national territory" Taylor, p. 210-11.

‡ "In important respects, the settlement of 1871 was a fulfilment of the aims of 1848 by means quite different from the methods of 1848." *Europe Since Napoleon*, David Thomson, p. 301.

বিস্‌মার্ক ও তাঁহার রাজনীতি (Bismarck & His political Principles) : ওটো ফন্‌ বিস্‌মার্ক (Otto Von Bismarck) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডেন্‌বার্গের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক ধারাকে প্রভাবিত করিবার শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে তিনিই ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।* তিনি অভিজাত বংশের মর্যাদা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়-সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বন্‌ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি প্রাশিয়ার সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু বৈচিত্র্যহীন চাকরি জীবনের একঘেয়েমি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া পিতার জমিদারি দেখিতে লাগিলেন। আট বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি জমিদারির প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইলেন। এই কয় বৎসর জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ ও জমিদারির উন্নতি সাধন ভিন্ন তিনি স্থানীয় অর্থাৎ গ্রাম্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং নানাপ্রকার গ্রন্থ পাঠে ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে বিস্‌মার্ক প্রজাতন্ত্রের সমর্থন করিতেন, কিন্তু প্রজাতান্ত্রিকদের অবাস্তব ধারণা ও কর্মপন্থা তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি তিনি তখনও তাঁহার নিজ মাতার উদারনৈতিক প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ধর্মের দিক দিয়াও তাঁহার মনে পরিবর্তন ঘটে —পূর্বে তিনি ছিলেন নাস্তিক, কিন্তু ক্রমেই তিনি গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট্‌-এ পরিণত হন।

বংশ পরিচয়

অভিজাত সম্প্রদায়-সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা

বন্‌ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ

'বৈচিত্র্যহীন চাকরি-জীবন পরিত্যাগ—' জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ

প্রথম জীবনে বিস্‌মার্ক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী —পরে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী— ক্রমে ঘোর রাজতান্ত্রিকে পরিণত

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এক প্রতিনিধি-সভা (Prussian Diet) আহ্বান করেন। বিস্‌মার্ক এই সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চারি বৎসর বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল বলা যাইতে পারে। এই কয়েক বৎসরের

রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বিস্‌মার্ক

---

* "...Was the greatest man the age produced, greatest in the political manifestations of his powers and in the influence which his achievements have exercised in the history of the world." Ketelbey, p. 234.

"This man who ranks among the greatest heroes of German history and among the most important statesmen of the modern world."—David Thomson, p. 281.

মধ্যে তিনি নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বলিয়া প্রমাণিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রভাব রোধ করা ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার ঘৃণা তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ (Political principles of Bismarck): ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ ও ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে। (১) তিনি রাজা অপেক্ষাও অধিকতর রাজতান্ত্রিক ছিলেন। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অন্ধ আনুগত্য তাঁহাকে রাজতন্ত্রের এক অসাধারণ শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত করিয়াছিল। রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমেই জার্মানির নিরাপত্তা ও উন্নতিবিধান সম্ভব—ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার রক্ষণশীল মনোবৃত্তি রাজতন্ত্রের কোনপ্রকার ক্ষমতা-হ্রাস সহ্য করিতে পারিত না। (২) গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতক দেশ-বিদ্রোহীর সমতুল্য ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত প্রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা জড়িত হউক, ইহা তিনি চাহিতেন না। (৩) বিপ্লবের প্রতিও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বিপ্লব দমনে তিনি স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়া সরকারের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিলেন। বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রভাব হইতে প্রাশিয়াকে তিনি মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। (৪) বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি আসুরিক শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রাশিয়ার উন্নতি একমাত্র সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি দ্বারাই সম্ভব—গণতন্ত্রের মাধ্যমে নহে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 'জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নহে।' তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সামরিক শক্তি অর্থাৎ "Blood and iron" নীতির অনুসরণই প্রাশিয়ার উন্নতির একমাত্র পন্থা।

(১) রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি—উন্নতির একমাত্র পন্থা

(২) গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা

(৩) বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন

(৪) সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস—'blood and iron' নীতি

এই সকল মতবাদের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই প্রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতি বিস্‌মার্কের প্রকাশ্য অশ্রদ্ধায়। ইহা ভিন্ন ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্মানির রাজমুকুট প্রাশিয়ার রাজাকে অর্পণ করিতে চাহিলে বিস্‌মার্ক উহা প্রত্যাখ্যান করার পক্ষপাতী ছিলেন। চতুর্থ ফেড্রারিক উইলিয়াম সমগ্র জার্মানির ক্ষমতাহীন সম্রাট-পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে বিস্‌মার্ক অত্যন্ত খুশী হইলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফেড্রারিক উইলিয়াম কর্তৃক আহূত আরফুর্ট (Arfurt) সম্মেলন বিফলতায় পর্যবসিত হইলে বিস্‌মার্কই সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে একতাবদ্ধ করা। বিসমার্কের রক্ষণশীলতা এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাস এত অধিক ছিল যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রাশিয়াকে অস্ট্রিয়া ওলমুজ (Olmutz)-এর সন্ধি দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক স্থাপিত কনফেডারেশন অব্ দি রাইন-এর শাসনতন্ত্র গ্রহণে বাধ্য করে, তখন তিনি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কারণ, এই শাসনতন্ত্রে রাজশক্তির প্রাধান্য ছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বিসমার্কের রাজনৈতিক মত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।*

১৮৪৭-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিসমার্কের রাজতন্ত্র-প্রীতিতে চতুর্থ উইলিয়ামের সন্তুষ্টি

১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিসমার্ক নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করেন এবং রাজা চতুর্থ ফেড্রারিক উইলিয়ামের সুনজরে পতিত হন। চতুর্থ ফেড্রারিক বিসমার্কের রাজতন্ত্র-প্রীতিতে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার উগ্র রাজতান্ত্রিকতায় তিনি খুব বেশী আস্থাবান ছিলেন না। তিনি বিসমার্ক সম্পর্কে নিজ মন্তব্য এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মন্তব্যটি এইরূপঃ "দেশে যখন সামরিক শাসনের প্রয়োজন হইবে কেবলমাত্র তখনই তাঁহাকে (বিসমার্ককে) মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।"†

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক ফ্রাঙ্কফুর্ট ডায়েট-এর সদস্য নিযুক্ত

সুতরাং দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় ফেড্রারিক বিসমার্ককে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি তাঁহাকে জার্মান কনফেডারেশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার (Federal Diet) সদস্য নিযুক্ত করিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিসমার্ক (Bismarck as a member of the Federal Diet Frankfort or Frankfurt)ঃ ফ্রাঙ্কফুর্ট

ফ্রাঙ্কফুর্টে দীর্ঘ আট বৎসর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিসমার্ক দীর্ঘ আট বৎসর যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন পরবর্তী জীবনে তাহা বিসমার্ককে এক অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করিয়াছিল,

---

* "Bismarck's political ideas centred in his ardent belief in the Prussian monarchy." Hazen, p. 217.

"Prussia ought to unite with Austria in order to crush common enemy, the Revolution." *Bismarck*, vide, Hazen, p. 218.

"I look for Prussian honour in Prussia's abstinence before all things from every shameful union with democracy."—*Bismarck, Ibid*, p. 218.

"Not by speeches and majority votes are the great questions of the day decided—that was the great blunder of 1848 and 1849—but by blood and iron"—*Bismarck, Ibid*, p. 220.

† Only to be employed when the bayonet governs unrestricted. Marginal note left by Frederick William IV. Vide, Lipson p. 67.

যুদ্ধামোদী এবং উৎকট রক্ষণশীল বিসমার্ক এক দূরদর্শী রাজনীতিকে পরিণত হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে তিনি জার্মানির বিভিন্ন অংশের সদস্যদের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন। ফ্রাংকফুর্ট সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, প্যারিস, ভিয়েনা এবং লণ্ডনেও কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। এইভাবে ১৮৫১ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ এগার বৎসর বিসমার্ক জার্মান এবং ইওরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে এক ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইওরোপের খ্যাতনামা রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র ক্যাভুর ভিন্ন আর সকলের সহিতই তিনি ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। এই সকল কারণে রাজনীতি-সংক্রান্ত কপটতা ও কূটকৌশল, মিথ্যাচার ও স্বার্থপরতা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি জার্মানির ঐক্যের সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। জার্মানিতে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া—উভয় দেশেরই স্থান হইবে না, অর্থাৎ প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যে-কোন একটি জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপিত হইবে, অপরটিকে সেই নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে হইবে—এই ধারণাই তাঁহার জন্মিয়াছিল।

জার্মানির রাজনীতিকদের সহিত পরিচয়

রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ গমনের ফলে অভিজ্ঞতা

ইওরোপীয় রাজনীতিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ফ্রাংকফুর্ট সভার সদস্য থাকাকালে জার্মানির ঐক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি জার্মানির ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এজন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অস্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিবার প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার ডায়েট্ বা প্রতিনিধি-সভা তাঁহার সামরিক সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থদানে অস্বীকার করিলে ক্রমে শাসনতান্ত্রিক এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার পিতার স্বহস্তে লিখিত বিসমার্ক সম্পর্কে মন্তব্যটি দেখিতে পান এবং শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহাকে মন্ত্রিসভার সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ (১৮৬১)

প্রাশিয়ার ডায়েটের সহিত বিরোধ

বিসমার্ককে মন্ত্রিসভার সভাপতি-পদে নিয়োগ

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিসমার্ক (Bismarck as the President of the Prussian Ministry) : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি জার্মানির ভাগ্য-নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে বিসমার্ক রাষ্ট্রভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অপর

প্রাশিয়ার সংকট মুহূর্তে বিসমার্কের দায়িত্ব গ্রহণ

কোন রাজনীতিক এইরূপ অচল এবং সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় এতটা সাহস দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি প্রথমেই রাজা উইলিয়ামকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি রাজতন্ত্রের রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন এবং পতন যদি ঘটে তবে রাজার সহিত তিনি একই সঙ্গে তাহা বরণ করিবেন।*

বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ও নীতি (Bismarck's ain s & policy) : মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিস্‌মার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : (১) প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। জার্মানির ঐক্য সাধন করিতে গিয়া প্রাশিয়ার প্রাধান্যের বিলুপ্তি তিনি চাহিতেন না। ইতালির ঐক্য পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার আত্ম-বিলুপ্তির মাধ্যমে সাধিত হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক কিন্তু প্রাশিয়ার ঐরূপ আত্ম-বিলুপ্তির মাধ্যমে জার্মানির ঐক্য সাধনে পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। (২) জার্মানিকে একতাবদ্ধ করিবার সর্বপ্রথম পদক্ষেপই ছিল জার্মানির উপর হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার স্থান নাই —এই দুইয়ের একটিকে নতি স্বীকার করিতে হইবেই।† সুতরাং জার্মানির ঐক্য-সাধনের অবশ্যগ্রহণীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আবার প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির। বিস্‌মার্ক ছিলেন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত প্রভৃতি আসুরিক নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন এবং গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন অনমনীয় শত্রু। তিনি বলিতেন, "বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে—একমাত্র 'blood and iron' নীতি—অর্থাৎ সামরিক শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তি দ্বারাই প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

উদ্দেশ্য :
(১) প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানির ঐক্যসাধন

(২) জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটান

Blood and iron' নীতি

প্রতিনিধি-সভা 'ডায়েট্'-এর সহিত দ্বন্দ্ব (Conflict with the Diet) : বিস্‌মার্কের 'blood and iron' নীতি ডায়েটের উদারপন্থী সদস্য মাত্রেরই মনঃপূত হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রকার বাধা ও সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক সংগঠনের কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডায়েটের দুই-কক্ষের মধ্যে ঊর্ধ্বকক্ষ ছিল

প্রাশিয়ার ডায়েট্ বা প্রতিনিধি-সভার সহিত বিরোধ

* "I will rather perish with the king than forsake your Majesty in the contest with Parliamentary government."—Bismarck, Vide, Hazen, p. 216.

† "As early as 1853 he (Bismarck) said in a report to Berlin that there was no room in Germany for two powers that one or the other must bend." Hazen, p. 219.

রাজতান্ত্রিক। সরকারী বাজেট বা অর্থ বিল (money bill) নিম্নকক্ষ প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু ঊর্ধ্বকক্ষ তাহা অনুমোদন করিত। বিসমার্ক ঊর্ধ্বকক্ষের অনুমোদনের উপর নির্ভর করিয়াই প্রয়োজনীয় কর আদায় করিতে লাগিলেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র তখন চালু থাকিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে উহার কোন মূল্য ছিল না। ইহা ভিন্ন, প্রাশিয়ার প্রতিনিধি-সভা ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে গঠিত। স্বভাবতই বিসমার্ক যখন এই সভার মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিতে লাগিলেন তখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায় হইতে কোনপ্রকার প্রতিবাদ আসিল না। উপরন্তু বিসমার্ক অল্পকালের মধ্যেই এমন এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন যে, প্রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমেই অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ : শাসনতন্ত্র মূল্যহীন

বিসমার্কের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি

বিসমার্ক অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাশিয়ায় সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ করিলেন। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে তিনি এক দুর্ধর্ষ এবং অপ্রতিহত সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের এই ক্ষমতা অটুট ছিল।

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

পোলগণের বিদ্রোহ, ১৮৬৩ (Polish rebellion, 1863) : বিসমার্কের প্রাশিয়ার শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পোলগণের বিদ্রোহে। রাশিয়ার অধীন পোলগণ রুশ আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় ঐ বৎসর এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে। ইওরোপের অধিকাংশ দেশই তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু বিসমার্ক পোলদের বিদ্রোহ দমনে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য দান করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। বিসমার্কের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ কারণ ছিল : প্রথমত, তিনি বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ড স্বাধীন হইলে প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যাণ্ডের রাজ্যাংশ ডানজিগ (Danzig) এবং থর্ন (Thorn) দাবি করিবে। তৃতীয়ত, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া রাশিয়াকে মিত্রশক্তি হিসাবে লাভ করা প্রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার সাহায্যে রাশিয়া দৃঢ় হস্তে পোলগণের বিদ্রোহ দমন করিল।

পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩)

বিসমার্ক কর্তৃক রাশিয়াকে সাহায্য দান : রাশিয়ার মিত্রতা লাভ

রাশিয়াকে সাহায্য দানের পশ্চাতে যুক্তি

বিসমার্ক ও অস্ট্রিয়া (Bismarck & Austria) : ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঐ বৎসর অস্ট্রিয়ার সম্রাট জার্মান কনফেডারেশনের

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধনের জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট নামক স্থানে জার্মানির রাজগণের এক সভা আহবান করেন। জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া অস্ট্রিয়া জার্মানির উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক রাজা প্রথম উইলিয়মকে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা বিস্‌মার্ক কর্তৃক ব্যাহত হয়।

অস্ট্রিয়া কর্তৃক জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা ব্যাহত

ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Danish, Austro-Prussian & Franco-Prussian Wars)ঃ ১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্ক তিনটি যুদ্ধে প্রাশিয়াকে জয়যুক্ত করিয়া জার্মানির ঐক্যসাধন করেন।

১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ :

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্যাডোয়ার যুদ্ধ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেডানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিস্‌মার্ক সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন (বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে)।

ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : জার্মানির ঐক্যসাধন

বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি, ১৮৭১-৯০ (Bismarck's foreign policy, 1871-90)ঃ ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বিস্‌মার্ক জার্মানির চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ-নীতিতে বিশ্বাসী বিস্‌মার্ক ইওরোপ মহাদেশে শান্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধাবসানে অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক্ যেমন অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শান্তিকামী হইয়া উঠিয়াছিলেন সেইরূপ বিস্‌মার্কও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসর স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধের দ্বারা মধ্য-ইওরোপে যে নূতন শক্তি-সাম্যের (New Balance of Power) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া চলিলেন। এই নূতন শক্তি-সাম্যের মূল কথা ছিল ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মানির প্রাধান্য বজায় রাখা। কিন্তু ইহা বজায় রাখিতে হইলে ফ্রান্সকে দুর্বল, নির্বান্ধব অবস্থায় রাখা এবং অপর দিকে জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের মর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াই জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বভাবতই ফ্রান্স এই পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিবে এই বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক কূটনৈতিক চালে ফ্রান্সকে ইওরোপ মহাদেশে মিত্রহীন করিয়া রাখিতে চাহিলেন।

(ক) বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য ঃ ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা

(খ) নূতন শক্তি-সাম্য (New Balance of Power) বজায় রাখা

(গ) ফ্রান্সকে দুর্বল ও মিত্রহীন রাখা ঃ জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা

সমগ্র ইওরোপে যাহাতে শান্তি বজায় থাকে, এবং জার্মানি যুদ্ধ-নীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিকামী হইয়াছে সেই কথা ইওরোপীয় দেশগুলি যাহাতে বুঝিতে পারে সেজন্য বিসমার্ক জার্মানিকে একটি "পরিতৃপ্ত দেশ" (Satiated country) অর্থাৎ জার্মানির পক্ষে রাজ্য বৃদ্ধির আর প্রয়োজন নাই—বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মোল্টকির (Moltke) ন্যায় সমরপ্রিয় নেতা এবং যুদ্ধোন্মত্ত প্রাশিয়াবাসীকে শান্তি নীতিতে বিশ্বাসী করিয়া তোলা বিসমার্কের পক্ষেও সহজ ছিল না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোল্টকি এবং অপরাপর যুদ্ধপ্রিয় নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায় বাধাইয়া বসিয়াছিলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষত রাশিয়ার চেষ্টায় এই পরিস্থিতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটনা ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রে বিসমার্ক চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রগুলি কার্যকরী করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জার্মানি 'Satiated' দেশ বলিয়া ঘোষিত

মোল্টকি ও প্রাশিয়াবাসীর যুদ্ধপ্রীতি

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেডানের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন ইওরোপীয় শক্তি-বর্গের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীভাব তেমন ছিল না। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তখন পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন, ইতালি ও অস্ট্রিয়া একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; একমাত্র রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে প্রকৃত মিত্রতা তখন পরিলক্ষিত হয়। বিসমার্ক স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে অস্ট্রিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল এবং সেইহেতু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল না। অপর দিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বলকান অঞ্চলের প্রাধান্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বিসমার্ক ইওরোপীয় দেশগুলির এইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিনে রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার এক যুগ্ম বৈঠক আহ্বান করিলেন এবং কূটকৌশলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া—দুইটি পরস্পর-বিরোধী দেশকে জার্মানির সহিত এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। এই চুক্তি 'ড্রেইকারজারবান্ড' (Dreikaiserbund) বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেসের বৈঠক পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্কের নেতৃত্বে ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্যান স্টিফানোর সন্ধির (Treaty of San Stefano) ফলে লব্ধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। ফলে, রাশিয়া বিসমার্কের উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ করে।*

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা

Dreikaiserbund বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (১৮৭৮)

বার্লিন কংগ্রেসের পর 'তিন সম্রাটের চুক্তি' ভঙ্গ (১৮৭৮)

* Vide, Ketelbey p.

বিসমার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির শক্তি দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার সহিত দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯)। এই চুক্তির দ্বারা অস্ট্রিয়া ও জার্মানি রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে 'দ্বি শক্তি চুক্তি' বা Dual Alliance (১৮৭৯)

ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক গোপনে ফ্রান্সকে টিউনিস (Tunis) নামক স্থানটি দখল করিতে উৎসাহিত করেন। ফলে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধিতার সুযোগ লইয়া বিসমার্ক ইতালিকে উহার দীর্ঘকালের শত্রু অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Dual Alliance) তে যোগদানে স্বীকৃত করাইলেন। ফলে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' (Triple Alliance)-তে পরিণত হইল। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি—এই তিনটি দেশ রাশিয়া ও ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল।

'দ্বি-শক্তি চুক্তি' Dual Alliance 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' বা Triple Alliance-এ পরিণত (১৮৮১)

বিসমার্ক ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের শত্রুদেশে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডকে মিশর দেশ দখলের উৎসাহ দান করিলেন। ফলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সৃষ্টি হইল। এই সুযোগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ইতালির মধ্যে এক নৌ-চুক্তি (Naval understanding) স্থাপিত হইল। এইভাবে ফ্রান্সকে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকার যাহাতে পরিবর্তিত না হয় সেই চেষ্টাও পরোক্ষভাবে বিসমার্ক করিতে ত্রুটি করেন নাই। জার্মানির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রাজতান্ত্রিক কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক। ইহার কারণ ছিল এই যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থার মধ্যে দুর্বলতম। এইজন্যই বিসমার্ক ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার অপরিবর্তিত রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের শত্রুদেশে পরিণত করিবার জন্য বিসমার্ক কর্তৃক ইংলণ্ডকে মিশর দখলে উৎসাহ দান

ফ্রান্সকে দুর্বল প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে রাখিবার জন্য বিসমার্কের অপচেষ্টা

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (Dreikaiserbund) ভাঙ্গিয়া গেলেও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক পুনরায় ইহা স্থাপন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বুলগেরিয়া ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রুমেলিয়া রাজ্যটি দখল করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন বুলগেরিয়া গঠন করিতে চাহিলে রাশিয়া তাহাতে বাধা দেয়। ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া বুলগার জাতির এই ঐক্য-স্পৃহা সমর্থন করে। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে যে 'তিন সম্রাটের চুক্তি' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। বিসমার্ক দেখিলেন যে, রাশিয়া

তিন সম্রাটের চুক্তি' বা Dreikaiserbund-এর পুনঃস্থাপন (১৮৮১)

ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অস্ট্রিয়ার মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানির বিরুদ্ধেও রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনা আছে। ইহা ভিন্ন, রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সম্ভাবনাও রহিয়া যায়। এই সব বিবেচনা করিয়া কূটকৌশলী বিস্‌মার্ক রাশিয়াকে জার্মানির সহিত 'রি-ইন্‌সিওরেন্স চুক্তি' (Re-insurance Treaty) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইলেন। এই চুক্তি দ্বারা রাশিয়া বা জার্মানি তৃতীয় কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পর সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

বুল্‌গেরিয়া-সঙ্কট ঃ 'তিন সম্রাটের চুক্তি' নাশ

'রি-ইন্‌সিওরেন্স ট্রিটি' (Re-insurance Treaty)

এইভাবে বিস্‌মার্ক বিভিন্ন চুক্তি দ্বারা (১) অস্ট্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা, (২) রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা, (৩) ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির সহায়তা, (৪) রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও ইতালির সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করিলেন।

বিস্‌মার্ক কর্তৃক জার্মানির নিরাপত্তার ব্যবস্থা

বিস্‌মার্ক ইংলণ্ডের সহিতও গোপন চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে ডিজরেইলি এবং পরে সল্‌স্‌বেরির সহিত তিনি এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া অকৃতকার্য হন। কারণ ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্ট এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার অজ্ঞাতসারে কোন গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন। ইংলণ্ডের সহিত গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিলে বিস্‌মার্ক জার্মানিকে দৃঢ়তর করিতে পারিতেন, কারণ ইহার ফলে একদিকে ফরাসী দেশ হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার সুযোগ হইত, অপর দিকে রাশিয়ার শত্রুদেশ ইংলণ্ডের মিত্রতা রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি করিত।

ইংলণ্ডের সহিত গোপন চুক্তি সম্পাদনে বিস্‌মার্কের অকৃতকার্যতা

কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে না পারিয়া বিস্‌মার্ক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী দৃঢ়তর করিবার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কারণ রাশিয়া ছিল ইংলণ্ডের শত্রুদেশ। ইহা ভিন্ন, ইংলণ্ডকে মিশর দখলে উৎসাহিত করিয়া বিস্‌মার্ক জার্মানির মিত্রদেশ ইতালির সহিত ইংলণ্ডের এক নৌ-চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের শত্রু এবং ইতালির মিত্র দেশে পরিণত করিতে কৃতকার্য

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর বিস্‌মার্কের আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার-নীতি ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু কূটকৌশলী বিস্‌মার্ক ইংলণ্ডের সহিত এ-বিষয় লইয়া কোনপ্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টির পথ বন্ধ করিতে সমর্থ হন, এমন কি, জার্মান ঔপনিবেশিক

ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা

বিস্তার-নীতি ইংলণ্ড কর্তৃক সমর্থিত হয়।* ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার সম্পর্কে ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে এক আপস-মীমাংসা সম্ভব হয়।

অনন্যসাধারণ কূটকৌশলী বিসমার্ক ১৮৭১—১৮৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর জার্মানির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে এমনভাবে এক জটিল চুক্তির জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ পায় নাই। উপরন্তু ইওরোপ মহাদেশে শান্তি ভঙ্গ করাও সম্ভব হয় নাই। এই আন্তর্জাতিক শান্তির সুযোগে বিসমার্ক জার্মানির অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিসমার্কের ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিক, কূটকৌশলী ব্যক্তি খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজনীতি ও কূটকৌশলকে তিনি এক শিল্পে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেই ছিলেন উহার প্রধান শিল্পী। একমাত্র বিসমার্ক-ই যাদুকরসুলভ চাতুরী দ্বারা অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালি—এই পাঁচটি দেশের তিনটিকে সর্বদা নিজ পক্ষে রাখিতে এবং অপর দুইটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।† তাঁহার সময়ে বার্লিন ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানি ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। শক্তি, সামর্থ্য ও মর্যাদায় জার্মানি তখন ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হইয়াছিল।

কূটকৌশল ও রাজনীতিতে বিসমার্কের শিল্পীসুলভ অনন্যসাধারণ ক্ষমতা

বার্লিন ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল—জার্মানি ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ন্তা-স্বরূপ

বিসমার্কের আন্তর্জাতিক চুক্তি নীতির দুর্বলতা (Weakness of the Bismarckian System of Alliances) : বিসমার্ক যতদিন জার্মানির চ্যান্সেলার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত পররাষ্ট্রের সহিত মিত্রতামূলক চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার এবং ফ্রান্স তথা অপরাপর যে-কোন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানিকে নিরাপদ রাখিবার নীতি সফল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল, যেগুলি তাঁহার ন্যায় কূটনৈতিক, দূরদর্শী রাজনীতিকের আমলে প্রকাশলাভ না করিলেও পরবর্তী কালে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিসমার্ক স্থাপিত মৈত্রী নীতি (System of Alliances) বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য তাঁহার ব্যক্তিগত সাফল্য

প্রথমত, ব্যারণ ফ্রিজ ফন হলস্টাইন দীর্ঘ পনর বৎসর বিসমার্কের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ওয়ালডারসি ও তাঁহার অনুচরদের সাহায্যে বিসমার্কের

* "If Germany is to become a colonising power, all I say is 'God speed her. She becomes our ally and partner, in the execution of the great purposes of Providence for the advantage of mankind." Gladstone to House of Commons 1885, Vide, Ketelbey p. 383.

† "In foreign affairs he remained as ever the supreme artist, statesman and diplomatist He was the only man who could juggle with five balls of which at least two were always in the air". *Ibid*, p. 351

পতনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। কারণ বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি হলস্টাইনের মনঃপূত ছিল না। স্বভাবতই বিস্মার্কের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হলস্টাইন এবং অপরাপর পদস্থ কর্মচারীরা বিস্মার্কের সাবধানী-নীতি ত্যাগ করিলেন। বিস্মার্কের মিত্রতামূলক চুক্তির মাধ্যমে পররাষ্ট্র-নীতির পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল অত্যধিক জটিলতাপূর্ণ। বিস্মার্কের ন্যায় কূটকৌশলী যাদুকর ভিন্ন এই জটিল ব্যবস্থার পরিচালনা অপর কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্কের পদত্যাগের পরবর্তী চব্বিশ বৎসরেব মধ্যে (১৮৯০—১৯১৪) চারিজন চ্যান্সেলরের কেহ-ই কূটকৌশল বা শাসন-দক্ষতায় বিস্মার্কের সমকক্ষ ছিলেন না। স্বভাবতই বিস্মার্ক-প্রবর্তিত পররাষ্ট্র ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছিল।

মিত্রতা চুক্তির মাধ্যমে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালন-ব্যবস্থার জটিলতা : বিস্মার্ক ভিন্ন অপর কেহ ইহা পরিচালনায় অক্ষম

দ্বিতীয়ত, বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলা। এই যুদ্ধ এড়াইয়া চলিবার মনোবৃত্তির মধ্যেই তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নিহিত ছিল—মৈত্রী-নীতির মধ্যে ততটা নহে।

যুদ্ধ এড়াইয়া চলাই পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের মূল কারণ —মৈত্রী-নীতি নহে

তৃতীয়ত, 'তিন সম্রাটের চুক্তি'র পশ্চাতে জার্মানি, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থের কোন ঐক্য ছিল না। বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮) ও বুলগেরিয়া সংকটের (Bulgarian Crisis) সময় (১৮৮৫) রাশিয়া ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিল। এই কারণে বার্লিন-কংগ্রেসের পর এই চুক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইলেও বুলগেরিয়া সংকটের পর পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। বিস্মার্কের পদত্যাগের পূর্ব হইতেই রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্ক চ্যান্সেলর-পদ ত্যাগ করিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়।

'তিন সম্রাটের চুক্তি'র পশ্চাতে স্বার্থের ঐক্যের অভাব

চতুর্থত, বিস্মার্কের মৈত্রী-নীতির মূল ভিত্তি ছিল ত্রি-শক্তি বা Triple Alliance। এই ত্রি-শক্তি চুক্তি বস্তুতপক্ষে ছিল এক অতি দুর্বল সংগঠন, কারণ অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে কোন আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। এই দুই দেশ বহুকাল ধরিয়া পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের মাধ্যমেই ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ত্রি-শক্তি চুক্তির দুর্বলতা—অস্ট্রিয়া ও ইতালির আন্তরিক সদ্ভাবের অভাব

পঞ্চমত, বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতিতে ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না, কারণ রাশিয়ার মৈত্রী রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য ইংলণ্ডের সহিত বিস্মার্ক সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি সেই সময়ে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার বিপদ নেহাত কম ছিল না।

রাশিয়ার মিত্রতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনের অক্ষমতা

ষষ্ঠত, বিস্মার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 'বিচ্ছিন্নকরণ' (isolation) নীতি সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও, শত্রুতা দূর হয় না, সেই কথা তিনি ভাবেন নাই। ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন এবং উহার মাধ্যমে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে নিরস্ত্রীকরণের নীতির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

ফ্রান্সকে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন অনুপলব্ধ

সর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিস্মার্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইওরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না, যদিও আধুনিক সামরিক সাজ-সরঞ্জামে দেশকে অগ্রবর্তী রাখিবার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র-দেশগুলির সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করিবার দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। এইজন্য বলা হয় যে, বিস্মার্ক ছিলেন প্রধানত ইওরোপ মহাদেশীয় রাজনীতিক। ইওরোপের বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি ততটা সম্প্রসারিত ছিল না।*

বিস্মার্কের অভ্যন্তরীণ-নীতি (Internal Policy of Bismarck): ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের সংগঠক বিস্মার্ক ১৮৭১—১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসর তিনি জার্মানির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামকস্বরূপ ছিলেন। সেডানের যুদ্ধ পর্যন্ত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করা তাঁহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা এবং সেই সুযোগে জার্মানির সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

বিস্মার্কের অভ্যন্তরীণ-নীতির উদ্দেশ্য: সাম্রাজ্যের সংহতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় প্রাশিয়াবাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধপ্রীতি জাগিয়াছিল তাহা দমন করিয়া, উদারপন্থীদের এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের সংবাদপত্র এমন কি, রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকের বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া বিস্মার্ক জার্মানির অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কার্যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিতে লাগিলেন। বিস্মার্ক

বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যগ্রহণ

* *European Alliances and Alignments*, pp. 503 ff. William Langer.

জার্মানির পররাষ্ট্র এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে Blood and Iron নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন।*

'বুন্ডেসরাথ' ও 'রাইকস্টাগ'

বিসমার্ক ছিলেন সামরিক শক্তি ও প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে তিনি স্বভাবতই স্বৈরাচারী হইয়া উঠিলেন। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি সমগ্র জার্মানির শাসনব্যবস্থার জন্য 'বুন্ডেসরাথ' (Bundesrath) নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন করেন। এই সভা ছিল জার্মানির বিভিন্ন অংশের রাজগণের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিবর্গের সভা। 'রাইকস্টাগ' (Reichstag) নামক একটি গণসভাও তিনি স্থাপন করেন। ইহা ছিল সমগ্র জার্মানির জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা। এই প্রতিনিধি-সভার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। গণতন্ত্রের প্রতি বিসমার্ক মাত্র এইটুকু শ্রদ্ধাই দেখাইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বিভাগ সম্রাট ও তাঁহার চ্যান্সেলরের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল। চ্যান্সেলর তাঁহার কার্যাদির জন্য সম্রাটের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন। সুতরাং দায়িত্বমূলক গণতান্ত্রিকতার কোন স্থান এই শাসনতন্ত্রে ছিল না।

সম্রাট ও চ্যান্সেলর

বিসমার্কের উন্নয়নমূলক কার্যাদি

শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য বিসমার্ক সরকারী কর্মচারিগণের পুনর্গঠন এবং সরকারী দপ্তরের পুনর্গঠন করিলেন। সমগ্র দেশের রেলপথ প্রসার ও উন্নতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় 'ব্যুরো' (Bureau) বা সমিতি স্থাপিত হইল। জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধাতুর ও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সেগুলির পরিবর্তে তিনি একই ধাতুর মুদ্রা সর্বত্র প্রচলিত করিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাংক' নামে একটি জাতীয় ব্যাংক স্থাপন করা হইল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধি পরিবর্তন করিয়া তিনি বিচারব্যবস্থারও উন্নতি বিধান করিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থারও উন্নতি বিধান করা হইল এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনে জনসাধারণের ভোট গ্রহণের নীতি প্রবর্তিত হইল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিসমার্ক জার্মানির অর্থনীতি ও শিল্পনীতির আমূল পরিবর্তনে মনোযোগী হইলেন। পূর্বে জার্মানিতে সংরক্ষণ-নীতি একপ্রকার ছিল

* "With a policy devoted no longer to war and bold constructive enterprises, but to peace conservation and development, through the period of inevitable reaction which follows the achievement of any long desired aim, in spite of opposition, attack and calumny that came from every direction, from Socialists, Liberals, Conservatives, from the Court, Press and people, Bismarck, kept his place, a figure of power and passion and the nerves, the autocrat of Germany." Ketelbey, p. 351.

না বলিলেই চলে। বিদেশী জিনিসের উপর অতি সামান্য শুল্ক স্থাপন করা হইত। ফলে, একপ্রকার অবাধ-বাণিজ্যই প্রচলিত ছিল। বিস্‌মার্ক শুল্কের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দান করেন। ফলে শুল্কলব্ধ অর্থ হইতে সরকারী আয় যেমন বৃদ্ধি পাইল, দেশীয় শিল্পও তেমনি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।* এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে জার্মানির অপরাপর দেশকে জার্মান সাম্রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগদানের বিনিময়ে অপরাপর দেশে সুযোগ সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হইল। অথচ পূর্বে ঐরূপ সুযোগ জার্মানি অপর দেশ হইতে পাইত না। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে জার্মানির শিল্পের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা হইতেই বিস্‌মার্কের সংরক্ষণ-নীতির সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

শিল্প সংরক্ষণ-নীতি

সংরক্ষণ-নীতির সুফল: শিল্পোন্নতি

জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী পনর বৎসর ধরিয়া জার্মানিতে এক তীব্র ধর্মদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই ধর্মদ্বন্দ্ব 'কুল্‌টুর্‌ক্যাম্ফ্‌' বা কৃষ্টির জন্য যুদ্ধ (Kulturkampf or War for Civilization) নামে পরিচিত। মার্টিন লুথার যখন প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রচার করেন সেই সময় হইতেই জার্মানির অধিবাসিগণ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-জার্মানির বেভেরিয়া, ব্যাডেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির কতক অংশ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিল। উত্তর-জার্মানির প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ছিল প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাশিয়ায় যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছিল উহাতে ধর্ম-ব্যাপারে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সুযোগ লইয়া ক্যাথলিকগণ, বিশেষত জেসুইট যাজকগণ ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। ফলে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। প্রাশিয়ার হস্তে ক্যাথলিক রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পরাজয় (১৮৬৬, ১৮৭০) জার্মানির ক্যাথলিকগণের দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রমে এই ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। ক্যাথলিকগণ 'সেণ্টার' (Centre) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া জার্মান জাতীয় প্রতিনিধি-সভা রাইক্‌স্টাগ্‌-এর সদস্যপদ দখল করিতে উদ্যোগী হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের উপরে চার্চ বা ধর্মাধিষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম পায়াস বা পাই (Pius IX) ঘোষণা করিলেন যে, পোপের ক্ষমতা রাজা, সম্রাট প্রভৃতি শাসকগণ অপেক্ষাও

কুল্‌টুর্‌ক্যাম্ফ্‌ (Kulturkampf)

ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ

---

* "We have hitherto, owing to our policy of open door, been the dumping ground for the over-production of other countries. It is this in my opinion, that has depressed prices in Germany, that has prevented the growth of our industries, the development of our economic life." —*Bismarck*, Vide, Hazen, p. 288.

অধিক। এই ঘোষণার ফলে জার্মানিতে রাষ্ট্র ও ধর্মাধিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ শুরু হইল। প্রোটেস্টান্ট্ ও প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকগণ (Old Catholics) পোপের এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করিল। ফলে প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকদের অনেককেই ধর্মাধিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। যাহারা ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানে যাজক ও শিক্ষকতার কাজ করিত তাহারা পদচ্যুত হইল। প্রাচীনপন্থী ও ক্যাথলিকগণ সরকারের নিকট তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন করিল। এই ধর্মদ্বন্দ্বের পশ্চাতে রাজনৈতিক মতলব ছিল বলিয়া বিস্‌মার্ক মনে করিতেন এবং জার্মানির ঐক্যের যাহারা বিরোধী ছিল তাহারা এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছে এই বিবেচনা করিয়া তিনি কতকগুলি আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা হইল। শিক্ষা ব্যাপারে চার্চের স্থলে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়েই চার্চের কোন প্রাধান্য বা প্রভাব রাখা হইল না। ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষালয়গুলির সরকারী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইল। যাজকদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপারেও সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্বে প্রোটেস্টান্ট্ ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ এমন কি, প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক ও সাধারণ ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ স্বীকার করিত না। ক্যাথলিক যাজকদের এই ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য সরকার রেজেস্ট্রীর মাধ্যমে বিবাহ-প্রথা (Marriage by Regisiration) বাধ্যতামূলক করিলেন। ইহা ভিন্ন, জেসুইট্ যাজকদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এক কঠোর প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নবম পায়াস-এর মৃত্যু হইলে ত্রয়োদশ লিও (Leo XIII) পোপ হইলেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার আমলে জার্মান সরকার ক্যাথলিক-বিরোধী আইনগুলি ক্রমে বাতিল করিয়া দিলেন। রেজিস্ট্রেশন দ্বারা বিবাহ-প্রথা, জেসুইট্‌দের দেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কয়েকটি আইন ভিন্ন অপরাপর আইনগুলি বাতিল হইয়া গেল। এদিকে বিস্‌মার্ক সমাজতান্ত্রিকদের আন্দোলনের প্রভাব হইতে জার্মানিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কুলটুর্‌ক্যাম্ফ্-এর অবসান ঘটিল।

ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট্, ক্যাথলিক ও প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধ

ক্যাথলিক-বিরোধী আইন

পোপ ত্রয়োদশ লিও-র আমলে কুলটুর্-ক্যাম্ফ্-এর অবসান

জার্মানির 'সোসিয়াল ডিমোক্রেটিক' বা সাম্যবাদী গণতান্ত্রিকগণ (Social Democrats) ছিল সর্বাপেক্ষা সুগঠিত রাজনৈতিক দল। তাহারা ছিল রাজতন্ত্রের এবং যুদ্ধ-নীতির বিরোধী। স্বভাবতই তাহারা জার্মানবাসী হইয়াও জার্মানির সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নেতা লাইবনেক্ট্ (Liebnecht), বেবেল (Bebel) প্রভৃতি উত্তর-জার্মান কনফেডারেশন স্থাপন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জার্মানির

জার্মানিতে সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি

সহিত আলসেস্-লোরেন নামক স্থানের সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সম্রাট প্রথম উইলিয়াম সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে তাঁহার 'ব্যক্তিগত শত্রু' বলিয়া মনে করিতেন। বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকিলেও তখনও তিনি সমাজতন্ত্র দমনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুইবার সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইলে বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিকগণকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দুইটি নীতি অবলম্বন করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। একদিকে তিনি সমাজতন্ত্রবাদ ও সামাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ও দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন, অপর দিকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে লাগিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি রাইকস্টাগের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির যে-কোন যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বা পরিকল্পনা তিনি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।*

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিসমার্কের নীতি : (১) দমন, (২) শ্রমিকদের উন্নয়ন

দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া বিসমার্ক কতকগুলি কঠোর-আইন-কানুন পাস করিলেন। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হইল। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক অথবা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা-সংবলিত কোনপ্রকার পুস্তক প্রকাশ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পুলিশের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র সন্দেহবশে গ্রেপ্তার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জোর-জুলুম করা হইতে লাগিল। বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা পুলিশের হস্তে নির্যাতিত হইল। কিন্তু এইসব ব্যবস্থার ফলেও সমাজতন্ত্রবাদকে নাশ করা সম্ভব হইল না। গোপন সমিতি ও ছদ্মনামে নানাপ্রকার সংঘের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলিতে লাগিল। অত্যাচার বা দমন নীতির দ্বারা কোন আদর্শ বা ভাবধারাকে রুদ্ধ করা সম্ভব নহে। স্বভাবতই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ শত অত্যাচারের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল। বিসমার্ক নিজেও ক্রমেই এই সত্য উপলব্ধি করিলেন।

দমন-নীতি

কেবল অত্যাচার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা সহজ হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি কতকগুলি শ্রমিকহিতৈষী আইন পাস করিলেন। শ্রমিকদের অসুস্থতা, শারীরিক অকর্মণ্যতা, দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়স ইত্যাদি জনিত বেকারত্বের কালে আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি বীমার ব্যবস্থা করিলেন।† এই সকল আইন প্রণয়ন করিতে গিয়া বিসমার্ক তীব্র

শ্রমিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ

* "I will further every endeavour which positively aims at improving the condition of the working classes."—*Bismarck*, vide, Hazen, p. 29.

† "Give to working man the right to employment as long as he has health, assure him care when he is sick, and maintenance when he is old."—Bismarck to the Reichstag, vide, Hazen, p. 292.

প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁহার অভিপ্রেত আইন-গুলি পাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনি নাম দিয়াছিলেন 'স্টেট্ সোশিয়েলিজম্' (State Socialism)।

বিসমার্কের সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিকদের মনঃপূত হয় নাই। কারণ এগুলি তাহাদের দাবির তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। ফলে, তাহাদের আন্দোলন পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাইকস্টাগের পঁয়ত্রিশ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবাদকে শেষ পর্যন্ত দমন করিতে পারেন নাই, এ-কথাই প্রমাণিত হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্রের জয়

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম, ১৮৮৮-১৯১৮ (Kaiser William II)। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম উইলিয়াম ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক সম্রাট হইলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। সামান্য তিনমাসের মধ্যেই (৯ই মার্চ হইতে ১৫ই জুন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে, তাঁহার ঊনত্রিশ বৎসরের পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম সম্রাট হইলেন।

তৃতীয় ফ্রেডারিক (৯ই মার্চ হইতে ১৫ই জুন, ১৮৮৮ খ্রীঃ)

প্রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে দ্বিতীয় উইলিয়ামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়, বিসমার্কের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি, প্রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান প্রভৃতির প্রভাবে তখন জার্মানির জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধ, আত্মশ্লাঘা ও আত্মচেতনা জাগিয়াছিল। বালক উইলিয়ামের মন ও চরিত্রের উপর এগুলি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি দৃঢ়চেতা, কর্মদক্ষ, দুঃসাহসিক এবং স্বমত-পোষক ব্যক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিলেন। তাঁহার চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভাবপ্রবণতা, অস্থিরমতিত্ব অনমনীয়তা প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি ভগবানপ্রদত্ত রাজ-ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

দ্বিতীয় উইলিয়ামের সম্রাট-পদ লাভ

উইলিয়ামের চরিত্র

বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইতিহাসের অধ্যাপক মোরেনব্রেকার (Maurenbrecher) বিসমার্কের রাজনীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় উইলিয়ামের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা জাগাইয়াছিলেন। বিসমার্কের প্রতি উইলিয়ামের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা বিসমার্কের নিকট তাঁহারই লিখিত পত্র (২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭) হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি এই পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনার অসুবিধার সৃষ্টি করা অথবা আপনার যাহা মনঃপূত নহে সেরূপ কিছু করা অপেক্ষা

তাঁহার শিক্ষা: বিসমার্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

আমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"* কিন্তু এইরূপ পত্রালাপের মধ্যেও উইলিয়ামের চরিত্রের অনমনীয়তা নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

সম্রাট-পদ লাভ করিবার অনতিকালের মধ্যেই দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং বিসমার্কের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম দেখিলেন যে, মন্ত্রিগণের উপর বিসমার্কের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহার নিজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। উইলিয়াম তাঁহার পিতামহ প্রথম উইলিয়ামের ন্যায় সম্রাট-পদ অলঙ্কৃত করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজেই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে অটুট আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে জনসাধারণকে শান্তি, সুশাসন, ন্যায়-বিচার প্রভৃতির প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছিলেন। এইসব হইতেই দ্বিতীয় উইলিয়ামের স্বমতপোষণের এবং নিজ প্রাধান্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিসমার্ক নিজেও যে তাহা না বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে। "উইলিয়াম নিজেই নিজের চ্যান্সেলর হইবেন" এই ভবিষ্যদ্বাণী বহুপূর্বে বিসমার্ক স্বয়ং-ই করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি বৃদ্ধ সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

বিসমার্কের সহিত মতানৈক্য

উইলিয়ামের ব্যক্তিগত প্রাধান্য-স্পৃহা

দ্বিতীয় উইলিয়ামের: (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং তাহা কার্যকরী করিবার মনোবৃত্তি, (২) বার্লিন রাজ-সভায় স্বার্থ-জনিত রেষারেষি এবং বিসমার্কের প্রাধান্য-বিরোধী প্ররোচনা তাঁহাকে ক্রমেই বিসমার্কের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। (৩) কিন্তু সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়াম যখন দেখিলেন যে, শাসনসংক্রান্ত এবং পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত অনেক কিছুই তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইতেছে তখন তিনি বিসমার্কের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিসমার্ক এবং উইলিয়াম উভয়েই ছিলেন স্বৈরপ্রকৃতির লোক। স্বভাবতই দুইজনের মতানৈক্য শীঘ্রই তীব্র আকার ধারণ করিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবধানও ছিল তাঁহাদের মতানৈক্যের তীব্রতার অন্যতম কারণ।

বিসমার্কের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণ: (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, (২) রাজসভায় বিসমার্কের প্রাধান্যের বিরোধিতা

(৩) শাসন ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়ে বিস-মার্কের গোপনীয়তা: উইলিয়ামের সন্দেহ

* "The great and affectionate respect and heart-felt attachment which I cherish for your Highness—and for you I would let my limbs be hewn piecemeal, one after another, rather than undertake anything that would be disagreeable to you, or cause you difficulties..." *Prince William in a letter to Bismark*, Dec. 21, 1887, Vide, Hazen, p. 299.

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়ের মতানৈক্য চরমে পেঁীছিল। উইলিয়াম বিস্মার্ককে স্পষ্টই বলিলেন যে, রাজার 'আদেশ' (command) তাঁহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। বিস্মার্ক তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি আপনার নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিবার বাধা সৃষ্টি করিতেছি ?" উইলিয়াম বলিলেনঃ "হ্যাঁ"।* বিস্মার্কের পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না, বস্তুত ইহা ছিল তাঁহার পদচ্যুতিরই সামিল। এইভাবে জার্মান রাষ্ট্রের পরিচালকের পদচ্যুতি সমসাময়িক এক ব্যঙ্গচিত্রে "Dropping the pilot" নামে বর্ণিত হইয়াছিল।

বিস্মার্কের পদচ্যুতি ("Dropping the pilot")

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Kaiser William II) ঃ কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল তিনটিঃ (১) সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপন (*Welt Poiitik i. e*, World politics), (২) জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, (৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন। বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক গোলযোগ এড়াইয়া চলা, শত্রুদেশ ফ্রান্সকে দুর্বল করা এবং ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা। এই কারণে তিনি জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' (satiated country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু উইলিয়ামের রাজ্যবিস্তার-নীতি বিস্মার্কের সাবধানী পররাষ্ট্র নীতির পথ ত্যাগ করাইয়া জার্মানিকে শক্তির দ্বন্দ্বে আগাইয়া লইয়া চলিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বলিতে ইওরোপে তিনি নিজে এবং তাঁহার পঁচিশ ডিভিসন সৈনা ভিন্ন আর কিছুই নাই।† কাইজার উইলিয়াম মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জার্মানির জাতীয় নীতি হইবে অগ্রগতিশীল, সক্রিয় এবং প্রসারধর্মী। এই প্রকার পররাষ্ট্র-নীতি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচালনায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দারুণ উত্তেজনা ও গোলযোগের সৃষ্টি করিত সন্দেহ নাই। আর কাইজার উইলিয়ামের ন্যায় অ-সাবধানী এবং সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তির হস্তে ইহা এমন এক ধারণার সৃষ্টি করিল যে, জার্মানি ইওরোপের উপর এক

কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য : (১) Welt Politik, (২) সাম্রাজ্য বিস্তার, (৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন

বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি পরিত্যক্ত

রাশিয়ার সহিত 'রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি' পরিত্যক্ত

ইওরোপে কাইজারের নীতির প্রতিক্রিয়া

---

* "The crisis came in March, 1890. The Emperor began to talk of 'Commands', a word which Bismarck had not heard on the lips of his old master. He insisted that his will should be carried out, if not by Bismarck, then by another. 'Then I understand Your Majesty', said Bismarck, speaking in English, 'that I am in your way.' 'Yes, was the answer." Ketelbey, pp. 355-56.

† "There is no Balance of Power in Europe except one—me and my twenty-five army corps." *Ibid*, p. 390.

সামরিক আধিপত্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার অক্ষমতা বিস্মার্কের চেষ্টায় স্থাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতার দ্রুত অবসান ঘটাইল। বিস্মার্কের অপসারণের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার সহিত "রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি" (Re-insurance Treaty) পরিত্যক্ত হইল। ক্রমে রাশিয়া ফ্রান্সের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং দুই দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের সহিতও জার্মানির দ্বন্দ্ব বাধিতে বেশী দিন লাগিল না। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর উইলিয়াম ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন এবং সেইজন্য জাঞ্জিবার (Zanjiber) ও উইটু (Witu) নামক দুইটি উপনিবেশের পরিবর্তে ইংলণ্ড হইতে হ্যালিগোল্যাণ্ড (Heligoland) পাইয়াছিলেন (১৮৯০)। জার্মানির সামুদ্রিক প্রাধান্যের জন্য হ্যালিগোল্যাণ্ড দখল করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার অল্পকাল পরে (১৮৯৩) ইংলণ্ড আফ্রিকায় ফরাসী প্রাধান্য প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-আফ্রিকা জার্মান প্রাধান্যাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে, কারণ ইহার ফলে আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে কাইজার উইলিয়াম মধ্য-আফ্রিকায় প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ফ্রান্স হইতে কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন তিনি বুঝিলেন না। কিন্তু ক্রমেই ইঙ্গ-জার্মান সম্প্রীতি নষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্রিটিশ নীতির ফলে বুওয়র যুদ্ধ (Boer War) শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মানি গোপনে বুওয়রগণকে উৎসাহিত করায় ইঙ্গ-জার্মানি মৈত্রী বিনষ্ট হয়। চীনদেশে জার্মানি কিয়া-ও-চাও (Kia o-Chau) এবং রাশিয়া পোর্ট আর্থার (Port Arthur) দখল করিলে জার্মানি ও রাশিয়ার প্রতি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ইংরাজ-বিরোধী এক শক্তিশালী মিত্রসংঘ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেই সুযোগও গ্রহণ করেন নাই।

ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাবের ফলে হ্যালিগোল্যাণ্ড লাভ

ইংলণ্ড কর্তৃক মধ্য-আফ্রিকায় জার্মানির অধিকার স্বীকৃত

বুওয়র যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ইংলণ্ডের বিরোধিতা

চীনদেশে জার্মানি ও রাশিয়ার অধিকার-বিস্তৃতিতে ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টি

কাইজার কর্তৃক জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ ত্যাগ

বুওয়র যুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রহীনতা ব্রিটিশ সরকারকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মৈত্রীবন্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত করাইল। সুতরাং জার্মানির এবং আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ড সচেষ্ট হইল। ফ্রান্স বা রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রশ্ন ছিল না, কারণ এই দুই দেশের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ ছিল অধিক। ১৮৯৯-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক চেষ্টা

জার্মানি ও আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডের চেষ্টা : কাইজার কর্তৃক সুযোগ ত্যাগ

করে, কিন্তু কাইজার উইলিয়াম সেই প্রস্তাব আগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্ভাব রক্ষার সুযোগ হারাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড জাপানের সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯০২)। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে সমর্থ হন।

ইংলণ্ড ও জাপানের চুক্তি (১৯০২)

এদিকে বাগদাদে রেলপথ স্থাপিত হইলে জার্মানি বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণ করিয়া পারস্য উপসাগরে নৌঘাটি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। এই সূত্রে ইংলণ্ডের ভীতির সৃষ্টি হয়, কারণ ইহার ফলে পারস্য উপসাগরে জার্মান প্রাধান্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইংলণ্ডের বিরোধিতায় জার্মানি শেষ পর্যন্ত এই রেলপথে সংযোগ স্থাপনে কৃতকার্য হইল না। এ-বিষয় লইয়াও ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ বৃদ্ধি পাইল।

বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের পরিকল্পনা

জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপন নীতির ফলে একদিক দিয়া যেমন ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ দিন-দিনই বাড়িয়া চলিল, অপর দিকে তেমনি ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের তীব্রতা কমিয়া আসিল। ইংলণ্ড দেখিল যে, সামুদ্রিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স বা রাশিয়া অপেক্ষা জার্মানিই অধিকতর শক্তিশালী শত্রু। এই কারণে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার বিরোধ ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি নৌবাহিনী ও যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে 'ত্রয়ী-শক্তি-চুক্তি' বা 'ট্রিপল আঁতাত' (Triple Entente) গঠিত হইল (১৯০৭)। বিসমার্ক স্থাপিত 'ত্রি-শক্তি-চুক্তি'র (Triple Alliance)—জার্মানি অস্ট্রিয়া ও ইতালি—প্রত্যুত্তর হিসাবে 'ট্রিপল আঁতাত' স্থাপিত হইল। এইভাবে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির ফলে বিসমার্কের বৈদেশিক চুক্তির দ্বারা জার্মানির নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইওরোপ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে Triple Entente স্থাপন

বিসমার্ক স্থাপিত Triple Alliance-এর প্রত্যুত্তর

অধ্যায় ১৩

রাশিয়া (১৮১৫—১৯১৯)
(Russia, 1815—1919)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়া (Russia at the opening of the 19th Century) : পিটার-দি-গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের (১৭৬২-১৭৯৬) চেষ্টায় রাশিয়া বহু শতাব্দীর জড়তা ও সুষুপ্তি কাটাইয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়া একটি ইওরোপীয় শক্তি অপেক্ষা এশিয়ার শক্তি হিসাবে বিবেচিত হইত। ইওরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতির দ্রুত পদক্ষেপের সহিত চলিবার মত সামর্থ্য রাশিয়ার তখনও ছিল না। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন রাশিয়া মধ্যযুগীয় তন্দ্রা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার অনগ্রসর সভ্যতা

সমাজ (Society) : রাশিয়ার সমাজ তখন জমিদার ও কৃষকশ্রেণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষক সম্প্রদায় তখন ভূমিদাস হিসাবে ভূম্যধিকারীর জমিচাষ, ব্যক্তিগত রাজকর্ম এবং করভার বহন করিতে আইনগত বাধ্য ছিল। জমিদারগণের অবৈধ অর্থশোষণ, জবরদস্তিমূলক শ্রমগ্রহণ ইত্যাদির ফলে কৃষকশ্রেণীর দুর্দশার সীমা ছিল না।* জমিদারগণ সার্ফ (Serf) বা ভূমিদাসদিগকে গরু-ভেড়ার ন্যায় বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। রাজার ব্যক্তিগত জমিজমা যাহারা চাষ করিত, তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। তাহারা 'মির' (Mir) নামক গ্রাম্য সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করিত। তাহারা কতক কতক স্বায়ত্তশাসন-মূলক অধিকারও ভোগ করিত। কিন্তু জমিদারদের অধীন কৃষকদের ন্যায় তাহাদিগকেও নানাপ্রকার কর দিতে হইত। একস্থান হইতে অপর স্থানে ইচ্ছামত চলিয়া যাওয়ার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সম্পত্তি ভোগদখলের ব্যাপারে তাহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

কৃষকগণ ভূমিদাস (Serf) : জমিদারগণের অধীন কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা

রাজকীয় জমির কৃষকদের অবস্থা

কৃষকদের এইরূপ দুরবস্থা বহুকাল পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। পিটার বা ক্যাথারিণ রাশিয়ার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া গেলেও সার্ফ-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের উন্নতি বিধানের প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কৃষকদের উন্নতিবিধানে পিটার ও ক্যাথারিণের উদাসীনতা

---

* "......the negroes on the American plantations were happier than the Russian private serfs." Vide, Lipson, p. 82.

শাসন (Administration) : শাসন-ব্যাপারেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত ছিল। পিটার, ক্যাথারিণের আমলের কর্মদক্ষতা বা নিপুণতা শাসনব্যবস্থায় তখন ছিল না। অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি শাসনব্যবস্থার সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।* রাজকীয় কর্মচারিপদগুলি তখন বিক্রয় করা হইত এবং যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিত তাহাকেই যে-কোন পদে নিযুক্ত করা হইত। কার্যক্ষমতা অথবা সততার কোন প্রয়োজন স্বভাবতই তখন ছিল না। রাজকর্মচারিগণের বেতন ছিল অতি সামান্য। সুতরাং তাহারা বেপরোয়াভাবে উৎকোচ গ্রহণে সংকোচ বোধ করিত না। বস্তুত ইহাই ছিল তখনকার সর্বজনস্বীকৃত নীতি। বিচার-ব্যবস্থা তখন একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বিচারালয়ে ন্যায্য বিচার পাওয়াটাই ছিল তখন আশ্চর্যের বিষয়। উচ্চ-নীচ সকল বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণ করা হইত এবং উৎকোচের পরিমাণের উপরই বিচার নির্ভর করিত।

শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অপকর্ষতা

বিচার-ব্যবস্থায় দুর্নীতি

রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিয়া কিছু ছিল না। তথাপি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সেখানে একেবারে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই এমন নহে। কৃষক সম্প্রদায় দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের প্রভাব দেখা গেল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। অভিজাত সম্প্রদায় সরকারী কর্মচারী শ্রেণীর ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট ছিল। ইহা ভিন্ন, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত বহু সামরিক কর্মচারী পশ্চিম-ইওরোপ এবং ফ্রান্সে যুদ্ধব্যপদেশে সাময়িকভাবে অবস্থান করিয়া যে উদার মনোভাব লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন তাহাও রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকার বিপ্লব যেমন ফরাসী জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তেমনই ফরাসী বিপ্লব রুশদিগকে তাহাদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লব ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিল। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া তাহারা বিপ্লবাত্মক প্রচারকার্য চালাইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে Union of Public Good নামে বিপ্লবাত্মক সুসংগঠিত এক সমিতি স্থাপিত হইল, ক্রমে অবশ্য এই সমিতি উত্তর অংশের সমিতি (Society of the North) ও দক্ষিণ অংশের সমিতি (Society of the South) নামে দুইটি সমিতিতে

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব

অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক উদারনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব

Union of Public Good : Society of the North, Society of the South

---

* "Everything was corrupt, everything unjust, everything dishonest." Vide, Lipson, p. 83.

বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সমিতি দুইটি পশ্চিম ইওরোপীয় রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ ছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা, উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা প্রভৃতির আদর্শ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সমিতি আন্দোলন চালাইয়াছিল। কিন্তু রুশ জনসাধারণ তখনও দেশাত্মবোধ ও উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠে নাই। স্বভাবতই এই মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিকের প্রচেষ্টা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার চাপে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

রুশদের দেশাত্মবোধ ও উদারনৈতিক চেতনার অভাবহেতু উদারনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ১৮০১-১৮২৫ (Czar Alexander I): ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের সময় রাশিয়ার জার ছিলেন প্রথম আলেকজাণ্ডার। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল আটত্রিশ বৎসর। তিনি বাল্যকালে লা হার্পে (La Harpe) নামে একজন সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসী বিদ্বান ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লা হার্পে ছিলেন উদার-নীতিতে বিশ্বাসী। স্বভাবতই আলেকজাণ্ডারের মনে তাঁহার রাজনৈতিক ধারণার প্রভাব পড়িয়াছিল। বাল্যকাল হইতে জার আলেকজাণ্ডার সংস্কার, প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিকতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের বাল্যজীবন

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার-পদ লাভ করেন। নেপোলিয়নের যুগে তিনি ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টিল্‌জিটের সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মিত্রতা ত্যাগ করিয়া তিনি নেপোলিয়নের এক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং অপ্রতিহত শত্রুতে পরিণত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার প্রাপ্ত হওয়ার সময় হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পূর্ব পর্যন্ত জার প্রথম আলেকজাণ্ডার তাঁহার উদার-নীতি অনুযায়ী শাসন-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। ১৮০৫ হইতে নেপোলিয়নের পতনের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া অবিশ্রাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সুতরাং উদারনৈতিক সংস্কারের সুযোগ বা সময় তখন ছিল না; ইহা ভিন্ন, অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা তখন এত বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল যে, উহার কোন একাংশের উন্নতি বিধান করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। সমগ্র শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করিতে না পারিলে আংশিকভাবে কোন উন্নতিতে বা সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার তখন পরিস্থিতি ছিল না। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারিগণ কোনপ্রকার সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল না, এমন কি, উহাতে সর্বপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং নেপোলিয়নের যুদ্ধাবসানের পূর্বে জার আলেকজাণ্ডার কোন উল্লেখযোগ্য শাসন-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

নেপোলিয়নের পতনে আলেকজাণ্ডারের দান

রুশ শাসনব্যবস্থার ব্যাপক দুর্নীতি

কিন্তু তাঁহার উদার মতবাদ এবং নেপোলিয়নের পতনে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের জন্য তিনি তদানীন্তন ইওরোপের সর্বাপেক্ষা উদারচেতা রাজা বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ১৮১৪-'১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় পুনর্গঠনে আলেকজাণ্ডার উল্লেখযোগ্য উদারনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই ভিয়েনা সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। জার আলেকজাণ্ডারের সনির্বন্ধতায়ই অষ্টাদশ লুই ফরাসী জাতিকে কতক শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জার্মানির প্রতিও তিনি অধিকতর উদার ব্যবস্থা অবলম্বনে পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

ভিয়েনা সম্মেলনে জার আলেকজাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

ভিয়েনা চুক্তির শর্তানুযায়ী জার আলেকজাণ্ডার গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো (Grand Duchy of Warsaw)-এর অধিকাংশ পাইয়াছিলেন। পোল্যাণ্ডের ঐ অংশকে তিনি পোলাণ্ড রাজ্য নামক একটি রাজ্যে পরিণত করেন এবং নিজ শাসনাধীনে রাখিলেও পোল্যাণ্ডবাসীকে কতক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করেন। পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে আলেকজাণ্ডার যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। আইনত জারের অধীনতা স্বীকার করা ভিন্ন পোলদের স্বাধীনতা কোনভাবেই তিনি ব্যাহত করেন নাই।* পোল্যাণ্ডে তিনি এক উদার শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের এবং ধর্মপালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পোলগণ ভোগ করিত। পোল ভাষা সেখানের সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃত ছিল। ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সে ঐ সময়ে যে-সকল শর্ত পূরণ করিলে ভোটাধিকার পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষাও সহজ শর্তে পোলদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডে এই উদার শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইলে আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায়ও অনুরূপ শাসনতন্ত্র স্থাপনের আশা পোষণ করিতেন।

পোল্যাণ্ডবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দান

অবশ্য রাশিয়ায়ও কতক কতক উদারনৈতিক সংস্কার তিনি ইতিমধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেশে অর্থনৈতিক জীবনের যে-ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে জার আলেকজাণ্ডার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার ব্যাপক দুর্নীতি দূর করিয়া শাসনকার্যে দক্ষতা

রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

* "He showed his liberal tendency even more unmistakbly in his Polish policy —The only connection between the two was in the person of the ruler. The Czar of Russia was to be the king of Poland." Vide, Hazen, p. 568.

তিনি আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রুশ শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি এত বেশী ব্যাপক এবং বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি এ-বিষয়ে অতি সামান্যই সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাসপাতাল, জেলখানা, পরিবহন-ব্যবস্থা, কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের তিনি উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জার পিটারের আমল হইতে শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগের জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারী সমষ্টিগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। জার আলেকজাণ্ডার এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগের প্রথা প্রবর্তন করেন। জার আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সার্ফদের (Serfs) অবস্থার উন্নয়নের কথা ভাবিতেন। অবশ্য তাঁহার আমলে সার্ফদের দুর্গতির কোন উপশম করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি তিনি সার্ফ-প্রথার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে প্রকাশ্য মন্তব্য করিয়া ভবিষ্যতে উহার উচ্ছেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। দেশে উচ্চশিক্ষা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য তিনি কয়েকটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিয়াছিলেন।

জনকল্যাণকর সংস্কার-কার্যাদি

শাসনব্যবস্থার সংস্কার

শিক্ষার উন্নতি

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল দেশে তিনি তাঁহার অনুচরগণের সাহায্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারনৈতিক মতবাদ ও কার্যাবলী অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কতক পরিমাণে ব্যাহত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের অস্থিরচিত্ততা এবং কর্মপন্থা ও নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতার সুযোগ লইয়া মেটারনিক্ তাঁহাকে নিজ দলে টানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেটারনিকের কূটকৌশলের নিকট জার আলেকজাণ্ডার পরাজিত হইয়াছিলেন। মেটারনিক্ তাঁহাকে এ-কথা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উদার-নীতি অনুসরণের একমাত্র এবং অবশ্যম্ভাবী ফল হইল অরাজকতা। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে সর্বপ্রকার উদারপন্থী কার্যকলাপ দমন করা একান্ত প্রয়োজন। এ-কথা জার আলেকজাণ্ডারকে বুঝাইতে মেটারনিকের দৃষ্টান্তের অভাব হইল না। ফরাসী প্রতিনিধি-সভায় উগ্র সমাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য, জার্মানিতে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃংখলতা, কট্জেবু হত্যা, গোপন সমিতিগুলির ক্রমবিস্তার এবং জার আলেকজাণ্ডারের নিজস্ব সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মেটারনিক্ জার আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক চেতনাকে আংশিকভাবে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন,

ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনে উদারনৈতিক সংস্কারের সহায়তা

মেটারনিকের প্রভাব: আলেকজাণ্ডারের প্রতিক্রিয়াশীলতা

পোল্যাণ্ডবাসীদের প্রতি তাঁহার উদারতা রুশ জাতির অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাশিয়ার উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন না করিয়া রাশিয়ার পূর্ব-শত্রু পোলদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে রুশ জাতির উদারপন্থিগণ জারের কার্যাদির সমালোচনা করিলে তিনি ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

১৮১৫-'২০ খ্রীঃ পর্যন্ত উদার-নীতির পৃষ্ঠপোষকতা

১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে উদার-নীতির পৃষ্ঠপোষকতার পর ১৮২০-'২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্রমেই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কার্যাদির সমালোচনা করাকে তিনি অকৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিলেন এবং দমন-নীতির দ্বারা সর্বপ্রকার সমালোচনা এবং উদার-নীতির প্রকাশকে বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

১৮২০-'২৫ খ্রীষ্টাব্দ : প্রতিক্রিয়াশীলতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রস্তাব জার আলেকজাণ্ডারই উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) তাঁহার আন্তর্জাতিকতারই ফলস্বরূপ। কিন্তু বিপ্লবের ভীতি এবং উদার-নীতির ভয়াবহ ফলের কথা ভাবিয়া তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 'প্রোটোকোল অব্ ট্রপো' (Protocol of Troppau) স্বাক্ষর করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রথম আলেকজাণ্ডার উদার-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বটে তথাপি তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ফিনল্যাণ্ড জয় করিয়াছিলেন। তুরস্ককে ভাগ করিয়া লইবার এবং এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নেপোলিয়নের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদিতা

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের চরিত্র (Character of Czar Alexander I) ঃ জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের চরিত্র যেমন ছিল অদ্ভুত তেমনি রহস্যাবৃত। তিনি ছিলেন বাস্তবতাবর্জিত আদর্শবাদী। তাঁহার নীতি এবং কার্যকলাপের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। দৃঢ়সংকল্প বা স্থিরবুদ্ধির পরিচয় তিনি কখনও দেন নাই। অতি সামান্য কারণেই তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন। আত্মম্ভরিতা, ভাবপ্রবণতা এবং অবাস্তববাদিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মবিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অতি গভীর। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় রাজনীতিতে স্থায়ী শান্তি এবং শৃঙ্খলা আনিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। কূটকৌশলে তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাঁহার চিন্তাধারা ছিল অসংলগ্ন। তিনি কোন সময়ে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, কখনও বা সাম্রাজ্যবাদী, আবার কখনও বা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রুশোর (Rousseau) গণতান্ত্রিক মতবাদে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেটারনিকের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরস্পর-বিরোধী প্রভাবে

চরিত্র

প্রভাবিত হইয়া তিনি কতকটা অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেটারনিক্ তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মনে করিতেন। সমসাময়িক ইওরোপের নিকট তিনি ছিলেন এক দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যাবৃত চরিত্রের লোক।

জার প্রথম নিকোলাস, ১৮২৫—'৫৫ (Czar Nicholas I, 1825-'55): অপুত্রক অবস্থায় জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম নিকোলাস জার হইলেন। তাঁহার সিংহাসন লাভে প্রতিক্রিয়ার চরম প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন প্রতিক্রিয়ার প্রতীক-স্বরূপ। তাঁহার আমলে শাসনতান্ত্রিকতা, উদার-নীতি সবকিছুরই অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নিকোলাস স্বৈরাচারকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে-যুগে সমগ্র ইওরোপ প্রতিক্রিয়া এবং উদার-নীতির পরস্পর-সংঘর্ষে আলোড়িত হইতেছিল ঐ সময়ে রাশিয়ার প্রথম নিকোলাসের দমন-নীতির ফলে এক শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্র অধিকতর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম নিকোলাস: রাশিয়ার প্রতিক্রিয়ার চরম বিকাশ

প্রথম নিকোলাস প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সেনাবাহিনীতে অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বভাবতই সৈনিকসুলভ কঠোরতা, সংকীর্ণতা এবং বাস্তবতা তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছিল। তিনি দুর্নীতি দূর করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া যুগধর্মের সহিত চলিবার মত মানসিক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল না। অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তিনি প্রতিক্রিয়া এবং স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক হিসাবে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাজ করিয়া গিয়াছিলেন।

চরিত্র

অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ (Internal Activities): জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে কন্‌স্টান্‌টাইন ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু প্রথম আলেকজাণ্ডার মৃত্যুর পূর্বে কন্‌স্টান্‌টাইনকে প্রথম নিকোলাসের সপক্ষে নিজ দাবি ত্যাগ করিতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সামরিক কর্মচারিগণ এবং উদারপন্থিগণ নিকোলাসের স্থলে কন্‌স্টান্‌টাইনকে সিংহাসনে স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁহারা নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা জানিতেন। নিকোলাস কন্‌স্টান্‌টাইনের দাবি উপেক্ষা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে সামরিক কর্মচারী এবং গুপ্ত সমিতিগুলি (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া এই সকল বিদ্রোহী 'ডিসেম্বরিস্ট্' বা 'ডেকাব্রিস্ট্' (Decembrists or Decabrists) নামে পরিচিত। উপযুক্ত সংগঠন এবং পরস্পর যোগাযোগের অভাবের ফলে এই বিদ্রোহ বিফল হইল। নিকোলাস বিদ্রোহিগণকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করিয়া তাহাদের শাস্তি দিলেন। ডিসেম্বরিস্ট্ বিদ্রোহীরা আপাতদৃষ্টিতে বিফল হইলেও তাহাদের আত্মত্যাগের আদর্শ পরবর্তী কালে বহু রাশিয়াবাসীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার

ডিসেম্বরিস্ট্ বিদ্রোহ

বিদ্রোহের সুফল

জন্য সর্বপ্রকার অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া জারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

নিকোলাসের দমন-নীতি

প্রথম নিকোলাস স্বভাবতই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। ডেকাব্রিস্ট্ বিদ্রোহ তাঁহাকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত করিল। তিনি গুপ্তচরবাহিনী এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে দেশে এক ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গুপ্তচর বাহিনীর নাম ছিল 'থার্ড সেক্‌শন্' (Third Section)। ইহারা ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা অথবা কয়েদ করা, যে-কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করা, যে-কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা অথবা অন্য যে-কোন ভাবে নির্যাতন করিবার অবাধ অধিকার তাহাদের ছিল।

'থার্ড সেক্‌শন্' (Third Section)

সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। সংবাদপত্র, অথবা অন্য কোনপ্রকার পুস্তকাদি এবং বক্তৃতা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। সঙ্গীতের মাধ্যমে কোনপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা যাহাতে প্রকাশ পাইতে না পারে সেজন্য সঙ্গীত রচনাও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। যে-সকল কর্মচারী এই নিয়ন্ত্রণ-কার্যে ভারপ্রাপ্ত ছিল তাহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল (১৮৪৮)। এই কমিটির কার্যাদির উপর নজর রাখিবার জন্য আরও একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৮৩২ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের মধ্যে মোট দেড়লক্ষ লোক দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল।

সরকারী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা

দেশবাসী যাহাতে রাজনীতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে না পারে সেইজন্য নিকোলাস সাহিত্য ও শিক্ষার উৎসাহ দান করিতেন, কিন্তু তাহারা যাহাতে কোনপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইতে না পারে সেই কারণে বিদেশী গ্রন্থাদি রাশিয়ায় আমদানি করা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য প্রথম নিকোলাসের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কবি পুস্‌কিন্ (Pushkin), ঔপন্যাসিক ডস্টোইয়েভস্কি (Dostoievski), তুর্গেনিভ্ (Turgeniev) এবং গোগোল (Gogol) তাঁহাদের রচনার দ্বারা ঐ যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল "রাশিয়ার অগাস্টিয়ান যুগ" (Augustian Age of Russia) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রুশ সাহিত্য উৎসাহিত : বিদেশী গ্রন্থাদির আমদানি নিষিদ্ধ

রাশিয়ার 'অগাস্টিয়ান যুগ'

বিদেশ হইতে কোনপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাব যাহাতে রুশবাসীকে স্পর্শ করিতে না পারে সেজন্য নিকোলাস রাশিয়ার প্রজাদিগের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী সরকার নির্ধারণ করিয়া দিতেন। দর্শনশাস্ত্র ধর্মযাজক ভিন্ন অপর কাহারো পক্ষে পাঠ

বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ

করা নিষিদ্ধ ছিল। অধ্যাপকগণ এবং ছাত্রদের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ

সামরিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজার অনুগত প্রজা সৃষ্টি করা।

ধর্মবিষয়েও কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। রাশিয়ার চার্চ ছিল গোড়া

ধর্মবিষয়ে নির্যাতন

ক্যাথলিক চার্চ (Orthodox Church)। কেহ এই ধর্ম ত্যাগ করিয়া অপর কোন ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত এবং তাহাকে দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডে উদারনৈতিক বিদ্রোহ দেখা দিলে নিকোলাস উহা দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল জীবন-মরণ সংগ্রাম করিয়াও পোলগণ কৃতকার্য হইতে পারিল না। ফলে নিকোলাস পোলদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নাকচ করিলেন। এতকাল

পোল বিদ্রোহ দমন

পোল্যাণ্ড একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য নাশ করিয়া পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডকে রাশিয়ার সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। পূর্বে পোলভাষা এই স্থানের সরকারী ভাষা ছিল। নিকোলাস পোলভাষার স্থলে রুশভাষা তথাকার বিচারালয়, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতিতে চালু করিলেন। পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চগুলির পরিবর্তে গোঁড়া চার্চ স্থাপন করা হইল। এইভাবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিকোলাস এক অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পররাষ্ট্র কার্যকলাপ (External Activities): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও প্রথম

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ

নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। অপরাপর দেশে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য তিনি সামরিক সাহায্যদানে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার এই প্রতিক্রিয়াশীলতা সমগ্র ইওরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল।

তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম নিকোলাস চিরাচরিত রুশ-নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে

তুরস্কের বিরুদ্ধে চিরাচরিত রুশ-নীতির অনুসরণ

তুরস্ককে গ্রীক-স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সূত্রে নাভারিনোর যুদ্ধে (১৮২৭) তুরস্ককে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গ্রীকদের সাহায্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলে নিকোলাস এককভাবে গ্রীকদিগকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন। প্রধানত নিকোলাসের চেষ্টায়ই

তুরস্ক আড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধি দ্বারা গ্রীক-স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গ্রীকদের সাহায্য করিবার ব্যাপারে নিকোলাস কোন উদারনৈতিক মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসকে তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং গ্রীসে রুশ প্রাধান্য স্থাপনের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার স্বার্থ-প্রণোদিত সহায়তা

গ্রীক যুদ্ধে তুরস্কের সুলতান নিজ সামন্ত-রাজ্য মিশরের পাশার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিতে আসিয়া মিশরের পাশা মেহমেৎ আলি তুরস্কের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তুরস্কের রাজধানী কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌লের নিকট উপস্থিত হন। ঐ সময়ে তুরস্কের সুলতান ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পান নাই, কিন্তু জার প্রথম নিকোলাস তুরস্কের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে উন্‌কেইর স্কেলেসি'র (Unkair Skelessi) সন্ধি দ্বারা নিকোলাস কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। কৃষ্ণসাগর প্রায় 'রুশ হ্রদ' (Russian lake)-এ পরিণত হয়।

'উন্‌কেইর স্কেলেসি'র সন্ধি (১৮৩২)

উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য দানের শর্ত-সংবলিত এক চুক্তি রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৮৪৮-'৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রথম নিকোলাস অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিকোলাসের সাহায্যেই হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ-দমনে রুশ সহায়তা

জার্মানির ইতিহাসেও জার নিকোলাস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট (১৮৪৮) যখন সমগ্র জার্মানির সম্রাট-পদ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল তখন প্রধানত প্রথম নিকোলাসের বিরোধিতার আশঙ্কা করিয়াই চতুর্থ উইলিয়াম উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম নিকোলাস ইওরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জার্মানির ঐক্যসাধনে নিকোলাসের বিরোধিতা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জার প্রথম নিকোলাস সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে রুশগণ এবং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে-ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। রুশজাতি নিকোলাসের সংকীর্ণ, অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্র এতদিন যাবৎ এই ভাবিয়াই মানিয়া চলিয়াছিল যে, রাশিয়া ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় তাহাদিগকে নিকোলাসের স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিল। নিকোলাসের

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের গুরুত্ব

শাসনব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা যেন আকস্মিকভাবে সকলের নিকট ধরা পড়িল। এইভাবে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানির* মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষ ভাগে প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হইল।

নিকোলাসের মৃত্যু

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৫৫—'৮১ (Czar Alexander II, 1855—'81): ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জারপদ লাভ করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় রাশিয়াবাসীদের মনে স্বৈরতন্ত্রের অকর্মণ্যতা সম্পর্কে যে-ধারণা এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা এবং সমাজ-জীবনে সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ও সুযোগ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উদারচেতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাশিয়ায় এক ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

সংস্কারের সুযোগ

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন দয়াপ্রবণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, জনকল্যাণকামী শাসক। উদার-নীতির প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না বটে, কিন্তু রাশিয়া এবং রাশিয়াবাসীর প্রতি তাঁহার অন্তরের টান ছিল অত্যন্ত প্রবল। রাশিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেতন। দেশ এবং দেশবাসীর কল্যাণার্থে কখন কি প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। পিতা প্রথম নিকোলাসের সামরিক শক্তি-প্রীতি বা প্রথম আলেকজাণ্ডারের অবাস্তববাদিতা বা ভাবপ্রবণতাও তাঁহার ছিল না। পিতা প্রথম নিকোলাসের স্বৈরাচারী শাসনের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলে গণতন্ত্র বা উদারতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনবোধে উদারনৈতিক বা গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহার বহুমুখী সংস্কার-কার্যের জন্য বিশেষত রাশিয়ার সার্ফগণকে মুক্তিদানের জন্য তিনি 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের চরিত্র

অভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms): ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শাসনের নানাবিধ দোষ-ত্রুটিই প্রধানত দায়ী ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি সমসাময়িক উদারনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারিলেন না। স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়া তিনি যথাসম্ভব হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার সংস্কারে তিনি রাজকীয় অধিকার এবং ক্ষমতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলেন। প্রথমেই তিনি ডিসেম্বারিস্ট্ বা ডেকাব্রিস্ট্ (Decembrist or, Decabrist) নামক বিদ্রোহীদিগকে নির্বাসন দণ্ড হইতে মুক্তি দিলেন।

(১) ডিসেম্বারিস্টদের মুক্তিদান

* *Ibid*, p. 588.

ডেকাব্রিস্ট্‌গণ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের পিতা প্রথম নিকোলাসের আমলে রাজদ্রোহের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইয়াছিল।

অতঃপর জার আলেকজান্ডার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসাহিত হইল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া রেলপথের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল রাশিয়ার রেলপথের অভাব। সুতরাং সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রেলপথের উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধন করা হইল।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(৩) রেলপথের উন্নতি সাধন

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল সার্ফগণের মুক্তিদান। রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল সার্ফ। সার্ফগণ ছিল জমিদারশ্রেণীর ভূমিদাস। তাহারা অর্থ দিয়া, দৈহিক পরিশ্রম করিয়া এবং নানাপ্রকার দুর্বিষহ নির্যাতন ভোগ করিয়াও জমিদারশ্রেণীর সন্তুষ্টি বিধানে বাধ্য ছিল। জমিদারশ্রেণীর স্বার্থবৃদ্ধি ও তাহাদিগকে নানাভাবে সেবা করিবার জন্য যেন সার্ফশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কুপ্রথার ফল ঐ সময়ের অর্থনৈতিক অবনতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক অবনতি, ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রভৃতি সার্ফ-প্রথার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বস্তুত, ১৮২৮ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহুবার রাশিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপের অপর কোন দেশে সার্ফ-প্রথা চালু ছিল না। একমাত্র রাশিয়ায় এই ভূমিদাসত্ব প্রচলিত ছিল বলিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার মর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancipation) দ্বারা সার্ফ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিলেন (১৮৬১)। সার্ফদের মুক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না।

মুক্তিদাতা জার আলেকজান্ডার (Czar Liberator)

(৪) সার্ফ-প্রথার উচ্ছেদ (১৮৬১)

প্রথমত, এই 'মুক্তির ঘোষণা' দ্বারা রাশিয়ার সার্ফদিগকে স্বাধীন প্রজার মর্যাদা দান করা হইয়াছিল। পূর্বে তাহাদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করিবার অনুমতি ছিল না। এখন সকল স্বাধীন প্রজার ন্যায় তাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিল। জমিদারগণের দাসত্ব হইতে তাহারা এখন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইল। সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার ফলে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জগতের ব্যক্তি-স্বাধীনতার

সার্ফ-প্রথা উচ্ছেদের গুরুত্ব :
(ক) সার্ফগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

এবং ব্যক্তির অধিকারের রীতি রাশিয়ায় গৃহীত হইয়াছিল এমন নহে, ইহা ভবিষ্যতে রাশিয়ার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং অধিকতর মাত্রায় পাশ্চাত্য জগতের জীবনযাত্রার ধারা অনুকরণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।*

দ্বিতীয়ত, তাহারা যে-সকল জমি ভূমিদাস হিসাবে চাষ করিত, তাহার উপর তাহাদের মালিকানা স্বীকৃত হইল। জমির ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে দিতে হইল বটে, কিন্তু জার সরকারী তহবিল হইতে সামান্য সুদে উনপঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে তাহাদিগকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিলেন। সুতরাং সার্ফদের মুক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল এই যে, তাহারা কেবল স্বাধীন প্রজার মর্যাদাই পাইল না, জমির উপর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটিল।

(খ) জমির উপর সার্ফদের স্বত্ব স্বীকৃত

তৃতীয়ত, বিরাট সংখ্যক সার্ফদের মুক্তি রাশিয়ার সামাজিক ক্ষেত্রেও এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সার্ফদের মুক্তি নৈতিকতার জয় বলিয়া বিবেচনা করাও অসমীচীন হইবে না।

(গ) সামাজিক বিপ্লব

'মুক্তির ঘোষণা'র পর আলেকজাণ্ডার আরও নানাপ্রকার সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনি জনমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেন। সংবাদপত্রের এবং স্বমত প্রকাশের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় এক দারুণ জনমতের সৃষ্টি হইলে আলেকজাণ্ডার সংবাদপত্র ও স্বমত প্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। বিদেশ ভ্রমণের উপর যে-নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা তিনি নাকচ করিয়া দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেন। ফলে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে অবাধে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশী চিন্তাধারার সহিত পরিচিতি সম্ভব হইল।

(৫) সংবাদপত্র ও স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা

বিদেশযাত্রা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ বাতিল

সামরিক বাহিনী ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠন দ্বারা তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। প্রতি বৎসর রাশিয়ার বাজেট জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিবার নীতি তিনি গ্রহণ করিলেন।

(৬) সামরিক ও নৌ-বাহিনীর উন্নতি সাধন

রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থা যেমন ছিল দুর্নীতিপূর্ণ তেমনি ছিল সংহতিবিহীন। জার আলেকজাণ্ডার বিচার-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। পূর্বেকার বিচার-ব্যবস্থার কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি এক নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিলেন। বিচার ও শাসন-ব্যবস্থার পৃথকীকরণ করিয়া তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার পথ প্রস্তুত করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাহাতে নির্ভীকভাবে বিচার করিতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল।

(৭) বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন: জুরি-প্রথার প্রবর্তন

* Vide, David Thomson, p. 302

জুরির সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থার তিনি প্রচলন করিলেন। সুদক্ষ বিচারকদের লইয়া ট্রাইবুন্যাল (Tribunal) গঠন করা হইল। ইহা ভিন্ন, দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন-বিধিরও সংস্কার সাধন করা হইল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। জনসাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সমর্থন পশ্চাতে না থাকিলে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময় পরাজয় অনিবার্য এই শিক্ষাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে রাশিয়া লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সেই কারণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়া এবং অত্যধিক কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা স্থানীয় প্রতিনিধি-সভার হস্তে কতক পরিমাণে বণ্টন করিয়া একক-প্রাধান্যের দোষ-ত্রুটি আংশিক-ভাবে হ্রাস করিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশে 'জেমস্ট্ভো' (Zemstvo) নামে স্থানীয় প্রতিনিধি-সভা গঠন করিয়া সেগুলিকে স্থানীয় শান্তিরক্ষক (Justices of the Peace) নির্বাচন, রাস্তা, পুল, প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার ভার দেওয়া হইল। তাহাদের কার্যের উপর নজর রাখিবার এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের কার্যাদি নাকচ করিবার ভার ছিল প্রাদেশিক গবর্ণরের উপর। পোল্যাণ্ডে তিনি পুনরায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(৮) শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, জেমস্ট্ভো নামক প্রতিনিধি-সভা গঠন

উপরি-উক্ত ব্যাপক সংস্কার-কার্যের দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার পিটার দি-গ্রেটের ন্যায় রাশিয়াকে পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলির সম-পর্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। রাশিয়াকে আধুনিক দেশে রূপান্তরিত করিবার কাজে দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডার পিটারের ন্যায় স্মরণীয়।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের দান, পিটারের কার্যাদির সহিত তুলনীয়

জার আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের সমালোচনা (Criticism of Czar Alexander's Reforms): রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধনে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের দান ছিল অপরিসীম, ইহা অনস্বীকার্য। একমাত্র পিটারের সহিত তাঁহাকে এ-বিষয়ে তুলনা করা চলে। তাঁহার ব্যাপক সংস্কার-কার্যের ফলে রাশিয়ায় এক নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কারের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সংস্কার-কার্যের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

রাশিয়ায় নবজীবনের সূচনা

প্রথমত, সার্ফগণকে স্বাধীন প্রজার মর্যাদায় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে জমির-মালিকানা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সার্ফদিগের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের মুক্তি তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই। 'মির' (Mir) নামক গ্রাম্য সমবায় সমিতির উপর গ্রামের সকল জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই সমবায় সমিতিগুলি শেষ পর্যন্ত

পূর্বেকার জমিদারদের ন্যায়ই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সার্ফগণ আশা করিয়াছিল যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের শ্রমে পুষ্ট জমিদারের নিকট হইতে তাহাদিগকে যে-জমি দখল করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেজন্য তাহাদিগকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে দিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবার ফলে জমিদারদের শক্তি এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন, অপরাপর নানাবিধ করভারও তাহাদের উপর স্থাপন করায় নবলব্ধ স্বাধীনতায় তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল। 'এই স্বাধীনতার মূল্য কি ?'—এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মনে স্বভাবতই জাগিতে লাগিল। সর্বোপরি সার্ফগণ জমির মালিক হইবার ফলে তাহাদের বংশধরেরা সেই জমির মালিক হইতে লাগিল। জমি স্বভাবতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িলে কাহারো পক্ষে জমি চাষ করিয়া জীবিকা অর্জন সহজ রহিল না। শেষ পর্যন্ত সার্ফ-প্রথার অবসান কৃষক-সমাজের অধিকাংশের অবস্থারই কোন উন্নতি ঘটাইতে পারিল না। কৃষকদের এই অভিযোগ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অসন্তোষে রূপান্তরিত হইল। সার্ফদের মুক্তি দান করিয়া জার আলেকজাণ্ডার কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিলেন না। পাশ্চাত্য দেশ হইতে মার্কসবাদী চিন্তাধারা তাহাদের মধ্যে সহজে বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। জার আলেকজাণ্ডারের প্রাণনাশের একাধিক চেষ্টা (১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৮০) করা হইল।

সার্ফদের অসন্তুষ্টি

দ্বিতীয়ত, তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারও উপযুক্ত বিচারক ও জুরির অভাবে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার সংস্কার দ্বারা রাশিয়ার ন্যায়বিচার সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ বিচার-ব্যবস্থা যে দুর্নীতিপূর্ণ না হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারে আশানুরূপ সাফল্যলাভে অকৃতকার্যতা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক সংস্কারই তাঁহার সংস্কারের বিফলতার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল বলা যাইতে পারে। ডেকাব্রিস্ট্‌দিগকে মুক্তিদান এবং পোল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিবার ফলে পোলদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এই সকল উদারনৈতিক কার্যকলাপকে তাঁহার দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিল। তাহারা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের পূর্বে পোল্যাণ্ডের যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞতার ফলে আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনমূলক যাবতীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন করিলেন এবং পোলদিগকে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার অধীন করিলেন। তাহাদের কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত বিনাশের চেষ্টা করা হইল। পোলদের অকৃতজ্ঞতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক সংস্কার-কার্যে বাধার সৃষ্টি করিল। তিনি ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিলেন।

পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩)

পোলদের বিদ্রোহ ভিন্ন রাশিয়ার 'নিহিলিস্ট'* (Nihilist) আন্দোলন নামে এক রাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইলে আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিলেন।

নিহিলিস্ট্ আন্দোলন

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত খেয়ালী শাসক। পরিস্থিতির চাপে তিনি ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহার পশ্চাতে আদর্শের কোন প্রেরণা ছিল না। ফলে, একবার ব্যাহত হওয়ামাত্র নিজের সংস্কার নাকচ করিতে এবং সর্বপ্রকার সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। পোলদের বিদ্রোহ এবং নিহিলিস্ট্দের আন্দোলন তাঁহার সংস্কার-স্পৃহাকে সহজেই বিনষ্ট করিয়াছিল, কারণ প্রকৃত সংস্কারক তিনি ছিলেন না। সংস্কারের প্রয়োজনের স্বীকৃতি তাঁহার অন্তরে ছিল না বলিয়াই তিনি এইরূপে আকস্মিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসনের পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল

* **নিহিলিজম্ বা নিহিলিস্ট্দের মতবাদ** (Nihilism : ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এক চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। তাহাদের মতবাদ 'নিহিলিজম্' (Nihilism) নামে পরিচিতি লাভ করে। রুশ বিদ্যায়তনগুলিতেই এই মতবাদ প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরে (১৮৬২ খ্রী) তুর্গেনিভ্ তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' (Father and Sons)-এর নায়ক ব্যাজারফের কথার মধ্য দিয়া নিহিলিজমের ব্যাখ্যা করেন। নিহিলিস্ট্দের মতে তদানীন্তন সামাজিক পারিবারিক তথা জাতীয় জীবনের সবকিছুই ছিল অকল্যাণকর এবং সেই হেতু সব কিছুরই ধ্বংস সাধন করা প্রয়োজন ছিল। জার, রাষ্ট্র, চার্চ কোন কিছুরই প্রাধান্য তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। নিহিলিস্ট্গণ কোনপ্রকার প্রাধান্য স্বীকার করিত না বা কোন প্রচলিত প্রথায় বিশ্বাস করিত না। তাহারা ছিল ঘোর বাস্তববাদী, ব্যক্তির বস্তুগত জীবনে কাজে লাগে না এরূপ কোন কিছুর কোন মূল্য আছে, এ-কথা তাহারা স্বীকার করিত না তাহাদের মতে একজন মুচি সেক্সপীয়ার বা গ্যেটে অপেক্ষা সমাজের বহুগুণে বেশী কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। কারণ, এক জোড়া জুতা কবিতা অপেক্ষা অধিক কাজে লাগে।

নিহিলিজম্ প্রচলিত সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় জীবনের ধ্বংস সাধন করিয়া নূতনভাবে এক সর্বজন মঙ্গলকর সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহাই ছিল নিহিলিজম্-এর গঠনমূলক দিক। অবশ্য কিভাবে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবে সেই বিষয়ে সকল নিহিলিস্ট একমত ছিল না। কেহ কেহ প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলেই উহা ঘটিবে মনে করিত। কিন্তু অনেকেই প্রচলিত সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জৈবতত্ত্বের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-জীবন গঠনের পক্ষপাতী ছিল। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিত না। পারিবারিক জীবন, সম্পত্তিভোগ, শাসনব্যবস্থা সবকিছুই সম্পূর্ণ সাম্যবাদের ভিত্তিতে তাহারা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল।

নিহিলিস্ট আন্দোলন পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সেই সকল দেশে বিশেষত ফ্রান্সে নিহিলিজম্ বাকুনিন (Bakunin)-এর বিপ্লবভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদের (Revolutionary Socialism) সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। (Contd.)

তথাপি আলেকজাণ্ডারের সার্ফদের মুক্তিসাধন, রাশিয়ার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সার্ফদের মুক্তিই অবশ্য তাঁহার সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সফল হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) নামের যোগ্য ছিলেন।

'মুক্তিদাতা জার' উপাধির যৌক্তিকতা

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষভাগে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্যারিসের সন্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে অপসরণ করিয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোলগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ফরাসী সম্রাট বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা ছিন্ন করিয়া প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক পোলবিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তী কালে জার্মান ঐক্যসাধন এবং অস্ট্রিয়াকে জার্মানি হইতে বিতাড়ন

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপীয় রাজনীতি হতে রাশিয়ার অপসরণ

নিহিলিজম্ প্রধানত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের ও উগ্র সংস্কারপন্থীদের মধ্যে এই আন্দোলন প্রসারলাভ করিলে শীঘ্রই নিহিলিজম্ সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। রাশিয়ার নিহিলিস্ট্‌দের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নিহিলিস্ট্‌দের প্রচারকার্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শুরু হইলে তাহারা ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতির ছদ্মবেশে জনসাধারণের সহিত মিশিয়া প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। সরকার এই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট দেড়লক্ষ লোককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে নিহিলিস্ট্‌গণ সরকারের গুপ্তচর, পুলিশ এমন কি, জার দ্বিতীয় অলেকজাণ্ডারের প্রাণনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেণ্ট্ পিটার্সবার্গের পুলিশের প্রধান কর্মচারী ও খারকফ্ প্রদেশের গবর্ণর প্রিন্স্ ক্রপটকিন্ নিহিলিস্ট্‌দের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের জীবন-নাশের একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। রুশ সরকার নিহিলিস্ট্ আন্দোলন দমনের জন্য ক্রমেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অবশেষে বাধ্য হইয়া আপস-মীমাংসার চেষ্টায় জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিনের মধ্যেই (১৮৮১) জনৈক আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলে আপস-মীমাংসার পথ বন্ধ হইল এবং নিহিলিস্ট্ আন্দোলনও ক্রমে থামিয়া গেল।

* "A nihilist···is one who does not bow down before any authority, who does not take any principle by faith, whatever reverences that principle may be entwined in." Ketelbey, p. 297.

Also vide : Garner : '*Political Science and Government*' p. 414 fn.

বহু পরিমাণে সহজ হইয়াছিল, কারণ ঐ সময়ে রাশিয়া ছিল জার্মানির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পূর্ব-উপকার বিস্মৃত হইয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়ার ফলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও প্রাশিয়ার মিত্রতা লাভ প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীর ফলে উভয় দেশই উপকৃত হইয়াছিল। প্রাশিয়ার মিত্রতার সাহায্যে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি নাকচ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্যান স্টিফানো (San Stefano) নামক সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সুলতান হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। ফলে, কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তিতে স্যান স্টিফানোর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং রাশিয়াকে তুরস্ক হইতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।*

স্যান স্টিফানো-এর সন্ধি ও বার্লিন চুক্তি

ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও এশিয়া অঞ্চলে তিনি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন: তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, দক্ষিণে তিনি রাশিয়ার রাজ্যসীমা ককেশাস্ পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। চীন দেশের সহিত তিনি এক চুক্তিবদ্ধ হন এবং উহার ফলে ভ্যাডিভস্টক্ বন্দর দখল করিতে সমর্থ হন।

এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার

ভ্যাডিভস্টক্-বন্দর দখল

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৮১-'৯৪ (Czar Alexander III, 1881-'94): ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) নিহত হইলে রাশিয়ায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের শেষদিকে যে-সংস্কারকার্য রুদ্ধ হইয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলতার মাত্রা চরমে উঠিল। পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রথম হইতেই উদার-নীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা শুরু করিলেন। তিনি প্রথম নিকোলাসের আমলের দমন-নীতির পুনঃপ্রবর্তন করিলেন।

চরম প্রতিক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তন

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ভগবানপ্রদত্ত রাজ-ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, জনকল্যাণের জন্য ভগবান স্বৈরাচারী শাসকদিগকে পৃথিবীতে

* বিশদ আলোচনা বার্লিন চুক্তি (চতুর্দশ অধ্যায়ে) দ্রষ্টব্য।

প্রেরণ করিয়াছেন।* ফলে, রাশিয়ার জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের কঠোরতা অনুভূত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ্ (Pobedonostev) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবিত তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারার এক প্রচণ্ড শত্রুতে পরিণত হইলেন। পোবিডোনোস্টেভ্ গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং পীড়াদায়ক শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্বভাবতই তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু রহিল না। নানা অজুহাতে সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রথম নিকোলাসের আমলের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় স্থাপন করা হইল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির উপরও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। জেম্স্ট্ভো নামক স্থানীয় প্রতিনিধি-সভাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করা হইল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের সুফলগুলির এইভাবে নাশ করিয়া তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এক ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করিলেন।

পোবিডোনোস্টেভ্-এর প্রভাব

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

বিচারালয় ও শিক্ষায়তন নিয়ন্ত্রণ

গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancipation) দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার তাহাদিগকে জমিদার-শ্রেণীর অধীনে পুনরায় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তাহাদের উপর জমিদারশ্রেণীকে পুলিশের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। শ্রমিকের পক্ষে চুক্তিভঙ্গ করা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। Justices of Peace পূর্বে নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল পদ জমিদারশ্রেণী হইতে মনোনীত 'ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন' (Land Captains) নামে একশ্রেণীর কর্মচারীকে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন এবং বিচার-কার্যের পৃথকীকরণ নীতি ত্যাগ করিয়া এই উভয় প্রকার কাজই একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন। বিচারের নামে অবিচার চালাইবার আর কোন অসুবিধা রহিল না।

স্বাধীন কৃষক শ্রেণীকে জমিদারের অধীনে স্থাপন

ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন নিয়োগ

'জেম্স্ট্ভো' নামক স্থানীয় প্রতিনিধি-সভাগুলি সামাজিক এবং জনকল্যাণকর

* "The Voice of God orders us to stand firm at the helm of govt...with faith in the autocratic power, which we are called to strengthen and preserve, for the good of the people from every kind of encroachment." Vide, Lipson, p. 107.

কার্যের দ্বারা রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল প্রতিনিধি-সভার কার্যাদি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং নিজ মনোনীত ব্যক্তিগণ যাহাতে এই সকল সভায় স্থান পায় সেই ব্যবস্থা করিলেন।

জেমস্টভো-এর স্বাধীনতা হ্রাস

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচার চলিতে লাগিল। জনসাধারণের সহিত সরকারের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিরপেক্ষ বিচার প্রভৃতি সভ্য সমাজের শাসনব্যবস্থার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রাশিয়া হইতে অপসৃত হইল।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার, আইনের চক্ষে সমতা বিলুপ্ত

একদিকে অবশ্য রাশিয়ার জাতীয় জীবনে ঐ সময়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল পর্যন্ত রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্প বলিতে তখন প্রধানত কুটির-শিল্পকেই বুঝাইত। কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্পোন্নতিতে যে উৎসাহদান শুরু হইয়াছিল, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলেও তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কতকগুলি আধুনিক ধরনের শিল্প তাঁহার আমলে রাশিয়ায় গড়িয়া উঠে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সার্জিয়াস-ডি-উইটি (Surgius de Witte) বাণিজ্য ও অর্থ-সচিব নিযুক্ত হইলে রাশিয়ায় এক শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। রাশিয়ার বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাইয়া রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে তৈয়ারী সামগ্রীতে পরিণত করিতে পারিলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যেমন হ্রাস পাইবে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও তেমনি উন্নত হইবে। ইহা ভিন্ন, তাহাদের করদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া উইটি এক ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। বিদেশী শিল্পপতিগণকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে রাশিয়ায় নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ফলে, প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন রাশিয়ায় শিল্প-গঠনে নিয়োজিত হইল। বিদেশী মূলধনের অধিকাংশই আসিল ফ্রান্স হইতে। এই সূত্রে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক দ্বি-পাক্ষিক মিত্রতা চুক্তি (Dual Alliance) সম্পাদনে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহন-ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা হইল। প্রতি বৎসর প্রায় ১৪০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হইতে লাগিল।

রাশিয়ার শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ উদারনৈতিক বিপ্লবের বীজ সহজেই ছড়ান সম্ভব হইল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে রুশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূত্রপাতের কথা বিবেচনা করিলে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালকে রাশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না।

ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী ভাবধারা, ধর্ম, ভাষা এবং কৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিল। রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির লোকদিগকে তিনি রুশভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র রাশিয়ায় এক শাসন, এক ধর্ম, এক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করা। এই কারণে ইহুদি, পোল, ফিন্ প্রভৃতি জাতির লোকের উপর রুশ বৈশিষ্ট্য (Russification) চাপাইবার সর্বপ্রকার চেষ্টা শুরু হইল। ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। স্থানে স্থানে ইহুদিদের সহিত মারামারি চলিল। ইহুদিদের উপর সরকারী সহায়তায় আক্রমণ চালান হইল। এই সকল আক্রমণ 'প্রোগ্রাম' (Progrom) নামে পরিচিত ছিল। বহুসংখ্যক ইহুদি ঐ সময়ে প্রাণ হারাইল এবং অনেক ইহুদি রাশিয়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-রাশিয়ায় প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মাবলম্বীদের উপরও অনুরূপ অত্যাচার শুরু হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপনের নীতির ফলে দেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এই নীতির কুফল নানাভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের 'Russification' নীতি

ব্যাপক অসন্তোষ

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস জারপদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাশিয়া দ্রুত বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মৃত্যু (১৮৯৪)

জার দ্বিতীয় নিকোলাস, ১৮৯৪-১৯১৭ (Czar Nicholas II, 1894-1917) : দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন আরোহণের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিল না। রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজ আশা করিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় নিকোলাসের জারপদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন শুরু হইবে। আইন-প্রণয়ন এবং শাসন-ব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিগণও অংশ গ্রহণ করুন, ইহাই ছিল রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজের ইচ্ছা। কিন্তু নিকোলাস জনসাধারণের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের আশা 'অলীক কল্পনা মাত্র' বলিয়া অভিহিত করিলে দেশের সর্বত্র বিশেষত শিক্ষিত সমাজে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয় নিকোলাস অবশ্য স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন এই ঘোষণা করিলেন।*

দ্বিতীয় নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি

* "He created intense disappointment, among the educated classes by characterising as 'senseless dreams' the ardent desire of the nations to be admitted to a share in legislation." Lipson, p. 111.

"Devoting all my efforts to the prosperity of the nations, I will preserve the principles of Autocracy as firmly and unswervingly as my late father." Nicholas II, Vide, Lipson, pp. 111-12.

কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তাঁহার রাজত্বকালেই রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় নিকোলাস স্বৈরাচারী শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসন-পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না। তিনি তাঁহার রাণীর প্রভাবাধীন ছিলেন। রাণী স্বয়ং ছিলেন রাস্‌পুটিন (Rasputin) নামে একজন নীচপ্রকৃতির সাধুর প্রভাবাধীন। রাস্‌পুটিনের ইঙ্গিতেই রাণী চলিতেন, স্বভাবতই নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সহিত রাণী ও রাস্‌পুটিনের খেয়ালখুশির সংমিশ্রণে রাশিয়ার এক ভয়াবহ কঠোর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ্ (Pobedonostev) এবং প্লেহ্‌বি (Plehve) নামক দুইজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী শাসনের নামে অত্যাচার চালাইলেন।

তাঁহার অকর্মণ্যতা : রাণী ও রাস্‌পুটিন, পোবিডোনোস্টেভ্ ও প্লেহ্‌বির প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ

ইহুদিদের উপর 'প্রোগ্রাম' (Progrom), অর্থাৎ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চলিতে লাগিল।

পুলিশের অত্যাচার, উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সন্দেহে শিক্ষিত সমাজের উপর অকথ্য অত্যাচার, রাশিয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন জাতির লোকদের উপর রুশভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বলপূর্বক চাপান প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে অনুসৃত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন হইতে উদারনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে পদচ্যুত করা এবং তাহাদিগকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা, গুপ্তচরগণের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা এবং শাস্তিদান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চলিল। এমতাবস্থায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ভিনোগ্রাডোফ (Professor Vinogradoff) ইংলণ্ডে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন : "তল্লাসী গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন দণ্ড হইতে কেহই রেহাই পাইবেন এমন অবস্থা নাই। ব্যক্তিগত জীবনও সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। রাশিয়াতে আমরা এইরূপ আইন-কানুনের অধীনে আছি।" * অধ্যাপক মিলিউকভ্ (Professor Miliukov) একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার মতামত নিকোলাস সরকারের মনঃপূত ছিল না বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। সরকারী ইচ্ছানুযায়ী যে-সকল সংবাদপত্র পরিচালিত হইতে রাজী হইল না সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করা হইল। গ্রীণ-এর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (Green's *History of England*)

প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র প্রভৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ

---

* "Nobody is secure against search, arrest, imprisonment and relegation to the remotest part of the Empire. From political supervision the solicitude of the authorities has spread into interference with all kinds of private affairs. Such is the legal protection we are now enjoying in Russia." Prof. Vinogradoff, vide, Hazen, p. 606.

এবং ব্রাইস-এর 'আমেরিকান কমনওয়েলথ' (Bryce's *American Commonwealth*) পাঠ করা নিষিদ্ধ হইল। ছাত্রসমাজের পশ্চাতে বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাত্র সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইল অথবা দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে ফিনল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়া আসিতেছিল। রাশিয়ার জার-এর অধীনতা স্বীকার করিয়া ফিনগণ নিজ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিতেছিল এবং ফিনল্যাণ্ডের নিজস্ব সেনাবাহিনী, মুদ্রানীতি ও ডাকবিভাগ ছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতেই ফিনল্যাণ্ডের এই স্বাতন্ত্র্য-নাশের চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক ঘোষণা দ্বারা ফিনল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। পূর্বে ফিনল্যাণ্ড সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন ফিনদের ডায়েট (Diet)-এ পাস করা হইত। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস কেবলমাত্র স্থানীয় বিষয়-সংক্রান্ত আইন-কানুন পাস করা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষমতা ডায়েট্-এর হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ফলে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনাধীনে স্থাপিত হইল। ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী রুশ সেনাবাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হইল। পূর্বে যে-সকল সরকারী পদে কেবলমাত্র ফিনগণই নিযুক্ত হইত সে-সকল পদে এখন রুশগণকে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। এই-ভাবে ফিনগণের জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নাশ করিবার চেষ্টা চলিল।

ফিনল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার বিলুপ্ত

একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতে শুরু হইয়াছিল তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কাউন্ট সার্জিয়াস্-ডি-উইটির চেষ্টায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতেছিল। শিল্পোন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রমিকগণ ক্রমেই নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। দলবদ্ধভাবে যুঝিয়া মালিক শ্রেণীর নিকট সুযোগ-সুবিধা আদায় করা অনেক সহজ, এই কথা তাহারা উপলব্ধি করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন শিল্পপতিগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইতে লাগিল। জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে ক্রমে রাজনৈতিক প্রাধান্য শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর হস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্য হইতে কতকগুলি নূতন রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হইল। এই সকল দলের মধ্যে 'সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদী' (Social Democratic) দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে

অর্থনৈতিক উন্নতি

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা

সামাজিক বিপ্লব সাধন করা। স্বৈরাচারী শাসনের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল ধর্মঘট দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল ধর্মঘটের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করাই উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে, এগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টাও চলিতেছিল। এই ধর্মঘট যাহাতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত থাকে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইতে না পারে সেজন্য সরকার গুপ্তচরদের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে গোপনে প্রচারকার্য শুরু করাইলেন। প্রয়োজনবোধে গোপনে অর্থ সাহায্য দান করিয়া শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু এই চেষ্টার ফল হইল বিপরীত। আর্থিক সাহায্যপুষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবেই ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

সরকার কর্তৃক ইউনিয়নগুলিকে রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা

১৯০৪-'০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপানের নিকট বিশাল দেশ রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার দরুনই এই শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। জাপানের সহিত যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন মন্ত্রী প্লেহ্‌বি (Plehve) আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান। এই সূত্রে রুশ-সরকার প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে বিনা-বিচারে নির্বাসিত বা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী মন্ত্রী প্রিন্স্ মির্স্কি (Prince Mirsky) ছিলেন উদারচেতা ব্যক্তি। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের অভিযোগ এবং দাবি সরকারের নিকট পেশ করিতে আদেশ দিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশের জেম্স্টভোগুলি যুক্তভাবে ১১ দফা দাবি উত্থাপন করিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগদখলের স্বাধীনতা, স্বমত প্রকাশের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি-সভা গঠন এবং শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য সংবিধান-সভা স্থাপন ছিল তাহাদের প্রধান দাবিগুলির অন্যতম।

রুশ-জাপানী যুদ্ধ (১৯০৪-'০৫)

প্রিন্স্ মির্স্কির উদারতা

১১ দফা সংস্কার দাবি

সংস্কার দাবি লইয়া দেশের সর্বত্র এক দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হইলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হইল। এই সূত্রে ২২শে জানুয়ারি ফাদার গ্যাপন (Father Gapon) নামে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভাযাত্রা জার নিকোলাসের নিকট তাহাদের দাবি পেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহাদের উপর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করিলে বহুসংখ্যক শ্রমিক হতাহত হইল। এই দিনের রক্তস্নানে রাশিয়ার বিপ্লবী

আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ২২শে জানুয়ারি, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে "রক্তরঞ্জিত রবিবার" (Red Sunday) নামে পরিচিত। এই দিনের ঘটনার ফলে রাশিয়ার সর্বত্র বিপ্লবাত্মক কার্যাদি শুরু হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদার শ্রেণীর সম্পত্তি, ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করিল। শহর অঞ্চলে পুলিশ কর্মচারী, গুপ্তচর প্রভৃতিকে হত্যা করা হইতে লাগিল। জার নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াপন্থী খুল্লতাত ডিউক সার্জিয়াসকেও (Duke Sergius) হত্যা করা হইল। এইভাবে জারতন্ত্রের ভিত্তি অবধি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলে নিকোলাস জাতীয় সভা আহ্বানের দাবি মানিয়া লইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নিকোলাস জাতীয় সভা (National Assembly or Duma) আহ্বান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দুই মাস পরে তিনি 'বুলিঘিন শাসনতন্ত্র' (Bulyghin Constitution) নামে একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সভার পরিবর্তে একটি 'ইম্পিরিয়াল ডুমা' (Imperial Duma) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সভাকে কেবলমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইম্পিরিয়াল ডুমার নির্বাচনে গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-শ্রমিকগণ এবং সম্পত্তিহীন গ্রামবাসীকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল না। দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপনের নীতিও গ্রহণ করা হইল না। স্বভাবতই এই শাসনতন্ত্র কাহারও সন্তুষ্টি বিধান না করায় সমগ্র রাশিয়ায় এক ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হইল। রাশিয়ার সমাজ-জীবন একেবারে অচল হইয়া পড়িলে ৩০শে অক্টোবর (১৯০৫ খ্রীঃ) একটি ঘোষণা (October Manifesto) দ্বারা নিকোলাস ডুমাকে আইন-প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করিলেন। এইভাবে রুশবাসীর নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইল এবং আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ হিসাবে ভোটদানের ক্ষমতার প্রসারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। শ্রমিকগণও ভোটাধিকার লাভ করিল। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯০৫ খ্রীঃ) এক সরকারী আদেশ দ্বারা এই সকল সংস্কার কার্যকরী করা হইল।

'রক্তরঞ্জিত রবিবার' (২২শে জানুয়ারি, ১৯০৫)

বুলিঘিন শাসনতন্ত্র

অক্টোবর ঘোষণা (৩০শে অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে জাতীয় সভা 'ডুমার' প্রথম অধিবেশন শুরু হইল। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কয়েকটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন। উদার-নীতিতে বিশ্বাসী দল 'কনস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্র্যাট' (Constitutional Democrats) নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণ্যে তাঁহারা 'ক্যাডেট' (Cadets) নামে অভিহিত হইতেন। রক্ষণশীল দল (Conservatives) নিকোলাস-প্রদত্ত অক্টোবর ঘোষণার উপর আস্থাবান ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা অক্টোবরিস্ট্ (Octoborists) নামেও অভিহিত হইতেন। শ্রমিক দল

প্রথম ডুমা (মে ১০ হইতে জুলাই ২১, ১৯০৬)

হইতে মোট ১০৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, স্বায়ত্ত-শাসনে বিশ্বাসী দল (Autonomists) নামে পোল ও অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধিবর্গও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। "ক্যাডেট"গণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নিকোলাস কয়েকটি ঘোষণা জারি করিয়া ডুমার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার এবং সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, দেশের মৌলিক আইন-কানুন পরিবর্তনের অধিকারও নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে দুই মাস ধরিয়া জার এবং ডুমার মধ্যে বিবাদ চলিল। অবশেষে ২১শে জুলাই নিকোলাস (১৯০৬ খ্রীঃ) ডুমা ভাঙ্গিয়া দিলেন।

ডুমার ক্ষমতা হ্রাস

নূতন নির্বাচনের সময়ে সরকারী পক্ষ হইতে অক্টোবরিস্ট্ বা রক্ষণশীল দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রতিনিধিগণকে সাহায্য দান করা হইল। উদারনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া অথবা অন্যান্য অবৈধ কৌশলে নির্বাচন হইতে দূরে রাখা হইল অথবা নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নির্বাচনে তাঁহাদিগকে পরাজিত করা হইল। ক্যাডেট দল মাত্র ৫০ হইতে ৬০টি আসন পাইল। দ্বিতীয় ডুমারও বেশীদিন অধিবেশনে থাকা সম্ভব হইল না। নিকোলাস তাঁহার প্রতি ক্যাডেট দলের আনুগত্যহীনতার অজুহাতে ক্যাডেট প্রতিনিধিগণকে ডুমা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিলে শেষ পর্যন্ত ডুমা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল।

দ্বিতীয় ডুমা (মার্চ ৫ হই ৩ জুন ১৬, ১৯০৭)

তৃতীয় ডুমা অবশ্য ১৯০৭ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিবেশনে রহিল। এই ডুমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কৃষকদিগকে তাহাদের চাষের অধীন জমির মালিকানা দান। পূর্বে গ্রামের সকল জমি কৃষকদিগকে সমষ্টিগতভাবে ভোগ-দখল করিতে হইত, এখন এ-বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করিল।

তৃতীয় ডুমা (১৯০৭-১৯১২)

চতুর্থ ডুমা নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্য সংখ্যা হইল সর্বাধিক (১৫৫ জন)। ক্যাডেট প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫২; অক্টোবরিস্ট্‌গণ অবশ্য এই সময় হইতে ক্যাডেটদের সহিত মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করিতে শুরু করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই, এই কারণে তাহারা সরকারের পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে ক্রমেই শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত বিবাদ বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রোগ্রেসিভ্ ব্লক' (Progressive Bloc) নামে এক নূতন দলের সৃষ্টি হইলে সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। জার নিকোলাসের অদূরদর্শিতার ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল। (রুশ বিপ্লবের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।)

চতুর্থ ডুমা (১৯১২-১৭)

রুশ বিপ্লব (১৯১৭)

অধ্যায় ১৪

নিকট-প্রাচ্যের বা পূর্বাঞ্চলের সমস্যা : বার্লিন কংগ্রেস
(Near-Eastern or Eastern Question : Congress of Berlin)

নিকট-প্রাচ্য বা পূর্বাঞ্চলের সমস্যা (The Eastern Question) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অব্যবহিত পরে পূর্বাঞ্চল অথবা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা সাময়িকভাবে জটিলতামুক্ত ছিল বটে, কিন্তু উহার কোন স্থায়ী সমাধান তখনও সম্ভব হয় নাই। জনৈক রুশ রাজনীতিক পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে গেঁটেবাতের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গেঁটেবাতের ন্যায়ই ইহা কখন কোথায় কিভাবে দেখা দিবে তাহা বলা কঠিন।*

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা 'গেঁটেবাতের' সহিত তুলনীয়

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ; স্লাভ্, গ্রীক প্রভৃতি জাতির স্বার্থবৃদ্ধি তাহাতে হয় নাই। তদুপরি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিবর্গের ও পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয় নাই। রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শুধু অপমানিত হইয়াছিল এমন নহে, কৃষ্ণসাগরে রুশ-প্রাধান্যনাশের ফলে রাশিয়ার ভীতিরও সঞ্চার হইয়াছিল। ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল চালু হইলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম প্রধান নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স তুরস্ককে সাহায্য করিতেছিল। ফরাসী মূলধন যাহা তুরস্ক সাম্রাজ্যে খাটান হইয়াছিল উহার নিরাপত্তার জন্যও তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল ফরাসী সরকারের স্বার্থ। অস্ট্রিয়ার পক্ষে দানিউব অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য বিস্তার কাম্য ছিল না, কারণ, দানিউব ছিল অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের যোগসূত্রস্বরূপে। এমতাবস্থায় ইওরোপীয় শক্তিগুলি পূর্বাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখিবারই পক্ষপাতী ছিল। পূর্বাঞ্চলের সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না হইলেও অন্তত সাময়িকভাবেও শান্তি বজায় থাকুক ইহাই ছিল বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের ইচ্ছা। একমাত্র জার্মানির সেই অঞ্চলে কোন সরাসরি স্বার্থ ছিল না বলিয়া জার্মানি পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান কামনা করিত, কারণ পূর্বাঞ্চলের সমস্যা লইয়া কোনপ্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া জার্মানির স্বার্থের প্রতিকূল ছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও পূর্বাঞ্চলের সমস্যা

ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ও পূর্বাঞ্চলের সমস্যা

* "This damned Eastern Question is like the gout. Sometimes it takes you in the leg, sometimes it nips your hand." – Vide, Ketelbey, p. 301.

কিন্তু সেই সময় পূর্বাঞ্চলের সমস্যা দেখা দিল বলকান অঞ্চলের স্লাভ্ জাতির লোকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা হইতে।*

তুরস্ক সুলতান কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সুযোগ ত্যাগ

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) তুরস্ক সুলতানকে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিয়া অথবা উদারনৈতিক সংস্কার দ্বারা সাম্রাজ্যাধীন প্রজাবর্গের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সুযোগ দান করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক সুলতান এই দুইয়ের কোন পন্থা-ই অনুসরণ করেন নাই। স্বভাবতই স্বাধীনতাকামী বলকান জাতির রাজনৈতিক চেতনা এবং তুরস্ক সুলতানের প্যারিস সন্ধির শর্তানুযায়ী সংস্কার সাধনে নিষ্ক্রিয়তার ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব ঘটিল।

বলকান রাজ্যগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রীস্ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবগঠিত স্বাধীন গ্রীসের রাজ্যসীমা গ্রীকগণের সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারে নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রীক-প্রধান স্থানগুলিও গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তাহারা সচেষ্ট ছিল। ইহা ভিন্ন, সার্বিয়া এবং দানিউব নদীর উত্তর তীরস্থ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নামক দুইটি প্রদেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই সকল স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা দিল।

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ায় পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব (Reappearance of the Eastern Question in Moldavia & Wallachia): দানিউব প্রদেশস্থ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার অধিবাসিগণ একই জাতির লোক ছিল বলিয়া তাহারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আশা পোষণ করিত। উভয় স্থানের অধিবাসিগণ নিজেদের 'রুমানিয়ান' (Roumanians) বলিয়া পরিচয় দিত এবং তাহাদের ভাষা, ঐতিহ্য সব কিছুই তাহাদের

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্পৃহা

ঐক্যভাব বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সুলতান প্যারিসের সন্ধি দ্বারা মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুইটি প্রদেশকে স্বাধীন জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের, ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা, আইন-প্রণয়ন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতাদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই সকল প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই তাহাদের

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি

স্বাধীনতা এবং ঐক্য-স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া একত্রিতভাবে রুমানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করুক, ইহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল, কারণ এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী-রাজ্য (Buffer state)

রুমানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থ

হিসাবে গড়িয়া উঠিলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহা ভিন্ন, তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বভাবতই ছিলেন জাতীয়তাবাদের সমর্থক। নিজ দেশে না হইলেও অপরাপর দেশে উদারনৈতিক আন্দোলন সাফল্যলাভ করুক, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং এজন্য তিনি সাহায্যদানেও

* Vide, Taylor, pp. 228-29.

কুণ্ঠিত ছিলেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকেও 'রুমানিয়া' নামক রাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়া এবং তুরস্কের আপত্তিতে রুমানিয়া রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্যারিস নগরীতে এক বৈঠকে সম্মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া পৃথক প্রদেশ হিসাবেই থাকিবে, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ শাসনকর্তা নির্বাচন করিবে। উভয় দেশেই একটি করিয়া পার্লামেন্ট স্থাপিত হইবে এবং উভয় দেশের পরস্পর-সম্পর্কিত বিষয়গুলি একটি যুগ্ম-সভার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের বিরোধিতা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস বৈঠকের সিদ্ধান্ত

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার অধিবাসীদের নিকট ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইতালীয় ঐক্যের দৃষ্টান্ত তাহাদের মনে অনুরূপ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হইল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় প্রদেশই আলেকজান্ডার কৌজা (Alexander Couza) নামে এক অভিজাত ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নির্বাচন করিল। এ-বিষয় লইয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে, বিশেষত অস্ট্রিয়ায় কতকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলেও ইতালির সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ তখন চলিতেছিল বলিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার একই শাসকের অধীনে স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইল না। ইহার কিছুকাল পরে (১৮৬২) উভয় প্রদেশ একই পার্লামেন্টের অধীনে আসিল। সংযুক্ত প্রদেশদ্বয়ের রাজধানী হইল বুকারেস্ট্ এবং ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের নাম হইল রুমানিয়া। রুমানিয়া অবশ্য তখনও তুরস্ক সুলতানকে বাৎসরিক কর দিতেছিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই বাৎসরিক কর দেওয়াও বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া কর্তৃক একই শাসক নির্বাচন

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার সংযুক্তি : রুমানিয়া রাজ্যের উৎপত্তি

আলেকজান্ডার কৌজা প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি রুমানিয়ার কৃষক-সমাজকে জমিদারশ্রেণীর দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করেন। শিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বুকারেস্ট্ ও জ্যাসির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্কার-নীতি রুমানিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। অপর দিকে কৃষকগণও অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশা পোষণ করিত বলিয়া আলেকজান্ডার তাহাদের যে-পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। এইভাবে বিভিন্ন দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইলে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হয়।

আলেকজান্ডার কৌজা (১৮৫৯-৬৬)

পরবর্তী শাসক ছিলেন হোহেন্‌জোলার্ণ বংশের প্রিন্স্ ক্যারোল। তিনি রুমানিয়াকে মধ্যযুগীয় অনগ্রসর রাষ্ট্র হইতে অগ্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুমানিয়াকে একটি রাজ্যে পরিণত করেন এবং 'প্রিন্স্' উপাধির পরিবর্তে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ

প্রিন্স্ ক্যারোল (১৮৬৬-১৯১৪)

করেন। তাঁহার উদারতার ফলে রুমানিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি রেলপথ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি দ্বারা রুমানিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি প্রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিলেন। ক্যারোল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর তিনি রাজপদ ত্যাগ করেন।

রুমানিয়া রাজ্যের উৎপত্তির পর সাময়িকভাবে নিকট-প্রাচ্য বা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন প্রকাশ পরিলক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু ঐ সময়ে তুরস্ক সরকার নিজ প্রজাবর্গের উপর যে-অত্যাচার চালাইয়াছিলেন, তাহাতে বলকান দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছিল। তুরস্ক সরকারের ধর্মান্ধ-নীতি বলকান অঞ্চলের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে ক্রমেই বিদ্রোহের প্রস্তুতির সহায়তা করিতেছিল। স্লাভ জাতি-অধ্যুষিত বলকান দেশগুলির প্রতি স্লাভ্ রাশিয়ার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বলকান দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য সার্বিয়া, বোস্নিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু গোপন সমিতি স্থাপিত হইল।

তুরস্ক সরকারের ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতি: বলকান দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন

বোস্নিয়া ও হারৎজেগোভিনা নামক স্থানে পূর্বাঞ্চল সমস্যার পুনরাবৃত্তি (Reappearance of the Eastern Question in Bosnia & Herzegovina): ১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোস্নিয়া ও হারৎজেগোভিনা নামক স্থানে এক ব্যাপক স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হইলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা পুনরায় দেখা দিল। এই দুই স্থানের আন্দোলনের পশ্চাতে তিনটি কারণ ছিল: (১) জাতীয়তাবোধ, (২) সামাজিক ও (৩) অর্থনৈতিক। অপরাপর বলকান দেশগুলির ন্যায় এই দুই স্থানেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, উভয় স্থানেরই সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কৃষকগণ একদিকে তুর্কী রাজকর্মচারীদের শোষণে দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছিয়াছিল, অপর দিকে জমিদারশ্রেণীর অন্যায় অত্যাচারে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্পত্তি রক্ষার লোভে অধিকাংশ জমিদারই ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া তুর্কী রাজকর্মচারী অপেক্ষাও অধিকতর নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করিতে শুরু করিয়াছিল। ফলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হারৎজেগোভিনার কৃষকসম্প্রদায় কোনপ্রকার করদান অথবা বিনা-পারিশ্রমিকে শ্রমদান বন্ধ করিল। তুরস্ক সুলতান অত্যাচার দ্বারা এই আন্দোলন দমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু অপরাপর বলকান দেশগুলির সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে আন্দোলনকারিগণ তুর্কী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল। ক্রমে বোস্নিয়াও আন্দোলনে যোগদান করিল। ইহার অব্যবহিত পরে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ক্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন দাবাগ্নির মত বলকান দেশগুলির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বুলগেরিয়াবাসীরাও আন্দোলনে যোগদান করিলে বিপ্লব ক্রমেই তুরস্কের নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া তুরস্কের সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিল এবং বহু সহস্র নরনারী ও শিশুকে হত্যা করিল।

বোস্নিয়া ও হারৎজেগোভিনায় স্বাধীনতা আন্দোলন

জাতীয়তাবোধ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হারৎজেগোভিনায় আন্দোলন শুরু: বোস্নিয়ায় আন্দোলনে যোগদান

বুলগেরিয়ার আন্দোলনে যোগদান: তুরস্ক সরকার কর্তৃক বুলগেরিয়ায় হত্যাকাণ্ড

বুলগেরিয়ার ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে ইওরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলিতে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে গ্ল্যাডস্টোন তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডিজ্রেলী ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তুরস্কের বিরোধিতা করিয়া তিনি তুরস্কের দুর্বলতা-বৃদ্ধি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিল রাশিয়া। অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যেও বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু রাশিয়া এ-বিষয়ে নিরপেক্ষ রহিল না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল রাশিয়া তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ইওরোপীয় দেশগুলির নিষ্ক্রিয়তা : তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল (জানুয়ারি, ১৮৭৭)। এই চুক্তির শর্তানুসারে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল। বিনিময়ে অস্ট্রিয়া বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনার উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিকার পাইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই যুদ্ধে রাশিয়া রুমানিয়ার সাহায্যলাভেও সমর্থ হইয়াছিল।

রাশিয়া-অস্ট্রিয়া মৈত্রী

রাশিয়া কর্তৃক রুমানিয়ার সাহায্যলাভ

ককেশাস্ ও দানিউব অঞ্চলে রাশিয়া তুর্কী সৈন্যকে সমভাবে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইলে তুরস্ক সুলতান এক বৎসরের মধ্যেই (১৮৭৮) স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইতে বাধ্য হইলেন।

তুরস্কের পরাজয়

স্যান স্টিফানোর সন্ধি, ১৮৭৮, মার্চ (The Treaty of San Stefano, March, 1878) : স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা তুরস্ক (১) রুমানিয়া, মণ্টিনিগ্রো এবং সার্বিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। (২) বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম আধিপত্যাধীনে স্থাপিত হইল। এই দুই স্থানে অনতিবিলম্বে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা হইবে স্থির হইল। (৩) দানিউব নদীর তীরস্থ তুর্কী দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং আর্মেনিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিতে হইবে—ইহা স্বীকৃত হইল। (৪) রাশিয়া বাটুম (Batum), কারস্ (Kars), বেসারাবিয়া (Bessarabia) ও দব্রুদ্জা (Dobrudja) লাভ করিল। (৫) স্যান স্টিফানোর সন্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল এক বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্যের গঠন। দানিউব নদী হইতে ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ম্যাসিডনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া এই নূতন বুলগেরিয়া রাজ্য

স্যান স্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি

গঠিত হইল। এই রাজ্য তুরস্কের করদ-রাজ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে ইহার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকিবে, স্থির হইল।

প্যারিসের সন্ধি নাকচ : বলকান দেশসমূহে রুশ প্রাধান্য

স্যান স্টিফানোর সন্ধি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির রুশ-বিরোধী শর্তগুলি নাকচ করিয়া বলকান দেশসমূহের উপর রাশিয়াকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছিল। ফলে, কাস্পিয়ান সাগরের ন্যায় কৃষ্ণসাগরও একটি রুশ-হ্রদে পরিণত হইয়াছিল।

বার্লিন কংগ্রেস, ১৮৭৮ (Congress of Berlin, 1878) : প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিস্তার-নীতি প্রতিহত করা হইয়াছিল। ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য-সংরক্ষণের নীতি প্যারিস সন্ধিতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। বলকান অঞ্চলে কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার একক প্রাধান্য স্থাপনের স্পৃহা ঐ সন্ধি-দ্বারা রোধ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়া তুরস্ক সুলতানকে স্যান স্টিফানোর সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করিয়া প্যারিসের সন্ধিতে রাশিয়ার পরাভবের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছিল। রাশিয়া কর্তৃক এককভাবে প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি এইভাবে নাকচ করায় পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলিতে এবং ইংলণ্ডে দারুণ প্রতিবাদ শুরু হইল। একমাত্র রাশিয়া ও বুলগেরিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশ—এমন কি, বলকান দেশগুলিও স্যান স্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিল না।

ইওরোপে স্যান স্টিফানোর সন্ধির বিরোধিতা

ম্যাসিডনিয়া পর্যন্ত রুশ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় গ্রীস অসন্তুষ্ট হইল, বেসারাবিয়া রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় এবং বিনিময়ে নিকৃষ্টতর স্থান দব্রুদ্জা প্রাপ্তিতে রুমানিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। পশ্চিম-ইওরোপীয় শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়া, জার্মানি প্রভৃতি রাশিয়া কর্তৃক প্যারিসের সন্ধির এইরূপ পরিবর্তনে এবং রুশ-প্রাধান্য বিস্তারে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রগতিতে ইংলণ্ড ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। ফলে, স্যান স্টিফানোর সন্ধি আন্তর্জাতিক বৈঠকে উপস্থাপিত করিবার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া হইল। ইংলণ্ড এ-বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করিবার স্বার্থপর মনোবৃত্তি লইয়া অস্ট্রিয়াও ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল।

গ্রীস, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অসন্তুষ্টি

রাশিয়া প্রথমে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দাবি উপেক্ষা করিয়া চলিল। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর দৃঢ়তায় এবং এ-বিষয় লইয়া তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া রাশিয়া অবশেষে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান স্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন, রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার বিবাদ শুরু হইলে বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ইহাও রাশিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল।

ডিজ্‌রেলীর দৃঢ়তায় স্যান স্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি আন্তর্জাতিক বৈঠকে উপস্থাপনে রাশিয়ার স্বীকৃতি

বার্লিন চুক্তির শর্তাদি (Terms of the Berlin Treaty) : ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বার্লিনে বিস্মার্কের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান স্টিফানোর সন্ধির পরিবর্তন করিয়া 'বার্লিন চুক্তি' নামে নূতন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (জুলাই ১৩, ১৮৭৮)। রাশিয়া বার্লিন চুক্তি গ্রহণে বাধ্য হইল। বার্লিন চুক্তির শর্তানুসারে (১) বেসারাবিয়া, কারস্, বাটুম এবং আর্মেনিয়ার একাংশের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল। (২) সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা তুরস্ক সুলতান স্বীকার করিয়া লইলেন। রাশিয়াকে বেসারাবিয়া দানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রুমানিয়াকে দব্রুদ্জা দেওয়া হইল। (৩) বোস্নিয়া ও

বার্লিন চুক্তির শর্তাদি

হার্জেগোভিনার শাসনভার অস্ট্রিয়ার উপর স্থাপন করা হইল। অস্ট্রিয়াকে এই দুই দেশের মধ্যবর্তী নবিবাজার (Novibazar)-এ সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার দেওয়া হইল। (৪) স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা যে-বিশাল বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল উহাকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়া নামে দুইটি রাজ্য গঠন করা হইল। বুলগেরিয়া নামেমাত্র তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত রহিল। বুলগেরিয়াবাসী নিজেদের শাসনকর্তা নির্বাচন করিবে এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা লাভ করিবে স্থির হইল। পূর্ব-রুমেলিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবেই রহিল বটে, কিন্তু তুরস্ক সুলতান খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভিন্ন অপর কাহাকেও রুমেলিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন না এবং রুমেলিয়া-বাসীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিবেন স্থির হইল। (৫) অপর একটি চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের শর্তে তুরস্ক সুলতানের নিকট হইতে সাইপ্রাস্ দখল করিল। (৬) বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত শক্তিবর্গ গ্রীসকে থেসালি (Thessaly) নামক গ্রীক-অধ্যুষিত স্থানটি দিবার জন্য সুপারিশ করিলেন। ইহা অবশ্য বার্লিন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সমালোচনা (Criticism) : বার্লিন চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য

বার্লিন চুক্তির সাফল্য সম্পর্কে ডিজ্রেলীর উক্তি

স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা হৃত স্থানগুলির মধ্যে মোট ত্রিশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান এবং প্রায় পঁচিশ লক্ষ প্রজা ফিরিয়া পাইল। বার্লিন চুক্তির সাফল্য সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজ্রেলী সগর্বে ঘোষণা করিয়া-ছিলেন : "There is again a Turkey in Europe"। তিনি বার্লিন কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া "আমরা সসম্মানে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি" —এইরূপ উক্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু

দোষ-ত্রুটি : (১) পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা

নিরপেক্ষ বিচারে বার্লিন চুক্তির গুণ অপেক্ষা দোষ-ত্রুটিই যে অধিক ছিল, তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে রাশিয়ার কূটনৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু অস্ট্রিয়া, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পক্ষেও উহা সাফল্যের পরিচায়ক

বলকান রাজ্যসমূহ
রা শি য়া
বেসারাবিয়া
হা ঙ্গে রী
দব্রুদজ
ও য়া লা চি য়া
রু
বো স নি য়া
সা র্বি য়া
বু ল গে রি য়া
কৃষ্ণ সাগর
মন্টিনিগ্রো
পূর্ব রু মে লি য়া
কনস্টান্টিনোপল
ম্যাসিডোনিয়া
ই তা লি
গ্রী স
ভূ ম ধ্য সা গ র
বুলগেরিয়া
(স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি)
বার্লিনের চুক্তি (১৮৭৮)
সার্বিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়া হইতে রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত

ছিল না।* (১) বার্লিন চুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হইল এই যে, পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন যুক্তিযুক্ত বা স্থায়ী সমাধান করিতে ইহা সক্ষম হয় নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনোন্মুখতা বোধ করিয়া বার্লিন কংগ্রেস তথা ডিজ্‌রেলী উহার অনিবার্য পতনের আনুষঙ্গিক সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র। (২) বার্লিন চুক্তি বলকান অঞ্চলের জাতীয়তা-স্পৃহা উপেক্ষা করিয়াছিল। বিশাল বুলগেরিয়াকে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকগণ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যেই (১৮৮৫) এই দুই অংশ আবার একত্রিত হইয়া ঐক্যবদ্ধ বুল-গেরিয়া গঠিত হইয়াছিল। বার্লিন কংগ্রেসের দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পূর্বে (১৮৫৮ খ্রীঃ) দূরদর্শী ব্রিটিশ রাজনীতিক গ্ল্যাড্‌স্টোন বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্যকরী এবং স্থায়ী বাধা সৃষ্টি করিবার একমাত্র পথ হইল বলকান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দান করা। রাশিয়ার বিস্তার প্রতিহত করিবার একমাত্র উপায় স্বাধীন বলকান—এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।† কিন্তু বার্লিনে সমবেত কূটনীতিকগণ এই সত্য উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না।

(২) জাতীয়তার অবমাননা—বুলগেরিয়া বিভক্ত

(৩) সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করিয়া বার্লিন কংগ্রেস সার্বিয়াবাসীদের প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছিল। ইহার ফলে বলকান অঞ্চলে জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় বলকান সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সূত্রেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। (৪) মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে বার্লিন চুক্তি সমর্থনযোগ্য ছিল না। ম্যাসিডনিয়াকে স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা গঠিত বিশাল বুলগেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত পুনঃসংযুক্ত করা মানবতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা—কোন দিক দিয়াই সমর্থন-যোগ্য ছিল না। বলকান অঞ্চলের অধিকাংশ খ্রীষ্টান দেশগুলিই যখন স্বাধীনতা অর্জন করিয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তখনও ম্যাসিডনিয়ার খ্রীষ্টানগণ প্রাচীনপন্থী স্বৈরাচারী তুর্কী শাসনাধীনে আরও বহুকাল নির্যাতিত হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার অংশ হিসাবে থাকিলে ম্যাসিডনিয়াবাসী-দের যে উন্নতি হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যাসিডনিয়াকে তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত রাখিবার ফলেই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৯১৩

(৩) সার্বিয়ার প্রতি অবিচার

(৪) মানবতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া সমর্থন-যোগ্য নহে

---

* 'If the Congress was a defeat for Russia, it was not a complete success for Austria-Hungary or even for Great Britain". Taylor, p. 252.

†"Surely the best resistance to be offered to Russia is by strength and freedom of those countries which have to resist her. You want to place a living barrier between Russia and Turkey. There is no barrier like the breasts of free men." *Gladstone,* May 4, 1858, Vide, Grant & Temperley, p. 385.

খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধও বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করিবার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। (৫) বার্লিন কংগ্রেসে বিস্মার্ক বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপনের সহায়তা করিয়া ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার উপর নিজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতেই অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে এক দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়। এই মৈত্রী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অটুট ছিল। (৬) ইংলন্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল নীতি-বিরুদ্ধ ছিল, বলা বাহুল্য। তুরস্ক সুলতানের মিত্রশক্তি হিসাবে ইংলন্ড বার্লিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার মূল্যস্বরূপ সাইপ্রাস দখল করায় একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত তুরস্ক-সংরক্ষণ নীতির অবমাননা করা হইয়াছিল, অপর দিকে ইংলন্ডের সততায় সন্দিহান হইয়া এবং ইংরাজ-মৈত্রীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তুরস্ক জার্মানির দিকে ঝুঁকিয়াছিল।

(৫) বিস্মার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ

(৬) ইংলন্ডের স্বার্থপরতা

ডিজ্‌রেলীর "Peace with honour" এবং "There is again a Turkey in Europe"—এই উভয় উক্তি-ই যে তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিত্রশক্তি হিসাবে বার্লিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার মূল্য হিসাবে সাইপ্রাস দখল করা যে সম্মানজনক ছিল না, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শান্তির কথা বিবেচনা করিলেও এই কথা বলিতে হয় যে, ম্যাসিডনিয়ার সমস্যার কোন যুক্তিযুক্ত সমাধান না করিয়া বার্লিন কংগ্রেস পরবর্তী বহু বৎসর ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই সূত্র ধরিয়াই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।* অনুরূপ বোস্‌নিয়ার সমস্যা হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ রাজ-পরিবারের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বলকান সমস্যার সমাধান বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক টেইলর-এর মতে স্যান স্টিফানোর সন্ধি যদি বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক অপরিবর্তিত না হইত, তাহা হইলে তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য অদ্যাবধি টিকিয়া থাকিত।† ১৮৭৮ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে যে শান্তি বজায় ছিল, তাহা কেবল বার্লিন কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য নহে। ঐ সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতা-ই ছিল ইহার প্রধান

ডিজ্‌রেলীর উক্তির অসত্যতা

ঐতিহাসিক টেইলর-এর অভিমত

বার্লিন চুক্তির পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক শান্তির কারণ ইওরোপের রাজনৈতিক দুর্বলতা

* Taylor, pp. 252-53.

† "If the treaty of San Stefano had been maintained, both the Ottoman empire and Austria-Hungary might have survived to the present day." *Idem.*

কারণ।* বার্লিন চুক্তির ফলে ইওরোপে পুনরায় তুরস্ক শক্তির যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল, তাহা মুমূর্ষু তুরস্ক সাম্রাজ্যের মৃত্যুযন্ত্রণা বৃদ্ধিরই সামিল ছিল। উপসংহারে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলকান অঞ্চলে যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ ও আদর্শের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সেই অবস্থায় পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আশা করা ছিল দুরাশা মাত্র।

তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, বার্লিন কংগ্রেস উহার কার্যকলাপ অপেক্ষা বার্লিন শহরে উহার অধিবেশন ও উহার সংগঠনের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল এবং ইওরোপীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। (১) বার্লিনে ঐ সম্মেলনের অধিবেশন জার্মানির নবলব্ধ আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে প্রাশিয়া দুর্বল নগণ্য শক্তি হিসাবে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বাইশ বৎসর পর জার্মানির রাজধানী বার্লিনের আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্রে পরিণতি জার্মানি ও জার্মান জাতির মর্যাদার যেমন পরিচায়ক, তেমনি জার্মানির ভবিষ্যৎ প্রাধান্যেরও ইঙ্গিতস্বরূপ। (২) কিন্তু অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বার্লিনে বিসমার্কের সভাপতিত্বে এই কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হওয়ার ফলে জার্মানিকে আন্তর্জাতিক শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলেই জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই আশঙ্কা করিয়াই বিসমার্ক প্রথম এই বৈঠক বার্লিনে না বসিয়া প্যারিসে আহূত হউক, সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ইওরোপে জার্মানির যে প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই বিসমার্ককে শেষ পর্যন্ত 'সাধু দালাল' (Honest Broker) সাজিতে হইয়াছিল। জার্মানির পক্ষে একদিকে যেমন অস্ট্রিয়ার মিত্রতা রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মৈত্রীর পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল, তেমনি জার্মানির অন্তর্গত পোল্যাণ্ডের রাজ্যাংশে যাহাতে কোনপ্রকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটিতে না পারে, সেজন্য রাশিয়ার সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিবারও প্রয়োজন ছিল। কারণ পোল্যাণ্ডের এক বিশাল অংশ ছিল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এদিক দিয়া জার্মানি ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল সমধর্মী। সুতরাং একদিকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যেমন রাশিয়াকে সাহায্য করা বিসমার্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অনুরূপ রাশিয়াকেও সম্পূর্ণ শত্রুতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। আবার রাশিয়া ও ইংলণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্কও যাহাতে

বার্লিন আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্রে পরিণত

'সাধু দালাল'-এর ভূমিকায় বিসমার্ক

* "That the settlement of Berlin actually lasted without serious disturbance for a generation is a tribute as much to the impotence and mutual rivalries of the powers and to the ineffectiveness of the Concert of Europe as to the enduring nature of its terms..." Ketelbey, p. 312.

দ্বন্দ্বমূলক না হইয়া উঠে, সেদিকেও বিসমার্ককে নজর রাখিতে হইয়াছিল। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে বিসমার্কের খুশি হইবারই কারণ ছিল বটে, কিন্তু সেইরূপ যুদ্ধ ঘটিলে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ যদি সেই যুদ্ধে যোগদান করে, তাহা হইলে ইঙ্গ-রুশ যুদ্ধ ইওরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইবে, এই ভয় বিসমার্কের ছিল। সুতরাং সেই পরিস্থিতিরও যাহাতে উদ্ভব না ঘটে, সেদিকে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। কারণ, এইরূপ ঘটিলে ফ্রান্স ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সন্ধি নাকচ করিয়া জার্মানির নিকট হইতে হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতে পারে, এই আশঙ্কা ছিল।

বিসমার্কের সম্মুখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা

সর্বশেষে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়া পুনরায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালীন ইঙ্গ-ফরাসী-অস্ট্রীয় মৈত্রী গঠনের কোন সুযোগ দান করাও বিসমার্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাহা হইলে জার্মানির প্রধান শত্রু ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সন্ধি ভঙ্গের আশংকা জন্মিবে। সুতরাং নবগঠিত ঐক্যবদ্ধ জার্মানির উত্থানের ফলে বার্লিনকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপে যে এক নূতন রাজনৈতিক শক্তি-সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বার্লিন বৈঠকে পাওয়া গিয়াছিল।*

বার্লিনের নেতৃত্বে ইওরোপে নূতন শক্তি-সাম্যের উদ্ভব

বার্লিন কংগ্রেসের পরবর্তী কালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্বরূপ, ১৮৭৮—১৯১৪ (Nature of the Eastern Question, 1878-1914)ঃ বার্লিন চুক্তিতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান হয় নাই, উপরন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থপর নীতির ফলে বলকান অঞ্চল ইওরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হইল। বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার ফলে বলকান অঞ্চলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৎসর অবধিও এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে সেই সমস্যাগুলির শেষ পরিণতি ঘটে। উপরন্তু নিম্নলিখিত কারণে বলকান তথা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বলকান সমস্যার জটিলতা

(১) বার্লিন চুক্তি বলকান জাতিগুলির জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিল। যে-সকল বলকান রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, সেগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠন না করায় স্বভাবতই সেই সকল রাজ্যের অধিবাসিগণ নিজ নিজ দেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাদিগকে নিজেদের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। (২) ইহা

কারণ ঃ (১) বার্লিন চুক্তিতে বলকান জাতীয়তার উপেক্ষা

* "The Congress of Berlin marked an epoch in where it met, not in what it did."—Taylor, p. 253.

"The Congress of Berlin was important for what it was rather than for what it did".

ভিন্ন, যে-সকল বলকান জাতি তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিও স্বাধীনতা দাবি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে "তরুণ তুর্কী" (Young Turk) বিদ্রোহ দেখা দিলে বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের বা রাজ্যবিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। (৩) সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করিবার ফলে বলকান অঞ্চলে জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়ার বলকান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার-নীতির ফলেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। (৪) বার্লিন চুক্তিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় পাইয়া তুরস্ক সুলতান জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতান জার্মানির ও নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ প্রস্তুতের জন্য সচেষ্ট হইলেন। (৫) এই সকল কারণ ভিন্ন বলকান দেশগুলির পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থের সংঘাতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এক অতিশয় জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, আর্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এই সমস্যার জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

(২) তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বলকান জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা

(৩) সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য

(৪) তুর্কী-জার্মান মিত্রতা

(৫) বলকান দেশগুলির পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বুলগেরিয়া ঃ বুলগার জাতির জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া বার্লিন কংগ্রেস বৃহৎ বুলগেরিয়াকে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়ায় বিভক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই কৃত্রিম বিভাগ ইতিহাসের ধারা ও ইঙ্গিতের বিরোধী ছিল বলিয়াই উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। রুশ প্রাধান্যাধীন বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠনের ভীতির ফলেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গও অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুলগার জাতি বার্লিন চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিল। ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স্ আলেকজান্ডার এই ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইনি রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়ার ঐক্যসাধনে স্টিফেন স্ট্যাম্বোলোভ্ (Stephen Stambolov) নামে একজন বুলগার নেতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক বুলগেরিয়ার কৃত্রিম বিভাগ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া ও পূর্ব-রুমেলিয়ার ঐক্যসাধন

রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বলকান অঞ্চলের শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইয়াছে, এই অজুহাতে সার্বিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অবশ্য ইহার মূল কারণ ছিল বুলগেরিয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে সার্বিয়ার ঈর্ষা।

সার্বিয়া কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা

কিন্তু বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া সার্বিয়ার সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল, এমন কি, বুলগেরিয়ার সৈনা সার্বিয়ার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে অস্ট্রিয়ার চাপে বুলগেরিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল এবং বুকারেস্ট (Bucharest)-এর সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে উভয় দেশ স্বীকার করিল।

সার্বিয়ার পরাজয়: বুকারেস্ট-এর সন্ধি

স্যান স্টিফানো সন্ধি দ্বারা যে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল উহা বিভক্ত করিয়া রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া এই দুইটি রাজ্য গঠনের জন্য বার্লিন কংগ্রেসের সমবেত সদস্যদের মধ্যে ডিজরেলীই ছিলেন প্রধানত দায়ী। ডিজরেলী বৃহৎ বুলগেরিয়ার উপর রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইবে মনে করিয়া বুলগেরিয়ার আকার যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হউক, এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুলগেরিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে থাকিতে রাজী নহে এই প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ড ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করিল।* অপর দিকে রাশিয়া বুলগেরিয়ার বিরোধিতা শুরু করিল। স্যান স্টিফানোর সন্ধির পর হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষত ইংলন্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বলকান নীতির পরিবর্তন ঘটিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ও ইওরোপের শক্তিবর্গ বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্য অনুমোদন করিলে রাশিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। ঐ বৎসরই রাশিয়া এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা আলেকজান্ডারকে বুলগেরিয়ার শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। পরবর্তী শাসক ফার্ডিনান্ড সেক্সিকোবার্গ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া তুরস্ক সুলতানের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। ফলে তুরস্ক সুলতান বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বুলগেরিয়া তুরস্ক সুলতানকে ক্ষতিপূরণ দান করিলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের পার্লামেন্ট বুলগেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বুলগেরিয়া নীতির পরিবর্তন

তুরস্ক ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক বুলগেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার (১৮৮৬)।

আর্মেনিয়ার সমস্যা (Armenian Affair) ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক সরকারের দমন-নীতির ফলে আর্মেনিয়াবাসীর দুর্দশার সীমা ছিল না। ইংলন্ড ছিল আর্মেনিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বার্লিনের চুক্তি এবং সাইপ্রাসের চুক্তিতে (Cyprus Convention) ইংলন্ড আর্মেনিয়ানদের জন্য তুরস্ক সুলতানের নিকট হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল; তুরস্ক সুলতান আর্মেনিয়ায়

আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন: তুর্কী দমন-নীতি

---

* "A Bulgaria friendly to the porte and jealous of foreign influence would be a far surer bulwark against foreign aggression than two Bulgarias severed in administration..." Lord Salisbury, Vide, Ketelbey, p. 315.

উদারনৈতিক সংস্কার সাধনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত তিনি এই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। আর্মেনিয়ানগণ তুরস্ক সরকার হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিলে তুরস্ক সুলতান আব্দুল হামিদ দেখিলেন যে, আর্মেনিয়ায় বুলগেরিয়ার মত আরও একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিবার আশংকা আছে। সুতরাং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনিয়ান আন্দোলনকারিগণ তুরস্ক সরকারের বিরোধিতা করিলে আর্মেনিয়া-বাসীদের উপর অত্যাচার শুরু হইল। ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মোট পঞ্চাশ হাজার আর্মেনিয়ান তুর্কীদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপলস্থ আর্মেনিয়ানগণ তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে একদিনে ছয় হাজার আর্মেনিয়ানকে হত্যা করা হইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত রহিল। আর্মেনিয়ানগণও অবশেষে বুলগারদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রাশিয়া আর্মেনিয়ানদিগকে কোনপ্রকার সাহায্যদানে অগ্রসর হইল না। ইহা ভিন্ন, আর্মেনিয়ানগণ রুশদের ন্যায় গ্রীক খ্রীষ্টান (Orthodox or Greek Christians) ছিল না, এইজন্য ধর্মের দিক দিয়াও রাশিয়ার কোন দায়িত্ব ছিল না, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তখন নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে তুরস্ক সুলতানের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিবাদ তুরস্ক সুলতান মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। ইংলণ্ড কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ নীতির পরিণাম উপলব্ধি করিয়া লর্ড সলসবেরি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ককে এতদিন সাহায্য করিয়া ইংলণ্ড ভুল করিয়াছে।*

আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড (১৮৯৪, ১৮৯৬ খ্রীঃ)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয় হাজার আর্মেনিয়ান হত্যা

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ঃ ইংলণ্ডের প্রতিবাদ

গ্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ (Graeco-Turkish War) ঃ বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সুলতান অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রীসকে ইপাইরাস (Eprius) ও থেস্যালির (Thessaly) একাংশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ পাইয়া গ্রীসের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল আইওনিয়ার গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের শাসনাধীন ছিল। লর্ড পামারস্টোন যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি এই কয়টি দ্বীপ গ্রীসকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দ্বীপ ক্রীট্ তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তুর্কী শাসনা-

ক্রীট্‌বাসীদের অপরিতৃপ্ত জাতীয়তা-স্পৃহা

* "Lord Salisbury together with most of his countrymen came to a significant conclusion, that in supporting Turkey hitherto England put her money on the wrong house." Vide, Ketelbey, p. 318.

ধীনে ক্রীট্‌বাসীরা বলকানদের ন্যায়-ই অত্যাচারিত হইতেছিল। ১৮৩০ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা মোট চৌদ্দবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ক্রীট্‌বাসীদের বিদ্রোহে গ্রীকগণ স্বভাবতই সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তুরস্ক সুলতানের নিকট হইতে তাহারা সংস্কারের মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীট্‌বাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বেচ্ছায় গ্রীসের সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। ক্রীট্‌বাসীদের সাহায্যের জন্য গ্রীস এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত থেস্যালির অংশ আক্রমণ করে। এই সূত্রে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৯৭)। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট তুরস্ক সুলতান সহজেই গ্রীসকে পরাজিত করিয়া কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি এবং প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন। আর্মেনিয়ান সমস্যার ক্ষেত্রে যেরূপ স্বার্থপরতা ও পরস্পর-বিরোধিতার ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে সেইরূপ না হইলেও এই সমস্যার সমাধানে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছিল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানি ছিল তুরস্কের পক্ষে। তাহারা তুরস্ক সুলতানের স্বার্থ-বিরোধী কোনও প্রস্তাব গ্রহণে রাজী ছিল না। কিন্তু ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার চাপে তুরস্ক সুলতান ক্রীটে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনে বাধ্য হইলেন। এই চারি দেশের এক যুগ্ম সমিতির হস্তে ক্রীটের শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। গ্রীসের রাজা জর্জের পুত্র যুবরাজ জর্জ 'ক্রীটের শাসনকর্তা' নিযুক্ত হইলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীট্‌বাসীরা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোল-যোগের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এইবারও গ্রীস সাহায্য প্রেরণ করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চেষ্টায় গ্রীস সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধের পর অবশ্য ক্রীট্ গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ক্রীট্ বিদ্রোহ

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৭)

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সানির্বন্ধতায় ক্রীটে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত ক্রীটের সংযুক্তি

তুরস্কে বিপ্লবী আন্দোলন (Revolutionary Movement in Turkey)ঃ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় এক নূতন জটিলতা দেখা দেয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তুরস্কে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন "তরুণ তুর্কী আন্দোলন" (Young Turk Movement) নামে পরিচিত। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের অত্যাচারে দেশত্যাগী একদল তুরস্কবাসী এই বিপ্লবী দল গঠন করিয়াছিল। দেশত্যাগ করে নাই, এমন বহুসংখ্যক তুর্কী যুবকও এই দলে যোগদান করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ লইয়া গঠিত 'তরুণ তুর্কী' দল

'তরুণ তুর্কী আন্দোলন'

তুর্কী সুলতানের অত্যাচারী শাসনের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। তাহারা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা, উদার শাসনতন্ত্র স্থাপন, প্রতিনিধিমূলক পার্লামেন্ট এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দাবি করিল। তাহাদের আন্দোলন দ্রুত সমগ্র তুর্কী-জাতির মধ্যে এক নব-চেতনার সৃষ্টি করিল। এমন কি, তুর্কী সৈন্যের মধ্যেও এই চেতনা জাগিল। সুলতান দ্বিতীয় হামিদ প্রমাদ গণিলেন। পরিস্থিতির চাপে তিনি 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনকারীদের দাবি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আব্দুল হামিদ এই সকল উদারনৈতিক সংস্কার নাকচ করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠিলে 'তরুণ তুর্কী' দল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে সুলতান-পদে স্থাপন করিল (১৯০৯)।

দ্বিতীয় হামিদের পদচ্যুতি ঃ পঞ্চম মহম্মদকে সুলতান-পদে স্থাপন

এই বিপ্লবের গুরুত্ব সমগ্র বলকান অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইল। এই সুযোগে বুলগেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া গেল। বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা নামক স্থান দুইটি অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লইল। ঐ সময়ে ইতালিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী ছিল। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইতালি আফ্রিকাস্থ তুরস্ক সাম্রাজ্যাংশ ত্রিপোলি (Tripoli) দখল করিয়া লইল।

'তরুণ-তুর্কী' আন্দোলনের ফলাফল

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা অধিকৃত হওয়ায় সার্বিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল, কারণ এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্ জাতির লোক ছিল। ইহা ভিন্ন, বলকান অঞ্চলে জার্মানির প্রাধান্য বিস্তৃতি এবং বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে রাশিয়ার অসন্তুষ্টি ক্রমেই বলকান রাজনীতি ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জটিলতার ফলেই ১৯১২, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বলকান অঞ্চলের জটিলতা

প্রথম বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ (The First Balkan War, 1912) ঃ 'তরুণ-তুর্কী' আন্দোলনের সাফল্যের পরও তুর্কী সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দানের কোন চেষ্টা করিলেন না। উপরন্তু তুরস্ক সরকার অত্যাচারের দ্বারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে গ্রীসদেশের মন্ত্রী ভেনিজেলোস্ (Venizelos) গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া এই কয়টি খ্রীষ্টান দেশ লইয়া 'বলকান লীগ' (Balkan league) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সরকারের অত্যাচার রোধ করা। অপর দিকে তুরস্ক সরকার ম্যাসিডনিয়াকে দমন-নীতির দ্বারা তুরস্ক সরকারের প্রতি অনুগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলকান লীগ অত্যাচারিত ম্যাসিডনিয়াবাসীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তুর্কী সুলতানকে ম্যাসিডনিয়ার প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধনের জন্য

বলকান লীগ

চাপ দিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ বলকান লীগকে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তুরস্ক ম্যাসিডনিয়ায় কোনপ্রকার সংস্কার প্রবর্তন করিতে স্বীকৃত হইল না। বলকান লীগ ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষেধ না মানিয়া মন্টিনিগ্রো. বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস চতুর্দিক হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধ প্রথম বলকান যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

অল্পকালের মধ্যেই বলকান দেশগুলির নিকট তুরস্ক পরাজিত হইল। গ্রীক সৈন্য ম্যাসিডনিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে স্যালোনিকা দখল করিল। মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া এই সকল দেশের সৈন্যরাও তুরস্কের সেনাবাহিনীকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। বলকান রাজ্যগুলির নিকট এইভাবে পরাজিত হইলে তুরস্কের সামরিক শক্তি প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বুলগেরীয় সৈন্য মর্মরসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দুর্গগুলি পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কনস্টান্টিনোপল্ তখন মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। এইভাবে আড্রিয়ানোপল, জানিনা, স্কুটারি এবং কনস্টান্টিনোপল্ ভিন্ন প্রধান দুর্গ ও অঞ্চল বলকান সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হইয়া গেল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের এই পতন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের, এমন কি, বলকানদের নিকটও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল। বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশের প্রতিনিধিবর্গ লন্ডনে তুরস্ক ও বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হইল। এই ব্যর্থতার কারণ তুরস্ক রুমানিয়াকে আড্রিয়ানোপল দিতে রাজী হয় নাই। এইবারের যুদ্ধে জানিনা, স্কুটারি ও আড্রিয়ানোপল তুরস্কের হস্তচ্যুত হইল।

তুরস্কের সর্বত্র পরাজয়

সর্বত্র পরাজিত হইয়া তুরস্ক সরকার লন্ডনের চুক্তি (Treaty of London) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (মে, ১৯১৩)। এই চুক্তির শর্তানুসারে কেবল কনস্টান্টিনোপল্ এবং থ্রেসের ক্ষুদ্র একাংশ বাদে সমগ্র বলকান অঞ্চল—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ইওরোপীয় অঞ্চল, তুরস্কের সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া গেল। কৃষ্ণসাগরের তীরে মিডিয়া (Midia) নামক স্থান হইতে ইজিয়ান সাগর তীরে এনোস (Enos) নামক স্থান পর্যন্ত এক কাল্পনিক রেখা টানিয়া সেই রেখার বাহিরের সকল অঞ্চল বলকান লীগের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। ইহা ভিন্ন, গ্রীসকে ক্রীট্ দ্বীপটিও দান করিতে হইল। আলবানিয়াকে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে স্থাপন করা হইল। কিন্তু লন্ডন চুক্তি ক্ষণস্থায়ী হইল।

লন্ডন চুক্তি (১৯১৩)

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ ১৯১৩ (The Second Balkan War, 1913) : আলবানিয়ার অধিকার লইয়া বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। সার্বিয়া মন্টিনিগ্রোর সহিত আলবানিয়া ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। কারণ আলবানিয়া স্বায়ত্তশাসিত পৃথক রাজ্য হিসাবে স্থাপিত হইলে সার্বিয়ার সমুদ্রের সহিত যোগাযোগের

আলবানিয়া অধিকার লইয়া বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ

পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং সার্বিয়া একটি স্থল পরিবেষ্টিত দেশে পরিণত হইবে। আলবানিয়ার একাংশ অধিকার করিতে পারিলে আড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশ পথ সার্বিয়ার খোলা থাকিবে। কিন্তু অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার এই দাবির ঘোর বিরোধী ছিল। ব্রিটেন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স সার্বিয়ার দাবি সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পরস্পর সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়া দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। এই আসন্ন-প্রায় যুদ্ধে রাশিয়াকে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়াকে জার্মানি সমর্থন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। জার্মানির উদ্দেশ্য ছিল সার্বিয়াকে আলবানিয়ার একাংশ অধিকার করিতে না দিলে এবং আলবানিয়ার মধ্য দিয়া আড্রিয়াটিক সাগরে পৌঁছিবার চেষ্টায় বাধা দিলে সার্বিয়া বাধ্য হইয়া ইজিয়ান সাগরের দিকে অগ্রসর হইবে এবং তাহার ফলে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সহিত বিবাদ বাধিবে। ইহাতে বলকান দেশগুলির ঐক্য যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে তেমনি জার্মানির পক্ষে সেই অঞ্চলে কূটনৈতিক প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব হইবে। জার্মানি এই কারণে অস্ট্রিয়াকে সর্বপ্রকার সমর্থন ও উৎসাহ দিতে লাগিল। যাহা হউক, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সাময়িকভাবে স্থগিত রহিল। কিন্তু বলকান রাজ্যগুলির পারস্পরিক স্বার্থ দ্বন্দ্ব পূর্ণোদ্যমে চলিল। গ্রীস প্রচীন গ্রীক সভ্যতার দোহাই দিয়া ম্যাসিডনিয়া দখল করিতে চাহিল, সার্বিয়া ম্যাসিডনিয়ায় স্লাভ্ জাতির লোক বসবাস করে এই যুক্তিতে এবং সার্বিয়াকে আলবানিয়া অধিকার করিতে বাধা দেওয়া হইতেছে সেই হেতু আলবানিয়ার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ম্যাসিডনিয়া দাবি করিল। বুলগেরিয়া ম্যাসিডনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী বুলগেরীয় জাতির লোক এই কারণে ম্যাসিডনিয়া দাবি করিল। ইওরোপীয় দেশসমূহের কূটচালে বলকান সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এক পক্ষে বুলগেরিয়া এবং অন্য পক্ষে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও রুমানিয়া দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু করিল। এই সুযোগে তুরস্ক নিজ হৃত সাম্রাজ্যাংশ পুনর্দখল করিতে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আড্রিয়ানোপ্‌ল দখল করিয়া লইল। অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পরাজয় হউক ইহা চাহিত না। অস্ট্রিয়ার চেষ্টায়ই বুকারেস্ট-এর সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটিল (আগস্ট, ১৯১৩)।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের স্বার্থ বনাম অস্ট্রিয়া ও জার্মানির স্বার্থ

ম্যাসিডনিয়ার অধিকার লইয়া বলকান রাজ্য-গুলির স্বার্থ দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূচনা ঃ তুরস্কের যোগদান

বুলগেরিয়ার পরাজয়, অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় সন্ধি স্থাপন

বুকারেস্ট্-এর সন্ধি, আগস্ট, ১৯১৩ (Treaty of Bucharest, August, 1913): (১) বুলগেরিয়াকে উত্তরে রুমানিয়ার নিকট সিলিস্ট্রিয়া এবং দবরুদজার এক বড় অংশ ত্যাগ করিতে হইল। (২) ম্যাসিডনিয়ার যে-সকল অংশ বুলগেরিয়া নিজে দাবি করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ গ্রীস, সার্বিয়া ও মন্টিনগ্রোকে ত্যাগ করিল। (৩) তুরস্ককে থ্রেস-এর কিয়দংশের উপর এবং আড্রিয়ানোপ্‌ল যাহা তুরস্ক যুদ্ধে পুনর্দখল করিয়াছিল তাহাতে

বুকারেস্টের সন্ধির শর্তাদি

তুরস্কের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল। (৪) **সাম্রাজ্যের সীমার** দিক হইতে বিচারে প্রথম এবং দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যাংশ প্রায় বিলুপ্ত হইল এবং খ্রীষ্টান রাজ্যগুলির সীমা বিস্তার লাভ করিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের গুরুত্ব (**Importance of the First & the Second Balkan Wars**) : (১) ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধের ফলে ইওরোপ মহাদেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটে। কেবল কনস্টান্টিনোপল্ এবং থ্রেস (Thrace)-এর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং আড্রিয়ানোপল ভিন্ন অপরাপর সকল স্থানই তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া পড়ে। দার্দানেলিস ও বোস্‌ফরাস প্রণালী দুইটি অবশ্য তুরস্কের অধিকারে রহিল।

তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যাংশের পতন

(২) তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বলকান অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইলেও বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল না, উপরন্তু সেগুলির পরস্পর ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইল। (৩) বলকান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার শত্রুতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের প্রধান বিরোধী ছিল সার্বিয়া। স্লাভ জাতি-অধ্যুষিত সার্বিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য ছিল তাহা রুশ-অস্ট্রিয়ার পরস্পর বিদ্বেষের ফলে অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে স্লাভ্ জাতিকে রক্ষা করা সার্বিয়া এবং রাশিয়া উভয় দেশেরই প্রধান দায়িত্বে পরিণত হইয়াছিল। অপর দিকে সেই সময় জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বলকান অঞ্চলে পরস্পর বিদ্বেষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যে বলকান যুদ্ধ সূত্রে যে-মনোমালিন্য ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল উহার সূত্র ধরিয়াই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার শত্রুতা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মূল কারণ

বলকান যুদ্ধের ফলে মন্টিনিগ্রোর রাজ্যসীমা বৃদ্ধির অনুপাতে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল গ্রীস ও সার্বিয়া। রুমানিয়া ২৬৮৭ বর্গমাইল রাজ্য এবং প্রায় তিনলক্ষ জনসংখ্যা পাইল। গ্রীস ক্রীট্ এবং ইজিয়ান সাগরের উত্তর উপকূলে আরও কতক স্থান, এবং ম্যাসিডোনিয়ার বহুস্থান লাভ করিল।

বিভিন্ন বলকান রাজ্যের লাভ

এই যুদ্ধে ফলে বুলগেরিয়া যে-পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লইতে গিয়া আরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

বুলগেরিয়ার ক্ষতি

অধ্যায় ১৫

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রাধীন ফ্রান্স

(France under the Third Republic)

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সমস্যাসমূহ (Problems of the third Republic) : সেডানের যুদ্ধে জার্মানির হস্তে ফ্রান্সের পরাজয় ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। সেডানের পরাজয়ের এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র ফরাসী জাতি ফ্রান্সকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৭০)। নূতনভাবে সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বাবধি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার 'জাতীয় প্রতিরক্ষক সরকার' (Government of National Defence) নামে একটি অস্থায়ী সরকারের ও 'জাতীয় সভা' (National Assembly) নামে একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি-সভার হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই সরকারের সম্মুখীন সমস্যাগুলি ছিল যেমন জটিল তেমনি বিভিন্ন ধরনের, যথা : (১) প্যারিসে 'কমুন'-বিদ্রোহ-প্রসূত অন্তর্দ্বন্দ্বের দমন, (২) জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান, (৩) সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং (৪) চার্চ ও সমাজতন্ত্রবাদ-প্রসূত সমস্যার সমাধান।

অস্থায়ী সরকার —জাতীয় সভা

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা

জাতীয় সভা সর্বপ্রথমেই জার্মানির সহিত চুক্তির শর্তাদি অনুমোদনের জন্য বর্দো (Bordeaux) নামক শহরে এক অধিবেশনে সম্মিলিত হইল। এদিকে প্যারিসবাসীর আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জার্মান সৈন্য প্রথমে প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করিয়া কয়েকদিন পর ফ্রান্সের অন্যত্র অপসরণ করিয়াছিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত জার্মান সৈন্য ফ্রান্সে অবস্থান করিবে, ইহাই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য।

বর্দো অধিবেশন— প্যারিস কমুনের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত

'প্যারিস কমুন'-এর বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune) : 'প্যারিস কমুন' (Commune) ছিল সমাজতন্ত্রবাদী, প্রজাতন্ত্রবাদী, সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থা-বর্জিত অরাজকতায় বিশ্বাসী—বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী জনসাধারণের একটি অদ্ভুত সংগঠন। প্যারিসের কমুন বহুবার ফ্রান্সের সর্বত্র বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল। পূর্ববর্তী একশত বৎসরের মধ্যে অন্তত দশবার এই 'কমুন' ফরাসী দেশের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়া

'কমুন'—ইহার মতবাদ ও দাবি

তুলিয়াছিল। এই সংগঠনের সদস্যগণ সমগ্র ফরাসী দেশকে শহর ও গ্রামের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শহর ও গ্রামে একটি করিয়া 'কম্যুন' স্থাপন এবং উহার উপর স্থানীয় শাসনভার অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা ফরাসী শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দাবি করিয়াছিলেন।

দেশের সর্বত্র কম্যুন স্থাপন

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় সভা নির্বাচন হইল উহাতে কম্যুনের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। জাতীয় সভায় রাজ-তন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। ফলে, কম্যুনের সদস্যদের মনে এই ধারণা ও ভীতি জাগিয়াছিল যে, জাতীয় সভা হয়ত পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে। তদুপরি কম্যুনের কর্মকেন্দ্র প্যারিস নগরীকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সভা যখন বর্দো শহরে অধিবেশনে সমবেত হইল, তখন কম্যুনের সদস্যদের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হইল। জাতীয় সভা যখন ফরাসী রাজতন্ত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভার্সাই শহরে উহার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিল, তখন জাতীয় সভা যে প্যারিস নগরীর রাজনৈতিক আবহাওয়া এড়াইয়া চলিতে ইচ্ছুক, এ-কথা 'কম্যুন' স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিল। ইহা ভিন্ন, প্যারিস নগরী জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। স্বভাবতই 'কম্যুন' জাতীয় সভার এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইল। প্যারিস নগরীর ঐতিহ্য, প্যারিস শহরবাসীর দুঃখ-কষ্ট, প্যারিস শহর রক্ষার জন্য তাহাদের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সবকিছুই ফরাসী অস্থায়ী সরকার তথা জাতীয় সভা উপেক্ষা করিয়াছে দেখিয়া এবং প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলোপের আশংকা করিয়া 'কম্যুন' এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা করিল। জাতীয় বাহিনী (National Guard) প্যারিস নগরী যাহাতে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক কোনোভাবে আক্রান্ত হইতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করিল। গাম্বেটা (Gambeta) ছিলেন ইহার অধিনায়ক। সরকার পক্ষ বিদ্রোহীদের দমন করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। থিয়ার্স (Thiers) প্যারিস শহর হইতে সরকারী সৈন্য অপসারণ করিলে প্যারিস সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহী কম্যুনের অধিকারে চলিয়া গেল। প্যারিস কম্যুন একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। প্যারিস কম্যুন সমগ্র ফ্রান্সকে কম্যুনে বিভক্ত করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া শাসন-ব্যাপারে চরম বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কার্যকরী করিতে চাহিল। বিভিন্ন কম্যুনের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের শাসন-কার্যে পরিদর্শনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, এ-কথাও কম্যুনের সদস্যগণ প্রচার করিলেন। তাঁহারা রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে শাসনকার্যে কেন্দ্রীকরণ নীতিকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দাবাদ করিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের স্বেচ্ছায় সাহায্যদানের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়া শোষণ, অন্যায়,

জাতীয় সভায় রাজ-তান্ত্রিক সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

'কম্যুন' কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা

প্যারিসে 'কম্যুন' কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

অবিচার, স্বার্থান্বেষণ প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা হইতে বিলুপ্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু কম্যুনের সদস্যদের মধ্যেও একতার অভাব ছিল। তাঁহারা মন্ত্রী নিয়োগ, সমাজতান্ত্রিক পতাকা গ্রহণ প্রভৃতি সবই করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ভার্সাই-এ স্থাপিত অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কম্যুন বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করিতে গিয়া তাঁহারা ভার্সাই আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সৈন্য কেবল অকৃতকার্য-ই হইল না, সেনাবাহিনীর বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও প্রাণ হারাইলেন। কম্যুনও প্যারিসের বহু বিত্তশালী এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আটক করিয়া উহার পাল্টা জবাব দিল।

কম্যুন প্রতিষ্ঠিত সরকারের মতানৈক্য

ভার্সাই আক্রমণ ব্যর্থ

থিয়ার্স ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য বিনাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রজাতান্ত্রিকতা ফ্রান্সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে, এই মিথ্যা প্রচার করিয়া প্যারিস কম্যুন কিভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তিনি সে-কথা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তখনও ভার্সাই-এর সরকারের হস্তে যথেষ্ট সৈন্যসংখ্যা ছিল না যাহাতে প্যারিস শহর জয় করা যাইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই জার্মানি ও সুইট্জারল্যান্ড হইতে ফরাসী সৈন্য দেশে ফিরিয়া আসিলে প্যারিস শহর পুনর্দখল করা সম্ভব হইল। কিন্তু প্যারিস শহর রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া কম্যুনের সদস্যগণ যে-সকল ব্যক্তিকে আটক রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে হত্যা করাইলেন। ভার্সাই সরকারের সেনাবাহিনীও প্যারিস শহরে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তিদানে দ্বিধা করিল না। প্যারিসের রাস্তাঘাট অসংখ্য প্যারিসবাসীর রক্তে রঞ্জিত হইল। জার্মান সৈন্য প্যারিস শহরে প্রবেশ করিবার কালেও এইরূপ বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। অবশেষে, গাম্বেটার সনির্বন্ধ অনুরোধে অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ভার্সাই সরকারের সামরিক বাহিনীও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিল। এইভাবে প্যারিস শহর পুনর্দখল করিয়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক একতা রক্ষা করা হইল। কম্যুন বিদ্রোহী দল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল।

ভার্সাই সরকার কর্তৃক প্যারিস শহর আক্রমণ

প্যারিস শহরে বীভৎসতার অনুষ্ঠান

কম্যুন' বিদ্রোহ দমন

জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন (Peace Treaty with Germany): জার্মানির হস্তে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স ইওরোপ মহাদেশের বিভিন্ন শক্তিগুলির তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি ফ্রান্স ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। কিন্তু জার্মানির হস্তে সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা ও শক্তি হিসাবে ইওরোপে চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল। স্বভাবতই নূতন প্রজাতান্ত্রিক অস্থায়ী সরকারের সমস্যাই ছিল ফ্রান্সের পুনর্গঠন। জাতীয় সভা বর্দো শহরে প্রথম অধিবেশনে সমবেত হইয়া থিয়ার্সকে (Thiers) শাসনব্যবস্থার প্রধান (Chief of the Executive) নির্বাচন করিয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য এই উপাধি পরিবর্তন করিয়া থিয়ার্সকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট উপাধি দেওয়া

থিয়ার্স ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট

হইল। প্রেসিডেণ্ট অবশ্য জাতীয় সভার নিকট তাঁহার শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদির জন্য দায়ী থাকিবেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সভার উপর ন্যস্ত, এ-কথাও বলা হইল। সুতরাং থিয়ার্সের সরকার একটি পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা ছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুত, পার্লামেণ্টারি রীতি অনুসরণ করিয়া জাতীয় সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাইবার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়ার্স পদত্যাগ করিয়াছিলেন (১৮৭৩)।

থিয়ার্সের সরকার: পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া থিয়ার্সের সরকার দেখিলেন যে, জার্মানির সহিত যুদ্ধ, জার্মানির নিকট আলসেস-লোরেন ছাড়িয়া দেওয়া এবং কম্যুন বিদ্রোহ সব কিছুর ফলে ফরাসী রাষ্ট্রের এক অভাবনীয় আর্থিক ক্ষতি ঘটিয়াছে। জনসংখ্যারও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। কিন্তু জার্মান সৈন্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায় ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সন্ধির শর্তানুসারে স্বীকৃত ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া। প্রেসিডেণ্ট থিয়ার্সের কর্মতৎপরতায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জার্মানির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া হইল। ফলে, জার্মান সেনাবাহিনীও ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া গেল। থিয়ার্স তাঁহার এই কর্মতৎপরতা দ্বারা ফরাসী জাতিকে জার্মান সামরিক প্রাধান্যমুক্ত করিলে কৃতজ্ঞ দেশবাসী কর্তৃক 'রাষ্ট্রের মুক্তিদাতা' (The Liberator of the Territory) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দান—জার্মান সৈন্যের অপসরণ

সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন (Military & Administrative Reorganisation): এদিকে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করাও একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামরিক আইন পাস করিয়া সামরিক কর্তব্য সম্পাদন প্রত্যেক নাগরিকের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। জাতীয় বাহিনী (National Guard) যাহা কম্যুন বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সামরিক আইন ফরাসী সামরিক পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ ও যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার করা হইল এবং নূতন ধরনের ও সহজে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী সৈন্যদিগকে দেওয়া হইল। এইভাবে সেডানের যুদ্ধে পর্যুদস্ত ফরাসী সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইল।

সামরিক পুনর্গঠন: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সামরিক আইন

এযাবৎ অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সভা ফ্রান্সের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রেসিডেণ্ট হিসাবে থিয়ার্স শান্তি স্থাপন ও ক্ষতিপূরণ দান করিয়া দেশকে জার্মান সৈন্যদলের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক পুনর্গঠন সম্পাদন করিলেন। জাতীয় সভায় রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রথম হইতেই ছিল। থিয়ার্সের কার্যের দ্বারা

থিয়ার্সের পদত্যাগ: ম্যাকম্যাহন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

দেশের অবস্থা উন্নততর হইবামাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থিয়ার্সের বিপক্ষে চলিয়া গেলে থিয়ার্স পদত্যাগ করিলেন। অতঃপর মার্শাল ম্যাক্‌ম্যাহন (Marshal Macmahon) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন (১৮৭৩)।

ম্যাক্‌ম্যাহন প্রেসিডেন্ট-পদ লাভের অব্যবহিত পরেই শাসনতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন উঠিল। রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেজন্য তখন রাজতন্ত্রই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সকলে মনে করিল। বুরবোঁ বংশের জনৈক বংশধর কম্‌টি ডি সেমবর্ড (Comte de Chambord)-কে তাহারা 'পঞ্চম হেনরী' উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু কম্‌টি ডি সেমবর্ড বিপ্লবী ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না; তিনি বুরবোঁ বংশের শ্বেত পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জিদ ধরিলে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বাতিল হইয়া গেল। মার্শাল ম্যাক্‌ম্যাহন সাত বৎসরের জন্য স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক গাম্বেটার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ফরাসী জাতির মনে যে প্রজাতান্ত্রিকতার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে দেশে প্রকাশ্য বিক্ষোভের সৃষ্টি হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা দূরীভূত হইলে শাসনতন্ত্র গঠনের কাজ শুরু হইল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া সিনেট ও চেম্বার অব্ ডেপুটিজ (Chamber of Deputies) বা প্রতিনিধি-সভা—এই দুই-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হইল। চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক তিন শত সদস্য লইয়া সিনেট এবং প্রতি চারি বৎসর অন্তর অন্তর জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইবে স্থির হইল।

রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের আশা বিলুপ্ত

নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র—দ্বি-কক্ষযুক্ত আইনসভা

এই শাসনতন্ত্র ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারি শাসন-পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্যের জন্য প্রতিনিধি-সভার নিকট দায়ী থাকিবে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক সদস্য ভোটদান করিলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভাকেই শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রেসিডেন্ট কেবল নামেমাত্রই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপিত রহিলেন। প্রেসিডেন্ট ও সিনেট অবশ্য ইচ্ছা করিলে প্রতিনিধি-সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন, এই নীতিও গৃহীত হইল। কিন্তু নূতন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিনিধি-সভায় প্রজাতান্ত্রিক দলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিনেটেও প্রজাতান্ত্রিক দলের যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইলে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিকতা চিরতরে কায়েম হইবার পথ প্রশস্ত হইল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্রের সমর্থক ম্যাক্‌ম্যাহন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে সেই স্থলে জুলেস্ গ্রীভি (Jules Grevy) নামক প্রজাতান্ত্রিক নেতা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক শাসন চলিয়া আসিতেছে।

দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব লাভ

বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলন (Boulangist Movement): জেনারেল বুলাঙ্গার (Boulanger) ছিলেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সামরিক কর্মচারিবর্গের অন্যতম। তিনি যেমন ছিলেন সুদর্শন, জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেমনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নীতি-জ্ঞানহীন। তিনি তাঁহার অধীন সৈনিকদের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিজের সমর্থক দলে পরিণত করেন। তারপর তিনি জার্মানির নিকট হইতে আল্‌সেস্ লোরেন পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে এক ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেন। তিনি ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার দাবি করেন। তাঁহার কর্মপন্থা অবশ্য তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। যাহা হউক, দেশের রাজনীতিক, যাজকসম্প্রদায় তথা যে-কোন অকৃতকার্য, হতাশ ব্যক্তি-মাত্রেই বুলাঙ্গারের পক্ষে যোগদান করিলে দেশে 'বুলাঙ্গিস্ট্' আন্দোলন শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে প্রতিনিধি-সভার সদস্য নির্বাচিত করিল। ইতিমধ্যে বুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিযোগ আনীত হইলে তাঁহার বিচারের ভার সিনেটের উপর অর্পণ করা হইল। বুলাঙ্গার দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি ব্রুসেল্‌স্-এ আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলনের অবসান ঘটিল এবং তাঁহার দলেরও পতন হইল।

জেনারেল বুলাঙ্গার

বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলন

আন্দোলনে অসাফল্য

ড্রেফুস ঘটনা (Dreyfus Affair): ক্যাপ্টেন আল্‌ফ্রেড ড্রেফুস (Alfred Dreyfus) ছিলেন জনৈক আল্‌সেশিয়ান ইহুদি। এস্টারহেজি (Esterhazy) নামক অপর একজন সামরিক কর্মচারী ড্রেফুসের বিরুদ্ধে সামরিক গোপন তথ্যাদি প্রকাশ করিবা দেওয়ার এক মিথ্যা অভিযোগ আনিলে সামরিক স্কুলের প্রাঙ্গণে ড্রেফুসের পোশাক হইতে সামরিক কর্মচারীর প্রতীক চিহ্ন (Badge of rank) ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল এবং ডেভিল্‌স্ দ্বীপে (Davil's Island) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ড্রেফুসের বক্তব্য কেহ শুনিল না। কিন্তু কিছুকাল পরে কর্ণেল পিকার্ট (Colonel Picquart) সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেই তথ্য সংগ্রহ করিলেন। কর্ণেল পিকার্ট ড্রেফুসের পুনর্বিচার দাবি করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অকৃতকার্য হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত হইলেন। এই ব্যাপার লইয়া দেশে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এমিল জোলা ড্রেফুসের বিচারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে তাঁহাকেও গ্রেফতার করা হইল এবং এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তিনি কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া বিদেশে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। এইভাবে ড্রেফুসের পুনর্বিচার সম্ভব হইল না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল হেনরী স্বীকারোক্তি করিলেন যে, তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র জাল করিয়াছিলেন। এই স্বীকারোক্তির পর তিনি আত্মহত্যা করিলেন। এস্টারহেজিও

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এমিল জোলা

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের প্রমাণ

অনুরূপ স্বীকারোক্তি করিয়া দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার পর ড্রেফুসকে নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় বিচারে যাবজ্জীবন কারাবাসের পরিবর্তে দশ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট এই দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া দিলেন।

ড্রেফুসের পুনর্বিচার

ইহাতে ড্রেফুস-বিরোধী দলের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। অপরপক্ষে ড্রেফুসের সমর্থকগণ ড্রেফুস নির্দোষ সেই কথা বিচারে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে ড্রেফুসের পুনরায় বিচার হইল (১৯০৬)। এইবার তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহার পদোন্নতি ঘটিল। পিকার্টকেও অনুরূপে পুনর্নিয়োগ করা হইল এবং তাঁহারও পদোন্নতি ঘটিল। ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জাল করিবার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পদচ্যুতি ও শাস্তি হইল। ড্রেফুস-বিচারে শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও সততার জয় ঘটিলে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল।

ড্রেফুসের তৃতীয়-বার বিচার—নির্দোষ সাব্যস্ত

চার্চ কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা (Opposition to Socialism by the Church)ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ হইতেই ফরাসী চার্চ রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু ফরাসী চার্চ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপর আস্থাবান ছিল না। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি ফরাসী চার্চের বিরোধিতা বুলাঙ্গিস্ট আন্দোলন ও ড্রেফুস বিচার-সংক্রান্ত আন্দোলনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বহু ধর্মযাজক এই দুই আন্দোলনের কালে তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, চার্চ ও ধর্মযাজকগণ বিরাট পরিমাণ সম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ নিজ শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই সময়ে ফ্রান্সের শিক্ষায়তনগুলির অধিকাংশ-ই ছিল চার্চের পরিচালনাধীন। সেই সূত্রে যাজক সম্প্রদায় রক্ষণশীলতা ও প্রজাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা প্রচারের সুযোগ পাইত। এমতাবস্থায় ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র জনমতের সৃষ্টি হইল। ওয়ালডেক্-রুশো (Waldeck-Rousseau) মন্ত্রিসভা ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নিরাপত্তার জন্য চার্চের ক্ষমতা হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সংঘ-সংক্রান্ত একটি আইন (Law of Association) পাস করিয়া নূতন কোন ধর্মসংঘ বা রাজনৈতিক সংঘ গঠন করিতে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সরকারের অনুমোদিত যাবতীয় ধর্মসংঘ ও রাজনৈতিক সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশও জারি করা হইল। ইহার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চার্চের অধীন বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিতে বা রাষ্ট্রের নিকট ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইল। পর বৎসর রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ আইন (Law of Separation) পাস করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সহিত যে-চুক্তি (Concordat) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া

চার্চ ও যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরোধিতা

ওয়ালডেক্-রুশো মন্ত্রিসভার আইন

চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ

হইল। চার্চকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়া তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। চার্চের ভূ-সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রাষ্ট্র হইতে চার্চ কোনপ্রকার অর্থ সাহায্য পাইবে না, চার্চের অধীন ধর্মাধিষ্ঠানে সকলে সমভাবে প্রবেশাধিকার পাইবে—এই সকল শর্ত প্রবর্তিত হইল। এইভাবে ফরাসী তৃতীয় প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ফরাসীগণ শোষণহীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের আন্দোলনের ফলে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন প্রবর্তিত হইল। এগুলির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দান (১৮৮৪), শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের আইন (১৮৯৮), শ্রমিকদের কর্মকাল দশ ঘণ্টায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া (১৯০৬) ও বৃদ্ধাবস্থায় পেনশন বা ভাতা দানের আইন (১৯১০) প্রভৃতি পাস করা হইল। এই সকল উন্নয়নমূলক আইন পাস হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রকার গোলযোগের কতকটা অবসান ঘটিল। কিন্তু ইহার পরও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন বন্ধ হইল না।

ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার

শ্রমিক-উন্নয়ন আইন

তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি (French Colonial Expansion under the Third Republic)ঃ ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি (১৭১৩) এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) ফলে ফ্রান্স (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে) যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, উহার অধিকাংশই ইংলণ্ডের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশ মাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, আফ্রিকার সেনিগাল, ভারতবর্ষে এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটে কয়েকটি স্থানে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের দিকে মনোনিবেশ করিল। প্রথমেই ফ্রান্স আফ্রিকার উপকূলে আলজিরিয়া অধিকার করিল। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স কোচিন-চীন, কম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া অধিকার করিল। ইহার কিছুকাল পর আফ্রিকার টিউনিস, গিনি, ড্যাহোমে, আইভরি কোস্ট, নাইজেরিয়া অঞ্চল, কঙ্গোর উত্তরাংশ প্রভৃতি ফ্রান্সের অধিকারে আসিল। এশিয়ার আনাম, টনকিং, ম্যাডাগাস্কার ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত হইল। ইহা ভিন্ন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স মরক্কো নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম হইল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের উপনিবেশ হস্তচ্যুত

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ঔপনিবেশিক বিস্তার-নীতি

বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ

অধ্যায় ১৬

গ্রেট ব্রিটেন ১৮৯০-১৯১৪

(Great Britain, 1890-1914)

ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের প্রসার (Spread of Socialism in Britain) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক প্রভাব অত্যধিক মাত্রায় বিস্তারলাভ করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মার্ক্স্‌বাদী সমাজতন্ত্র ইংরেজদের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে 'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' (Social Democratic Federation) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। উইলিয়াম মরিস্‌, হেনরী হিণ্ডম্যান-এর ন্যায় মনীষীরাও এই দলভুক্ত ছিলেন।

'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' (Social Democratic Federation)

দুই বৎসর পর 'ফ্যাবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান মার্ক্স্‌-এর মতবাদের উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া সরকার, ভূ-সম্পত্তি ও শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি প্রয়োগের জন্য সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারকার্য শুরু করে। জর্জ বার্ণার্ড শো, সিড্‌নী ওয়েব্‌ প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন।

'ফ্যাবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society)

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কেয়ার হার্ডি নামে জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্‌ লেবার পার্টি' (Independent Labour Party) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে 'উদারপন্থী' (Liberal) ও 'রক্ষণশীল' (Conservative) দলের বিরোধিতা শুরু করেন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্‌ লেবার পার্টি' (Independent Labour Party)

এদিকে ব্রিটেনের ট্রেড্‌ ইউনিয়নের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল ট্রেড্‌ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ও আয়বৃদ্ধির ফলে ট্রেড্‌ ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, এগুলি ব্রিটেনের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইয়া উঠে।

ট্রেড্‌ ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এমন সময় (১৯০১) ব্রিটেনের সর্বোচ্চ বিচারালয় প্রিভিকাউন্সিল অর্থাৎ হাউস্‌ অব্‌ লর্ডস্‌ ট্রেড্‌ ইউনিয়নের ধর্মঘট সম্পর্কে এক বিচারে রায় দিলেন যে, ট্রেড্‌ ইউনিয়ন ধর্মঘট করিলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সেই ক্ষতিপূরণ ট্রেড্‌ ইউনিয়ন আইনত দিতে বাধ্য। ইহার ফলে ট্রেড্‌ ইউনিয়নের ধর্মঘট করিবার ক্ষমতা স্বভাবতই নাকচ হইয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের ট্রেড্‌ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ফ্যাবিয়ান সোসাইটি, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি, সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন—এই সব

ব্রিটেনের লেবার পার্টির উৎপত্তি

কয়টি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'ব্রিটেনের লেবার পার্টি' (Labour Party) গঠন করিল। ট্রেড্ ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লেবার পার্টি গড়িয়া উঠিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মোট ২৯ জন শ্রমিক লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হইল। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা, বলা বাহুল্য।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির সাফল্য

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্তনে ব্রিটেনের উদারনৈতিক দল (Liberal Party) সামাজিক ও ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকরী করিতে উৎসাহী হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল দল ব্রিটিশ জনসাধারণের সমর্থন স্বভাবতই হারাইল। ১৯০৫ খ্রীঃ হইতে ১৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত উদারনৈতিক দল তাহাদের প্রগতিশীল নীতি অনুসরণের ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। ট্রেড্ ইউনিয়নের ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া Trade Disputes Act নামে এক আইন পাস করা হইল (১৯০৬)। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়নের সঞ্চিত অর্থ রাজনৈতিক নির্বাচনের কাজে ব্যয়িত হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইল। ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্যগণ যাহাতে পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারে সেজন্য পার্লামেন্টের সভ্যদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। Workingmens' Compensation Act, Trade Boards Act, Labour Exchange Act, Minimum Wage Act প্রভৃতি বিভিন্ন আইন পাস করিয়া উদারনৈতিক দল শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করিল এবং লেবার পার্টির পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন রহিল। তথাপি উদারনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সমালোচনার অভাব হইল না। লেবার পার্টি হইতে আরও শ্রমিক-কল্যাণ আইন দাবি করা হইল, আবার উদারনৈতিক দলের অনেকে সরকারের অত্যধিক প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করিলেন।

উদারনৈতিক সরকারের শ্রমিককল্যাণ ও ভূ-সম্পত্তির সংস্কার সাধন প্রবর্তন

সমাজকল্যাণমূলক আইন

যাহা হউক, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যে-সকল সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল এবং সেই কারণে, যে-অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন ছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং সামরিক ও নৌবিভাগের প্রসারের বর্ধিত ব্যয় সংকুলানের জন্য ল্যয়েড্ জর্জ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপর অধিক মাত্রায় করভার স্থাপন করিলেন। আয়কর, অধিক আয়-জনিত সুপার ট্যাক্স, উত্তরাধিকার কর, অনুপার্জিত সম্পত্তির উপর কর, মোটর গাড়ীর উপর কর—প্রভৃতি নানাবিধ কর স্থাপন করিয়া বাজেট পাস করিলেন। হাউস্ অব্ লর্ডস্ উহা প্রত্যাখ্যান করিলে ল্যয়েড্ জর্জ পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনে জয়ী হইয়া প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে ব্রিটেনের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। ইহার পর ল্যয়েড্ জর্জ পার্লামেন্ট সংস্কার আইন (১৯১০) পাস করিয়া ব্রিটিশ হাউস্ অব্ লর্ডস্-এর ক্ষমতা খর্ব করিলেন।

ল্যয়েড্ জর্জ বাজেট: হাউস্ অব্ কমন্স ও হাউস্ অব্ লর্ডস্-এর বিরোধিতা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেন্ট সংস্কার আইন

তাহার ফলে ব্রিটেন উহার বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিল। এই কারণে ব্রিটেন এশিয়ার উদীয়মান শক্তি জাপানের সহিত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই Splendid Isolation নীতি পরিত্যাগ করিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিতও ব্রিটেন এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। এইভাবে তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের এবং নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যেটুকু সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল তাহা ব্রিটেন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (১৯০২)

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী (১৯০৪)

১৯০৫ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উদারনৈতিক দলের মন্ত্রিত্বকালে এডোয়ার্ড গ্রে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এই সময়কার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতি অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই পৃথক ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, নৌবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি নীতির দিক দিয়া তুলনা করিলে ডিজ্‌রেইলী, সল্‌স্‌বেরির পররাষ্ট্র-নীতি এবং এডোয়ার্ড গ্রে তথা উদারনৈতিক মন্ত্রিসভার নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এডোয়ার্ড গ্রে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলিলেন, তদুপরি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্বেই এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ফ্রান্স, ইংলন্ড ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার ফলে এই তিন দেশ 'ট্রিপ্‌ল্‌ আঁতাত' (Triple Entente) নামে এক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। জার্মানি কর্তৃক সংগঠিত 'ট্রিপ্‌ল্‌ এলায়েন্স' (Triple Alliance) এর ইহা ছিল প্রত্যুত্তর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রিচার্ড হেলডেন্‌-এর সামরিক সংস্কার ও নৌ ও সেনাবাহিনীর প্রসার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডোয়ার্ড গ্রে'র কার্যকলাপ সহজতর করিয়াছিল। জার্মানি কর্তৃক নৌশক্তি বৃদ্ধির পাল্টা জবাব হিসাবে ব্রিটেন নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নৌবল বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইল। ফলে, ইঙ্গ-জার্মান নৌবল বৃদ্ধির এক প্রতিযোগিতা শুরু হইল। এইভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

উদারনৈতিক দলের পররাষ্ট্র-নীতি রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতির অনুসৃতি মাত্র

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (১৯০৭)

ট্রিপ্‌ল্‌ আঁতাত

ব্রিটিশ নৌবল বৃদ্ধি

অধ্যায় ১৭

সমাজতন্ত্রবাদ

(Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি (Rise of Socialism) : আধুনিক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হইল সমাজতন্ত্রবাদের জনপ্রিয়তা। শিল্প-বিপ্লব প্রসূত কারখানা প্রথার (Factory System) দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ট্রেড্ ইউনিয়ন ও প্রজাহিতৈষী আন্দোলন ফ্যাক্টরী-প্রথা প্রসূত সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই অর্থ সঞ্চিত হইতেছিল। এইভাবে অর্থবলে বলীয়ান এবং মূলধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর দিকে শ্রমিকগণ সামান্য পারিশ্রমিকে নিজ শ্রম বিক্রয় করিয়া দরিদ্র-জীবন যাপন করিতেছিল। মূলধনী বা মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যুগ্ম চেষ্টায় যে-অর্থ আয় হইত তাহার একাংশ শ্রমিকগণ পারিশ্রমিক হিসাবে পাইত বটে, কিন্তু মুনাফার অঙ্কে তাহাদের কোন দাবি বা অংশ ছিল না। ফলে, দিন-দিনই মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অভাবনীয় পার্থক্যের সৃষ্টি হইল। এই অন্যায়মূলক পার্থক্য এবং মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ফলে 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামক চিন্তা-ধারার উদ্ভব হইল। মূলত সমাজতন্ত্রবাদ অন্যায়মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরিদ্র ও শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হিসাবেই শুরু হইয়াছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার লাভ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তির কারণ

শ্রমিকদের উপকারার্থে এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য জমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা প্রয়োজন এবং এই সকল উপাদান কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে বা নিয়ন্ত্রণা-ধীনে থাকিবে না, ইহাই হইল সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা। শ্রম, জমি, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের সামগ্রী কাজে লাগাইয়া কেহ লাভবান হইতে চাহিলেই শোষণ ও অন্যান্য প্রকার অ-ন্যায্য ব্যবহারের সুযোগ হইয়া থাকে। এইজন্য সমাজতান্ত্রিকগণ এই সকল উপাদানের উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করেন না।

উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন

সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এবং এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বা দলের মতবাদে কতক কতক পার্থক্যও আছে। কিন্তু (১) ব্যক্তিগত মূলধন ও মূলধনী সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন, (২) শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং (৩) উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্থাপন—এই তিনটি মূলনীতি সকল শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিকগণ মানিয়া থাকেন। সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যেও মতানৈক্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বণ্টনের ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।* সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত মূলধন বা ভূ-সম্পত্তির মাধ্যমে মানুষের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য হরণ বন্ধ করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্বপ্রকার সম্পত্তির বিলোপ সাধন এই মতবাদের উদ্দেশ্য নহে।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের মৌলিক ঐক্য : (১) মূলধন ও মূলধনীর বিলোপ, (২) শ্রমিকদের উন্নতি, (৩) উৎপাদনের উপাদানের রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব : সংজ্ঞা

ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) সর্বপ্রথম 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism) কথাটির ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ নামকরণের বহু পূর্ব হইতেই অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা একাধিক মনীষী করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমষ্টিগত ভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখল করিবার মতবাদ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অসাম্য, মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণ ইংরেজ মনীষী জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জেম্স্ মিল (James Mill) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এবং অন্যান্য দেশের অনেকেরই সমালোচনা এড়ায় নাই। তাঁহারা অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেন নাই। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা হউক এবং তাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হউক, এইজন্য তাঁহারা প্রয়োজনীয় সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কৃষিজীবী-সম্প্রদায়-উদ্ভূত ফ্রাঁসোয়া বেইবিউফ্ (Francois Baibeuf) সরকারের কর্তৃত্বাধীনে সমগ্র জাতীয় আয় বণ্টনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ষড়যন্ত্রের সাহায্যে শাসনতন্ত্র হস্তগত করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি ধরা পড়েন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অন্তত

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

বেন্থাম্, মিল

ফ্রাঁসোয়া বেইবিউফ্

* "Socialism signifies the conduct of all the processes of production and distribution by society itself, organised on a democratic basis. It would abolish all private capital and all private ownership of land It does not necessarily mean the elimination of private property or levelling all individuals to the same wage." Riker, p. 432.

এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্ব হইতেই অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজতন্ত্রবাদ : ইংলণ্ডের আওয়েন, হজ্‌স্কিন, টমসন, ফ্রান্সের ফোরিয়ার, সেণ্ট্ সাইমন

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে একশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিকের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen), টমাস্ হজ্‌স্কিন (Thomas Hodgskin), উইলিয়াম টম্‌সন্ (William Thompson) এবং ফ্রান্সের চার্লস্ ফোরিয়ার (Charles Fourier) ও সেণ্ট্ সাইমন (Saint Simon)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমাজতান্ত্রিকের আদর্শ ছিল এমন সমাজ স্থাপন করা, যে-সমাজে সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে এবং সকলের শ্রম দ্বারা লব্ধ আয় সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা হইবে।* ইহারা 'ইওটোপিয়ান্স্' (Utopians) বা অবাস্তব আদর্শবাদী নামে পরিচিত। কার্ল মার্কস্ তাঁহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। 'ইওটোপিয়ান্'গণ নিজেরা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। রবার্ট আওয়েন প্রথম জীবনে ম্যান্চেস্টার-এর এক কাপড়ের কলের ম্যানেজার ছিলেন। ফ্যাক্টরী-প্রথার যাবতীয় কুফল ও দুঃখ-দুর্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। নিউ ল্যানার্ক (New Lanark) নামক স্থানে তিনি একটি আদর্শ কাপড়ের কল স্থাপন করেন। শ্রমিকদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিউ ল্যানার্ককে তিনি শ্রমিকদের এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত স্থাপয়িতা।

'ইওটোপিয়ান্স্' বা অবাস্তব আদর্শবাদী আখ্যা

রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)

ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী সেণ্ট্ সাইমন ছিলেন রবার্ট আওয়েনের সমসাময়িক। তিনিও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন এবং মোট আয় বণ্টনের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শিল্প ভিত্তিক রাষ্ট্র (Industrial State) গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। পরস্পর প্রতিযোগিতাবিহীন, ব্যক্তিগত স্বার্থজ্ঞানশূন্য এবং অর্থনৈতিক দুর্দশামুক্ত সমাজ গঠন করিয়া জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা বহু ফরাসী যুবককে প্রভাবিত করিয়াছিল। আওয়েন যেমন ছিলেন ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক, সেইরূপ ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিকতার প্রকৃত

সেণ্ট্ সাইমন (১৭৬০-১৮২৫)

* They advocated "a system of self-sufficing communities which should work in the common and share equitably the fruit of all their labours." Rikes, p. 437.

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সেণ্ট্ সাইমন ; ফরাসী সমাজতান্ত্রিক চার্লস্ ফোরিয়ার পনর শত জনসংখ্যা লইয়া এক একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'কমুন' (Commune) বা 'ফ্যালান্স্টারি' (Phalanstary) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেকটি কমুন একত্রে কাজ করিবে এবং সকলের শ্রমে উৎপন্ন সম্পদ নিজেরা ভোগ করিবে। সামাজিক উন্নতির মূলসূত্রই হইল পরস্পর সমতা স্থাপন এবং সকলের মধ্যে একতার ভাব জাগাইয়া তোলা—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

চার্লস্ ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭)

'ইওটোপিয়ান্' সমাজতান্ত্রিকগণ ও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx)-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)। তিনি বাস্তববাদী সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। সেণ্ট্ সাইমনের ন্যায় তিনিও "প্রত্যেকেই নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং উহার বিনিময়ে প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইবে"—এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইওটোপিয়ান্দের ন্যায় তিনি অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করিয়া উহার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ কার্যকরী করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এইজন্য তিনি জাতীয় কারখানা স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং সুপরিকল্পিত কার্যপন্থার অভাবহেতু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

লুই ব্লাঁ

লুই ব্লাঁ সমাজতন্ত্রবাদকে অবাস্তব কল্পনার জগৎ হইতে বাস্তব জগতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন।* তাঁহার সময় হইতেই উহা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসাবে রাজনীতিতে স্থান লাভ করে।

লুই ব্লাঁ যখন ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা চালাইতেছিলেন ঐ সময়ে ইংলণ্ডে চার্টিস্ট্ আন্দোলন (Chartist Movement) নামে এক শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় (১৮৪৮)। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার আদায় করা। চার্টিস্টগণ ভোটাধিকার দাবি করিয়াছিল, কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভোটাধিকারের সাহায্যে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াই নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব। চার্টিস্ট্ আন্দোলন বলপূর্বক দমন করা হইলেও উহার প্রভাব পরবর্তী কালে সরকারী নীতির উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকটি দাবিই † স্বীকৃত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৪৮)

* "With Blanc, socialism came nearer to the earth and entered into practical politics." *Europe Since Napoleon*, David Thomson, p. 178.

† "The Chartists demanded six concessions ; manhood suffrage, vote by ballot annual Parliaments, payment of members of Parliament, abolition of property, qualification for membership of Parliament and equal electoral districts.

শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা ইংরেজ সাহিত্যসেবী টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle)-এর রচনায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার 'চার্টিজম্' (Chartism), 'পাস্ট এ্যান্ড্ প্রেজেন্ট' (Past and Present) এবং 'লেটার-ডে প্যামফ্লেটস্' (Letter-day Pamphlets) নামক পুস্তকগুলিতে কার্লাইল শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি যে-অবিচার চলিতেছিল, উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সমাজতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।*

টমাস্ কার্লাইলের সমাজতান্ত্রিক প্রভাব

প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকগণ তাঁহাদের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সক্ষম না হইলেও তাঁহাদের প্রচারকার্য এবং সমাজতান্ত্রিক কার্যাদি শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির উপরও এই নূতন ভাবধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এ্যাডাম্ স্মিথ প্রমুখ মনীষীদের প্রচারিত স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individual theory) ক্রমে পরিত্যক্ত হইল। সমাজতন্ত্রের উপর মানুষের আস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কার্ল মার্ক্স্ তাঁহার মানসিক ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সাহায্যে সমাজতন্ত্রবাদকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা প্রদর্শন করিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে এক নূতন রূপ দান করিলেন।

প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব

কার্ল মার্ক্স্ কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদের নূতন রূপদান

কার্ল মার্ক্স্, ১৮১৮-'৮৩ (Karl Marks, 1818-'83) : কার্ল মার্ক্স্ ছিলেন একজন জার্মান ইহুদি। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলের ট্রিয়ার (Trier) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বভাবতই তিনি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই কার্ল মার্ক্স্ বাল্যকাল হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ (Bonn) ও বার্লিন (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্স্ শিক্ষালাভ করেন। আইনজীবী পিতার পুত্র হিসাবে আইন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিলেও ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ঐ সময়ে জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) দার্শনিক হিসাবে চরম সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্ক্স্ হেগেলের প্রভাবাধীনে আসিলেন। ইতিহাসকে ক্রমবিবর্তনের অভ্রান্ত গতি হিসাবে উপলব্ধি করিবার জ্ঞান তিনি হেগেলের নিকট হইতেই লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপিকিউরাসের দর্শন (Philosophy of Epicurus) সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর

কার্ল মার্ক্সের জন্ম, বাল্যজীবন ও শিক্ষা

ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি অনুরাগ : হেগেলের প্রভাব

* "He was the strongest influence towards Socialism." Vide, Hazen, p. 266.

ডিগ্রী (Doctorate) লাভ করেন। ঐ সময়ে জার্মানির যুবসমাজের মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল কার্ল মার্কস্ তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

মার্কস্ আজন্মই একজন বিপ্লববাদী ছিলেন. নানাবিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের পর তিনি ক্রমে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন এবং শ্রমিক সমাজের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। ঐ সময়ে তিনি 'রেনিশ গেজেট' (Rhenish Gazette) নামে একটি চরমপন্থী গণতান্ত্রিক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রগতিশীল মতবাদ অল্পকালের মধ্যেই প্রাশিয়ার সরকারের কোপানল প্রজ্বলিত করিল। মার্কসের পত্রিকা সরকারী আদেশে বন্ধ হইল। তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল। মার্কস্ ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি প্রাওধন, হাইনরিক্ হাইন্, পিয়েরি লেরক্স (Proudhon, Heinrick Heine, Pierre Leroux) নামক ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের সংস্পর্শে আসিলেন. সেই সময়কার সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্গণ প্রায়ই প্যারিস, ব্রুসেলস্, লণ্ডন এবং সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নির্বাসিত অবস্থায় তাহাদের কার্য-কলাপ চালাইতেন। ফ্রান্সে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Frederick Engels) নামে একজন জার্মান সমাজতান্ত্রিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। প্রাশিয়ার সরকারের ইঙ্গিতে ফ্রান্স হইতেও মার্কস্‌কে বহিষ্কৃত করা হইল। তিনি ব্রুসেলস্-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে এঙ্গেলস্-এর সহায়তায় কার্ল মার্কস্ 'কমিউনিস্ট্ লীগ' (Communist League) নামে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বস্তুত ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন নির্বাসিত জার্মান সমাজতান্ত্রিক ফ্রান্সে "লীগ অব্ দি জাস্ট" (League of the Just) নামে যে-সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস্ উহাতে যোগদান করেন। ইহার নূতন নাম হয় 'কমিউনিস্ট্ লীগ' (Communist League)।* ক্রমে এই লীগে বহু ইংরেজ সমাজতান্ত্রিকও যোগদান করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বক্তৃতা এবং রচনার সাহায্যে কার্ল মার্কস মূলধন ও ধনতান্ত্রিকতার অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ব্রুসেলসে কয়েক বৎসর বাস করিবার পর মার্কস্ ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেখানে অবস্থানকালে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) নামে তাঁহার বিখ্যাত প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। রবার্ট আওয়েন, সেন্ট্ সাইমন, ফোরিয়ার, ব্লাঁ প্রভৃতি আদর্শবাদী অবাস্তব সমাজতান্ত্রিক (Utopian and visionary socialism) চিন্তাধারার স্থলে আধুনিক সমাজতন্ত্র-বাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই ম্যানিফেস্টোতে দিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন,

মার্কসের নির্বাসন : ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিকদের সহিত পরিচয় : ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (১৮২০-'৯৫)-এর সহিত বন্ধুত্ব

কমিউনিস্ট্ লীগ স্থাপন

কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)

*Vide, David Thomson, p. 179.

"সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হইল বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার আমূলে উৎপাটন।"* এই 'ম্যানিফেস্টো' আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের 'প্রথম ধ্বনি' (birth-cry) বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রচারপত্রের জ্বালাময়ী আবেদনের মাধ্যমে মার্কস্ তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর সকল শ্রমিককে সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। কার্ল মার্কস্ 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism)-এর পরিবর্তে কমিউনিজম্ (Communism) নামটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।

'কমিউনিজম্' নাম ব্যবহারের যুক্তি

কারণ, প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকগণ 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism) কথাটি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মতবাদ প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকদের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল বলিয়া তিনি 'কমিউনিজম্'—এই নূতন নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল' (Das Capital) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক তীব্র সমালোচনা করেন। ঐ সময় হইতে রুশোর 'সামাজিক চুক্তির মতবাদ' (Contrat Social)-এর ন্যায় মার্কসের 'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধর্মগ্রন্থস্বরূপ—অর্থাৎ মূলনীতি হইয়া উঠে। রুশোর সামাজিক চুক্তির মতবাদ যেমন ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা দান করিয়াছিল, সেইরূপ ড্যাস্ ক্যাপিট্যালও রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের মৃত্যু হয়।

'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল'-এর প্রভাব

মার্কসের মৃত্যু (১৮৮৩)

কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) : কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোতে মার্কস্ হেগেলের মতবাদ হইতে ইতিহাসের অগ্রগতি এক অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বমূলক (dialectic) বিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব হইতেছে, এই যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হেগেল যেখানে এই অগ্রগতিকে সর্বব্যাপী আত্মার প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, মার্কস্ সেইখানে উহা একমাত্র অর্থনৈতিক তাগিদের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ইতিহাস কেবল বঞ্চিত এবং বঞ্চনাকারীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতেছে। ইতিহাস সেই কারণে শ্রেণী-সংগ্রামের কাহিনী। আধুনিক সমাজে শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বুর্জোয়াদের হস্তেই অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া থাকে এবং এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া তাহারা উৎপাদনের উপাদান নিজেদের মালিকানাধীনে আনিতে পারে। ফলে, পৃথিবীর উৎপাদনের উপাদান এবং শ্রমিক যাহারা নিজেরা উৎপাদনের উপাদানের মালিক নহে তাহাদের শোষণ অনিবার্য হইয়া উঠে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের উদ্যোগী এবং

কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোর মুখ্য বক্তব্য

*"All men are brothers, the single purpose is the forcible overthrow of the whole existing social order." *Ibid*, p. 179.

প্রতিপত্তিশালী অংশ হইবার ফলে যাহারা শ্রম বিক্রয় করে, অর্থাৎ যাহারা শ্রমিক তাহাদের শোষণ এবং পীড়ন সমানভাবে চলে। কিন্তু মার্কস্ তাঁহার ম্যানিফেস্টোতে এই কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বুর্জোয়ারা যাহা উৎপাদন করে তাহার সর্বোপরি উৎপন্ন হয় সেই সব লোক যাহারা তাহাদের কবর খনন করিবে। বুর্জোয়াদের পতন এবং প্রোলিটারিয়েটদের জয়লাভ সমভাবে অবশ্যম্ভাবী।

বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন অবশ্যম্ভাবী

মার্কসের মতে সেই কারণে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক শাসন চলাইবার কেবলমাত্র মুখোস হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রমিকদের কোন জাতীয়তাবোধ অর্থাৎ নিজ দেশের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য থাকা সমীচীন নহে। কারণ পৃথিবীর অপরাপর দেশের শোষিত শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত প্রত্যেক দেশের শ্রমিকের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। এই একই কারণে প্রোলিটারিয়েট বিপ্লব অর্থই হইল পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব। প্রথমে প্রোলিটারিয়েট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রোলিটারিয়েট ডিক্টেটরশিপ স্থাপিত হইবে এবং ক্রমে শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হইবে। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ এই ম্যানিফেস্টোতে সেই বিখ্যাত আশ্বাস সকল শ্রমিককে শুনাইয়াছিলেন: "শ্রমিকদের কেবল শৃংখল ভিন্ন আর কিছুই হারাইবার নাই, তাহাদের পাইবার আছে অনেক কিছু। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকগণ এক হও।"

প্রোলিটারিয়েট বিপ্লবের প্রকৃতি

কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম লণ্ডন শহর হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসেই ফ্রান্সে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার উপর এই ম্যানিফেস্টো বা প্রচারপত্রের কোন প্রভাব পড়ে নাই। কিন্তু পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে উহা সমগ্র ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সংস্করণ বাহির হয়। ইহা পৃথিবীর আধুনিক সমাজতান্ত্রিকদের নিকট বাইবেল গ্রন্থস্বরূপ।

কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোর বিস্তার

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে প্রোলিটারিয়েট-শাসিত সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলি হইল: (১) জমির মালিকানা বাতিল করা এবং জমির খাজনা সমাজের কাজে ব্যবহার করা। (২) উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি ভোগ দখল রোধ করা। (৩) ক্রমপর্যায়ে বর্ধিত পরিমাণে আয়কর ধার্য করা। (৪) দেশত্যাগী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। (৫) পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা। (৬) ব্যাংক-এর মালিকানা বাতিল করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ মূলধনে ব্যাংক পরিচালন করা। (৭) রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগৃহীত শিল্পের ক্রমবিস্তার এবং পতিত জমি রাষ্ট্রের উদ্যোগে চাষের উপযোগী করা। (৮) শ্রমিকের প্রতি সমান দায়িত্ব পালন করা এবং তাহাদিগকে শোষণমুক্ত রাখা। (৯) কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য সাধন করা এবং ক্রমে গ্রাম ও শহরের কৃত্রিম পার্থক্য দূর করা। (১০) প্রচলিত

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে প্রোলিটারিয়েট সমাজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পদ্ধতিতে কারখানায় শিশু-শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা। (১১) সকল শিশুকে অবৈতনিক ভাবে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। (১২) শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা।

ডক্টর এঙ্গেল্‌স্‌, ১৮২০-'৯৫ (Dr. Engels, 1820-'95): ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌ কার্ল মার্ক্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহযোগী ছিলেন। মার্ক্স্‌ প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার সহিত পরিচিত হন। প্যারিস হইতে মার্ক্স্‌কে বহিষ্কার করা হইলে এঙ্গেল্‌স্‌ও তাঁহার সহিত ব্রুসেলস্‌-এ চলিয়া যান। ১৮৪৪ হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক্সের মৃত্যু পর্যন্ত এঙ্গেল্‌স্‌ মার্ক্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার *The Condition of Working Classes in England* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ধনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন।

মার্ক্সের সহিত বন্ধুত্ব

কমিউনিস্ট্‌ ম্যানিফেস্টো রচনায় মার্ক্স্‌কে সহায়তা

এঙ্গেল্‌স্‌ কার্ল মার্ক্সের সহিত একযোগে শ্রমিক সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে উহার সর্বপ্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই এই সংঘের নাম হয় কমিউনিস্ট্‌ লীগ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিখ্যাত কমিউনিস্ট্‌ ম্যানিফেস্টো মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌—উভয়ে রচনা করিয়াছিলেন।

নিজ গ্রন্থসমূহ

Das Capital-এর ২য় ও ৩য় খণ্ড সম্পাদনা

এঙ্গেল্‌স্‌ মার্ক্সের অন্যান্য গ্রন্থ রচনায়ও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থের মধ্যে *Socialism, Anti-Duhring Utopian and Scientific, Private Property and the State* প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পর ড্যাস্‌ ক্যাপিট্যাল (Das Capital)-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা এঙ্গেল্‌স্‌ করিয়াছিলেন।

মার্ক্সের মতবাদ ও উহার গুরুত্ব (Marxism : Its Importance): কার্ল মার্ক্স্‌ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক হিসাবে জগদ্বিখ্যাত। তিনি তাঁহার পূর্বগামী সমাজতান্ত্রিকদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের চারিটি মূলসূত্র রহিয়াছে :

প্রথমত, হেগেলের ন্যায় তিনিও পরস্পর-বিরোধী, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও শক্তির সংঘাতের ফলস্বরূপ ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিতেছে—এই কথা বিশ্বাস করিতেন। মার্ক্স্‌ ঐতিহাসিক ধারাকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংঘর্ষের কাহিনী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে মানুষের জীবনের মূল প্রভাবই হইল অর্থনৈতিক প্রভাব। সুতরাং প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের ইতিহাস মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরস্পর সংঘর্ষ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস ও স্বাধীন শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণী ও সার্ফদের দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক যুগের

ইতিহাস—অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কাহিনী

মালিক ও মজুর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব একই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষ। এইভাবে মার্কস্ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, মার্কস্ মানবসমাজকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা: মূলধনী বা মালিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। মালিক বা মূলধনী শ্রেণীর উচ্ছেদের মধ্যেই শ্রমজীবী শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধভাবে মালিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রমজীবীদের নিকট আবেদনে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন: "শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আঘাতে মালিক শ্রেণী কম্পমান হউক। এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর কোন কিছু হারাইবার ভয় নাই। মালিক শ্রেণীর শোষণ ভিন্ন অপর কিছুই তাহারা হারাইবে না।"* প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বলপূর্বক উচ্ছেদ সাধনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি পৃথিবীর শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।† মালিক শ্রেণীর অবসান অন্য দিক দিয়া বিচার করা তিনি প্রয়োজন মনে করিতেন। মালিক বা মূলধনী-ভিত্তিক সমাজের প্রধান ত্রুটিই হইল উৎপন্ন সম্পদের অন্যায্য বণ্টনব্যবস্থা। এইরূপ সমাজে অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হয়। ফলে, যাহারা ধনী তাহারা অধিকতর ধনবান হইতে থাকে, অপরপক্ষে দরিদ্রেরা অধিকতর দরিদ্র হইতে থাকে। এই অর্থনৈতিক অসাম্য রোধ করিবার একমাত্র পন্থা হইল ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান।

মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর স্বার্থ-বিরোধিতা

তৃতীয়ত, মার্কস্ ইংরেজ অর্থনীতিক রিকার্ডো এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিকদের (Classical Economists) 'Labour theory of value'-এর উপর ভিত্তি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন সামগ্রীর মূল্যের সর্বপ্রথম উপাদান হইল শ্রম। কাঁচামাল বা মূলধন অর্থাৎ উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান (Produced means of production) এবং জমি ইত্যাদি সবই মূলত প্রকৃতির দান। মানুষের শ্রম ভিন্ন এগুলিকে সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে। সুতরাং কোন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য উহার পশ্চাতে ব্যয়িত শ্রমের ফল ভিন্ন অপর কিছু নহে।†† এইজন্য কার্ল মার্কসের মতে একমাত্র শ্রমের মাপকাঠিতেই মুনাফা বণ্টিত হওয়া উচিত। শ্রমিকদের শ্রমের ফলে উৎপন্ন

দ্রব্যের মূল্য মানুষের শ্রমের ফলমাত্র

*"Let the ruling classes tremble at Communistic revolution." Vide, Ketelbey, p. 341.

† "Workingmen of all countries unite!" *Communist Manifesto*, Vide, Hazen, p. 272.

†† "The economic value of a commodity consists in human labour crystallised, being directly derived from the labour that has gone to its construction." Ketelbey, p. 341.

সামগ্রী হইতে লব্ধ আয় একমাত্র শ্রমিকদেরই প্রাপ্য—অপর কাহারো ইহাতে অংশ থাকা অবৈধ এবং অযৌক্তিক।

চতুর্থত, মার্কস্-এর সমাজতন্ত্রবাদের একটি আন্তর্জাতিক আবেদন রহিয়াছে। এই কারণে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘ' (International Workingmen's Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহা সাধারণত First International নামে পরিচিত। পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় International এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চতুর্থ International স্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক আবেদন

মার্কস্‌বাদের সমালোচনা (Criticism of Marxism): মার্কস্‌বাদের নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সকল সমালোচনার মূল কথাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(১) অনেকে মার্কস্‌বাদ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, কারণ যে-সকল প্রভাব এবং প্রবণতা ধনতান্ত্রিক সমাজের (Capitalistic Society) বিলোপ সাধন করিবে বলিয়া মার্কস্ মনে করিতেন, বিগত দীর্ঘকালের ইতিহাসে ঐ সকল প্রভাব সেরূপ কিছু সম্পন্ন করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই মার্কস্‌বাদ যে অভ্রান্ত নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। বিগত অর্ধ শতাব্দীরও দীর্ঘকালের ইতিহাস মার্কস্‌বাদের অসারতাই প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

মার্কস্‌বাদ ভ্রান্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য

(২) মার্কস্‌বাদের সমালোচনায় মার্কস্-প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ধারার বা প্রয়োজনের উপরই নির্ভরশীল নহে। অর্থনৈতিক তাগিদ ভিন্ন অপরাপর বহু প্রকার প্রয়োজনের চাপে এবং বহুবিধ প্রভাবের ফলে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিয়া থাকে। ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, দৈহিক শক্তি, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রগতিশীল প্রেরণা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার শক্তি ও প্রভাবের সমষ্টিগত ফলই হইল ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন। সুতরাং ইতিহাসকে একমাত্র অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কাহিনী বা অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের আন্দোলনের বর্ণনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা অনেকেই ভুল মনে করেন। মানুষের সমস্যার মূলে অর্থনৈতিক কারণ প্রধান হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান আশা করা অযৌক্তিক।

মার্কস্-প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ত্রুটি

(৩) ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব ক্রমে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে বলিয়া মার্কস্ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রভাব এবং প্রবণতার বিরুদ্ধেই যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই কথা মার্কস্ বিবেচনা করেন

নাই। মানবসমাজের ধর্মই হইল সমাজের স্বার্থবিরোধী বা অমঙ্গলজনক সব কিছুই ক্রমে নাশ করিয়া সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মার্কসের সামাজিক বিপ্লবের (Social Revolution) ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। বস্তুত, শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক উন্নয়ন আইন-কানুন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের কার্যকলাপ প্রভৃতির ফলে মূলধনী ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। শ্রমজীবী ও মালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে।

মালিকশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের বিভেদের ক্রমহ্রাস

(৪) অধ্যাপক সিম্‌খোভিচ্ (Prof. Simkhovitch) প্রমুখ সমালোচকগণ মনে করেন যে, সম্পদ ক্রমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হইবে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা ক্রমে দরিদ্রতর হইবে, মার্কস্-এর এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় না হইয়া ক্রমে উন্নতির পথেই চলিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় সম্পদ ও শিল্প মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত না হইয়া বরং সমাজের সর্বস্তরে বণ্টিত হইতেছে। ইহা ভিন্ন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শিল্প-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে সংঘটিত না হইয়া কৃষি-প্রধান রাশিয়ায় ঘটিয়াছে। ইহা হইতে মার্কস্‌বাদের মালিক ও শ্রমিকের পরস্পর বিদ্বেষের ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত হওয়ার আশংকা ভ্রান্ত

কিন্তু মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধজনিত জটিল সমস্যার সমাধানে মার্কস্‌বাদ তথা সমাজতন্ত্রবাদ সার্থক ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হইয়াছে। আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির সহজাত দোষ-ত্রুটির নির্ভীক সমালোচনা দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহা মার্কস্‌বাদ সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। মার্কসের সময় হইতে প্রত্যেক দেশেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই সমাজবাদী রাষ্ট্রকর্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়াছে, জনসাধারণের নিকট সমাজতন্ত্রবাদের আবেদন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কস্‌বাদের অবদান

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন প্রকার (Different types of Socialism): মার্কস্‌বাদের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল কথা হইল এই যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতির ফলে ধনতান্ত্রিকতা সমাজতান্ত্রিকতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, কারণ মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকৃতপক্ষে

কার্যকরী হইতেছে না, এই ছিল তাঁহাদের অভিজ্ঞতা। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে সকলেই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাহেন। কিন্তু মালিকানার অবসানের উপায়, কিরূপ রাষ্ট্রের হস্তে এই মালিকানা ন্যস্ত হওয়া উচিত, এই সকল বিভিন্ন বিষয়ে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তাঁহাদের মতভেদের মূল কারণগুলি হইল : (১) উৎপাদনের উপাদানগুলি কি ধরনের সরকারের হস্তে দেওয়া হইবে, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা আংশিকভাবে স্বীকার করা হইবে কি না, (৩) কি পন্থা অনুসরণ করিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আনা হইবে?

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিকদের প্রকারভেদের মূল কারণ

উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নরমপন্থী সমাজতান্ত্রিকগণ (Moderate Socialists)—যেমন ইংলন্ডের লেবার পার্টি, জার্মানি ও ফ্রান্সের কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দল—'কালেক্টিভিজম্' (Collectivism) অর্থাৎ রাষ্ট্র-কর্তৃক কেবলমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। এই মতবাদে বিশ্বাসিগণ ধর্মঘট এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ এবং শাসনতান্ত্রিক উপায়ে শাসনকার্য হস্তগত করিয়া নিজ মতবাদ কার্যকরী করিতে চাহেন।

'কালেক্টিভিজম্' (Collectivism)

অপরপক্ষে সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌গণ (Syndicalists) শ্রমিক সংঘের উপর মালিকানা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালি ও ফ্রান্সে এই মতবাদে বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিকদের সাময়িক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌গণ বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী।

'সিণ্ডিক্যালিজম্' (Syndicalism)

বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী অপর একদল সমাজতন্ত্রবাদী 'এ্যানার্কিস্ট্' (Anarchist) নামে পরিচিত। ইহারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা এমন একটি সমাজ-স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে কোন আইন, সরকার বা মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত কোন শাসনব্যবস্থা থাকিবে না। তাঁহারা 'প্রাকৃতিক' রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাকুনিন (Bakunin) এবং ক্রপট্‌কিন্ (Kropikin) ছিলেন এই মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিভাবে এইরূপ প্রাকৃতিক রাষ্ট্রে পেঁছিান যাইবে, সে-বিষয়ে এ্যানার্কিস্ট্‌গণ কোন নির্দেশ দেন নাই।

'এ্যানার্কিজম্' (Anarchism)

'গিল্ড্ সোশিয়েলিজম্' (Guild Socialism) নামে অপর একটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ইংলন্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা 'কালেক্টিভিজম্' ও 'সিণ্ডিক্যালিজম্'-এর সংমিশ্রণে নিজেদের মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিল্প-পরিচালনার ভার তাঁহারা বিভিন্ন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, ম্যানেজার প্রভৃতির উপর স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন।

'গিল্ড্ সোশিয়েলিজম্' (Guild Socialism)

বিপ্লবাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিকগণ কমিউনিস্ট্ নামে পরিচিত। ইঁহারা চরমপন্থী সমাজতান্ত্রিক। তাঁহারা সর্বপ্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রের অধীন জনসাধারণকে এক বিশাল শ্রমিক সমাজে পরিণত করিতে চাহেন। শ্রম সকলকেই করিতে হইবে এবং সেই শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক যাহাতে পাওয়া যায় সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা বিপ্লবাত্মক উপায়ে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

'কমিউনিজম্' (Communism)

বর্তমানে উপরি-উক্ত বিভিন্ন প্রকারভেদ উঠিয়া গিয়া বিবর্তনমূলক (Evolutionary) এবং বিপ্লবাত্মক (Revolutionary) সমাজতন্ত্রবাদে রূপলাভ করিয়াছে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ এই দুই নামেই সমাজতান্ত্রিকদের প্রধানত ভাগ করা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিকতার প্রসার (Progress of Socialism in different States): সমাজতন্ত্রবাদ যে ক্রমেই শক্তিশালী এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রভাবে পরিণত হইতেছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয়। ফার্ডিনান্ড ল্যাসেল (Ferdinand Lassalle)-এর নেতৃত্বে স্থাপিত জার্মানির সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দল (Social Democratic Party) বিসমার্কের ন্যায় প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তিকেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক আইন-কানুন প্রণয়নে বাধ্য করিয়াছিল।

জার্মানি

ইংলণ্ডে ফ্যাবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society) এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট্ লেবার পার্টির স্থাপনের মধ্যেই সেখানকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিচয় লাভ করা যায়। নানাপ্রকার কারখানা-আইন এবং শ্রমিক-হিতৈষী আইন পাস সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসাবে পরিগণিত হয়।

ইংলণ্ড

ফ্রান্সে প্যারিস কম্যুনের স্থাপনে তথাকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেইবিউফের সময় হইতেই সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাব ফ্রান্সে অনুভূত হইয়াছিল।

ফ্রান্স

মার্কস্বাদের আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায় লেনিন ও বল্শেভিক দলের জারতন্ত্র দমনে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লব মার্কস্বাদের সর্বাধিক সফল প্রয়োগ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। চীন, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি অপরাপর দেশেও 'কমিউনিজম্' স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক বিবর্তনে 'কমিউনিজম্' এক শক্তিশালী প্রভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাশিয়া

অপরাপর বহু রাষ্ট্র উগ্র সমাজতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী না হইলেও বিবর্তনমূলক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষপাতী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন প্রগতিশীল রাষ্ট্র মাত্রেরই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অপরাপর রাষ্ট্র

অধ্যায় ১৮

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় বিস্তারনীতি
(European Expansion beyond Europe)

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় দেশগুলির বিস্তার রেনেসাঁস যুগ হইতেই শুরু হইয়াছিল। নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সময় হইতেই স্পেন, হল্যান্ড, পোর্তুগাল এবং ক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিল।

নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কার : বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ইহা ভিন্ন, ব্রাজিল পোর্তুগালের আধিপত্য অস্বীকার করে। ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কতকাংশ হারাইয়া ফেলে। এই সকল দৃষ্টান্ত ইওরোপীয় শক্তিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সাময়িকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি নূতন কারণ উপস্থিত হইলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইওরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির এক নব উদাম শুরু হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ-বিস্তারে আগ্রহ হ্রাস ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নূতন আগ্রহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির কারণগুলি ছিল প্রধানত—(১) অর্থনৈতিক, (২) রাজনৈতিক, (৩) সামাজিক (৪) ধর্মনৈতিক ও (৫) সামরিক।

কারণ :

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সর্বত্র যন্ত্রপাতির এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগের ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সব প্রচুর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে নূতন নূতন বাজারের প্রয়োজন প্রত্যেক দেশেই উপলব্ধ হইল। যানবাহনের উন্নতির ফলে মাল রপ্তানির কোন অসুবিধা ছিল না। সুতরাং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য-বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের এক উৎকট আগ্রহ দেখা দিল।

অর্থনৈতিক

কিন্তু অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন ইহার রাজনৈতিক কারণও ছিল : প্রত্যেক দেশই সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সামরিক ঘাঁটি দখল করিবার এক দারুণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। সাম্রাজ্যের বিশালতার উপরই দেশের শক্তি ও মর্যাদা নির্ভরশীল, এইরূপ এক মনোবৃত্তি প্রত্যেক দেশেই দেখা দিল। সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির প্রতিযোগিতার সূত্রে দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইল।

রাজনৈতিক

প্রত্যেক দেশে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জীবিকার সংস্থান করা সহজ ছিল না। ফলে, বেকারত্ব প্রায় সকল দেশেই এক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যা এবং বেকারদের সংস্থানের জন্যও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল।

সামাজিক

খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন দেশে তাহাদের যাতায়াতের ফলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

ধর্মনৈতিক

ইহা ভিন্ন, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ইওরোপীয় দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই ইওরোপীয়দের সহিত সংঘর্ষে এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল না। ফলে, এই দুই মহাদেশের প্রায় সকল স্থানই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

সামরিক

এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার (European Expansion in Asia) ঃ ইংলণ্ড ঃ [পূর্বকথা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, নিউ ব্রান্সউইক, নোভাস্কোশিয়া, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, হাড্‌সন উপসাগরীয় অঞ্চল, জেমেইকা এবং অপরাপর কয়েকটি পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপ ইংলণ্ডের অধীন ছিল। ভারতবর্ষে বাংলা দেশ, বোম্বাই এবং পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলের কতক স্থান ইংরেজদের অধিকারে ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলির মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এই সূত্রে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডার্‌হাম্‌কে কানাডার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংস্কারের সুপারিশের জন্য নিয়োগ করিলেন। ডার্‌হাম্‌ কানাডার শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই এক অতি দুর্বল এবং অকার্যকর অনুকরণ দেখিতে পাইলেন এবং সেখানে প্রকৃত দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণা তখনও ইংরেজদের স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, সুতরাং ডার্‌হাম্‌ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উভয় অংশকে (Upper & Lower Canada) একত্রিত করিয়া একই আইনসভা ও শাসন-ব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করা হইল। কিন্তু কানাডার একাংশ ছিল ফরাসী-প্রধান এবং অপরাংশ ছিল ইংরেজ-প্রধান। এমতাবস্থায় নূতন শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হইল না। লর্ড ডার্‌হাম্‌ উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে একই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাধীনে স্থাপনের সুপারিশও করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ-নর্থ আমেরিকান এ্যাক্ট' পাস করিয়া কানাডার উভয় অংশ নোভাস্কোশিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইক—এই কয়টি উপনিবেশ লইয়া ডোমিনিয়ন অব্‌ কানাডা (The Dominion

ডার্‌হাম্‌ রিপোর্ট ঃ 'ব্রিটিশ-নর্থ আমেরিকান' উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসন লাভ

of Canada) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হইল অটওয়া (Ottowa)। এইভাবে আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি
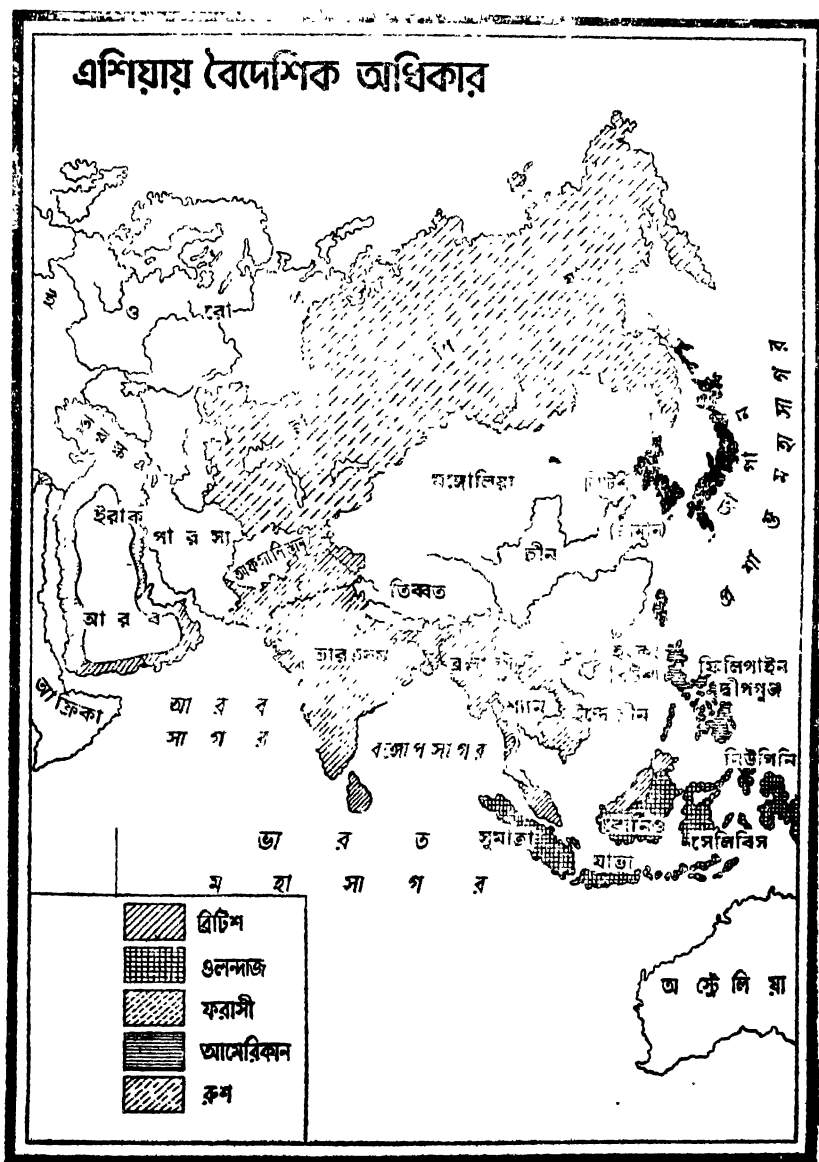
স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিল। ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে এই সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দূরীভূত হইল।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্যাপ্টেন কুক্‌ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ওলন্দাজগণ সর্বপ্রথমে এই সকল স্থান অধিকার করিলেও এই সকল স্থানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাহারা কোনপ্রকার খবরাখবর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্যাপ্টেন কুক্‌ কর্তৃক এই দুই স্থান পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতার পর সেখানে ইংলন্ডের নির্বাসন-দন্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া দন্ডাদেশপ্রাপ্ত ইংরেজগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপে নির্বাসন-দন্ডে দণ্ডিত এবং স্বেচ্ছায় আগত ঔপনিবেশিকদের সহ অস্ট্রেলিয়ার মোট ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার। স্বেচ্ছায় যাহারা অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতিবাদের ফলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ দন্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রেরণ করা বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার সোনার খনি আবিষ্কৃত হইলে দলে দলে ঔপনিবেশিকগণ অস্ট্রেলিয়ায় আসিতে থাকে। অল্পকালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ক্রমে এই অঞ্চলে নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, কুইনসল্যান্ড ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া ও টাসম্যানিয়া—এই কয়টি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সকল উপনিবেশকে কানাডার শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসনব্যবস্থার অধীনে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্রমবর্ধমান অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষে পরিণত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

অস্ট্রেলিয়ার বার শত মাইল পূর্বে অবস্থিত নিউজিল্যান্ড নামক স্থানে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ইংরেজগণ উপনিবেশ বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশটি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যান্ডকে 'ডোমিনিয়ন' আখ্যা দেওয়া হয়।

নিউজিল্যান্ডে ব্রিটিশ অধিকার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মারাঠাসংঘকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শত্রুর পতন ঘটাইল। ইহার পর হইতে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের শেষ সশস্ত্র অভিযান বিফল হইল। পর বৎসর ঘোষণা দ্বারা ভারতের শাসনভার ইস্ট্‌ ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

ভারতে ব্রিটিশ অধিকার

আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও বালুচিস্তান

১৮৩৯-'৪২ এবং ১৮৭৮-'৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইটি আফগান যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানের উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইহা ভিন্ন, ভারতের নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান, যথা ব্রহ্মদেশ, বালুচিস্তান প্রভৃতিও ব্রিটিশ অধীনে আসিল।

আফগানিস্তান ও পারস্যের দিকে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

রাশিয়া : প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬) পর সাময়িকভাবে ইওরোপ মহাদেশে রুশ-বিস্তারনীতি রুদ্ধ হইলে রাশিয়া সেই ক্ষতি এশিয়া মহাদেশে পূরণ করিয়া লইতে চাহিল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং পূর্বদিকে চীনের অন্তর্দেশ পর্যন্ত রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার বিস্তৃতি ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবে আশঙ্কায় ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতিতে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দিল। এই সূত্রেই আফগানিস্তানের সহিত ব্রিটিশ সরকারের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অবশেষে দুইটি আফগান যুদ্ধের দ্বারা আফগানিস্তানের সিংহাসনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজন আমীরকে স্থাপন করা হইলে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত হইল। উত্তরদিকে রুশ সাম্রাজ্য উরাল সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। চীনদেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হইল।

উত্তরদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তৃতি

ভ্লাডিভস্টক দখল

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীন হইতে ভ্লাডিভস্টক দখল করিল। এই বন্দরটি দখল করিবার ফলে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা কোরিয়ার নিকটবর্তী হইল। ইহা ভিন্ন, চীনদেশে রুশ-বিস্তারনীতির ফলে মাঞ্চুরিয়া রুশ সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল।

কোচিন-চীন, আনাম, কম্বোজ, নিউ ক্যালিডোনিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

ফ্রান্স : ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুই ফিলিপের রাজত্বকালের শেষ দিকে ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমল হইতেই ঔপনিবেশিক নীতি পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। লুই ফিলিপ যে ঔপনিবেশিক নীতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে অনুসৃত হয়। ফ্রান্স কোচিন-চীন (Cochin China) গ্রাস করে, ইহা ভিন্ন, আনাম (Annam), কম্বোজ (Combodia), টংকিং (Tongking) প্রভৃতি স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia) ও নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ফ্রান্সের অধিকারে আসে।

সুয়েজ খাল-খনন

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরদেশের সহিত মিত্রতা-সূত্রে ফ্রান্স সুয়েজ খাল খনন করে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা এবং প্রধানত ফরাসী অর্থে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছিল।*

---

*"The Canal architected by De Lesseps, financed mainly from France was formally opened by the Empress Eugene in 1869." Ketelbey, p. 430, footnote.

জার্মানি, ইতালি, আমেরিকা, হল্যান্ড: বিস্মার্ক জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' (Satiated Country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানিও ঔপনিবেশিক বিস্তারনীতি গ্রহণ করে। আফ্রিকা ও চীনদেশে জার্মানি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। চীনদেশ ইওরোপীয়দের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইলে ইতালিও চীনদেশে সুযোগ-সুবিধা লাভে অগ্রসর হয়। ইহা ভিন্ন, ইতালি আফ্রিকা মহাদেশে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা মনরো নীতি ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় আক্রমণ হইতে আমেরিকা মহাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া আমেরিকার সাম্রাজ্যবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। হল্যান্ডও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে পশ্চাৎপদ ছিল না। বোর্নিও, যাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনির একাংশ প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

চীনদেশে জার্মানি ও ইতালির স্বার্থান্বেষণ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত

আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় বিস্তারনীতি (Expansion of Europe in Africa): ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশেও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে ইওরোপীয়দের মধ্যে বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। মিশরীয় ও কার্থেজীয় সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি ইওরোপীয়দের জানা থাকিলেও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark Continent) নামে অভিহিত হইত, কারণ আফ্রিকার উপকূল-রেখা ভিন্ন অভ্যন্তর দেশের কোন তথ্যই তখনও জানা ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্কট্, স্পেক্, লিভিংস্টোন্ ও স্টেন্‌লি প্রভৃতি ভূগোলজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসা এবং দুঃসাহসিক ফরাসী অভিযাত্রী দু' চাইলু ও দিব্রাজা, ওয়েলসের অধিবাসী হেনরি মর্টন স্টেন্‌লি এবং জার্মান কার্ল পিটার্সের চেষ্টার ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তর দেশের খবর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছিয়াছিল। স্কট্, স্পেক্, লিভিংস্টোন প্রভৃতির আফ্রিকা অভিযানের কাহিনী ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করে। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়। কোন কোন অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার লইয়া অবশ্য কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নাই। যেমন, ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া ও আনাম অধিকার, ব্রিটেন কর্তৃক নাইজেরিয়া ও আসান্টি দখল কোন ইওরোপীয় বিবাদের সৃষ্টি করে নাই।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্কট্, স্পেক্, স্টেন্‌লি ও লিভিংস্টোনের আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর আবিষ্কার

আফ্রিকার আধিপত্য-বিস্তারে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন

অগ্রণী। স্টেনলির অভিযানের অব্যবহিত পরেই (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনি এক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতি স্থাপন করেন। এই আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার সভ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতি
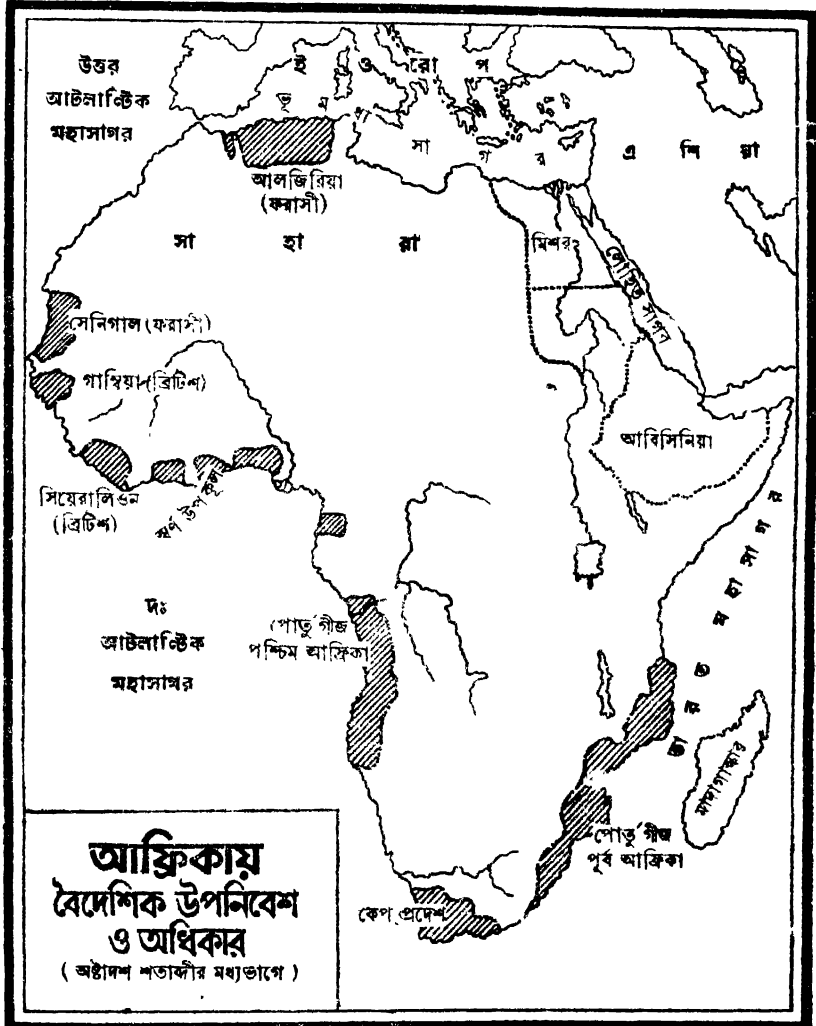
করা। কিন্তু এই সমিতির আন্তর্জাতিক চরিত্র অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইল। আফ্রিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে জানিবার আগ্রহের পরিবর্তে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন

করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড কঙ্গো অঞ্চলের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না। বেলজিয়ামের এই ঔপনিবেশিক বিস্তারনীতিতে ব্রিটেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশ যেগুলির পক্ষে কঙ্গো নদীতে অবাধে চলাচল প্রয়োজন ছিল তাহারা ভীত হইল। তাহারা কঙ্গো নদী কমিশন নামে একটি যুগ্ম কমিশন স্থাপন করিল। ব্রিটেন পোর্তুগাল কর্তৃক পঞ্চদশ শতক হইতে অধিকৃত এ্যাংগোলার উপর এবং সমগ্র কঙ্গো নদীর মোহনার উপর পোর্তুগালের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইহা হইতে এ-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, পুরাতন ঔপনিবেশিক শক্তি ইংলণ্ড ও পোর্তুগাল নূতন কোন দেশ ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হউক তাহা চাহে নাই। বেলজিয়াম এমতাবস্থায় ফ্রান্স ও জার্মানির সাহায্য চাহিল, কারণ ফ্রান্স কঙ্গো নদীর উত্তরে এবং জার্মানি ক্যামেরুনস্-এ উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহী ছিল। ফলে বার্লিনে একটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে কোন ইওরোপীয় দেশ আফ্রিকার কোন স্থান অধিকার করিলে অপরাপর শক্তিবর্গকে তাহা জানাইতে হইবে। এই শর্তের ফলে ইওরোপীয় শক্তিদের মধ্যে আফ্রিকা দখলের এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হইল। ইহা ভিন্ন বার্লিন চুক্তি (১৮৮৫) দ্বারা বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের কঙ্গো অঞ্চল অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। অবশ্য এই অঞ্চল আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকিবে এবং অবাধ-বাণিজ্য-নীতি মানিয়া চলিবে, ইহা স্থির হইল। নাইজার ও কঙ্গো নদী সকল দেশের চলাচলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। বলা বাহুল্য, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তি আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের মধ্যে বিনা-যুদ্ধে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিল। সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়াম 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য' (Congo Free State) নামক আফ্রিকার এক বিরাট অংশ দখল করিল। আয়তনে এই রাজ্যটি ছিল বেলজিয়ামের প্রায় দশগুণ। অপরাপর দেশও পশ্চাৎপদ রহিল না। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

ইঙ্গ-পোর্তুগাল কঙ্গো নদী কমিশন

বেলজিয়াম ফ্রান্স ও জার্মানির সাহায্য প্রার্থনা

বার্লিনের চুক্তি (১৮৮৫)

বিনা-যুদ্ধে আফ্রিকা অধিকারের প্রতিযোগিতা

বেলজিয়াম

আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে আলজিরিয়া দেশটি ছিল ফরাসী-অধিকৃত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিস দখল করিল। ইহার পর ফ্রান্স মরক্কো দখল করিতে অগ্রসর হইল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মরক্কো ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন, ফ্রান্স সমগ্র সাহারা, দাহোমি, গিনি এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনিগাল, কঙ্গো নদী ও আইভরি কোস্ট (Ivory Coast)-এর মধ্যবর্তী সকল স্থান অধিকার করিল। এইভাবে উত্তর-আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। ইহা ভিন্ন সোমালিল্যান্ডের একাংশ, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের নিকটবর্তী মাদাগাস্কার দ্বীপটিও ফ্রান্স অধিকার করিয়া লইল।

ফ্রান্স

ব্রিটেন

আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিল ইংলণ্ড। উত্তরে কায়রো হইতে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত প্রায় সকল স্থান ইংলণ্ডের অধীনে আসে। একমাত্র জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা এই বিশাল

আফ্রিকায় বৈদেশিক উপনিবেশ ও অধিকার (১৯১৪ খ্রীঃ)

ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছিল (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ইংলণ্ড বেচুয়ানাল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, ন্যাসাল্যাণ্ড প্রভৃতিও অধিকার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান পূর্ব-

আফ্রিকার Mandate ইংলণ্ডকে দেওয়া হইলে এই যোগাযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই বিশাল ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড ভিন্ন গাম্বিয়া, সিয়েরালিয়োন, গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের একাংশও বৃটিশ অধিকারে আসে। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চল, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনি লইয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা (Union of South Africa) গঠিত হয়।

ক্ষুদ্র দেশ পোর্তুগালও আফ্রিকা দখলের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণে পোর্তুগাল বহুকাল পূর্ব হইতেই কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সকল স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পোর্তুগাল এঙ্গোরা নামক এক বৃহৎ প্রদেশ গড়িয়া তোলে। আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে মোজাম্বিক বা পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা নামক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পোর্তুগালের ইচ্ছা ছিল পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা ও পোর্তুগীজ পশ্চিম-আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার ফলে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

পোর্তুগাল

আফ্রিকা-গ্রাসের প্রতিযোগিতায় ইতালি অপরাপর ইওরোপীয় দেশ অপেক্ষা বিলম্বে অবতীর্ণ হইলেও ইতালি ইরিত্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ডের একাংশ দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের ফলে ইতালি ট্রিপোলি ও সাইরেনেইকা দখল করে। ঐ সময়ে আবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করিয়া ইতালি অকৃতকার্য হয়, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির আমলে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হইয়াছিল।

ইতালি

বিসমার্কের মন্ত্রিত্বকালে জার্মানি প্রথমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু ক্রমে বিসমার্ক আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তৃতির নীতি গ্রহণ করেন। আফ্রিকা মহাদেশে জার্মানি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা, ক্যামেরুনস্, ও টোগোল্যাণ্ড দখল করে।

জার্মানি

স্পেন আফ্রিকা মহাদেশে উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি প্রদেশ এবং জিব্রাল্টারের বিপরীত দিকে আফ্রিকার উপকূলে কতক স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

স্পেন

এইভাবে অসহায় আফ্রিকাবাসীর মাতৃভূমি ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হইল।

অধ্যায় ১৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য (১৮৭১-১৯১৪)
(Characteristics of the Age Preceding World War I)

সশস্ত্র শান্তির যুগ বা আপাত শান্তির আড়ালে যুদ্ধ-প্রস্তুতির যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগকে (১৮৭১-১৯১৪) শান্তির আড়ালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ (Age of Armed Peace) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বিবেচনা করিলে এই দীর্ঘকালের মধ্যে পশ্চিম-ইওরোপে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। পূর্ব-ইওরোপে বার্লিনের চুক্তির পর হইতে প্রথম বলকান যুদ্ধের (১৯১২) পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যাপক যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া এক পক্ষে যোগ দিলেও এই যুদ্ধকে ইওরোপীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ছিল ইওরোপের প্রস্তুতির যুগ : সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই যুগে এক অভূতপূর্ব প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) শিল্পোন্নতি, (২) শ্রমিক আন্দোলন, (৩) সমাজ-তন্ত্রবাদ ও (৪) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ।

শান্তির আড়ালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ

১৮৭১-১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) **শিল্পোন্নতি (Industrialism) :** বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ইওরোপীয় দেশগুলির উৎপাদন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিল। পোল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ক্রমে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই মানুষের শ্রমের পরিবর্তে বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইতেছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কলকারখানা চালান আরম্ভ হইয়াছিল এবং কয়লার পরিবর্তে খনিজ তৈল ব্যবহার করিয়া যন্ত্রপাতি চালাইবার ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। টেলিগ্রামের পরিবর্তে বেতার, ঘোড়ার পরিবর্তে মোটর গাড়ীর, বাইসাইকেলের ব্যবহার শুরু হইয়াছিল এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল।

বিজ্ঞানের উন্নতি

শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রম-বিভাজন (Division of Labour) প্রভৃতির প্রয়োগে অল্প সময়ে বেশী এবং উন্নত ধরনের সামগ্রী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্প স্বভাবতই টিকিতে পারিল না।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহন-ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। বাণিজ্য নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হইল।

পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে তাহারাও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মালিকপক্ষের সহিত যুঝিতে শুরু করিল। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে রাজনৈতিক ক্ষমতার যে প্রয়োজন তাহা তাহারা উপলব্ধি করিল এবং সেজন্য আন্দোলন শুরু করিল। কারখানায় স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সম-পর্যায়ে কাজ করিয়া ক্রমে পুরুষদের সহিত সমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সমতা লাভের জন্য স্ত্রীলোকদের আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই স্ত্রীজাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তিভোগ প্রভৃতি নানা কিছু সুবিধা তাহারা লাভ করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের অল্পকালের মধ্যেই নারীজাতির আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

স্ত্রীজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, আইন-গত ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

(২) **শ্রমিক আন্দোলন (Working Class Movement)** ঃ ১৮৭১—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের মধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শিল্পোন্নতির ফলে ধনী, দরিদ্র বা মূলধনী ও শ্রমজীবী এই নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। মূলধনী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যে শ্রমিকদের কাজে খাটাইয়া তাহারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা দিন-দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রমিকগণ মূলধন ও সংগঠনশক্তি ও উদ্যম-উৎসাহের অভাবহেতু মালিক শ্রেণীর নিকট সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাজ করিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া স্বভাবতই তাহাদের কিছু ছিল না। শিল্পোন্নতির ফলে বহু শিল্প-কেন্দ্রিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশযুক্ত ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় বসবাস করিবার ফলে শ্রমিক শ্রেণী স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র উভয়ই হারাইল। অধিক শ্রম, বেকারত্বের ভয় এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকিয়া ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য তাহারা অন্দোলন শুরু করিল। এই

শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণী

শ্রমিকদের আর্থিক, দৈহিক ও নৈতিক অবনতি

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলনের তিনটি ভিন্ন পর্যায় ছিল: (ক) ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন, (খ) শ্রমিক-হিতৈষী আন্দোলন ও (গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

(ক) ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন (Trade Union Movement): মালিক শ্রেণী হইতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা সমষ্টিগতভাবে দাবি উত্থাপন করা বহু বেশী কার্যকরী হইবে এই বিবেচনা করিয়া শ্রমিক শ্রেণী 'ট্রেড্ ইউনিয়ন' (Trade Union) নামক শ্রমিক-সংঘ স্থাপন করিতে শুরু করিল। মালিক শ্রেণীর সহিত দ্বন্দ্বে নিজেদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা হিসাবেই সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা গেল। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মালিক শ্রেণীর শ্রমিক-সংঘ-বিরোধিতা এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব অবধি ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনী ছিল। কিন্তু ক্রমে ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে ট্রেড্ ইউনিয়ন আইনত স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা আইনসম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সকল শ্রমিক-সংঘের একমাত্র অস্ত্র হইল ধর্মঘট। ধর্মঘট দ্বারা কলকারখানার কাজ অচল করিয়া মালিক শ্রেণী হইতে সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রমিক-হিতৈষী ব্যবস্থা আদায় করিয়া লওয়া, ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকদিগকে ট্রেড্ ইউনিয়ন তহবিল হইতে সাহায্য দান করা এবং শোষণ, ছাঁটাই বা অন্যায়ভাবে পদচ্যুতি হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা হইল ট্রেড্ ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রমিকগণ কর্তৃক সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধ

মালিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা

ট্রেড্ ইউনিয়ন ক্রমে আইনত স্বীকৃত

(খ) শ্রমিক-হিতৈষী আন্দোলন (Humanitarian Movement): শ্রমিকদের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের মালিক শ্রেণী, রাষ্ট্র, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যাহারা শ্রমিক কাজে খাটায় তাহারা স্বেচ্ছায় কতক কতক শ্রমিক-হিতৈষী কার্য করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক কারখানা আইন (Factory Act), শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ইন্সিওরেন্স ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির উন্নয়নমূলক আইন পাস করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানে চেষ্টা করা হইয়াছিল। স্বৈরাচারে বিশ্বাসী জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্কও শ্রমিকদের উপকারার্থে কতকগুলি আইন পাস করিয়াছিলেন। প্রজা-হিতৈষী আন্দোলন স্বপ্রণোদিত ছিল বলিয়া ইহা Humanitarianism নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।

রাষ্ট্র, মালিক শ্রেণী ও পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিক-হিতৈষী ব্যবস্থা অবলম্বন

(গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (Socialist Movement) ঃ ট্রেড্ ইউনিয়ন, প্রজা-হিতৈষী আন্দোলন প্রভৃতি শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত ফ্যাক্টরী-প্রথার অপগুণ দূর করিতে সমর্থ হইল না। সেই কারণে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইল। প্রধানত তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিল ঃ প্রথমত, মূলধনী ও মূলধন তন্ত্র (Capitalists and Capitalism) উভয়ের বিলোপসাধন করিয়া অর্থ-বলের সাহায্যে শ্রমিকদের শোষণের সম্ভাবনা বন্ধ করা ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপাদান জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের হস্তে স্থাপন করিয়া মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকের শ্রমের ফল হরণ করা নিবারণ ; এবং তৃতীয়ত, সর্ব-প্রকার শোষণ হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত করা। (সমাজতন্ত্রবাদের বিশদ আলোচনা [illegible] দ্রষ্টব্য।)

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজতন্ত্রের মূলনীতি

(ঙ) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism) ঃ আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান কিংবা আন্তর্জাতিক সমবায় এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার দিক দিয়া বিচার করিলে ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত যুগকে আন্তর্জাতিকতার যুগ বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিকতা [illegible] অধিক। সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়াও সর্বত্র [illegible] প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদানের মাত্রাও ঐ সময়ে ছিল পূর্বাপেক্ষা অধিক। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর নির্ভরশীলতা এই যুগে পূর্বকাল অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুক্ত চেষ্টা, মরক্কো সমস্যা এবং কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যস্থাপন প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

১৮৭১-১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার যুগ

কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতার অন্তরালে জাতীয়তাবোধের উগ্রতা ক্রমেই এমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, উহার সংকীর্ণ স্বার্থপরতার আঘাতে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি ধসিয়া গিয়াছিল। বলকান জাতিগুলির জাতীয়তা-বোধ, পোল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের জাতীয়তা-বোধ ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করিয়াছিল। জাতীয়তাবোধের সর্বাধিক সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিয়াছিল জার্মানি। সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী জার্মানি বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনের চরম উন্নতি মনে করিয়া নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ভাবিতে লাগিল এবং যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া জার্মানিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিল।

বিভিন্ন দেশে উগ্র জাতীয়তাবোধ

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি হেতু প্রত্যেক দেশে সামরিক প্রস্তুতিও চলিতেছিল। জার্মানির কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতে ফ্রান্সও সামরিক শক্তি পুনর্গঠনে মনোযোগী হইয়াছিল। জার্মানি

ফ্রান্স ও জার্মানির সামরিক প্রতিযোগিতা

কর্তৃক আলসেস্-লোরেন অধিকার ফ্রান্স কোনক্রমে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। অপর দিকে জার্মানি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে গড়িয়া তুলিতেছিল। এইভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সামরিক প্রস্তুতির এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল। এই দুই দেশের সামরিক প্রতিযোগিতার প্রভাবে ক্রমে অপরাপর দেশেও প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

ইংলণ্ড ও জার্মানির শক্তির প্রতিযোগিতা

জার্মানির নৌবল-বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের নৌবলের প্রাধান্য ব্যাহত হইতে চলিয়াছে ভাবিয়া ইংলণ্ড নৌবল-বৃদ্ধি শুরু করিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গ না হইলেও ইওরোপীয় শক্তিগুলি যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা চালাইল। সমগ্র ইওরোপ এক বিশাল 'বারুদখানায়' পরিণত হইল।

ইওরোপ বারুদখানায় পরিণত

বিসমার্ক জার্মানির নিরাপত্তার জন্য যে সামরিক চুক্তি-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইওরোপের অপরাপর শক্তিগুলিও অনুসরণ করিতে লাগিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে ট্রিপল্ এলায়েন্স (Triple Alliance) স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর [illegible] অন্য তিন ইওরোপের [illegible] জার্মানিকে [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পর ক্রমেই [illegible] এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের ট্রিপল্ আঁতাত (Triple Entente) স্বাক্ষরিত হয়। [illegible] ইওরোপ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

ট্রিপল্ এলায়েন্স ও ট্রিপল্ আঁতাত

অধ্যায় ২০

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

(World War I)

যুদ্ধের পথে (Towards War) : ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস জানিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইওরোপীয় দেশগুলি কিভাবে ক্রমেই এক সর্বগ্রাসী এবং আত্মঘাতী যুদ্ধের সম্মুখীন হইতেছিল সেই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। জার্মানি কর্তৃক 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance) স্থাপন এবং উহার প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড কর্তৃক 'ট্রিপল্ আঁতাত' (Triple Entente) স্বাক্ষর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'যুদ্ধ শিবিরে' পরিণত হইয়াছিল তখন যে-কোন আন্তর্জাতিক ঘটনার সূত্র ধরিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশংকা স্বভাবতই ছিল। এদিকে তুরস্কে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সুযোগ লইয়া অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা, এবং ট্রিপলি দখলের জন্য ইতালির যুদ্ধ-ঘোষণা বলকান সমস্যা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অত্যধিক জটিলতাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ইওরোপের শক্তিবর্গ পরস্পর-বিরোধী দুইটি যুদ্ধ শিবিরে পরিণত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War I) : প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সর্বপ্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যুদ্ধের ন্যায় মানবসভ্যতা প্রলয়ংবিধ্বংসনকারী কোন ঘটনা কোন আকস্মিক কারণ হইতে উদ্ভূত নহে। ইহার পশ্চাতে দীর্ঘকালের কতক-গুলি পরোক্ষ কারণ বিদ্যমান ছিল, যেগুলির সহিত আরও কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণের সংযোগে এই বিশাল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। পরোক্ষ কারণগুলি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেস হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল, বলা বাহুল্য।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ

পরোক্ষ কারণ : (১) ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান অবদান ছিল জাতীয়তাবাদ, আর এই জাতীয়তাবাদই ছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেই ভিত্তি ধ্বংস করিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা চুক্তির ত্রুটিগুলির প্রায় অধিকাংশ দূর করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল ত্রুটি দূর করিতে গিয়া যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়তাবাদের উপেক্ষায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ নিহিত

হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী নূতন কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

(২) সমগ্র ইওরোপ তখন কতকগুলি পরস্পর-প্রতিযোগী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন-কানুন অপেক্ষা রাষ্ট্রের ইচ্ছাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং রাষ্ট্রের স্বার্থই একমাত্র চিন্তা ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পাইয়া বসিয়াছিল। স্বাদেশিকতা নিছক স্বার্থপরতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

পরস্পর-প্রতিযোগী রাষ্ট্র : স্বাদেশিকতা স্বার্থপরতার নামান্তর

(৩) সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি ফ্রান্সকে আলসেস্-লোরেন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জার্মানির নিরাপত্তা এবং এই সকল স্থান জার্মান-অধ্যুষিত, এই দুইটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই জার্মানি আলসেস্ লোরেন দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দুই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ বহুকাল ফরাসী শাসনাধীনে থাকিয়া নিজেদের ফরাসী জাতিভুক্ত বলিয়াই মনে করিত। স্বভাবতই ফ্রান্স এই দুইটি স্থান যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরায় ফরাসী রাজ্যভুক্ত হয়, সেই আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। ফরাসী জাতির মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি ভিন্ন অর্থনৈতিক কারণেও ফ্রান্স আলসেস্-লোরেন পুনরুদ্ধার করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। লোরেন অঞ্চল ছিল লৌহখনিতে পরিপূর্ণ। জার্মানির শিল্পোন্নতি লোরেনের লৌহখনির জন্যই প্রধানত সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ফরাসী লৌহ-ইস্পাত শিল্পোৎপাদকগণ লোরেন অঞ্চল জার্মানির হস্তে চলিয়া যাওয়া কোনভাবেই ভুলিতে পারিল না।

আলসেস্-লোরেন পুনরধিকারের জন্য ফ্রান্সের সংকল্প : জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি

(৪) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ট্রেন্‌টিনো (Trentino) এবং ট্রিয়েস্ট্ (Area around Trieste) তখনও ইতালি দখল করিতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলে ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সুতরাং ইতালি এই সকল স্থান দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল।* এই সকল স্থান দখল না করিলে ইতালীয় ঐক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এজন্য প্রয়োজনবোধে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেও ইতালি প্রস্তুত ছিল।

ট্রেন্‌টিনো ও ট্রিয়েস্ট্ অঞ্চল দখলের জন্য ইতালীয়দের সংকল্প : ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মনোমালিন্য

(৫) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা নামক দুইটি স্লাভ্-অধ্যুষিত বলকান প্রদেশের উপর আধিপত্য

* "The oft-heard cry *Italia Irredenta* (Unredeemed Italy), therefore, was one of the causes of war." *The World Since 1914*, Langsam, p. 4.

লোভ করে। কিছুকাল পরে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে সার্বিয়া এই দুইটি স্থান নিজ রাজ্যের সহিত সংযুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকে। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাবাসীরাও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী হইতে স্বাধীন হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তি না চাহিলেও সার্বিয়ার সাহায্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর ছিল। অপরপক্ষে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার জাতীয়-স্পৃহা উপেক্ষা করিয়া অস্ট্রিয়া স্বৈরাচারী শাসন চালাইতেছিল। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়।

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার সপক্ষে সার্বিয়ার নেতৃত্ব, অস্ট্রিয়ার স্বার্থ, জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা : অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার মনোমালিন্য

(৬) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের অবমাননার চরম নিদর্শনস্বরূপ ছিল। পোল, চেক, স্লোভাক, রুথেনীয় ও রুমানিয়ান অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য কোনপ্রকার জাতীয়তাবোধজনিত ঐক্য-স্পৃহায় উদ্‌বুদ্ধ ছিল না। একমাত্র বৃদ্ধ সম্রাট যোসেফ ফার্দিনান্দের জনপ্রিয়তার জন্যই এই সাম্রাজ্য টিকিয়া রহিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের সংগঠন জাতীয়তা-বিরোধী

(৭) জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার সময় হইতে জার্মান নিরাপত্তার জন্য বিসমার্ক যে সামরিক চুক্তি স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে অপরাপর জাতিও অনুসরণ করিতে থাকে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক তাঁহার 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance) বা 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' সম্পাদন করেন। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার ব্যাপারে পরস্পর সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ফ্রান্স, ইংলন্ড ও রাশিয়া প্রত্যেকেই এককভাবে থাকিবার বিপদ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া জার্মানির সহিত 'রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি' ভঙ্গ করিল। এই সুযোগে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের অসুবিধা হইল না। কিন্তু ইংলন্ড তখন সম্পূর্ণভাবে মিত্রহীন। জার্মানিকে ইংলন্ড শত্রুদেশ বলিয়া বিবেচনা করিত। এমতাবস্থায় ইংলন্ডের বিরোধী অপর দুইটি শক্তি—ফ্রান্স ও রাশিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলে ইংলন্ডের ভীতি আরও বৃদ্ধি পাইল। ইংলন্ডের নিরাপত্তার প্রশ্ন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে থিওফাইল ডেলক্যাসি (Theophile Delcasse) নামে একজন জার্মান-বিরোধী ফরাসী রাজনীতিক ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে ইংলন্ডের সিংহাসনে সপ্তম এডোয়ার্ড আরোহণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের উপশম হইল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলন্ড তাহাদের পরস্পর ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া 'আঁতাত

সামরিক চুক্তি : 'ট্রিপল্-এলায়েন্স'

কর্ডিয়েল' (Entente Cordiale) নামে এক মৈত্রী স্থাপন করিল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে (১৯০২) ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে এক মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

'ট্রিপল্ আঁতাত'

বিস্মার্কের পদচ্যুতির পর রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক মিত্রতাচুক্তি স্থাপিত হইলে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পর মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। ইহার ফলে ক্রমে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে 'ট্রিপল্ আঁতাত' (Triple Entente) নামে এক মৈত্রী স্থাপিত হয়। ট্রিপল্ আঁতাত ছিল ট্রিপল্ এলায়েন্স-এর প্রত্যুত্তর। ফলে সমগ্র ইওরোপ 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' ও 'ট্রিপল্ আঁতাত' এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বলকান অঞ্চল যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত

(৮) অপর দিকে তুর্কী সরকারের শাসন পরিচালনায় অকর্মণ্যতা, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা (*Drang nach Osten* i.e., urge towards the East), রাশিয়ার স্লাভ্ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার নীতি (Pan-Slavism) এবং ম্যাসিডন অধিকার লইয়া গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা বলকান অঞ্চলকে যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত করিল।

S. B. Fay ও অপরাপর ঐতিহাসিকের মতে প্রধান পাঁচটি মৌলিক কারণ

উপরি-উক্ত কারণগুলি ভিন্ন আরও চারিটি বিশেষ কারণ যুদ্ধের জন্য মূলত দায়ী ছিল। ঐতিহাসিক Sydney Bradshaw Fay এগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অপরাপর ঐতিহাসিকগণও এই সকল কারণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচটি কারণ হইল : (১) উৎকট জাতীয়তাবাদ, (২) সামরিক চুক্তি, (৩) অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, (৪) গোপন কূটনীতি ও কূটনৈতিক চুক্তি, এবং (৫) সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন।*

(১) **উৎকট জাতীয়তাবাদ (Acute Nationalism)** : জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা অথবা জাতীয়তাবাদ দমনের মধ্যে যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহের বীজ নিহিত থাকে, তেমনি উৎকট জাতীয়তাবোধও যুদ্ধের মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়তা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর

উৎকট জাতীয়তাবোধ : পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি : মানসিক প্রস্তুতি

শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে এই উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানিতে চরমভাবে প্রকাশ পায়। জার্মান ঐতিহাসিক হেনরিক ফন্ ট্রিট্স্কি (Heinrich Von Treitschke) এবং হিউস্টন্ স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlain), জেনারেল ফ্রেডারিক ফন্ বার্ণহার্ড (Freidrich Von Bernhard.) প্রভৃতি জার্মান জাতীয়তাবোধের এক নূতন রূপ দান করেন। জার্মান পিতৃভূমি (Vaterland) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এবং জার্মান জাতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এই ধারণা জার্মানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

* Vide, *The Origins of the World War*, S. B. Fay.

কেবলমাত্র জার্মানিতেই এই ধরনের উৎকট জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নহে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও ঐ সময়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। জার্মানিতে উহার মাত্রা একটু বেশী ছিল এই মাত্র। রাশিয়ার যাবতীয় স্লাভ্‌জাতির লোককে একই ছত্রাধীনে আনিতে, ফ্রান্সের আল্‌সেস্‌-লোরেন পুনরায় দখল করিয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হওয়ার মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল, এমন কি, পরস্পর কূটনৈতিক আদান-প্রদান কঠিন হইয়া পড়িল। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল।

(২) সামরিক চুক্তি (Military Alliance): ইওরোপীয় দেশগুলির প্রত্যেকটিরই ক্ষমতার অনুপাতে অত্যন্ত বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং আনুষঙ্গিক গুপ্তচর চক্র, পরস্পর সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বেষ ও ঘৃণা ইওরোপে শান্তির পক্ষে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের এইরূপ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই অসামরিক সরকারের উপর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এইরূপ সামরিক প্রভাবে প্রভাবিত পরিস্থিতি দীর্ঘকালের ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতি বলা বাহুল্য।

স্থায়ী সেনা ও নৌবাহিনী ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার প্রভাব

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হইতে শুরু করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সব কিছু এই একই পথেরই ইঙ্গিত দিয়াছিল যে, সামরিক শক্তিই একমাত্র শক্তি। ইহা ভিন্ন, সামরিক জেনারেলগণ প্রায়ই নিজেদের কর্মপন্থা, পরিকল্পনা কোন কিছুরই সম্পূর্ণ বিবরণ পররাষ্ট্র দপ্তরকে পর্যন্ত সরবরাহ করিতেন না। তাঁহাদের উপদেশ বা নির্দেশ ভ্রান্ত হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই অসামরিক প্রশাসনকে মানিয়া অগ্রসর হইতে হইত এবং পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইত সেই সময়ে জনসাধারণকে যুদ্ধের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়মকে পর্যন্ত যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত রাখা হয় নাই। এই সকল কারণে যুদ্ধামোদী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের যুদ্ধ-মানসিকতা যুদ্ধের মৌল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সামরিক পদস্থ কর্মচারীদের প্রাধান্য

যুদ্ধামোদী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের যুদ্ধ-মানসিকতা

(৩) অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ (Economic Imperialism): উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তার লইয়া এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জাতীয় রাষ্ট্র (national state) মাত্রেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজ শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী অধিকার বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতে

স্বভাবতই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সমর্থপুষ্টভাবে বিদেশে অর্থ-বিনিয়োগের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলে পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষের সৃষ্টি হইল, বলা বাহুল্য। আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ইওরোপীয় বিস্তারনীতির ফলে ইওরোপীয় শক্তি-বর্গের মধ্যে এক রেষারেষির সৃষ্টি হয়। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার মধ্যে প্রভৃতি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের (Economic Imperialism) পূর্বাভাস হিসাবে দেখা দেয়। এই অর্থনৈতিক প্রতি-যোগিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেরই শিল্পপতিগণ যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছিল। এই সকল জিনিসপত্রের রাশিকৃত উৎপাদন ক্রমে শিল্পপতিদের যুদ্ধ-সৃষ্টির জন্য উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল; কারণ, যুদ্ধ ভিন্ন এই সকল সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার সুযোগ ছিল না।

ঔপনিবেশিক প্রতি-যোগিতা ঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ (Economic Imperialism)

অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব

শিল্পপতিগণের যুদ্ধ-স্পৃহা

(৪) **গোপন কূটনীতি ও গোপন-চুক্তি সম্পাদন ব্যবস্থা (System of secret Diplomacy and secret Alliances)**ঃ এইভাবে সমগ্র ইওরোপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; তাহাদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার আন্তরিক চেষ্টা করিবার মত কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে, দিন দিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ এবং গোপন কূটনীতি (Secret Diplomacy) দেখা দিল। আন্তর্জাতিক ব্যবহারে গোপনতা রক্ষা করিয়া চলিবার সাধারণ নীতি প্রয়োজনীয়তার সীমা অতিক্রম করিল। একই মন্ত্রিসভার সকল সদস্য নিজ নিজ সরকার কি কি গোপন-চুক্তি (Secret Alliance) সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা জানিবার সুযোগ পাইতেন না। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক খবর দেওয়া হইত না। চতুর্দিকের সন্দেহের ধূম্রজালে ইওরোপ তখন দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে ইওরোপ তখন এক বারুদ-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। স্বভাবতই এইরূপ পরিস্থিতিতে যে-কোন ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।*

গোপন কূটনীতি ঃ পরস্পর সন্দেহ ঃ ইওরোপ বারুদস্তূপে পরিণত

(৫) **সংবাদপত্র (Newspapers)**ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণ-সমূহের অন্যতম ছিল সেই সময়কার সংবাদপত্রের ভূমিকা। প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিল এবং অপর, অর্থাৎ

* "Peace remains at the mercy of an accident."—*Wilhelm Von Schoen,* Ambassador to Paris, Vide, Langsam, p. 13.

যে-সকল দেশকে শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া মনে করা হইত সেই সকল দেশ সম্পর্কে নানা প্রকার আজগুবি এবং অসত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া জনমানসে সেই দেশের বিরুদ্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন কি, সরকার যেখানে অপর রাষ্ট্রের সহিত শান্তি এবং সমঝোতার সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন, সেই সকল ক্ষেত্রেও পত্রিকাগুলি তাহাদের উস্কানিমূলক লেখার দ্বারা এক জঙ্গী মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। আবার এইরূপ ঘটনাও বিরল ছিল না যেখানে এক দেশের সরকার নিজ দেশের সংবাদপত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় এবং মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশ করিলে সেই সরকার বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সাংবাদিকতা বন্ধ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না যদি অপর রাষ্ট্রও সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেইরূপ বলিয়াছেন। আবার এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে, সরকার নিজ দেশের সংবাদপত্রের দোষ জানিয়াও সেগুলিকে সমর্থন করিয়াছেন। কোন কোন সরকার আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দোহাই দিয়া বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার দমনে সচেষ্ট হন নাই। এইভাবে সংবাদপত্রগুলিও সেই সময়ে যুদ্ধ-সংঘটনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

(পার্শ্বটীকা: সংবাদপত্রের জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে সহায়তা; বিদেশী রাষ্ট্রের বিরূপ, অসত্য সমালোচনা; সরকারের মনোভাব)

প্রত্যক্ষ কারণঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ উদ্ভূত হইল। সার্বিয়া অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর স্লাভ্-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, ইহা ভিন্ন, সার্বিয়া আড্রিয়াটিক সাগরতীরে একটি বন্দর দখল করিবার চেষ্টা করিলে বার বার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালি বাধা দান করিয়াছিল। সার্বিয়া বাধ্য হইয়াই অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজ রপ্তানি দ্রব্য পাঠাইত। কিন্তু এই বিষয় লইয়া প্রায়ই সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইত। এই সকল বিবাদের ফলে অস্ট্রিয়ার স্লাভ্-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতালাভ এবং সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তির স্পৃহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নানাপ্রকার গোপন সমিতি গড়িয়া উঠে। 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' (Black Hand)* নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল বোসনিয়ার গবর্ণর ওস্কার পোলিওরেক (Oskar Poliorek)-কে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিন্যান্ড বোস্নিয়া ভ্রমণে আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা গবর্ণরের পরিবর্তে আর্ক-ডিউক ফ্রান্সিস্‌কেই হত্যা করা স্থির করিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার পত্নী বোস্নিয়ার রাজধানী

(পার্শ্বটীকা: অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ)

*Also known as 'Union of Death'

সেরাজিভো (Serajevo) ভ্রমণে আসিলেন। এ সময়েই সার্বিয়ায় আগত তিনজন সন্ত্রাসবাদী বোস্নিয়ান ছাত্রের একজন আর্কডিউক ফ্রান্সিসের মোটর গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। এ-যাত্রা আর্কডিউক রক্ষা পাইলেন। বোমা নিক্ষেপকারী ধরা পড়িল। আর্কডিউক তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলেন। সেখানে সম্বর্ধনাপত্র পাঠ শেষ হইলে ফিরিবার পথে সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের অপর একজন পিস্তলের গুলি করিয়া আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার স্ত্রী সোফির (Sophie) প্রাণনাশ করিল।

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড বারুদখানায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কাজ করিল। অস্ট্রিয়ার সরকার সার্বিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিলেন। সার্বিয়ানগণকে অস্ট্রিয়ার সরকার 'আততায়ীর জাতি' (race of assassins) বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়ার অধীন বোস্নিয়ার অধিবাসী-ই ছিল দায়ী। জাতি হিসাবে অবশ্য বোস্নিয়ানগণ সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্ ছিল। ইহা ভিন্ন, এই হত্যাকাণ্ড অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোস্নিয়ার রাজধানী সেরাজিভোতে সংঘটিত হইয়াছিল। তথাপি অস্ট্রিয়ার সরকার জার্মানির সাহায্যের গোপন প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৩শে জুলাই (১৯১৪) সার্বিয়ার সরকারের নিকট কতকগুলি কঠোর শর্ত-সংবলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে (Austrian note) সার্বিয়া সরকারের (ক) অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। (খ) সার্বিয়া সরকারকে সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ঘোষণা প্রকাশ করিতে বলা হইল। (গ) ইহা ভিন্ন, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত আছেন, এইরূপে সরকারী কর্মচারী ও স্কুলশিক্ষকগণের পদচ্যুতি দাবি করা হইল। (ঘ) সার্বিয়ার দুইজন পদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে বলা হইল। (ঙ) আর্কডিউকের হত্যার তদন্ত ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে এবং অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করিতে সার্বিয়ার সরকারকে জানান হইল। (চ) মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর দাবি করা হইল।

সার্বিয়ার নিকট অস্ট্রিয়ার চরমপত্র

চরমপত্রের শর্তাদি

২৫শে জুলাই (১৯১৪) সার্বিয় সরকার এই চরমপত্রের উত্তর প্রেরণ করিলেন। ইহাতে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে উল্লিখিত দাবিগুলির অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু অপর কয়েকটি শর্ত যাহা মানিয়া লইলে সার্বিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইত, সেগুলির মীমাংসার জন্য সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট সময় চাহিল এবং আন্তর্জাতিক কোন বৈঠকে সেগুলির মীমাংসা হউক, এই দাবি করিল। সার্বিয়ার উত্তর অস্ট্রিয়ার মনঃপূত হইল না। ২৬শে জুলাই (১৯১৪) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। দুই দিন পর (২৮শে জুলাই, ১৯১৪) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সার্বিয়ার উত্তর : অস্ট্রিয়ার অসন্তুষ্টি

অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)

এই যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বলকান

অঞ্চল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন হইলে রাশিয়ার স্লাভ্ ঐক্যের আদর্শ নাশ হইবে। ইহা ভিন্ন, রাশিয়ার বলকান-প্রাধান্যের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না বিবেচনা করিয়া রাশিয়া ঘোষণা করিল যে, সার্বিয়ার ভাগ্য-বিপর্যয়ে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না।* অস্ট্রিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে রাশিয়াও সৈন্যসমাবেশে পশ্চাৎপদ থাকিবে না, এই কথা রাশিয়ার জার স্পষ্ট-ভাষায় অস্ট্রিয়ার সরকারকে জানাইয়া দিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এইভাবে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে, তখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব স্যর এডওয়ার্ড গ্রে এই জটিল সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ২৯শে জুলাই (১৯১৪) অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড-এর উপর কামান দাগিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ দাবাগ্নির ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

এডওয়ার্ড গ্রে কর্তৃক শান্তিরক্ষার চেষ্টা : বেলগ্রেড আক্রমণ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (২৯শে জুলাই, ১৯১৪)

সার্বিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিল। জার্মানি রুশ সৈন্যসমাবেশকে রাশিয়ার যুদ্ধ-ঘোষণার সামিল মনে করিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্রে (ultimatum) সৈন্যসমাবেশ বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইল। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জার্মানি সরকার ফ্রান্সের নিকট অপর একটি চরমপত্র দ্বারা জানিতে চাহিলেন। রাশিয়া জার্মানির চরমপত্রের কোন জবাব না দেওয়াতে ১লা আগস্ট (১৯১৪) জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স জার্মানির চরমপত্রের উত্তরে জানাইল যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য তাহাই করিবে। রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে, ইহা নিশ্চিত মনে করিয়া জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৩রা আগস্ট, ১৯১৪)। এদিকে ইতালি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। 'ট্রিপল্ এলায়েন্সের' অপর দুইটি শক্তি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, এই যুক্তিতে ইতালি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইল। কারণ, 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' ছিল আত্মরক্ষামূলক চুক্তি (Defensive Alliance)।

রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণা

ইতালির নিরপেক্ষতা

এদিকে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। অথচ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হইয়াছিল। জার্মানি ও ফ্রান্স ছিল এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী। ফ্রান্স বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেও জার্মানি তাহা মানিল না। বেল-জিয়ামের নিরাপত্তা বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির

জার্মানি কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য

* "In no circumstances will Russia remain indifferent to Serbia's fate." *Tsar's telegram to Serbia.* Vide, Ketelbey, p. 393.

মূলসূত্রের অন্যতম। সুতরাং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির সৈন্য উহার সীমা লঙ্ঘন করিলে বেলজিয়াম ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। গ্রেট ব্রিটেন সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪)।* এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবর্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথিবীর প্রধান দেশ মাত্রেই এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যোগদান করিল। ইতালি, জাপান, চীন ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে (The Allies) যোগদান করিল। রুশ-তুর্কী বিরোধ বহুকাল হইতেই চলিতেছিল। স্বভাবতই তুরস্ক রাশিয়ার শত্রুদেশ জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল।

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়ভাগ (Responsibility for the First World War): প্রথম যুদ্ধের কালে এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যুদ্ধের জন্য কোন্ দেশ দায়ী ছিল সেই বিষয়টি লইয়া অনেক মতামত, ঘোষণা, দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের বিবৃতিতে এক দেশ বা অপর দেশের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইবার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সকল ঘোষণা, বিবৃতি বা মতামত ঈর্ষা, ঘৃণা আত্মাভিমান প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু চিরাচরিত কূটনৈতিক ঐতিহ্য, রীতি-নীতি লঙ্ঘন করিয়া বিভিন্ন সরকার তাহাদের কূটনৈতিক দলিলপত্র প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের জন্য তাহারা দায়ী নহেন, এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। *German White Book* † নামক সরকারী কূটনৈতিক দলিলের একটি সংকলন জার্মান সরকার প্রকাশ করিলেন। এই দলিল দ্বারা এই কথাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইল যে, জার্মানি সরকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য হইয়াছে। ২৭টি টেলিগ্রাম ও বহুসংখ্যক চিঠি এই সংকলনে ছাপাইয়া জার্মানির জনসাধারণকে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। জার্মান জাতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, রাশিয়ার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। *German White Book*-এ এই কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, জার্মানি অস্ট্রিয়াকে শান্তিরক্ষার জন্য যথেষ্ট চাপ

জার্মান White Book

* "If I am asked what we are fighting for, I can reply in two sentences, in the first place, we are fighting to fulfil a solemn international obligation, secondly, we are fighting to vindicate the principle that small nationalities are not to be crushed, in defiance of international good faith, by the arbitrary will of a strong and overmastering power."—*Mr. Asquith* in his speech in the House of Commons, August 6, 1914. "Why is our honour involved in this war? Because......we are bound in an honourable obligation to defend the independence, the liberty and the integrity of a small neighbour that has lived peaceably, but she could not have compelled us, because she was weak"—*Lloyd George* in a speech in Queen's Hall, London, September 19, 1914.

† "Preliminary Memoir and Documents Concerning the Outbreak of War" commonly known as the *German White Book*. Vide, *The Origins of the World War*, p. 3, S. B. Fay.

ইওরোপ
জার্মানি (১৯১৪)
রাশিয়া
ওয়ারসো
ভিয়েনা
অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী
আফ্রিকা
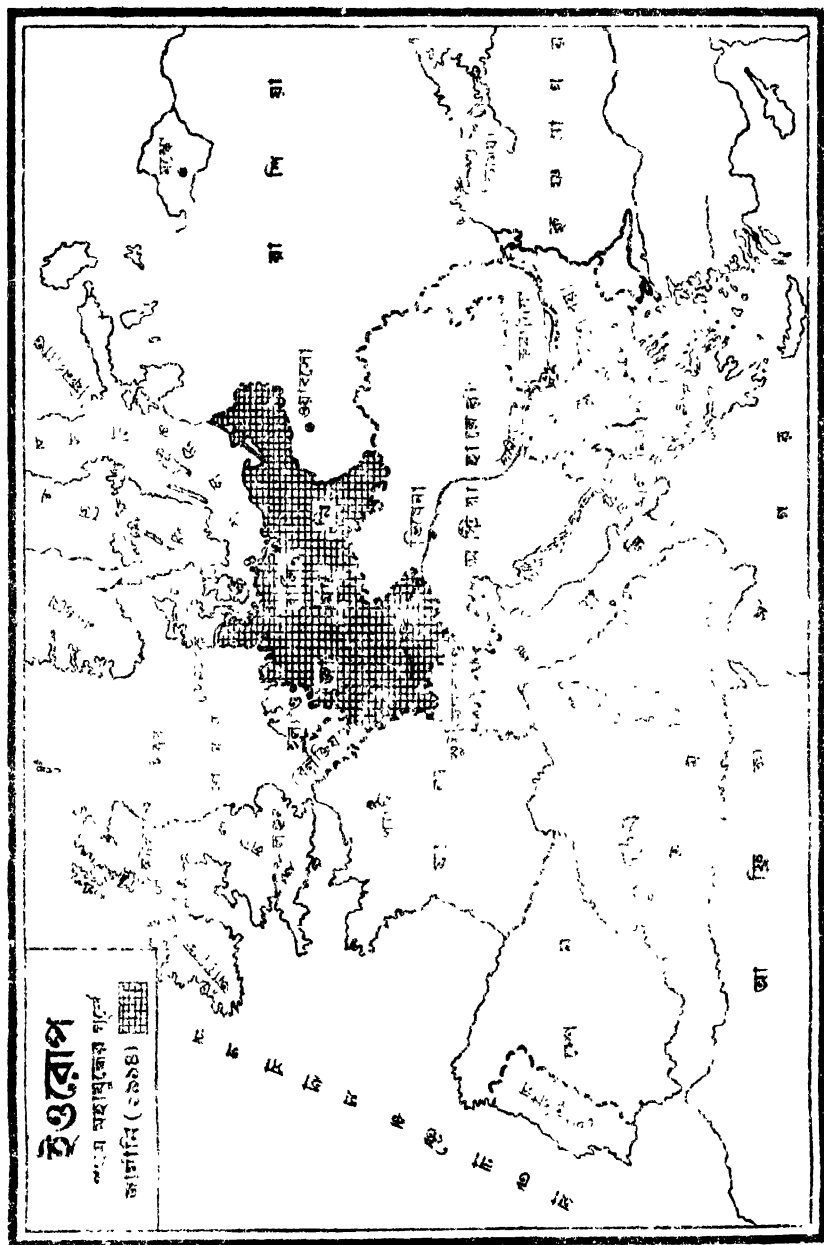
দিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে জার্মানগণকে দুষান গেলেও ইওরোপে এই সকল যুক্তি কেহ মানিয়া লইল না। *White Book*-এ কতক সত্য, কতক অসত্য ও কতক অর্ধ-সত্যের পরিবেশন করা হইয়াছে, এই কথা অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের নিকট গোপন করা গেল না।

ব্রিটিশ সরকার *British Blue Book* নামে পুস্তকে ধারাবাহিকভাবে সকল তথ্য সাজাইয়া কিভাবে প্রথম যুদ্ধ শুরু হইয়াছে এবং স্যর এডোয়ার্ড গ্রে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে শান্তিরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও কিভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং প্রতি পদে পদেই কিভাবে জার্মানি তাঁহার প্রচেষ্টায় বাধা দান করিয়াছে তাহা এবং জার্মান সমর্থনপুষ্ট অস্ট্রিয়া কিভাবে শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে সকলকে অবহিত করিলেন। এই পুস্তক হইতে যুদ্ধের জন্য জার্মানি ও অস্ট্রিয়া দায়ী ছিল, এই ধারণা ইওরোপের সর্বত্র এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে জন্মাইল।

ব্রিটিশ Blue Book

ইহার পর রাশিয়া *Russian Orange Book* নামে পুস্তকে রাশিয়া শান্তি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে সেই যুক্তিই তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিল। কিন্তু সার্বিয়া তথা স্লাভ্ জাতির সমর্থনে রাশিয়া যে সৈন্য সমাবেশ আগে হইতে করিয়াছিল তাহা গোপন করিতে ভুলিল না। রাশিয়া যুদ্ধের দায়িত্ব জার্মানি-অস্ট্রিয়ার উপরই চাপাইল।

রাশিয়ান Orange Book

বেলজিয়াম *Belgian Gray Book*-এ জার্মানি কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিয়া কিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষীকৃত বেলজিয়ামের সীমা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে এবং সার্বিয়া *Serbian Blue Book*-এ কিভাবে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের জন্য অন্যায়ভাবে নির্দোষ সার্বিয়াকে দায়ী করিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিল।

বেলজিয়াম Gray Book

সার্বিয়ান Blue Book

ফরাসী সরকার *Yellow Book* প্রকাশ করিয়া জার্মানির যুদ্ধ-মনোবৃত্তি এবং সেরাজেভোতে আর্কডিউক-এর হত্যার পূর্ব হইতেই কিভাবে জার্মানি ইওরোপে যুদ্ধ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল তাহা নানাপ্রকার দলিলপত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। *French Yellow Book* এর বক্তব্য ফ্রান্সের সহিত জার্মানির যুদ্ধ অনিবার্য ছিল, এই কথা জার্মানির কাইজার উইলিয়াম কর্তৃক যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপর অত্যাচারের কাহিনী দ্বারা সমর্থন লাভ করিল। *French Yellow Book*-এর বক্তব্য অনেকেই বিশ্বাস করিল।

ফরাসী Yellow Book

সার্বিয়ার *Blue Book*-এর প্রত্যুত্তর হিসাবে অস্ট্রিয়া *Austrian Red Book* প্রকাশ করিল। ইহাতে বহু দলিল, চিঠিপত্র গোপন রাখিয়া অস্ট্রিয়া কিভাবে শান্তির প্রস্তাব দিয়াছিল এবং সার্বিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল তাহাই বুঝাইতে চাহিল।

অস্ট্রিয়ান Red Book

এইভাবে যুদ্ধ শুরু হইবার পরই বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া

যুদ্ধের জন্য অপর কাহারা দায়ী তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। যুক্তি ও প্রমাণের দিক হইতে বিচারে অবশ্য ব্রিটিশ *Blue Book* এবং ফরাসী *Yellow Book* ইওরোপ-বাসীর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে নূতন নূতন সরকারী দলিল ও চিঠিপত্র, কূটনৈতিক টেলিগ্রাম, চিঠি-পত্র সব কিছুর উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, গবেষক প্রভৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে যে দায়ভাগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন্ বা কোন্ কোন্ দেশ যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। এই সকল ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনা এবং অন্যান্য জীবনী ও দলিল-দস্তাবেজ হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, জার্মানি যুদ্ধের জন্য কোন পরিকল্পনা রচনা করে নাই, এবং জার্মানি একটা ইওরোপীয় যুদ্ধ সৃষ্টি হউক তাহাও চাহে নাই। গবেষকগণ সকলেই এ-বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যদিও জার্মানি কূটনৈতিক নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রথমে অস্ট্রিয়াকে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, সেই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু যখনই দেখিল যে, যুদ্ধের পরিধি বিস্তারলাভ করিতে চলিয়াছে অর্থাৎ রাশিয়া যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই জার্মানি অস্ট্রিয়াকে বিরত করিতে চাপ দিয়াছিল।* Kautsky documents নামে প্রকাশিত যুদ্ধ সংক্রান্ত জার্মান সরকারের যাবতীয় দলিল, কূট-নৈতিক কাগজপত্র হইতে গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল দলিল দস্তাবেজ হইতে এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মানি আন্তরিকভাবে বিশ্বযুদ্ধ যাহাতে না বাধে সেই চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানি নিজ দোষেই তখন বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া বসিয়া আছে। এই সব হইতে অন্ততঃ ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, জার্মানি ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছিল সেই কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অলীক কল্পনাপ্রসূত।†

ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতামত

---

* "Scholars of all countries gradually came to agree that though Germany was responsible for having at first foolishly encouraged Austria to take action against Serbia, Germany supposed (wrongly, as it turned out) that the conflict could be 'localised' but when it began to appear that 'localisation' was doubtful and that Russia might intervene, Germany tried to restrain Austria and made genuine efforts to prevent the Austro-Serbian conflict from developing into a World War." *The Origins of the World War*, p. 8, S. B. Fay.

† "It (*Kaustsky Documents*) showed scholars that during the critical days before the War, Germany had made real efforts to avert it, but that she had been guilty of blunders and mistakes in judgment which contributed to set fire to the inflamable material heaped up in the course of years. It showed, moreover, that the notion that Germany had deliberately plotted the World War was a pure myth." *Ibid*, pp. 9, 10.

জার্মান সরকারের ক্ষেত্রে কটস্কি যাহা করিয়াছিলেন, অনুরূপ কাজ করিয়াছিলেন অস্ট্রিয়ার সরকারের পক্ষে ডক্টর রোডেরিক্ গুস্ (Dr. Roderich Gooss)। তাঁহার *Austrian Red Book of 1919*-এ অস্ট্রিয়া কিভাবে জার্মানিকে বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন এবং এই কথাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদিও অস্ট্রিয়া বিশ্বযুদ্ধ চাহে নাই, তথাপি সার্বিয়ার দিক হইতে অস্ট্রিয়ার যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহার অবসানকল্পে অস্ট্রিয়া বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটাইতে প্রস্তুত ছিল।

ডক্টর গুসের পুস্তকে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধের জন্য দায়ীকরণ

বলশেভিক রাশিয়ার নূতন সরকার জারের আমলে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রাশিয়া যে *Orange Book* প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে যে-সব মিথ্যা বলা হইয়াছিল এবং যে-সকল দলিল, চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম গোপন করা হইয়াছিল বা আংশিকভাবে ছাপান হইয়াছিল সেই সব প্রকাশ করিয়া এই কথাই সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছিল, যে, জার্মানি অপেক্ষা রাশিয়া এবং ফ্রান্সই ছিল বিশ্বযুদ্ধের জন্য অধিক মাত্রায় দায়ী। রাশিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল কনস্টান্টিনোপল দখল করা এবং অস্ট্রিয়াকে শাস্তি দেওয়া এবং ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল আলসেস-লোরেন পুনর্দখল করা।

বলশেভিক সরকার কর্তৃক জার-শাসিত রাশিয়া ও ফ্রান্সকে অধিকতর দায়ী সাব্যস্তকরণ

ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘকাল এই বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া নূতন তথ্যাদি সংযোগ করিয়া এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের *British Blue Book*-এ ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হইয়াছিল এইরূপ যে-সকল দলিল সেই সময় ত্রিপল আঁতাতের খাতিরে প্রকাশ করা হয় নাই তাহা প্রকাশ করিল। জার্মানির Kautsky Documents-এর যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত নূতন দলিলপত্র বস্তুত সেগুলির অনুকরণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের সুস্পষ্ট বিবরণ লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিল।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নূতন তথ্য প্রকাশ

উপরি-উক্ত বিভিন্ন দলিল এবং ব্যক্তিগত জীবনী, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী এডোয়ার্ড গ্রে'র ব্যক্তিগত বিবরণী হইতে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মাত্রেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কেবলমাত্র জার্মানি ও উহার মিত্রবর্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিল ইহা সত্য নহে। তাঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব সকল বৃহৎ রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সকল রাষ্ট্রের দায়িত্বই যে সমান, এমন নহে, দায়িত্বের দায়ভাগে কোন রাষ্ট্রের কম, কোন রাষ্ট্রের বেশী ভাগ দায়িত্ব লইতে হইবে।

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত

জার্মানির এমন কি, ফ্রান্স এবং অপরাপর দেশেরও কোন কোন লেখক, যুদ্ধের

দায়িত্বের ক্ষেত্রে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে দায়ী না করিয়া রাশিয়া, সার্বিয়া, ফ্রান্স এমন কি, ইংলণ্ডকে অধিকমাত্রায় দায়ী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কারণ হিসাবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স ও সার্বিয়া তাহাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশে সততা প্রদর্শন করে নাই যেমন জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া করিয়াছে। ইংলণ্ডও ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাহা করে নাই।

দায়িত্বের আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধি

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব ইওরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে কম এবং বেশী বহন করিতে হইবে। কোন একটি দেশকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যেমন চলিবে না, তেমনি কোন রাষ্ট্রকেই দায়মুক্ত করা যাইবে না।

উপসংহার

যুদ্ধের প্রকৃতি (Character of the War): (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহার পূর্বে অপর কোন যুদ্ধই এত ব্যাপকতা লাভ করে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War)। ইহার পূর্বে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছিল সেগুলির কোনটিতেই পৃথিবীর এতগুলি দেশ অংশ গ্রহণ করে নাই। (২) ইহা ভিন্ন, এই যুদ্ধে যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র উভয় পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া যুদ্ধজয়ের এইরূপ চেষ্টা পূর্বে কখনও হয় নাই। ডুবোজাহাজ, ট্যাংক, বড় কামান, হাউইট্জার প্রভৃতির ব্যবহার, মাস্টার্ড গ্যাস, তরল আগুন (Liquid fire), বিষাক্ত গ্যাস, রোগের জীবাণুর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিবার অভিনব চেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম করা হইয়াছিল। (৩) জল, স্থল ও আকাশে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে বিমান ও ডুবোজাহাজের ব্যবহার সংগ্রামশীল জগতের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। (৪) জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং সর্বগ্রাসী সামরিক প্রাধান্য নীতি ইওরোপে যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জার্মানির প্রাধান্যে ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপনেরই চেষ্টা, সন্দেহ নাই। (৫) এই যুদ্ধে যে-সকল মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেগুলির মারণ-ক্ষমতা যেমন ছিল অভূতপূর্ব তেমনি ছিল বীভৎসতাপূর্ণ। সামরিক বা বেসামরিক লোক বা বস্তুর কোন পার্থক্য রাখা হইত না। গণতান্ত্রিক যুগের গণতান্ত্রিক যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধ-জয়ের জন্য শিল্প, রাজস্ব, প্রচারকার্য সব কিছুরই এইরূপ নিয়োগ ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নাই।

সর্বাত্মক যুদ্ধ

বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার

বিমান ও ডুবোজাহাজ

শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপনের সংকল্প

সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রভেদ লুপ্ত

যুদ্ধের ঘটনাবলী (Events of the War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলীকে বৎসর হিসাবে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

১৯১৪ খ্রীঃ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল তখন যুদ্ধে লিপ্ত শক্তিগুলির মধ্যে জার্মানি ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। স্বভাবতই জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিবার শক্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। লীজ্ (Leige) ও নামুর (Namur) নামক স্থানে বেলজিয়ামবাসী বীরত্ব-সহকারে যুঝিয়াও জার্মান সৈন্যকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। মন্স্ ও শার্লে'রয় (Mons and Charleroi) নামক স্থানে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর বাধা প্রতিহত করিয়া জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প'য়ত্রিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মিত্রপক্ষের সেনাপতি জেনারেল ফচ্ (Foch) মার্ণ (Marne) নদীর তীরে জার্মান সেনাবাহিনীকে বাধা দান করেন। এই যুদ্ধে জেনারেল ফচের তৎপরতা ও দক্ষতায় জার্মানবাহিনী পরাজিত হইয়া মার্ণ নদীর তীর ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্যারিস রক্ষা পাইল। ইহা ভিন্ন, মিত্রপক্ষ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পাইল। জার্মানি মার্ণ-এর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ দ্রুত অবসানের সুযোগ হারাইল। কিন্তু এইস্নি (Aisne) নদীর তীরে তাহারা মিত্রপক্ষের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া সদৃঢ়ভাবে নিজেদের শিবির স্থাপন করিল। উভয়পক্ষে তুমুল ট্রেঞ্চ্-যুদ্ধ (Trench warfare) চলিল।

লীজ্ ও নামুর-এর যুদ্ধ

মার্ণ-এর যুদ্ধ

'ট্রেঞ্চ্' হইতে যুদ্ধ

এই বৎসর অপর প্রান্তে জার্মানবাহিনী সমগ্র বেলজিয়াম দখল করিয়া লইল, কিন্তু ইপ্রেস্ (Ypres) নামক স্থানে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা ব্রিটিশ-বাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিল না। এদিকে রুশ সেনাবাহিনী পূর্ব-প্রাশিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়া ট্যানেনবার্গের (Tannenberg) যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতিও জার্মানির সহায়তায় রুদ্ধ হইল। রুশবাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজ্যসীমা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

ইপ্রেস্ ও ট্যানেনবার্গের যুদ্ধ

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি পূর্ব-ঘোষিত নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে। অপরদিকে জার্মানি তুরস্ককে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। তুরস্ক দার্দানেলিজ প্রণালী (Dardanelles) মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বন্ধ করিয়া দিয়া রাশিয়া ও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর যোগাযোগের পথ রোধ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী সেনা দার্দানেলিজ আক্রমণ করিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গেলিপোলি (Galli-poli) উপদ্বীপেও মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে কুট-এল্-আমারা (Kut-al-Amara)-এর যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য বাগদাদ

১৯১৫ খ্রীঃ

গেলিপোলি ও কুট-এল্-আমারা-এর যুদ্ধ

ব্রেস্ট্ লিটভস্কের সন্ধির পরে
রাশিয়া (১৯১৮ খ্রীঃ)
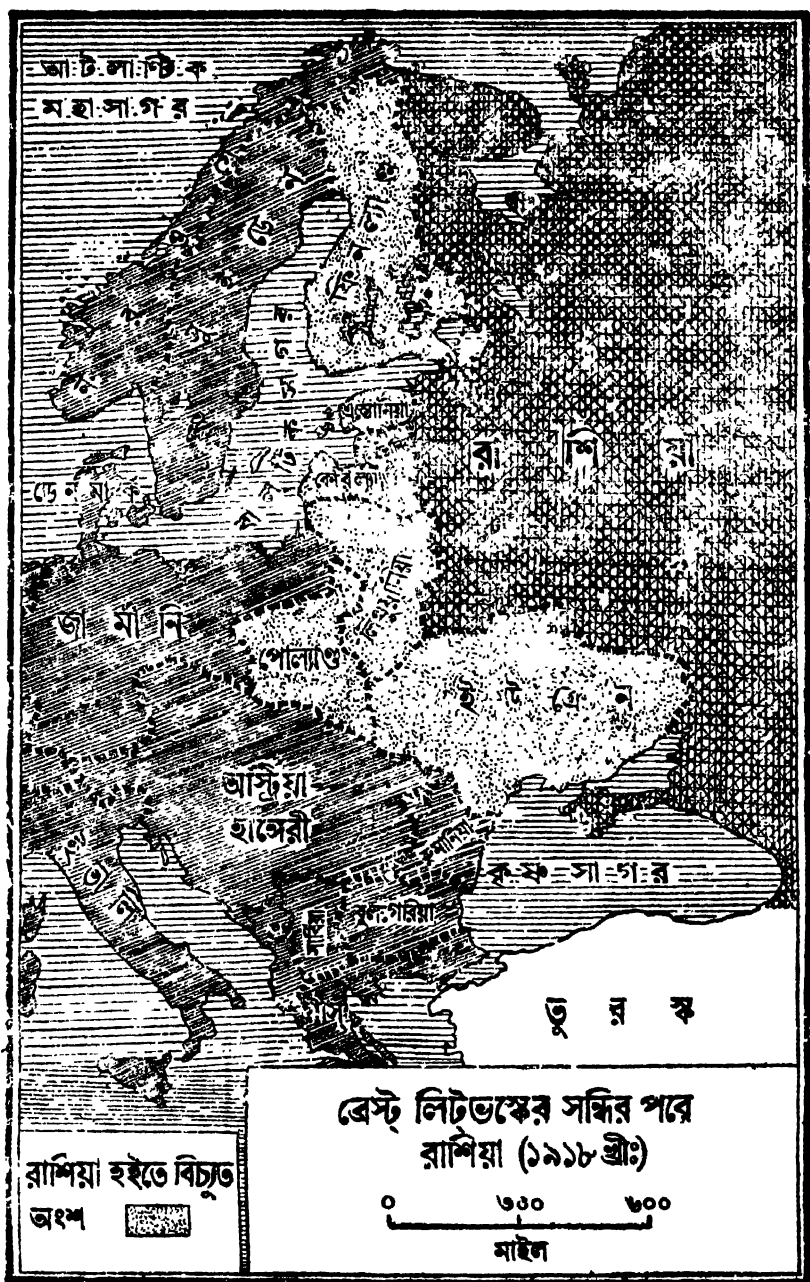
দখল করিয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ কতক পরিমাণে লইতে সমর্থ হয়। এই বৎসর হইতেই জার্মানি ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে 'সাবমেরিণ' বা ডুবোজাহাজের আক্রমণ দ্বারা ইংরেজ জাহাজ ধ্বংস করিতে শুরু করে।

সার্বিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয়

ইহা ভিন্ন, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম আক্রমণে সার্বিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং শত্রুপক্ষের পদানত হয়। এইভাবে সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের পরাজয় ঘটে।

১৯১৬ খ্রীঃ: ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্দুন (Verdun) ও সোম (Somme)-এর রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনী ও ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ ঘটে। ফ্রান্সের দ্বারদেশে ভার্দুনের যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়, কিন্তু কোন পক্ষেরই পরাজয় ঘটে নাই। জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ফরাসী সৈন্য নিজ অবস্থান বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। অপরদিকে সোমের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়।

এই বৎসর অবশ্য রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে, কিন্তু জার্মানি হইতে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে অস্ট্রিয়াকে আর পরাজিত করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার সামরিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়। রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট অস্ট্রিয়া-জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়।

রুমানিয়ার যুদ্ধ-ঘোষণা—পরাজয়

ডগারব্যাংক ও হেলিগোল্যাণ্ডের যুদ্ধ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জাট্ল্যাণ্ডের জল-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পূর্বে ডগারব্যাঙ্কে (Doggerbank) ও হেলিগোল্যাণ্ডের উপসাগর (Bay of Heligoland)-এর জল-যুদ্ধে জার্মান নৌবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মান রণপোত ব্রিটিশ রণপোতের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ফলে উভয়পক্ষে যে ভীষণ নৌযুদ্ধের সৃষ্টি হয় তাহাই জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে উত্তর সাগরে (North Sea) এই যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষেই বিশালাকার এবং বহুসংখ্যক রণতরী ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী পরাজিত হয়। উভয়পক্ষেই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হয় যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও জার্মানি আর ইংরেজ নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং পরাজিত হইয়াও ব্রিটিশ পক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভের-ই ফলভোগ করিয়াছিল।

জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ (৩১শে মে, ১৯১৬)

বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। বলশেভিক দল সরকার গঠন করে। এই নব-গঠিত সরকার স্থাপিত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে যে বিশৃংখলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যেও দেখা গেল। ইহা ভিন্ন, বলশেভিক সরকার যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ব্রেস্ট্-লিট্ভস্ক্ (Brest-Litvosk)-এর সন্ধি দ্বারা জার্মানির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিল। এই সন্ধির শর্তানুসারে রাশিয়া পোল্যান্ড, বাল্টিক প্রদেশসমূহ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় স্থান জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধাবসানের ফলে জার্মানি পূর্ব-ইওরোপ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য পশ্চিম-ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের সামরিক অবস্থা তাহাতে সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু এমন সময়ে আমেরিকা মিত্রপক্ষের সহায়তার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়।

ব্রেস্ট্-লিট্ভস্ক্-এর সন্ধি (১৯১৮)

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

জার্মান সাবমেরিনের নির্বিচার আক্রমণে মার্কিন জাহাজ ও ধনজনের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এই কারণে জার্মানিকে পরাজিত করা আমেরিকার স্বার্থের দিক দিয়াও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

জার্মান সৈন্যের হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অপসরণ

এই বৎসরই জার্মান সেনাবাহিনী সোম নদীর তীর হইতে অপসরণ করিয়া হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অবস্থান করিয়াছিল। এখানে মিত্রপক্ষের সহিত জার্মানদের তুমুল যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিল। উভয় পক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইলেও কোন পক্ষই [illegible] করিতে সক্ষম হইল না।

এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মানি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে [illegible] করিল। এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধে [illegible] করিলেও এই দুই স্থান রক্ষা করিতে [illegible] সংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাইল। সাময়িকভাবে [illegible] প্যারিস অভিমুখে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু পরে জার্মানির পরাজয় শুরু হইল। জেনারেল ফচ্-এর সুদক্ষ সমর পরিচালনায় ইওরোপ ও এশিয়ার প্রতিক্ষেত্রেই জার্মান বাহিনী পরাজিত হইতে লাগিল। জার্মানির মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। এদিকে জার্মানির অভ্যন্তরে উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাশিয়ার বিপ্লবের অনুকরণে এক রাষ্ট্র-বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিল। জার্মান

জার্মানিতে বিপ্লবের আশংকা

নৌবাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সর্বত্র সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলে জার্মান সরকার যুদ্ধ অবসান করাই স্থির করিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মিত্রপক্ষের সহিত জার্মানির যুদ্ধবিরতি ঘটিল। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। দীর্ঘ চার বৎসর যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতার পর ইওরোপে শান্তি ফিরিয়া আসিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মিত্রপক্ষের দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক বসিল। ইহাতে এই যুদ্ধ অবসানের স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইল।

যুদ্ধবিরতি (১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)

প্যারিসে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে (৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮) ল্যয়েড্ জর্জ মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংস করা বা জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ধ্বংস করা বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল্ (ইস্তানবুল) দখল করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া ঘোষণা করেন। ল্যয়েড্ জর্জ এ-কথাও বলেন যে, পূর্ব-স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্বণ্টন, আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করিয়া পৃথিবীতে যুদ্ধের সম্ভাব্যতা দূর করা ব্রিটিশ যুদ্ধ-উদ্দেশ্যের মূল কথা। কিন্তু মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' (Fourteen Points) নীতির বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ দফা পরিকল্পনা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ : ল্যয়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেন্ট উইলসন

(১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা হইবে না। গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন সমুদ্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্য বিষয়ে শুল্ক প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন যথাসম্ভব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধাদির সরঞ্জাম হ্রাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিক সামরিক শক্তি রাখা হইবে না। (৫) উদার ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি লইয়া ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা করা হইবে—অর্থাৎ কে কোন্ স্থানের অধিকারে স্থাপিত

হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং রাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে, সেই সুযোগ দিতে হইবে। (৭) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সকে আলসেস্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৯) জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতালির রাজ্য-সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হইবে। (১১) জাতীয়তার ভিত্তিতে বলকান দেশগুলির পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১২) দার্দানেলিজ-প্রণালীকে আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুর্কী সুলতানের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। (১৩) পোল্যান্ডকে পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পেঁছিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও রাজ্য-সীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত

বলা বাহুল্য, ল্যয়েড্ জর্জের ঘোষণার চারিটি মূলসূত্র, যথা: পরাজিত শত্রুর প্রতি কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির অনুসরণ করা, আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিরক্ষা করা এবং অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা—প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

ল্যয়েড্ জর্জ ও উইলসনের ঘোষণার সামঞ্জস্য

কিন্তু প্রেসিডেন্ট উইলসনের উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা শর্ত-সংবলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইংলন্ড, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্য না করিলেও উহা গ্রহণও করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইলসন ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিরোধের পথ প্রস্তুত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (Results of the World War I): প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সংখ্যার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৭০ লক্ষ পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে মোট যে সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক ১৯১৪—১৯১৮ এই চারি বৎসরে প্রাণ হারাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের অর্থাৎ ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি জার্মানি-বিরোধী

হতাহতের সংখ্যা

দেশগুলিরই সর্বাধিক লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং মোট হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল মিত্রপক্ষের।

বেসামরিক ক্ষতি

যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিরাট সংখ্যক সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বেসামরিক লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল। সামরিক আক্রমণ, খাদ্যাভাব, নানাপ্রকার রোগ ও মহামারী বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল। এই বিশাল সংখ্যক নরনারীর মৃত্যুতে একাধিক দেশে পরবর্তী যুগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল।

অর্থ ও সম্পত্তিনাশের পরিমাণ

খরচের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই যুদ্ধের বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির মোট দৈনিক খরচ ছিল ২৪ কোটি ডলার এবং যুদ্ধের মোট খরচ হইয়াছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। ইহা হইতেই যুদ্ধে কি পরিমাণ সামগ্রী ও সম্পত্তি মানুষের প্রাণনাশে ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার ধারণা পাওয়া যায়।

জাতীয় জীবনের ক্ষতি

ইহা ভিন্ন, মৃত এবং হতাহত সৈন্যের স্থান পূরণ করিবার জন্য যে জবরদস্তিমূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের নীতি (conscription) চালু করা হইয়াছিল তাহাতে উদীয়মান বহু বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংরেজ কবি উইলফ্রিড্ আওয়েন ও রবার্ট ব্রুকের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনেই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন ১৯১৯, (The Peace Conference of Paris, 1919): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্জারল্যাণ্ডেই এই সভার অধিবেশন আহূত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ বৎসর পূর্বে সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিস নগরীতে চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। ফ্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। একমাত্র ফ্রান্সের মন রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্যারিস নগরীতে সমবেত হইল।

প্যারিস নগরী শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত

প্রধান চারিজন (Big Four)

৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড্ ল্যয়েড্ জর্জ, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্শো, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দেশ-বিদেশ হইতে শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four)-এর হস্তেই ছিল। ইঁহারা হইলেন:

উইলসন, লয়েড্ জর্জ, ক্লিমেনশো এবং ওর্লান্ডো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেনশো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

শান্তির চেষ্টা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন ছিলেন উদ্যোগী। কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেণ্ট উইলসন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড্ জর্জ তাঁহাদের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। পূর্বেই এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

উইলসন ও লয়েড্ জর্জের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বর্ণনা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয় যে, জার্মান সাম্রাজ্য কিংবা জার্মান জাতিকে বিচ্ছিন্ন করা, অথবা জার্মানি সাম্রাজ্যবাদী সংবিধান পরিবর্তন করা, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য বিভক্ত করা, অথবা তুরস্ককে উহার রাজধানী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ হইতে বিতাড়িত করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য নহে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে তাহা দ্বারা পূর্বে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সেইগুলি দ্বারা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল সেই ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের

লয়েড্ জর্জের বিবৃতির মূল সূত্র

ভিত্তিতে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে, এবং আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা গঠন করিয়া অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে। লয়েড্ জর্জের বিবৃতি হইতে কয়েকটি নীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল: (১) জার্মানির প্রতি কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার শান্তি স্থাপন কালে করা হইবে না, (২) শান্তি-চুক্তি স্বায়ত্ত-শাসন-নীতির ভিত্তিতে রচিত হইবে, (৩) আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিতে হইবে। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা নীতি মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এক বার্তায় প্রকাশ

উইলসনের চৌদ্দ দফার মূল নীতি

করিলেন। উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতির এবং লয়েড্ জর্জের বিবৃতির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। উইলসনেও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র—সকলেরই রাজ্যসীমা অপরিবর্তিত রাখিবার গোপন কূটনীতি ত্যাগের, স্বায়ত্তশাসন-নীতির ভিত্তিতে শান্তি-চুক্তি স্থাপন, লীগ-অব্-ন্যাশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং নিরস্ত্রীকরণ সাধন, প্রভৃতি মূল নীতির সহিত আরও কতকগুলি নীতির উল্লেখ করিয়াছিলেন। লয়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বিবৃতি প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্যবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কার্যত সংকীর্ণ স্বার্থপরতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শবাদের মৌখিক প্রকাশে কোন ত্রুটি করিলেন না। ভিয়েনা

সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেকজান্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিস শান্তি-সম্মেলনেও সেইরূপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন। তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের মর্যাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। "জনমতের ভিত্তিতে আইনসম্মত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য"—এই কথা উইলসন সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ব্যক্ত করিলেন* এবং এই আদর্শ কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'-সংবলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইল না, কারণ যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন, জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন দেশের ছিল। জনমতের চাপে লয়েড্ জর্জও তাঁহার পূর্বেকার বিবৃতি কার্যকরী করা সম্ভব নহে এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আদর্শবাদ

ইওরোপের দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

এইভাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হইল। একদিকে ন্যায় ও সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাহাতে বিনষ্ট না করিতে পারে সেজন্য জার্মানিকে দুর্বল করিবার, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা।† এই দুই আদেশের দ্বন্দ্বে পরাজিত জার্মানিকে পদানত করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে ন্যায় ও সততার আংশিক প্রয়োগ

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত

* "What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind." *Wilson*, Vide, Ketelbey p. 430.

† "At the peace conference two ideas were struggling for mastery ; on the one side was the conceptions of an impartial and altruistic distribution of justice ; on the other were notions more familiar to the peace conference, of the balance of power, of security against a recurrence of danger from the defeated State, of territorial and economic compensation on the part of the victors." Ketelbey, p. 431.

যে না করা হইল এমন নহে, তথাপি প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির কূট-কৌশল ও জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন ল্যয়েড্ জর্জ, ক্লিমেনশো, ওর্লান্ডো প্রমুখ কূটনীতিকগণের কূটচালে সহজেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) নামেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকরী হইল না।

উইল্‌সনের আদর্শবাদের পরাজয়

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন জার্মানির সহিত ভার্সাই (Versailles)-এর সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত সেন্ট্ জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-এর সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভ্‌রে (Sevres)-এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুঝিলেন না, তেমনি ইওরোপের পুনর্গঠনে ন্যায় বা সত্যের ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

ভার্সাই, সেন্ট্ জার্মেইন, ট্রিয়ানন, নিউলি ও সেভ্‌রে—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেন্ট-প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা শর্তের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) জার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং জার্মান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ট্রিয়েস্ট্ (Triest) ও ট্রেন্‌টিনো (Trentino) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি এবং পোল্যান্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা, এবং (৫) জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সমস্যা

লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না, সে-বিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২৮শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব্-ন্যাশন্‌সের চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নূতন শর্ত সংযোজনের দ্বারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বা মন্‌রো-নীতির (Monroe Doctrine) ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি লীগ-অব্-ন্যাশন্‌সের নীতি বিরুদ্ধ হইবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং

লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তি গৃহীত

প্রত্যেক দেশের প্রজাই সম-মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব প্যারিস সম্মেলনের নিকট জাপান উত্থাপিত করিলে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর কৃত্রিম বৈষম্য সম্পূর্ণভাবেই বজায় রহিল।

রাইন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য ফরাসী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্স দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ডের অন্তর্বর্তী দশ হাজার বর্গমাইল স্থান একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous buffer state) বলিয়া ঘোষিত হউক। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আল্‌সেস্‌-লোরেনের ন্যায় অপর একটি সমস্যাসঙ্কুল স্থানের সৃষ্টি হইত। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতে নিজ নিরাপত্তার দাবি ত্যাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে ফরাসী মন্ত্রী ক্লিমেনশো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে আরও দুইটি চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার দায়িত্ব গ্রহণ

জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের বিদ্বেষ

ভার্সাই-এর সন্ধির খসড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি লিখিত মন্তব্য পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০টি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর সন্ধির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ ৪৪৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখিয়া পেশ করিলেন। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ এই সকল মন্তব্য বিবেচনা করিয়া এগুলির মধ্য হইতে অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। এই সামান্য পরিবর্তনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্‌ জর্জের বিশেষ সনির্বন্ধতায় সম্ভব হইয়াছিল। ল্যয়েড্‌ জর্জ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় যে-প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা সামান্য পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরিবর্তিত সন্ধির শর্তানুসারেও জার্মানির ভাগ্য-বিড়ম্বনার অবধি ছিল না।

ভার্সাই-এর সন্ধি, ১৯১৯ (Treaty of Versailles, 1919): ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। (২) গণভোটে সমর্থিত হইলে উত্তর-শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ডেনমার্ককে, সাইলেশিয়ার

একাংশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে দিতে হইল। (৩) বেলজিয়ামকে মরেস্নেট্, ইউপেন ও মার্মেডি (Moresnet, Eupen and Malmedi) দিতে বাধ্য হইল। (৪) পোল্যান্ডকে পোজেন (Posen)-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম প্রাশিয়া দিতে হইল, এবং যদি উত্তর-সাইলেশিয়া ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যান্ডকে দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। (৫) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে এই বন্দরটি লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। (৬) জার্মানিকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হইল। চীনদেশস্থ জার্মান অধিকারসমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mendatories'-এ পরিণত করা হইল।

পুনর্বণ্টনের শর্তাদি

জার্মানির সামরিক শক্তির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষে আনা হইল। (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি জার্মানিকে ত্যাগ করিতে হইল। (৩) যে সামান্য সৈন্যসংখ্যা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং জার্মানির সীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল। (৪) জার্মানির নৌ-বাহিনীরও সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, হেলিগোল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। (৫) রাইন নদীর বাম তীরের যে-সকল জার্মান দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং দক্ষিণ তীরের পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনপ্রকার সৈন্য সমাবেশ, দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি সামরিক ক্রিয়াকলাপ করা চলিবে না। (৬) বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলা-বারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—এই সকল শর্তও জার্মানির উপর চাপান হইল। (৭) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেজন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল। (৮) জার্মানির যুদ্ধ-জাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সকল যুদ্ধ-জাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাডমিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa flow) নামক জলভাগে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বেই ডুবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

সামরিক শর্তাদি

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির বাণিজ্যপোতের অধিকাংশ ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সার (Saar) অঞ্চল নামক একটি জার্মান জেলা পনর বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা

হইল। এই দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফরাসী কয়লার খনিগুলি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পনর বৎসর অতিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন স্থির করা হইবে, বলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকেও জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। (৩) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধ জার্মানির উপর আরোপ করিয়া জার্মান-সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবি করা হইল। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পরিমাণ অর্থ জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবে, তাহা স্থির করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিসাব অনুযায়ী এই দাবি মোট ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারের মধ্যে দাঁড়াইল। কী পরিমাণ অর্থ দাবি করিলে ঠিক হইবে, তাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ সোনা বা অপর কোন জিনিস দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানিকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন আর জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

অর্থনৈতিক শর্তাদি : ক্ষতিপূরণ

ভার্সাই-এর সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles) : প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং ইওরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে লক্ষ্য করি। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, উপযুক্ত মর্যাদা, ন্যায় বা সততা প্রদর্শনের দূরদৃষ্টি বা প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা বা অন্তর্দৃষ্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ করিতে না পারে, সেই ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল।

মিত্রপক্ষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জ এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহাদের নিজ নিজ সরকারের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য (War-aims) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ রাখিলে আমাদের নিরপেক্ষতার খাতিরে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এই সকল যুদ্ধ-উদ্দেশ্য শান্তি-চুক্তি রচনার কালে

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে (১৯১৯)
জার্মানি
উত্তর
সাগর
গণভোট সাপেক্ষ
গ্রেট ব্রিটেন
বেলজিয়ামকে
আলসেস
লোরেন
ফ্রান্স
সার অঞ্চল
ফ্রান্সকে
১৫ বৎসরের জন্য
স্পেন
পোর্তুগাল
ডেনমার্ক
স্বাধীন শহর জাতিসংঘ কর্তৃক শাসিত
লিথুয়ানিয়া
রাশিয়া
মিত্রশক্তিকে
পোল্যাণ্ড
গণভোট সাপেক্ষ
সাইলেশিয়া
পোল্যাণ্ডকে
চেকোস্লোভাকিয়াকে
চেকোস্লোভাকিয়া
মিউনিক
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
যুগোস্লাভিয়া
গ্রীস
ইটালি
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
সুইডেন
নরওয়ে
বার্লিন
হামবুর্গ
কোলন
ফ্রাঙ্কফুর্ট
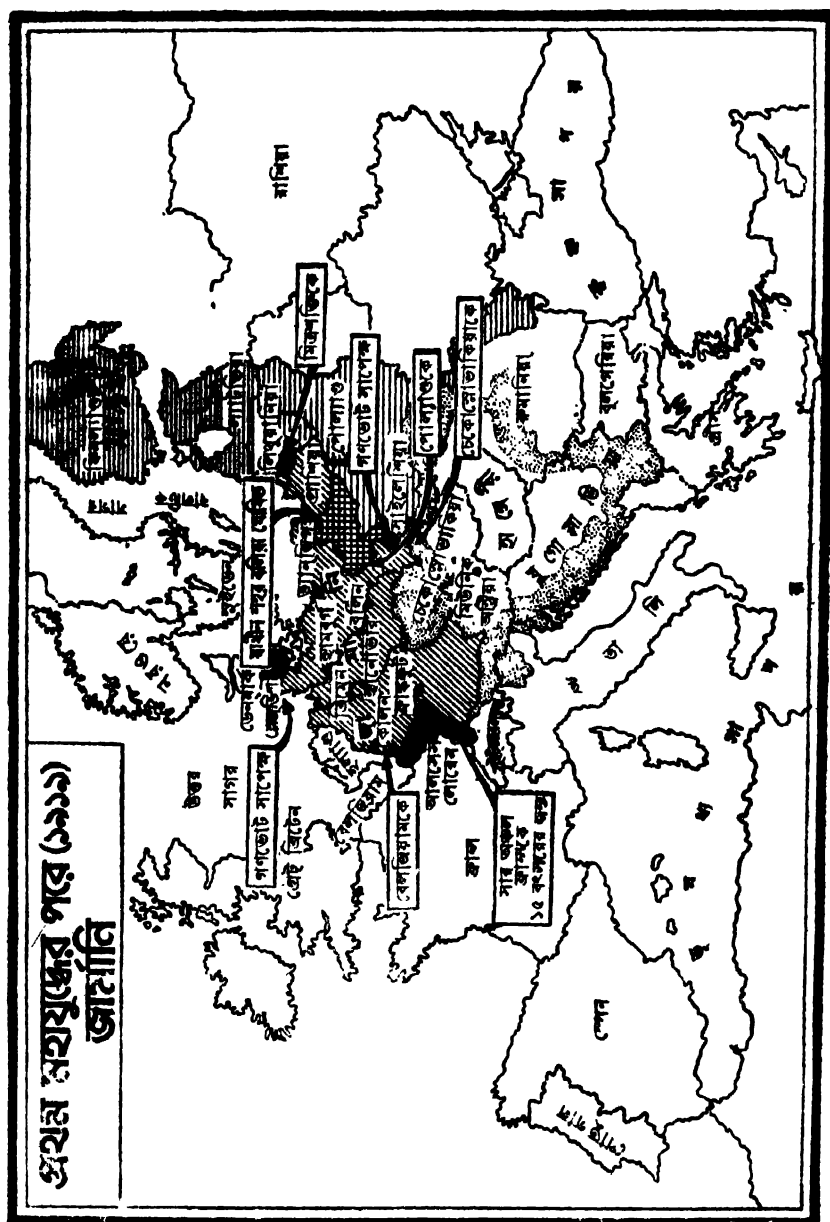
প্রতিফলিত হইবে, এই আশা করা জার্মানির পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু কার্যত ভার্সাই-এর সন্ধিতে* আমরা দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, যথা: (১) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিষ্যতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই দুই নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিকগণ পরাজিত শত্রুর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শান্তি-স্থাপন ও শ্রদ্ধা-অর্জনের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায্য-বিচার, দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নহে, এ-কথা প্রমাণ করা যায়।

দুইটি প্রধান নীতি: (১) জার্মানিকে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দান, (২) ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তি-সঞ্চয়ের পথ রোধ

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনের কাজে পরাজিত শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি অন্যায্য এবং অপমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ স্বভাবতই থাকে না, ফলে, শান্তি-চুক্তির বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুরু হয়।† এই বিরোধ ও বিদ্বেষ ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও এইরূপ হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই-এর চুক্তির খসড়ার উপর কেবলমাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু জার্মান প্রতিনিধি-বর্গকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত করিয়া অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় যতটুকুই

(১) মানসিক প্রতি-ক্রিয়ার দিক দিয়া শান্তির প্রতিকূল

জার্মানির প্রতি অযথা অপমান-জনক ব্যবহার

* "The treaty represented two main ideas; a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." *A Short History of Modern Europe*, Riker, p. 396.

† "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, p. 322.

থাকুক না কেন, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান জাতি, এমন কি, ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated Peace' বা বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তি-চুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই, জার্মান জাতি এই সন্ধির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-'৪৫) বীজ এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

'Dictated Peace'

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর সন্ধি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর পত্তন করিয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্সাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শর্তাদি কোন উদার বা ন্যায্য-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করা হইয়াছিল, কিন্তু জার্মানি হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিদানে জার্মানিকে কোন সুবিধাদানের মনোবৃত্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ-অব্-ন্যাশনস্-এর শর্তানুসারে* উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

(২) অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অনুদারতা ও অবিচার—লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নীতি-বিরোধী

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রই গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেসিডেন্ট উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী (Fourteen Points)। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তানুযায়ী† স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্বৃত্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানির উপরই মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও হ্রাস করা হইয়াছিল।

সামরিক শক্তি-হ্রাস-নীতি অবহেলিত

---

* "A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." *League of Nations Covenant*, Vide, Langsam, p. 69.

† "Adequate guarantees that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety." Wilson's *Fourteen Points*, Langsam, p. 69.

এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

চতুর্থত, জার্মানি হইতে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফ্রান্সকে দান করা, পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া, পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দিয়াছিলেন, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডকে যে-সকল স্থান জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির লোকসংখ্যা অধিক ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল।*

জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

পঞ্চমত, জার্মানিকে যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির সর্বনাশ সাধনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। জার্মানিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক কিত্তৃতির দিক দিয়া দুর্বল করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে বিচার করিলে পরাজিত শত্রুর এইরূপ অবমাননা এবং নির্যাতন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তিগুলির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি ঃ রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

ঐতিহাসিক রাইকার (Riker) বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিত, তাহা হইলে জার্মানিও যে মিত্রশক্তিগুলির উপর অনুরূপ শর্তাদি চাপাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেস্ট্‌-লিটভস্কের সন্ধি এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমত সমর্থন করিবার জন্য ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুকে শত্রুতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে—এইরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে রহিয়াছে। অস্ট্রিয়া ও

ঐতিহাসিক রাইকারের অভিমত

* "It was perhaps open to question whether the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations." E H Carr : *International Relations between the two World Wars*, pp. 5-6.

প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) পর জার্মানির প্রতি অস্ট্রিয়ার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিসমার্কের উদারতার ফলস্বরূপ, ইহা অনস্বীকার্য। মানবতা এবং নৈতিকতার দিক ভিন্ন প্রকৃতক্ষেত্রেও ভার্সাই-এর সন্ধি যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই।* (১) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইতে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে এইভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যহীন করিবার মধ্যেই ভার্সাই-এর সন্ধি ভঙ্গ করিবার দৃঢ়সংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। পুনরায় যুদ্ধ সৃষ্টি করিয়া নিজ মর্যাদা এবং হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। (২) পোল্যান্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া ফিরাইয়া দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিবার ফলে জার্মান জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপত্তারও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সুযোগ পাইলেই উহার পরিবর্তন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিষ্যতে জার্মানির উত্থানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জার্মানি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথম হইতেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। (৩) তদুপরি জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অভাবনীয় পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল, তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের যে বিরাট বোঝা চাপাইয়াছিল, তাহার মধ্যেই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছিল। কাল্পনিক যে-কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করিবার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বা শত্রুকে দুর্বল করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ মিত্রশক্তিদের স্বার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। হাঁসকে উপবাসী রাখিয়া সোনার ডিম আশা করা দুরাশা মাত্র। জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করিয়া ক্ষতিপূরণের আশা করা ঐরূপ সোনার

জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল: সন্ধি ভঙ্গ করিবার জন্য জার্মানির সংকল্প

জার্মানির অপমান: সন্ধি ভঙ্গের সংকল্প

অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ দাবি: অদূরদর্শিতার পরিচায়ক

* But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

তিজ্ঞের ন্যায়ই দুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শান্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকর রহিয়া গিয়াছিল।

উপসংহার :

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানত জার্মানি কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নরনারীর যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধাত্মক জনমত গঠিত হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি-সংগঠকগণ এই শক্তিশালী জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংকীর্ণ স্বার্থপর জাতীয়তাবোধ, জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রভৃতি কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশকে পূর্বে কখনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্বভাবতই এই সন্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই যে বপন করা হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(১) ইওরোপীয় জনমতের চাপ, (২) মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর চুক্তি

সংকীর্ণ স্বার্থপরতা-হেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ সৃষ্টি

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইলসনীয় নীতির মধ্যে অসামঞ্জস্য (Deviations of the Treaty of Versailles from Wilsonian Principles) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এবং অন্যত্র কয়েকটি বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের (The Allies) যুদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন। এই সকল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি-স্থাপন ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি-রক্ষা করাই ছিল উইলসনের উদ্দেশ্য। উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তের পরিকল্পনায় জেনারেল স্মাট্‌স ও ফিলিমোর-এর দানও নেহাত কম ছিল না। উইলসনীয় নীতিগুলি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট তাঁহার ভাষণে বিবৃত চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points)* ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসের নিকট অপর এক বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি নীতি' (Four Principles), মাউণ্ট ভার্নন নামক স্থানে

উইলসনীয় নীতি : 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) 'চারটি নীতি' (Four Principles) 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) ও 'পাঁচটি ব্যাখ্যা' (Five Particulars)

*** Fourteen Points :**

1. "Open covenants of peace openly arrived at, after which there shall be no private international undertakings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. (Contd.)

৪ঠা জুলাই তারিখের বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) এবং নিউইয়র্কে বক্তৃতায় বিবৃত 'পাঁচটি ব্যাখ্যা' (Five Particulars)—এই সকল বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লিখিত ও বিবৃত নীতির সমষ্টিমাত্র। এই সকল নীতির ব্যাখ্যা ও ঘোষণা সাধারণ্যে বিশেষত জার্মান জাতির মনে এই ধারণা স্বভাবতই জাগিয়াছিল যে, মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানির প্রতি ব্যবহারে এগুলির প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে এই সকল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির প্রতি যেরূপ আচরণ করা উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ইহাই ছিল প্রধান অভিযোগ। তাহাদের নিকট ভার্সাই-এর সন্ধি ছিল জাতীয় অপমানের প্রতীকস্বরূপ।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির অভিযোগ

সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইওরোপীয় লেখক মাত্রেরই ভার্সাই-এর সন্ধি বিজিত শক্তি জার্মানির উপর বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের আক্রোশে ও প্রতিশোধপরায়ণতার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত তথা উইলসনীয় নীতির প্রয়োগে জার্মানির প্রতি অবিচার অর্থাৎ উইলসনীয় নীতির ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির প্রয়োগে অসামঞ্জস্যের মধ্যেই জার্মানির পুনরুত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ উপ্ত ছিল। ইদানীং কোন কোন লেখক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির প্রতি অবিচারের বিশেষ কোন পরিচয় পান না। তাঁহাদের মতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তগুলির প্রয়োগে উইলসনীয় নীতিগুলির অন্ধ অনুসরণই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ, এই দুইয়ের অসামঞ্জস্য নহে।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কের মতানৈক্য

---

2. Absolute freedom of navigation upon the seas outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement the international covenants.

3. The removal, as far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.

4. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be redused to the lowest point consistent with domestic safety.

5. A free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the population concerned must have equal weight with the equitable claims of the Government whose title is to be determined. (*Contd.*)

গ্যাথোর্ণ হার্ডি'র মতে যদিও জার্মানি উইল্‌সনীয় নীতির ভিত্তিতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং যদিও বা প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের বক্তৃতায় বিবৃত নীতিগুলির প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তথাপি জার্মানির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উদার ব্যবহার আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তিনি টেম্‌পার্‌লির (H. W. V. Temperley) সহিত একমত যে, উইল্‌সনীয় নীতি রাজনৈতিক বক্তৃতা ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এই বক্তৃতাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া বা কূটনৈতিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োগ করা যেমন ছিল অসম্ভব, তেমনি উহার পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা ছিল অযৌক্তিক।* ইহা ভিন্ন, এ-কথাও বলা হইয়া থাকে যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে জার্মানি রাশিয়ার উপর ব্রেস্ট্‌-লিটভস্ক-এর এবং রুমানিয়ার উপর বুখারেস্ট-এর যে সন্ধি চাপাইয়াছিল, তাহা হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি জয়লাভ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের যে কি অবস্থা হইত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং জার্মান জাতির উইল্‌সনীয় নীতির প্রয়োগে ত্রুটির বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার নৈতিক অধিকার ছিল না। বস্তুত, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বাল্টিমোর নামক স্থানে এক বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন জার্মানি কর্তৃক রাশিয়ার উপর যে শান্তি-চুক্তি চাপান হইয়াছিল, উহার ফলে যুদ্ধের পর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার পূর্বধারণা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন। সুতরাং উইল্‌সনীয় নীতি জার্মানির সহিত শান্তি-স্থাপনের ভিত্তি, এ-কথা বলা যায় না। †

ভার্সাই-এর চুক্তির সমর্থন

গ্যাথোর্ণ হার্ডি এ-কথাও বলিয়াছেন যে, উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের অধিকাংশই

---

6. The evacuation of all Russian territory, and as such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest co-operation of other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing: and more than welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded to Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of her goodwill, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy. (*Contd.*)

---

* Temperley: *A History of the Peace Conference of Paris*, vol. vi, p. 540. Gathorne Hardy: *A Short History of the International Affairs*, p. 20.
† President Wilson's Baltimore Speech, April 16, 1918.

ছিল সর্বজনীন শর্ত।* কেবলমাত্র ৫, ৭, ৮ ও ১৩—এই চারিটি শর্ত ছিল জার্মানির স্বার্থ-সম্পর্কিত। পঞ্চম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, উপনিবেশের উপর কোন দেশের দাবি স্বীকার করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিতে গেলে জার্মানিকে সর্বাবস্থায় নিজ উপনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে, এ-কথা জার্মান নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সপ্তম ও অষ্টম শর্তে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হইতে জার্মান সৈন্যাপসারণ এবং বেলজিয়ামকে মার্সেডি, মরেসনেট, ফ্রান্সকে আলসেস্-লোরেন প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন উইলসনের চারিটি নীতি'তে (Four Principles) বিবৃত স্বাধিকার (Self-determination) নীতির প্রয়োগ জার্মানি ডেনমার্ককে গণভোট সাপেক্ষভাবে উত্তর-শ্লেজ্‌উইগ্ নামক স্থানটি অর্পণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শর্তে পোল্যান্ডের পুনর্গঠন ও সমুদ্রের সহিত সেই পুনর্গঠিত রাষ্ট্রের সংযোগের সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালের এক অন্যায় দূরীভূত হইয়াছিল। এই সকল চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাথোর্ণ হার্ডি বলেন যে, ভার্সাই-এর সন্ধি ও উইলসনীয় নীতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। সার অঞ্চল ও রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকার ছিল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উইলসনীয় নীতি ও এই সকল ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী ছিল না। জার্মানি যাহাতে ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পালন করিয়া চলে, সেজন্য এই সকল ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছিল। কেবলমাত্র যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে জার্মান সম্রাট কাইজারের বিচারের শর্তটি উইলসনীয় নীতি বহির্ভূত ছিল। এক্ষেত্রেও গ্যাথোর্ণ হার্ডি বলেন যে, কাইজারের বিচারের শর্তটির বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের কিছু থাকে, তাহা একমাত্র কাইজারের ব্যক্তিগত অভিযোগ হইতে পারে, ইহা জার্মানির জাতীয় অভিযোগ হইতে পারে না।

গ্যাথোর্ণ হার্ডি'র যুক্তি

---

7. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single act will serve as this will serve to restore confidence among nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of International Laws is for ever impaired.

8. All French territory should be freed, and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matters of Alsace-Lorraine, which had unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order tnat peace may once more be made secure in the interest of all.

(*Contd.*)

---

* Gathorne Hardy. pp. 18-19.

কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি যে উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত ও অপরাপর নীতি-বিরোধী ছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইদানীং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির যুক্তিবাদী সমর্থনের প্রবণতা বিশেষভাবে ইংরাজ লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইলেও নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইলসনীয় নীতির মধ্যেই যে অসামঞ্জস্য ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল।

নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনীয়তা

---

9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognisable lines of nationality.

10. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safe-guarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.

11. Rumania, Serbia and Montenegro should be evacuated ; occupied territories restored ; Serbia accorded free access to the sea ; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality, and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

12. The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured, as secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured of an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardenelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

13. An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish population, which should be assured a free and secure access to the sea, whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant.

14. A general associations of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike.

Four Principles :

1. That each part of the final settlement must be based upon essential justice of that particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that will be permanent. *(Contd.)*

প্রথমত, উইলসনীয় নীতির সাধারণ শর্তগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র যেগুলি সরাসরিভাবে জার্মানির স্বার্থ-সম্পর্কিত ছিল, সেগুলি বিচার করিলে জার্মানির অভিযোগের ন্যায্যতা প্রমাণিত হইবে। উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তের পঞ্চম শর্তে উপনিবেশ সম্পর্কে যে-নীতি বর্ণিত আছে, তাহা কেবলমাত্র জার্মানির উপরই প্রযুক্ত হইয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিচার করিয়া দেখা দূরের কথা, জার্মানির উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনসমাজের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনও তাহারা উপলব্ধি করে নাই। সার অঞ্চল, শাণ্টুং, সিরিয়া প্রভৃতির জন-

উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টনের নীতির অবমাননা

---

2. That peoples and provinces are not to be bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, even the great game, now for ever discredited, of the Balance of Power but,

3. That every territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment or compromise of claims amongst rival states.

4. That all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction that can be accorded to them without introducing new or perpetuating old elements of discord and antagonism that would be likely in time to break the peace of Europe, and consequently of the world.

Four Ends :

1. The destruction of every arbitrary power anywhere that can separately, secretly, and of single choice disturb the peace of the world ; or if it cannot be presently destroyed at least its reduction to virtual impotence.

2. The settlement of every question, whether of territory, sovereignty, of economic arrangements or of political relationship, upon the basis of free acceptance of that settlement by the people immediately cocerned and not upon the basis of material interest or advantage of any other nation or people which may desire a different settlement for the sake of its own exterior influence or mastery.

3. The consent of all nations to be governed in their conduct towards each other by the same principles of honour and respect for the common law of civilized society that govern the individual citizens of all modern states in their relations with one another to the end that all promises and covenants may be sacredly observed, no private plots or conspiracies hatched, no selfish injuries wrought with impunity, and a mutual trust established upon the handsome foundation of a mutual respect for right. *(Contd.)*

সাধারণের মতামতের প্রতি কোনপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কথা তাহারা মনেও আনে নাই।

দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শর্তানুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে-পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজ সরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন, উহার অধিক সামরিক শক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রই হ্রাস করিবে। এই নীতি একমাত্র পরাজিত জার্মানির উপরই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অপরাপর রাষ্ট্র নিজ নিজ সামরিক শক্তির এতটুকুও হ্রাস করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। পক্ষান্তরে জার্মানির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যে-পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন ছিল, তাহা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হয় নাই।

সামরিক উপকরণ হ্রাসের প্রশ্ন

---

4. The establishment of an organisation of peace which shall make it certain that the combined power of free nations will check every invasion of right and serve to make peace and justice the more secure by affording a definite tribunal of opinion to which all must submit and by which every international readjustment that cannot be amicably agreed upon by the people concerned shall be sanctioned.

Five Particulars :

1. The impartial justice meted out must involve no discrimination between those to whom we wish to be just and those to whom we do not wish to be just. It must be justice that knows no favourites and knows no standards but the equal rights of the several peoples concerned.

2. No special or separate interest of any single nation or any group of nations can be made the basis of any part of the settlement which is not consistent with the common interest of all.

3. There can be no leagues or alliances or special covenants and understandings within the general and common family of the League of Nations.

4. And more specially, there can be no special selfish economic combinations within the League and no employment of any of economic boycott or exclusion, except as the power of economic penalty, by exclusion from the markets of the world, may be vested in the League of Nations itself as a means of discipline and control.

5. All international agreements and treaties of every kind must be made known in their entirety to the rest of the world. Special alliances and economic rivalries and hostilities have been the prolific source in the modern world of the plans and passions that produce war. It would be an insincere as well as an insecure peace that did not exclude them in definite and binding terms.

তৃতীয়ত, উইলসনের নীতির অন্যতম প্রধান ছিল স্বাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Self-determination)। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগে কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় নাই। পুনর্গঠিত পোল্যান্ডকে যে-সকল স্থান দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলির কয়েকটিতে জার্মান জাতির লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত পোল্যান্ডে জার্মান জাতির লোকের ঐ একই অধিকার উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইতালির রাজ্যসীমাও জাতীয়তা-নীতির ভিত্তিতে করা হয় নাই। যে আশা লইয়া ইতালি প্রথম যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, তাহা ব্যাহত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানির সহিত জার্মান জাতির লোক-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছাধীনভাবে ঐক্যবন্ধ হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি উইলসনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অবমাননা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। অস্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্য পরাজিত জার্মানিকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, এই যুক্তির ভিত্তিতে মিত্রশক্তিবর্গের কার্য সমর্থন করা সুযৌক্তিক হইবে না। পরাজিত শত্রুকে পদানত রাখিবার মনোবৃত্তি বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসেও ফ্রান্সকে পদানত ও হীনবল করিয়া রাখিবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্যের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হইবার যে আশংকা ছিল, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে ন্যায় ও উদারতা প্রদর্শনের ত্রুটি সেই আশঙ্কা কোন অংশে হ্রাস করিয়াছিল বলা চলে না। পরাজিত শত্রুকে উদার-নীতির মাধ্যমে মিত্রতে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা বা দূরদর্শিতা মিত্রশক্তিবর্গ উপলব্ধি করে নাই। মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে জার্মানি কোন ন্যায্য ব্যবহার পায় নাই এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি পরাজিত জার্মানির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্বভাবতই জার্মান জাতিকে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়া ও জার্মানির ঐক্যবন্ধ হইবার সম্ভাব্য ফল হিসাবে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইতে পারে, এই যুক্তিতে জার্মানিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে পরাজিত ও অপমানিত জার্মান জাতির মনে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে স্থানান্তরিত না করিয়া সম্ভব হইত না, এজন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগের প্রশ্ন বাদ দিয়া মিত্রশক্তিবর্গ দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিল। ডেভিড্ টমসনের (David Thomson) এই যুক্তির বিরুদ্ধে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, জার্মানির ও অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও এই দুই দেশের ঐক্যের পথ রুদ্ধ করিয়া জার্মানিকে দুর্বল করিয়া রাখা গেলেও উইলসনীয় নীতির অবমাননা ইহাতে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির অবমাননা

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা : সংখ্যালঘু সমস্যা

ডেভিড্ টমসনের যুক্তি : উহার সমালোচনা

গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে জার্মান সম্রাট কাইজারের উপর যুদ্ধ-অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর কয়েকজন যুদ্ধ-অপরাধী জার্মানকে বিচার করিবার শর্তটি শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হইলেও* ইহা জার্মান জাতির অভিযোগের কারণ হইতে পারে না, ইহা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উহা কাইজারের এবং অপরাপর কয়েকজন জার্মান সেনানায়কের ব্যক্তিগত অভিযোগ ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু উইলসনের বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে-সকল নীতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির সম্রাটের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যে অবিচার এবং জার্মান জাতির মর্যাদায় যে আঘাত করা হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, জার্মানির উপর এক বিশাল ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপাইয়া দিয়া উইলসনের চারিটি নীতি (Four Principles)-সংক্রান্ত বক্তৃতায় (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ) উল্লিখিত "There shall be no annexations, no contributions, no punitive damages"—এই কথাগুলির অবমাননা করা হইয়াছিল। এখানে এ-কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লয়েড্ জর্জ ব্রিটিশ যুদ্ধাদর্শ বর্ণনা করিতে গিয়া যে-সকল নীতি উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলিও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে মানিয়া চলা হয় নাই।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে মিত্রশক্তিবর্গ চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। পরাজিত শত্রুর পক্ষে ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইবার পথ বন্ধ করা এবং শক্তি-সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতিই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম হইতেই 'Thy head or my head' নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। সুতরাং মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত হইলে জার্মানি যে-ব্যবহার করিত, পরাজিত জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গও অনুরূপ আচরণই করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোন ব্যাপক যুদ্ধের পর মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিয়া শত্রুর প্রতি চরম উদারতা প্রদর্শন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে কোন কালেই ঘটে নাই। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিসমার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার প্রতি উদার ব্যবহারের পশ্চাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সাহায্য লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল বলবতী। এই উদাহরণ বাদ দিলে ইওরোপীয় ইতিহাসে বিজিতের প্রতি চরম উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কূটনৈতিক চাল, বিভিন্ন দেশের সরকারের পরিবর্তন, যুদ্ধের গতির পরিবর্তনশীলতা, ব্রেস্ট্ লিট্ভস্ক সন্ধির কঠোরতা, মিত্রশক্তি-বর্গের গোপন-চুক্তি প্রভৃতি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

উপসংহার

* "Less clearly perhaps within the agreed frame-work were the provisions for the trial of the Kaiser and of war criminals, but if these constituted a grievance it was personal rather than national." Hardy, p. 19.

এমতাবস্থায় উইলসনের আদর্শবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা বৃথা ছিল। এই সকল যুক্তির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির ত্রুটিসমূহ কতকটা মার্জনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of Saint Germain) : মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি তথা অপরাপর সন্ধিগুলিও ভার্সাই-এর সন্ধির মূল-নীতির অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা হইল। জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তার ভিত্তিতে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করিল। অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত এমন কোন চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীয় রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার উপর চাপাইলেন।

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়া : সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, সেইজন্য অস্ট্রিয়ার জার্মান অধিবাসীদিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তার দোহাই দিয়াই সমবেত রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া, সুদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটি একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন শ্লাভ্-অধ্যুষিত বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল যুগোস্লাভিয়া (Yugo-Slavia)। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল। দক্ষিণ-টাইরল (South Tyrol), ট্রেনটিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria) এবং ড্যালম্যাশিয়া (Dalmatia)-'র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ-টাইরলের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হইয়াছিল। জার্মানির ন্যায় অস্ট্রিয়াও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিতেছিল, তাহা মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তিতে বাধাদান

জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলোপ

অস্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এই সকল কারণে অস্ট্রিয়ার অর্থনীতি যেভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হিসাবে অস্ট্রিয়া Anschluss বা জার্মানির সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আন্দোলন শুরু করিয়াছিল।* অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবং সৈন্য-সংগ্রহ ব্যাপারে জার্মানির উপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অনুরূপ ব্যবস্থা অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস : ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভার্সাই-এর সন্ধির যে-সকল দোষ-ত্রুটি ছিল ঠিক সেইরূপ দোষ-ত্রুটি সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধিতেও ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধেও একই প্রকার অভিযোগ করা যাইতে পারে।

নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly): নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্বর ২৭, ১৯১৯)। এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ৩৩ হাজারের বেশী হইবে না স্থির হইল। ক্ষতিপূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ খুব বেশী হ্রাস না পাইলেও এই সকল শর্তের ফলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেশে পরিণত হইল।

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি

ট্রিয়ানন-এর সন্ধি (Treaty of Trianon): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যস্থ ম্যাগিয়ার জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়াকে ট্রান্সিলভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্ভারের অবশিষ্টাংশ ক্রোশিয়া-স্লাভোনিয়া যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোস্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যান্ড বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজার সৈনিকের অধিক সৈন্য হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌবাহিনীরও কোন অস্তিত্ব রাখা হইল না, সমুদ্র অঞ্চলে পাহারার জন্য সামান্য কয়েকটি জাহাজ তাহাদের

হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর সন্ধি

---

*"One of the strongest drives in Austria for *Anschluss* or union with Germany came from the peculiarly difficult economic situation in which the Austrian republic was placed by the Treaty of St. Germain." *The World Since 1919*, Langsam, p. 36.

রহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের ন্যায় হাঙ্গেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপূরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

সেভ্‌রে-এর সন্ধি (Treaty of Sevres)ঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সেভ্‌রে-এর সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টিউনিস প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া ও সিরিয়ার উপর হইতেও তুরস্কের অধিকার বিলোপ করা হইল। স্মার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া-মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীসকে ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেওয়া হইল। রোড্‌স ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির অধিকার স্বীকৃত হইল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দার্দানেলিজ ও বোস্‌ফোরাস্‌ প্রণালীদ্বয় আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং উহার তীরস্থ সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইল। একদা বিশাল ওটোমান সাম্রাজ্য (Ottoman Empire) কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ এবং এ্যানাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

তুরস্কের সহিত সেভ্‌রে-এর সন্ধি

তুরস্ক এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত

তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদের প্রতিনিধি সেভ্‌রে-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইল, তখন মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা দান করিল। শেষ পর্যন্ত ল্যসেনের (Lausanne) এই সন্ধির দ্বারা তুরস্ক সেভ্‌রে-এর সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদী দলের বাধাদান

ম্যান্ডেটস্‌ (Mandates)ঃ জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং তুরস্কের আরবীয় উপদ্বীপস্থ সাম্রাজ্যের শাসনভার লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর দায়িত্বাধীনে গ্রহণ করা হইল। লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। যে-সকল দেশের অধীনে এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল, সেগুলিকে Mandatory Powers এবং সেগুলির অধীনে স্থাপিত স্থানগুলিকে Mandates নামকরণ করা হইল।

এই সকল Mandates-এর অধিবাসীদের উন্নতি বিধান করাই ছিল লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর Mandatory power-গুলিকে তাহাদের অধীন Mandates-এর অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট দাখিল করিতে হইত।

Mandate-গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণী। তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত যে-সকল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নিজ শাসন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহাদিগকে Mandatory power-গুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্যদান করিবে। যখনই এই সকল স্থানের অধিবাসীরা নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিবে, তখনই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandate-গুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশ-গুলিকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। এই সকল স্থানে Mandatory power-কে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না। 'গ' পর্যায়ে রাখা হইল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে। এগুলি নিকটবর্তী Mandatory power-এর রাজ্যাংশ হিসাবে বিবেচনা করা হইল, তবে এই সকল স্থানের জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুন্ন না হয়, সেইজন্য কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

'ক' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে দেওয়া হইল, সিরিয়া, লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'খ' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেরুনস্-এর একাংশ, টোগোল্যাণ্ডের একাংশ এবং টাঙ্গানিকা (জার্মান ইস্ট্-আফ্রিকা) ব্রিটেনের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনস্-এর অবশিষ্টাংশ স্থাপন করা হইল ফ্রান্সের অধীনে। বেলজিয়ামকে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির শাসনভার দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়-ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকাকে দেওয়া হইল, জার্মান স্যামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাণ্ডকে, নাউরু দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলণ্ডকে। বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অপরাপর যাবতীয় জার্মান উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরস্থ সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical Importance of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সুদূর-প্রসারী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, সেগুলির প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা বা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত হইবে না।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: ব্যাপক ও বিভিন্ন

(১) ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই এই যুদ্ধের প্রভাবমুক্ত ছিল না। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপকতা—জল, স্থল, আকাশ—সর্বত্র এই যুদ্ধের

সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)

বিস্তৃতি নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

জার্মান, রুশ, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন : নূতন নূতন রাষ্ট্রের উত্থান

(২) এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ইওরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের মানচিত্রের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র একেবারে ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের মানচিত্র তদানীন্তন লোকের নিকট কোন নূতন মহাদেশের মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়ার পুনর্গঠন, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। বলকান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

গণতন্ত্রবাদ—প্রজাতন্ত্রের প্রসার

(৪) এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে-সকল নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের জয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যান্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকালের মধ্যেই (১৯৩২) ইওরোপীয় মহাদেশের প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইয়াছিল মোট ষোল।

ডিক্টেটরশিপ-এর উদ্ভব (Rise of Dictatorship)

(৫) কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিরুদ্ধ ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের স্থলে 'ডিক্টেটরশিপ' (Dictatorship) বা একক-অধিনায়কত্বের উদ্ভব হইতে থাকে। এই নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে, ইতালির ফ্যাসিজম্‌ ও জার্মানির নাৎসীজম্‌-এর উত্থানে।

(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর 'কনসার্ট অব্ ইওরোপ' (Concert of Europe) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাময়িকভাবে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কনসার্ট অব্ ইওরোপের অনুকরণে প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশনস্ (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'থার্ড ইন্টারন্যাশন্যাল' (Third International)-এর প্রতিষ্ঠায়।

আন্তর্জাতিকতার বৃদ্ধি : লীগ অব্-ন্যাশনস্

(৭) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পরবর্তী যুগের যুব-সমাজের মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

যুবসমাজের জাগরণ

(৮) এই যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি ঋণগ্রস্ত দেশ, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাজন দেশে (creditor country) পরিণত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান পরবর্তী কালে নানাপ্রকার ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ফলাফল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্র এই যুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বেসামরিক বিমান চলাচল, নৌ-চলাচল প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানের উন্নতি

(৯) ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর দান ছিল সর্বাধিক। তাহাদের শ্রমের ফলেই এই বিশাল যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বভাবতই শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। ক্রমেই তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা করিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। নারীজাতিরও রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

শ্রমিকদের উন্নতি : নারীজাতির নূতন মর্যাদা লাভ

(১০) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবোধের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। মিত্রশক্তিবর্গের অধীন ঔপনিবেশিক জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রভাব বিস্তৃত হইলে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মিশর, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে।

জাতীয়তা ও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আগ্রহ

(১১) এই যুদ্ধে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, তাহার ফল দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকটে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিল। এই সকল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে যে-অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপূরক হিসাবেই দেখা দিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

অধ্যায় ২১

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্
(The League of Nations)

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা (The need of International Security) : যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দারিদ্র্য ও দুর্দশা মানুষকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের উপায় হিসাবে যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া মানুষকে পুনরায় যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধের পর শান্তি, এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা সাময়িকভাবে মানুষের মনে শান্তিস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ (League of Nations) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর শান্তি—শান্তির পর যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার প্রথম চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় কন্সার্ট অব্ ইওরোপ (Concert of Europe) গঠনের মধ্যে। নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিয়া যে অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করিয়াছিল, উহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় সেজন্য ইওরোপীয় কন্সার্ট গঠিত হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূলনীতি ছিল ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বজায় রাখা। এই সংস্থা প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলপূর্বক বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে পুনরায় শক্তি-সঞ্চয়ে বাধা দান করা এবং কোন রাষ্ট্রই যাহাতে অপর কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ছিল ইওরোপীয় কন্সার্টের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক অবস্থা যাহা ভিয়েনা সম্মেলন বলপূর্বক পুনঃস্থাপন করিয়াছিল উহা রক্ষা করিয়া চলিবার অর্থই ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা। এই সকল ব্যবস্থা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার নামে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকাশ রুদ্ধ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তব জগতের পক্ষে উপযোগী

প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইওরোপীয় কন্সার্ট (Concert of Europe)

ছিল না বলিয়াই 'পবিত্র চুক্তি' (Holy Alliance) কোন প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্সার্ট অব্ ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের স্বীকৃতি আমরা দেখিতে পাই।

ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেস রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেইগ্ কন্ফারেন্স (Hague Conference) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরি-উক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তথাপি স্থায়ী শান্তি-স্থাপনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলব্ধ হইতেছিল, এই সকল চেষ্টার মধ্যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা

যাহা হউক, উপরি-উক্ত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা যে মূলত শক্তি-সাম্য-নীতি-ভিত্তিক ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ নামে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল, উহার মূলনীতি ছিল পূর্বগামী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মূলনীতি ছিল সমবেত-ভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা করা। শক্তি-সাম্য-নীতির প্রাধান্য লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর গঠনতন্ত্র অথবা কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয় না। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং কন্সার্ট অব্ ইওরোপের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইতে উচ্চতর ও বহুলাংশে পৃথক ছিল। মানব-ইতিহাসের সকল স্তরেই পশুশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই পশুশক্তি জগতের সমস্যা-গুলির সমাধান না করিয়া আরও জটিলতর কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া থাকে। এই কারণে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ মানুষের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ (The League of Nations): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর সর্বশেষ শর্তটির* উপর

---

* The High Contracting Parties.

In order to promote International co-operation and to achieve International eace and security.

(Contd.)

ভিত্তি করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশনস্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদির সহিত উহার গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি ল্যয়েড্ জর্জ ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মূল উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা

লীগ-অব্-ন্যাশনস্-এর চুক্তিপত্র বা 'কভেনান্ট' (Covenant)-এর মূল সূত্র ছিল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি আন্তরিকতার সহিত এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। সমসাময়িক জনসাধারণের মনে এই আশা জাগিয়াছিল যে, লীগ-অব্-ন্যাশনস্ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানই শুধু করিবে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নূতন নেতৃত্ব ও সমবায়ের সূচনা করিবে।*

পরস্পর বিবাদে লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ

এই কভেনান্ট-এর দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগ-অব্-ন্যাশনসের সদস্য-দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর বিবাদ দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে এবং মধ্যস্থতার অন্তত তিনমাসের মধ্যে কোন-প্রকার সামরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন সদস্য-দেশ যদি লীগের কভেনান্ট উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে অপরাপর সদস্য দেশগুলি সেই যুদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার সামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কভেনান্ট-ভঙ্গকারী দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করিবে। প্রয়োজনবোধে সদস্য-দেশগুলি লীগের কভেনান্ট রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক, নৌ এবং বিমান-বহরের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

লীগের কভেনান্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

লীগ-অব্-ন্যাশনসের সংগঠন

লীগ-অব্-ন্যাশনসের একটি সাধারণ-সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council), একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) ছিল। এই দপ্তরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations.

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another, agree to this Covenant of the League of Nations. *Preamble to the Covenant of the League of Nations,* Langsam, p. 124.

* Littlefield : *History of Europe Since 1815,* p. 196.

বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠন করা হইল। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর হইল এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল।

লীগ চুক্তিপত্রে (Covenant) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সর্বপ্রথম লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্য হইল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরকারী ত্রিশটি এবং অপর আরও তেরটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য হইল। মার্কিন সিনেটের আপত্তিহেতু মার্কিন সরকার লীগের সদস্য হইলেন না, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিও স্বাক্ষর করিলেন না। পরাজিত জার্মানিকেও লীগের সদস্যপদে গ্রহণ করা হইল না।* ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগের সদস্য সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৬-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্ত হইতে হইলে লীগ চুক্তিপত্রের শর্তাদি মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইত। লীগের সাধারণ-সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা সমর্থিত হইলে কোন উপনিবেশ, ডোমিনিয়ন প্রভৃতিরও সদস্যপদভুক্ত হওয়া চলিত। লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইলে সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া দুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইত।

সদস্য সংখ্যা : সদস্যপদভুক্তি : সদস্যপদ ত্যাগ

লীগের সাধারণ-সভা লীগের যাবতীয় সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি সাধারণ-সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দেওয়া চলিত না। প্রতিবৎসর সাধারণ-সভার অধিবেশন বসিত। জেনিভা নামক শহরে এই সভার অধিবেশন আহূত হইত। লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌ সংগঠিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইবার সময় পর্যন্ত সাধারণ-সভার মোট উনিশটি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার বিংশ তথা সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌সের অবসান ঘটে। সাধারণ-সভা লীগের শান্তি ও নিরাপত্তার কার্য-সম্পর্কিত যে-কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিত। প্রতি বৎসর সাধারণ-সভার অধিবেশনে সমবেত হইয়া সদস্যগণ নিজেদের মতামত, লীগের কার্যাদির সমালোচনা ইত্যাদি করিতেন। তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কার্য ছিল লীগ কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যগণকে নির্বাচন করা। ইহা ভিন্ন লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর ব্যয় বরাদ্দ করা, নূতন সদস্যপদপ্রার্থী রাষ্ট্রের আবেদন বিচার করিয়া দেখা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচনে লীগ কাউন্সিলকে সাহায্য করা।

সাধারণ-সভার সংগঠন ও কার্যাদি

লীগ কাউন্সিল ছিল লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর কার্যকরী সভা। এই কাউন্সিল

---

* Vide, Langsam, p. 1.

যা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং প্রতি বৎসর সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত চারিজন অস্থায়ী সদস্য—মোট এই নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইতে রাজী না হওয়ায় উহার সদস্য-সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ৮ জনে আসিয়া দাঁড়ায়। স্থায়ী সদস্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করিলে অপর চারিটি সদস্য-রাষ্ট্র উহার স্থায়ী সদস্য-পদভুক্ত থাকে। কিছুকাল পর অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র সংখ্যা ক্রমপর্যায়ে এগার পর্যন্ত করা হইয়াছিল। লীগ কাউন্সিল সাধারণত বৎসরে তিনবার মিলিত হইত, কিন্তু ইহা ভিন্ন বিশেষ অধিবেশনও বসিত। কাউন্সিলের সদস্যগণ যখন লীগ্-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর কোন সদস্য-রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করিবেন, তখন সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে লীগ কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে লীগ কাউন্সিলের মতামত সর্ববাদিসম্মত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হইতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে লীগ কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। ম্যাণ্ডেট-এর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্প প্রস্তুত করা, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রকে সাহায্য দান করা, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, আন্তর্জাতিক যে-কোন বিবাদ-বিসংবাদ কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হইলে সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজনবোধে সাধারণ-সভার মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা প্রভৃতি ছিল কাউন্সিলের দায়িত্ব। লীগের চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাও লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল।

লীগ কাউন্সিলের সংগঠন, সদস্য সংখ্যা ও কার্যকলাপ

লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর দপ্তর (Secretariat) 'সেক্রেটারী জেনারেল' নামে একজন কর্মচারীর অধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কাউন্সিলের মতানুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৭০০) অপরাপর কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই দপ্তর জেনিভা নামক শহরে অবস্থিত ছিল। সার এরিক ড্রামণ্ড্ ছিলেন লীগের সর্বপ্রথম সেক্রেটারী জেনারেল। লীগ চুক্তিপত্রেই সার ড্রামণ্ড্ প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন, এই কথার উল্লেখ ছিল। পরবর্তী সেক্রেটারী জেনারেল লীগ কাউন্সিল সাধারণ-সভার মত লইয়া নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। দপ্তরের নানা বিভাগ ছিল। লীগ কাউন্সিল ও লীগের সাধারণ-সভায় যাবতীয় কার্যাদিকে রূপদান করাই ছিল দপ্তরের কাজ।

দপ্তরের সংগঠন ও কার্যাদি

লীগের অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা। লীগ কাউন্সিল ও সাধারণ-সভা মিলিতভাবে

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন করিত। বিচারপতিগণ নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। প্রথমে বিচারপতিদের সংখ্যা ছিল এগার, পরে উহা পনর করা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিবাদে আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নাদির মীমাংসা, আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দায়িত্ব ছিল। হেইগ্ (Hague) নামক স্থানে এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা জেনিভা শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রমিকদের অবস্থা-সংক্রান্ত এবং তাহাদের উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিচারাদির আলোচনা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট শ্রমিক-উন্নয়নের সুপারিশ প্রেরণ করা এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল। লীগের সদস্যপদভুক্ত হইলেই এই সংস্থার সদস্যভুক্ত বলিয়া ধরা হইত। প্রতি সদস্য-রাষ্ট্র হইতে চারিজন প্রতিনিধি এই সংস্থার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন।

সাধারণ-সভা লীগের কভেনান্ট স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-দেশ তিনজন প্রতিনিধি সেই সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু সদস্য-দেশের একটির বেশী ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের স্থায়ী সদস্য ছিল—গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। (আমেরিকা যোগদান না করিলে চারিজন) এই চারিটি দেশের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যান্য সদস্য-দেশ হইতে আরও চারিজন সদস্য সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব্-ন্যাশন্সের কার্যনির্বাহক সভার ন্যায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

বিভিন্ন অংশের কার্যাদি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন সরকার লীগ-অব্-ন্যাশন্সে যোগদানের চুক্তি অনুমোদন না করায় আমেরিকা লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লীগ ত্যাগ

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা (Efforts of Disarmament)ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা নিরস্ত্রীকরণের সমস্যার সহিত সরাসরিভাবে জড়িত, বলা বাহুল্য। স্বাভাবতই উইল্সনের যে-চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র বা Covenant রচিত হইয়াছিল, উহার চতুর্থ শর্তে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া ন্যূনতম পরিমাণে আনিতে হইবে, এ-কথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল।* লীগ চুক্তিপত্রের

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

* "Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety."—*Art. 4, Wilson's Fourteen Points.*

অষ্টম শর্তে এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল এবং একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশক্রমে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইবে, এ কথা লীগ চুক্তিপত্রের নবম শর্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব ও চেষ্টা লীগ কাউন্সিলের উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু লীগের বাহিরেও নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একাধিকবার বিভিন্ন রাষ্ট্র করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে কেবলমাত্র লীগের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আলোচনা করা হইবে।

লীগের মাধ্যমে ও লীগ বহির্ভূতভাবে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য, বলা বাহুল্য। কারণ, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ও সামরিক সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা শুরু হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি হয়। এই ভীতি সকলের মনে নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে, ফলে রাষ্ট্রজোট গঠন শেষ পর্যন্ত 'যুদ্ধের সৃষ্টি' প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা যুদ্ধের পূর্বচ্ছায়াস্বরূপ। মানবতার দিক হইতে বিচার করিলেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের যুক্তি রহিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের তথা যুদ্ধ-জাহাজ ও যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যাবৃদ্ধি বেসামরিক উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাসের উপরই অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে। অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলে স্বভাবতই জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা কতক পরিমাণে হ্রাস পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে যে-অর্থনৈতিক মন্দা সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তখনও বিভিন্ন দেশের সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের ঊর্ধ্বে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিকে স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান কেবল সুযৌক্তিকই নহে, অপরিহার্যও বটে।

নিরাপত্তা ও মানবতার দিক হইতে নিরস্ত্রীকরণের যৌক্তিকতা

লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম এবং নবম শর্তের নির্দেশানুসারে লীগ কাউন্সিল লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যে-আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য দেখা গিয়াছিল উহার সুযোগ লইয়া নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তুতির জন্য একটি কমিশন (Preparatory Commission of Disarmament) নিযুক্ত করিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জেনিভা শহরে এই প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশন শুরু হইলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে এই কমিশনের আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ পৃথক পৃথক খসড়া উত্থাপিত হইল। এই দুইয়ের মধ্যে এবং সদস্যবর্গের আলাপ-আলোচনায় মতানৈক্য এমনভাবে

প্রকট হইয়া উঠিল যে, নিরস্ত্রীকরণের মূল প্রশ্নটি সকলে ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ভীতি, বিদ্বেষ, পরস্পর স্বার্থ প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) প্রধানত তিনটি অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। পদাতিক সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবার ব্যাপারে সকলে একমত হইলেও প্রকৃত বা কার্যকরী সৈনিক (Effectives) বলিতে কাহাদের বুঝাইবে সে-বিষয় লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। ফ্রান্স এবং অপরাপর যে-সকল দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নীতি চালু ছিল সেই সকল দেশ 'সৈনিক' সংখ্যার হিসাব হইতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ যাহারা স্থায়ী সৈনিকের কাজ করে না, তাহাদিগকে বাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ সৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে এই ধরনের ব্যক্তিদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিল।

প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission)

নৌবাহিনী হ্রাসের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রত্যেক দেশের নৌবাহিনীর মোট বহনক্ষমতা কত টন (Tonnage) হইবে, তাহা স্থির করিবার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জাহাজের পৃথক পৃথক ভাবে বহনক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত মোট Tonnage-এর পরিমাণ ঠিক রাখিয়া যে-কোন পর্যায়ের জাহাজের জন্য কোন বাঁধাধরা Tonnage স্থির না করিবার পক্ষপাতী ছিল। বিভিন্ন দেশ নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা, তাহা পরিদর্শনের জন্য ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল, কারণ সকল দেশের প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের মধ্যেই ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা নিহিত বলিয়া মনে করিত। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী নিয়োগের দাবিও করিয়াছিল। কিন্তু অপরাপর দেশ কোনপ্রকার পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের বা পুলিশবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী ছিল না। প্রত্যেক দেশের সততার উপরই নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব তাহারা ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল।*

সমবেত সদস্যদের মতানৈক্য

উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ে মতানৈক্য ভিন্ন অপরাপর অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অনুরূপ মতানৈক্য দেখা দিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অস্ত্রশস্ত্র' (Armament) বলিতে কি বুঝাইবে, তাহা লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত ইহা নির্ধারণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইল। ইহা ভিন্ন, ইংলণ্ড

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাবউত্থাপন

* Vide, Langsam, pp. 84-86.

ফ্রান্স প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের সামরিক বাজেট হ্রাস করিবার প্রশ্ন উঠিলে আমেরিকা উহার বিরোধিতা করিল। কারণ, মোট সৈন্যসংখ্যা নির্ধারিত হইলে পর উহাদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, সে-বিষয়ে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করাই উচিত, এই ছিল আমেরিকার অভিমত। জার্মানি ও ইতালি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির রদ-বদল দাবি করিল, কারণ তাহাদের মতে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নের সহিত ভার্সাই-এর সন্ধির পরিবর্তন ছিল সরাসরিভাবে জড়িত। কিন্তু পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সকল দেশের স্বার্থের পক্ষে ভার্সাই-এর চুক্তি অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সকল দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। এইভাবে প্রস্তুতি কমিশনের কার্য প্রতিপদেই ব্যাহত হইতে লাগিল। জার্মানি নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রত্যেক পর্যায়ের অস্ত্রশস্ত্র কোন্ দেশ কি পরিমাণ রাখিতে পারিবে, তাহা নির্ধারিত করা হউক দাবি করিলে অপরাপর দেশ উহার বিরোধিতা করিল। এমতাবস্থায় রুশ প্রতিনিধি লিট্ভিনভ্ প্রত্যেক দেশই অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকৃত হউক, এই প্রস্তাব করিলেন। স্বভাবতই এই কঠিন এবং অবাস্তব প্রস্তাবে কেহ তেমন গুরুত্ব আরোপ করিল না।

রুশ প্রতিনিধি লিট্ভিনভ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব

এইভাবে প্রস্তুতি কমিশনের সদস্যগণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন ও উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মূল নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, যে-সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সদস্যগণ মোটামুটি একমত এবং যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, সেগুলি একটি দলিলে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রস্তুতি কমিশন তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিলেন (১৯২৭)। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় প্রস্তুতি কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, সেগুলি সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা, তাহাই ছিল প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য। এদিকে ঐ সময়ে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর বাহিরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেজন্য লণ্ডনে একটি নৌবাহিনী-সংক্রান্ত কন্ফারেন্স (Naval Conference) আহূত হইয়াছিল।

প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তি-স্বরূপ দলিলের খসড়া রচনা

প্রস্তুতি কমিশন এই কন্ফারেন্সের ফলাফল কি হয়, তাহা দেখিয়া পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি এই কন্ফারেন্সে গৃহীত শর্তাদি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান উহার শর্তাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও চুক্তিটি অকার্যকর হইয়া পড়িল। এই সময়ে প্রস্তুতি কমিশন পুনরায় তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্সে আলোচনার ভিত্তি

হিসাবে একটি দলিলের খসড়া (Draft Convention) প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এই খসড়ায় কোন সর্বাদিসম্মত নীতি বা পন্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন দেশের সদস্যবর্গের মতানৈক্য পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়া গেল। যাহা হউক, প্রস্তুতি কমিশনের একপ্রকার অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনিভা শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) আহ্বান করিল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন—২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। মোট ৬১টি* দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক গৃহীত চুক্তি বা দলিলের খসড়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। এই দলিলে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা হইবে উহার বিবরণ থাকিলেও কি পদ্ধতিতে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা যাইতে পারে, সে-বিষয়ে কোন নির্দেশ ছিল না।† স্বভাবতই নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে প্রস্তুতি কমিশনের কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। তাঁহারা পদাতিক সৈন্য, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী হ্রাস করিবার এবং একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি উত্থাপিত হইলে সম্মেলনের সদস্যবর্গকে সর্বাধিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল।

ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর নিরাপত্তা রক্ষার দাবি

ফ্রান্সের প্রতিনিধি জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া নিজ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে রাজি হইলেন না। এজন্য তিনি লীগ-অব্-ন্যাশন্সের আদেশাধীন পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন। পক্ষান্তরে, জার্মানি ফ্রান্সের সম-পর্যায়ের সামরিক শক্তি অর্থাৎ সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি জানাইল। এইভাবে প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিল। জার্মানি এককভাবে নিরস্ত্রীকৃত থাকিবে, ইহা জার্মান জাতি কোনভাবেই মানিয়া লইবে না—এই সংকল্প জার্মান প্রতিনিধির দাবিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার সূচনা করিল।

ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব

---

* "The conference was attended by representatives of sixty one states including five non-members of the Nations."—Carr, p. 183.

"When the Geneva Conference opened there were present representatives from about sixty states." Langsam, p. 88.

† "It was a *skeleton lacking flesh and blood.*" —Vide, Langsam, p. 88.

ফরাসী-জার্মান বিরোধ ভিন্ন আরও নানাপ্রকারের জটিলতাও দেখা দিল। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি কোন কোন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বিশাল আকৃতির কামান, ডুবো-জাহাজ, ট্যাংক, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম হিসাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হইল। অতঃপর তিনটি পৃথক কমিশনের উপর এই সকল প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহাদের সুপারিশ নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স-এর নিকট পেশ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। ফরাসী প্রতিনিধির মতে কেবলমাত্র বিশালাকৃতির ট্যাংক ভিন্ন অপর সবকিছুই ছিল আত্মরক্ষা-মূলক অস্ত্রশস্ত্র। বিশালাকৃতির ট্যাংক ভিন্ন অপর কোন-প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না।

তিনটি কমিশনের উপর ব্রিটিশ প্রস্তাব বিবেচনার ভার অর্পণ

ফ্রান্সের বিরোধিতা

জার্মান প্রতিনিধি যুক্তি দেখাইলেন যে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামই আক্রমণাত্মক এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সেগুলির নিষিদ্ধকরণ প্রয়োজন। বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে অবশ্য কোন দ্বিমত ছিল না এবং উহা নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, সে-কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করিবার কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত তিনটি কমিশন কেবলমাত্র বিষাক্ত গ্যাস, বিমান আক্রমণ ও বিশালাকৃতির ট্যাংক সম্পর্কে সর্ববাদিসম্মত সুপারিশ পেশ করিতে সমর্থ হইলেন। বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনে কোন বাধা না থাকিলেও উহা যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না, বৃহদাকৃতির ট্যাংক ব্যবহার করা চলিবে না, বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করা চলিবে না এবং প্রত্যেক দেশের বিমান সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, বেসামরিক বিমান চলাচলও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই কয়টি ধারা-সংবলিত একটি প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের নিকট উপস্থাপন করা হইল (২০শে জুন, ১৯৩২)। (বিশালাকৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহা অবশ্য বলা হইল না।) মোট ৪১টি দেশ এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিল, জার্মানি ও রাশিয়া উহার বিরোধিতা করিল, ইতালি সহ মোট আটটি দেশের প্রতিনিধি নিরপেক্ষ রহিলেন। জার্মান প্রতিনিধি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না যে, ভার্সাই-এর চুক্তি অনুসারে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া যে-পর্যায়ে আনা হইয়াছিল, অপরাপর দেশকেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস

বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে কমিশনের মতৈক্য—অপরাপর বিষয়ে অনৈক্য

কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব

জার্মানি ও রাশিয়ার বিরোধিতা

করিয়া অনুরূপ পর্যায়ে আনিতে হইবে নতুবা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ব্যাপারে জার্মানিকে অপরাপর ইওরোপীয় দেশের সহিত সম-অধিকার দিতে হইবে, অর্থাৎ জার্মানিকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইবার অধিকার দিতে হইবে। এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই যখন কোনপ্রকার সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না তখন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সাময়িক কালের জন্য মুলতবী রাখা হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩২) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হইল। জার্মান প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিলেন না। পাছে জার্মানি এককভাবে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিতে শুরু করে, সেজন্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলন্ড, ইতালি ও ফ্রান্স জার্মানির সম-অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। অবশ্য এই স্বীকৃতিতে বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি সম-অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এই ঘোষণার পর জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিলেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি অপরাপর শক্তির সম-পর্যায়ে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে, এই শর্তটির ফলে ফ্রান্স কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আশু সমাধান সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন

ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির সম-অধিকার স্বীকৃত

পর বৎসর (১৯৩৩) ফেব্রুয়ারি মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইল। ইহার কয়েকদিন পূর্বে (জানুয়ারি, ১৯৩৩) এডল্ফ হিট্লার জার্মানির চ্যান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে নাৎসী সরকার যেমন অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির ব্যাপারে কালবিলম্ব করিতে রাজী ছিলেন না, তেমনি ফরাসী সরকারও জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দাবি কোনভাবেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা চরম তিক্ততায় পরিণত হইল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ (Ramsay Macdonald) নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে কোন্ দেশ কি পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে, উহার একটি বিশদ পরিকল্পনা সম্মেলনের নিকট পেশ করিলেন। ইহা 'ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা' (Macdonald Plan) নামে পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘ চারি সপ্তাহের আলাপ-আলোচনায় সমবেত সদস্যদের পরস্পর মতানৈক্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা' শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে ফরাসী প্রতিনিধি একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপন করিলেন।

'ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা' প্রত্যাখ্যাত

ফরাসী পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় নিরস্ত্রীকরণের কাজকে দুইভাগে ভাগ করা হইল। প্রথম চারি বৎসর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরিদর্শন করিবে এবং এই সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সামরিক বাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হইবে। এই চারি বৎসরের পর প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ শুরু হইবে এবং যে-দেশের সাজ-সরঞ্জাম নির্ধারিত পরিমাণের অধিক থাকিবে, তাহা হ্রাস করিতে হইবে। ব্রিটিশ ও ইতালীয় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রান্সের এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়া গেলেন (১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩) এবং ইহার অব্যবহিত পরেই জার্মানি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল। এদিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরও কয়েকমাস অধিবেশনে থমকবার পর ভাঙিয়া গেল। ইহার পর উহার আর কোন অধিবেশন হয় নাই। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হইল।

জার্মানি কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অবসান

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of the failure of Disarmament Conference): নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ এবং পরস্পর ভীতি ও সন্দেহের মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ

(১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পটভূমিকা রচনা করিয়া নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা যে বিফলতায় পর্যবসিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

(২) ইহা ভিন্ন, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্পাদক (Secretary) আর্থার হেণ্ডারসন্। কিন্তু সম্মেলন শুরু হইবার পূর্বেই লেবার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পুনরায় যে-সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে আর্থার হেণ্ডারসন্ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন বা ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিতে পারিতেন, সেরূপ ক্ষমতা স্বভাবতই তাঁহার আর ছিল না।

হেণ্ডারসনের ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-নির্বাচনে পরাজয়

(৩) ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের কোন কর্মচারীকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রেরণ না করিয়া এই সম্মেলনের অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণে ত্রুটি

জার্মানির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

(৪) জার্মানির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন এবং ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রভৃতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মান মতামতের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে জার্মানির মনোবৃত্তি স্বভাবতই সহায়ক ছিল না।

প্রস্তুতি কমিশনের ব্যর্থতায় কুফল

(৫) প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) নিরস্ত্রীকরণের আলাপ-আলোচনার ভিত্তি রচনা করিতে গিয়া কোন সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। উপরন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর-বিরোধিতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যকরী নির্দেশ এই কমিশন দিতে পারে নাই।*

ফরাসী-জার্মান বিরোধ

(৬) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা—নিরাপত্তার অজুহাতে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অপেক্ষা অধিকতর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ফ্রান্সের সম-পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা রাখিবার দাবি —নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের পন্থা রুদ্ধ করিয়াছিল। জার্মানিতে হিট্‌লারের উত্থান এ-বিষয়ে জার্মান সরকারের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করায় ফরাসী-জার্মান-বিরোধ অধিকতর জটিল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

(৭) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ইঙ্গ-ফরাসী নীতির অনৈক্যও প্রকাশ পাইয়াছিল। স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি কি হইবে এ-বিষয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্স চাহিয়াছিল স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন কর্তৃক কিছুকাল অন্তর প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তদন্ত বাধ্যতা-মূলক করিতে। কিন্তু ইংলণ্ড উহা বাধ্যতামূলক না করিয়া কোন দেশ কর্তৃক অপর কোন দেশে নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে স্থায়ী কমিশন ঐ বিষয়ে তদন্ত করিবে—এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল।

(৮) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে কেবল ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যই প্রকটিত হইল না,

* "The Preparatory Commission had provided more signposts to the pitfalls of disarmament than to promising lines of advance." —Carr, p. 184.

আমেরিকার সহিতও ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল।

আমেরিকার সহিত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মতানৈক্য

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার প্রত্যেক দেশের সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলন্ড ও ফ্রান্স এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে আমেরিকার উৎসাহ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৯) অনুরূপ, ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাও দীর্ঘ আলোচনার পর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণ অপেক্ষা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে রাশিয়া ফ্রান্সের সমর্থক ছিল। কিন্তু আমেরিকা, ইংলন্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশ নিরস্ত্রীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের কার্যে কোন একতা বা মতৈক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ফ্রান্স কর্তৃক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অপরাপর দেশ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ

(১০) সর্বশেষে, হিট্‌লারের চ্যান্সেলর-পদ লাভ এবং ভার্সাই-এর চুক্তি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প জার্মান মনোভাবকে ক্রমেই অনমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মান প্রতিনিধির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ ছিল উহার ব্যর্থতার শেষ পদক্ষেপ।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ ও আন্তর্জাতিক শান্তি (League of Nations & World peace) : আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর দায়িত্ব যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, লীগ চুক্তিভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে যথাযথ অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, ম্যান্ডেট্ রাজ্যগুলি পরিচালনা ও পরিদর্শন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদি সব কিছুই লীগের কর্তব্য-কার্যের তালিকাভুক্ত ছিল। এই সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা মোচন, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি আনয়ন প্রভৃতি বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ গঠিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ করিবার ক্ষমতা লীগকে দেওয়া হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব

(১) আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান দেশগুলির মধ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে এবং লীগের এ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিলের পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের অবসান ঘটান ছিল লীগের দায়িত্ব। এই সকল

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতি

দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হইবে তাহা লীগ চুক্তিপত্রে (League Covenant বর্ণিত ছিল।

(২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইয়া যুদ্ধ রোধ করাই লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আক্রমণকারী দেশকে উপযুক্ত শাস্তিদান করাও ছিল লীগের কর্তব্য-কার্যের অন্যতম। প্রত্যেক দেশের সীমার নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে বা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকিলে লীগ কাউন্সিল উহা রোধ করিবার যথাযথ উপায় ও ব্যবস্থার নির্দেশ দিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' রক্ষা করা লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর প্রধান দায়িত্ব হইলেও লীগ চুক্তিপত্রের কোন স্থানে 'শান্তি' (Peace) শব্দটির উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা—আক্রমণকারী রাষ্ট্রের শাস্তির ব্যবস্থা

(৩) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, নৌ-বল ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, এ-কথা উপলব্ধি করিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ধরনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে পারিলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার পথ সহজতর হইবে, তেমনি অপর দিকে অযথা এক বিশাল ব্যয়ের বোঝা হইতে প্রত্যেক দেশ রক্ষা পাইবে। এইভাবে অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অসুস্থতা হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি স্বভাবতই সহজ হইবে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ

(৪) লীগের চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করা লীগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে সার অঞ্চল ও ডানজিগ্ শহরের উপর পরিদর্শনমূলক কার্য লীগকে করিতে হইয়াছিল। ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলগুলির শাসন-কার্যের পরিদর্শন অধিকারও লীগের উপর ন্যস্ত ছিল।

সার অঞ্চল, ডানজিগ্ শহর ও ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের কাজ

(৫) বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য প্রত্যেক দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে ন্যায্য ব্যবহার ও সম-অধিকার পাইতে পারে, সেজন্য লীগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের বা নির্দেশদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতা

(৬) সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞান, নূতন ধারণা প্রভৃতি প্রত্যেক দেশকে সরবরাহ করিয়া, নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে পরস্পর নির্ভরশীল, পরস্পর শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইভাবে লীগ-অব-ন্যাশন্স্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল।

সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের মাধ্যম

লীগের কার্যকলাপ (Activities of the League) : নিরাপত্তা রক্ষার কার্যাদি (Activities for the Preservation of Security) : প্যারিসের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি মোট ৪০টি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই সমস্যার জটিলতা সম-পরিমাণ ছিল না। যাহা হউক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। এগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লীগ নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েকটির ক্ষেত্রে লীগ অসহায় দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল।

লীগ কাউন্সিলের সম্মুখে সর্বপ্রথম যে-ঘটনাটি উপস্থিত হইয়াছিল উহা 'এঞ্জেলি ঘটনা' (Enzeli Affair) নামে পরিচিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নৌবহর কাস্পিয়ান অঞ্চলে এঞ্জেলি বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিলে পারস্য সরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুধু তাহাই নহে, পারস্য সরকার রাশিয়ার সহিত সরাসরি এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চালান। শেষ পর্যন্ত লীগ কাউন্সিলের কোন কিছু করিবার পূর্বেই পারস্য সরকার ও রুশ সরকার এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) এঞ্জেলি ঘটনা

ঐ বৎসরই (১৯২০) সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (Aaland Island)-এর আধিপত্য লইয়া বিবাদ দেখা দিলে ইংলন্ডের মধ্যস্থতায় এই উভয় দেশ লীগের সদস্য না হইলেও তাহাদের বিবাদটি মীমাংসার জন্য লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। লীগ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে লীগের সদস্য ভিন্ন অপরাপর দেশের এই ধরনের বিবাদের মীমাংসা লীগ কাউন্সিলের করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং লীগ আন্তর্জাতিক বিচারালয় তখনও গঠিত হয় নাই বলিয়া কয়েকজন আইনজ্ঞের একটি কমিটি নিয়োগ করিল; এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে লীগ কাউন্সিল এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে উভয় পক্ষ অর্থাৎ ফিনল্যান্ড ও সুইডেন তাহা মানিয়া লইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র ও

(২) আল্যান্ড দ্বীপ-পুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ

(৩) আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনা

তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিলে লীগ-অব্-ন্যাশনস্-এর মাধ্যমে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কিছু করিবার পূর্বে আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র তুরস্ক কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যায়।

(৪) ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

পর বৎসর (১৯২১ খ্রীঃ) টিউনিসিয়ার অধিবাসীদের এক শ্রেণীর লোককে ফরাসী সরকার ফরাসী নাগরিক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদিগকে ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিলে ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করে। কারণ, ইংলণ্ড এই সকল লোককে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া দাবি করিত। শেষ পর্যন্ত এ-বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসিত হইবার পূর্বেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই বিবাদ মিটাইয়া লয়।

(৫) জার্মানি-পোল্যাণ্ড সীমান্ত-সমস্যা।

ঐ বৎসরই জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে লীগ কাউন্সিল এই দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাণ্ড লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

লীগের অপরাপর কার্যাদি

লীগ-অব্-ন্যাশনস্ সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডেব বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া ও আলবানিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিবাদের মীমাংসায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাত্র সার্বিয়ার ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডানজিগ্, সার অঞ্চল, দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী-সংক্রান্ত নানা বিষয়েও লীগ-অব্-ন্যাশনস্ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন, আফিং ব্যবসায়, ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে অর্থনৈতিক সংকট হইতে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে লীগের অবদান নেহাত কম ছিল না।

কিন্তু যে-সকল ঘটনায় লীগের শক্তির প্রকৃত পরিচয় দানের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রেই লীগের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে লীগের অসামান্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষক সংস্থা হিসাবে উহার ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৭) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে করফু ঘটনায় (Corfu Incident) লীগের প্রকৃত শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিতে পারা গেল। ঐ বৎসর গ্রীক ও আলবানিয়ার সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সভার অধিবেশন গ্রীসে যখন চলিতেছিল, তখন ঐ সভার সদস্য ইতালীয় দূত জনৈক জেনারেলকে

গ্রীসের রাজ্যসীমার মধ্যে হত্যা করা হয়। ইতালি এইজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিলে গ্রীস সরকার উহা দিতে অস্বীকৃত হন। ইতালি গ্রীসের করফু নামক দ্বীপটির উপর গোলা বর্ষণ করে এবং উহা দখল করিয়া লয়। এই ব্যাপার লইয়া লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করা হইলে মুসোলিনি লীগের অধিকার অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের যে-সভা গ্রীসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সভা গ্রীসের উপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দিলে গ্রীস তাহা দিতে বাধ্য হয়। ইতালি কর্তৃক লীগের বিচার-ক্ষমতা অস্বীকার লীগের দুর্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

করফু ঘটনা

(৮) ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'সীমা নির্ধারণ কমিশন' (Boundary Commission) নিযুক্ত করে। মসুল (Mosul) নামক জেলাটি লইয়া এই বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কমিশন যখন কার্যে রত ছিল ঐ সময় তুরস্কের অধীনে কুর্দ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে আরম্ভ করিলে কুর্দগণ ইরাক-তুরস্কের সীমান্তে পলাইয়া আসে এবং সেখান হইতে তুর্কী সৈন্যদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ একটি দ্বিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরস্কের সীমা নির্ধারিত হয়। ব্রিটেন তুরস্ক ও ইরাক এই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি-সংবলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯২৬)।

ইরাক ও তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

(৯) গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রায়ই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁহার একজন অনুচর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ এই বিষয়ে তদন্তের পর গ্রীসকে সেনা অপসারণে এবং বুলগেরিয়ার সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। গ্রীস অবশ্য এই সকল শর্ত মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে ইতালি যখন গ্রীসের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তখন লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া গ্রীস স্বভাবতই লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা

(১০) লিথুয়ানিয়ার সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' (State of War) ঘোষণা করিলে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দুই দেশে তথাপি মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর তৎপরতায় দূর হইয়াছিল।

লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ-সৃষ্টিতে বাধাদান

(১১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানকে নিরস্ত্র করিতে চাহিল। লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, কারণ চীন জাপানের ন্যায়-ই ছিল লীগের সদস্য-রাষ্ট্র। জাপান স্বেচ্ছাকৃতভাবে লীগ-চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল এবং সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলে এবং জাপান তাহা অগ্রাহ্য করিলে লীগ লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করিলে সুদীর্ঘ আলোচনার পর লীগ জাপানের উপর দোষারোপ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানের অন্যায় আচরণের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, জাপানের বিরুদ্ধে লীগ-চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তানুযায়ী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক, জাপান ও লীগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে জাপান লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া লীগের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল

(১২) ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (১৯৩৬) এবং লীগের বিভিন্ন সদস্যের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অযথা কালক্ষেপ লীগের অকর্মণ্যতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালি ও ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্ব ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় সোমালিল্যান্ড ও ইথিওপিয়ার সীমায় ওয়ালওয়াল (Walwal) নামক স্থানে ইথিওপীয় ও ইতালীয় সৈনিকদের সংঘর্ষ হইতে শুরু হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া ইথিওপিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবার ফলস্বরূপ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া লইলেন। রাজ্যহারা ইথিওপিয়ার রাজা হেইলেসেলাসি লীগের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া লীগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লীগ কাউন্সিল কর্তৃক রাজ্যহারা হেইলেসেলাসিকে লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। ইথিওপিয়াকে লীগের সদস্য হিসাবে স্বীকার করিলে ইতালি লীগ ত্যাগ করিয়া গেল। ইহার দুই বৎসর পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর অকর্মণ্যতা ও চরম দুর্বলতা পৃথিবীর জনসমাজের নিকট পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল। এই সময় হইতে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) দখল

ইহার পর স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো তথাকার প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত

করিয়া স্বহস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্য অন্তর্বিরোধ শুরু করিলে একক-অধিনায়কত্বাধীন জার্মানি ও ইতালি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ অবলম্বন করিল। স্পেনীয় সরকার লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন কার্যকরী সাহায্য পাইলেন না। লীগ কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব পাস করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে একক-অধিনায়কত্বের জয় ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এরও পতন ঘটিল।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মূল্যায়ন (Worth of the League of Nations) : লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ নানা কারণে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অবদান যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। প্রথমত, লীগ পৃথিবীর জনসমাজকে আন্তর্জাতিক সমবায়, সৌহার্দ্য ও সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর জনসাধারণকে মনোযোগী করিয়া তুলিয়া নিছক জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনে কতক পরিমাণে দমন করা উচিত, এই শিক্ষাই দিয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর অবসান ঘটিলেও লীগ-প্রচারিত আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ পূর্ববর্তী কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারেও এক নূতন অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বিবাদ-বিসংবাদ লীগ চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মীমাংসার ব্যবস্থা এবং লীগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) লীগের আদর্শ ও সংগঠনের অনুবৃত্তি, এ-কথা অনস্বীকার্য।* আন্তর্জাতিক সমবায়ের ধারণা অতি

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সংস্থা হিসাবে লীগের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব

* "The ideals which it (League) sought to promote, the hopes to which it gave rise, the methods it devised, the agencies it created, have become essential part of the political thinking of the civilized world and their influence will survive until mankind enjoys a unity transcending the divisions of state and nations.

Whatever the fortunes of the United Nations may be, the fact that, at the close of the Second World War, its establishment was desired and approved by the whole community of civilized peoples must stand to future generations as a vindications of the men who planned the League." Walter, vide, Langsam, pp. 55-56

প্রাচীন হইলেও লীগের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল যেমন অভিনব, উহার প্রভাবও ছিল তেমনি ব্যাপক ও স্থায়ী।

লীগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদির গুরুত্ব

তৃতীয়ত, লীগ উহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার কার্যাদির দ্বারা পৃথিবীর জনসাধারণের সম্মুখে এক চমৎকার এবং অভিনব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাধারণ মানুষকেই যে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে, এই শিক্ষাই লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ পরবর্তী যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছিল।

সর্বজাগতিক ঐক্যের আদর্শ

সর্বশেষ, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ পৃথিবীর সকল অংশের রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে পৃথিবীর মূল ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

যৌথ-নিরাপত্তার ধারণা (Concept of Collective Security) : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যৌথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল ধারণা হইল এই যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে এমন একটি সংগঠনের অধীনে আনিতে হইবে যাহাতে কোন একটি বা দুইটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে সাহসী না হয়। অবশ্য আদর্শের দিক দিয়া সকল রাষ্ট্রকে একত্রে একই সংগঠনের অধীনে আনিতে পারিলে যৌথ-নিরাপত্তা নীতির চরম সার্থকতা ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রকে একই আন্তর্জাতিক সংগঠনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব নহে, এজন্য যৌথ-নিরাপত্তায় এমন সব রাষ্ট্রকে একই সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে যে কয়েকটি রাষ্ট্র এই সংগঠনের বাহিরে থাকিবে তাহারা এককভাবে বা যুগ্মভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে সাহস না পায়। অর্থাৎ সংগঠনটি সকল রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইলে (Universal) ভাল, নতুবা অন্তত এমন হওয়া দরকার যাহাতে শক্তিশালী প্রায় সকল রাষ্ট্রই (Nearly universal) সেই সংগঠনভুক্ত হয়।

যৌথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার শর্ত : Universal or nearly Universal

যৌথ-নিরাপত্তার মূল ধারণার দিক হইতে বিচার করিলে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ যৌথ নিরাপত্তাদানে সক্ষম ছিল না, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কারণ পৃথিবীর নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ না-ছিল সকল রাষ্ট্রের সংগঠন, না-ছিল শক্তিশালী প্রায়-সকল রাষ্ট্রের সংগঠন। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় শক্তিধর রাষ্ট্র সদস্য লীগ-অব্-ন্যাশন্সের সদস্যপদ গ্রহণ করে নাই। পরাজিত জার্মানিকে সদস্যপদ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াকেও দীর্ঘকাল সদস্যপদে গ্রহণ

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ যৌথ-নিরাপত্তা নীতির দিক হইতে ব্যর্থ সংগঠন

করা হয় নাই। অথচ এই সব দেশের যে-কোন একটি ইচ্ছা করিলেই এককভাবে বা যুগ্মভাবে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করিতে পারিত। সুতরাং যৌথ-নিরাপত্তা নীতির দিক হইতে বিচারে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান করিতে যে সমর্থ হইবে না, তাহা প্রথম হইতে স্পষ্ট হইয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্সের কার্যকলাপ হইতেও লীগের দুর্বলতা এবং বিফলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations): উপরি-উক্ত কার্যকারিতা সত্বেও লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ প্রকৃত সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল।

লীগের ব্যর্থতার কারণ: (১) পরীক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান

প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছিল। স্বভাবতই লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন দেশেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কেহ তেমন উপলব্ধি করে নাই।

(২) জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরাজয়

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে স্বভাবতই প্রত্যেক দেশ লীগের শর্তাদি ও লীগের মূল নীতির অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। জাতীয় সার্বভৌমত্বের (National Sovereignty) ধারণা দ্বারা রাষ্ট্রবর্গ অত্যধিক প্রভাবিত হইবার ফলে লীগের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য তাহাদের জন্মিতে পারে নাই।

(৩) সকল বৃহৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতার অভাব

তৃতীয়ত, লীগ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপসরণ এবং প্রথম দিকে রাশিয়া ও জার্মানিকে উহার সদস্যপদভুক্ত না করা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইল্সন ছিলেন লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর স্রষ্টা। কিন্তু প্রথমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এ যোগদানে অস্বীকার করিলে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, বলা বাহুল্য। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি দ্বারা জার্মানিকে এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ ত্যাগ করিয়া গেলে উহা পুনরায় ক্ষুদ্রপরিসর হইয়া পড়িল। লীগের ইতিহাসে কোন সময়েই পৃথিবীর সকল বৃহৎ দেশ ইহার সদস্য-পদভুক্ত ছিল না। ইহা লীগের দুর্বলতা তথা বিফলতার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচ্য।

চতুর্থত, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং উভয় ক্ষেত্রে লীগের ব্যর্থতা পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বৃহৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে লীগ সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে, লীগের কার্যকারিতা সম্পর্কে সর্বত্র সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল। ইহা লীগের পতনের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই।

(৪) লীগের দুর্বলতা

পঞ্চমত, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন—এই নীতির ফলে কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। লীগের আলাপ-আলোচনায় সেজন্য রাষ্ট্রগত ও জাতিগত স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করিত। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৫) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

ষষ্ঠত, লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার মত কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকায় লীগের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লীগের নিজস্ব কোন প্রকার সামরিক শক্তি না থাকায় লীগের সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে মনে করা হইত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ফলে ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে ইতালিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা লীগ করিয়াছিল, তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ জাপানকে কোনভাবেই নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৬) লীগের সামরিক শক্তির অভাব

সপ্তমত, লীগ-চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার ফলে ইহার আন্তর্জাতিক প্রকৃতি কতকাংশে ব্যাহত হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রের পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখাই লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর প্রধান দায়িত্ব, এই ধারণা অনেকের মধ্যে জন্মিয়াছিল। ইহা লীগের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

(৭) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে লীগ-চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার কুফল

অষ্টমত, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে-অর্থনৈতিক মন্দা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিয়াছিল, উহার অন্যতম ফল হিসাবেই ইওরোপে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ঘটে। অথচ লীগ-চুক্তিপত্র ছিল গণতন্ত্র-ভিত্তিক দলিল। স্বভাবতই একক-অধিনায়কত্বের আদর্শ ও কর্মপন্থা লীগের আদর্শ ও কর্মপন্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। জাপান, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের আচরণে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

(৮) একক-অধিনায়কত্বের উদ্ভব

নবমত, লীগের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল সদস্য দেশগুলির আন্তরিক এবং নৈতিক সাহায্য ও সহায়তা। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন দেশই আন্তর্জাতিক শান্তি বা লীগের নীতি মানিয়া চলিবার প্রশ্নের ধার ধারিত না। এই সকল কারণে ক্রমেই লীগ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে লাগিল। ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৫), জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই লীগ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল।

(৯) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহযোগিতার অভাব

দশমত, লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর প্রকৃত জন্মদাতা প্রেসিডেন্ট উইলসন লীগ সনন্দের দশম শর্তকে লীগের 'ভিত্তি প্রস্তর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শর্তানুসারে লীগের সদস্যবর্গ পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমার অখণ্ডতা মানিয়া লইবেন এবং প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের রাজ্যসীমা ও স্বাধীনতা বহিরাগত আক্রমণ হইতে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা কোন সদস্য-রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে অথবা আক্রান্ত হইবার ভীতি দেখা দিলে লীগ কাউন্সিল যেভাবে নির্দেশ দিবে, সেইরূপ সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দশম শর্তের* প্রকৃত অর্থ কি সেই বিষয়ে লীগ এ্যাসেম্ব্লীতে আলোচনার পর স্থির হয় যে, লীগের সনন্দের দশম শর্তানুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য লীগ কাউন্সিল যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিবে, সেই নির্দেশ প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট, আইনসভা বা অপর কোন প্রকার জাতীয় সংস্থা বিচার করিয়া কি পরিমাণ সাহায্য সেই সদস্য-রাষ্ট্র দিবে তাহা স্থির করিবে। দশম শর্তের এই ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাব অবশ্য পারস্যের বিরোধিতায় গৃহীত হয় নাই, তথাপি যে-ব্যাখ্যা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ এ্যাসেম্ব্লীতে করা হইয়াছিল উহাই সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ১৬নং শর্তের ক্ষেত্রেও পর পর ১৯টি প্রস্তাব পাস করিয়া উহার যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল তাহাতে ১৬নং শর্তের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার একটি সংস্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই ধারণা বিশেষভাবে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে জন্মিয়াছিল।

(১০) লীগ সনন্দের দশম ও ষোড়শ শর্তের ব্যাখ্যা

---

* Art 10. "The members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

লীগের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে এইরূপ ধারণা লীগের পতনের পথ সহজতর করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

একাদশত, লীগের পতনের মূলে কতকগুলি সহজাত, মৌলিক দুর্বলতা ছিল। লীগের সনন্দের মধ্যে কতক ফাঁক (gaps) থাকার ফলেই এই দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল এই সকল দুর্বলতাকে (১) শাসনতান্ত্রিক (Constitutional), (২) সাংগঠনিক (Structural) ও (৩) রাজনৈতিক (Political)—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।*

(১) লীগের সনন্দ ছিল লীগের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (Constitution)। এই সনন্দে কতকগুলি ফাঁক (gaps) ছিল যাহার ফলে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর কার্যকারিতা বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছিল এবং লীগের পতন সহজ তথা অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। লীগের সনন্দে যুদ্ধমাত্রই বে-আইনী বা নিষিদ্ধ, এ-কথা বলা হয় নাই, অর্থাৎ যুদ্ধ কোন অবস্থায়ই করা চলিবে না, এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা লীগ সনন্দে উল্লিখিত হয় নাই। ১২নং শর্তে বলা হইয়াছে যে, কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্পর্কে সালিশের (Arbitrator) সিদ্ধান্ত প্রকাশের তিন মাস অতিবাহিত না হইলে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে না। স্বভাবতই সনন্দের-ই শর্তানুযায়ী তিন মাস অতিবাহিত হইলে পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাধা ছিল না। কেবলমাত্র ১৩নং শর্তের ৪নং ধারা এবং ১৫নং শর্তের ৬নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, (১) লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র লীগের অপর কোন সদস্য-রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় তাহা হইলে সেই সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে না। (২) লীগ কাউন্সিল কোন বিবাদে যদি সিদ্ধান্ত দান করে এবং বিবদমান রাষ্ট্রের যে-টি বা যেগুলি সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। ইহা হইতে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, লীগের সনন্দ রচয়িতাগণ যুদ্ধ-বিরোধ সম্পর্কে অতি দুর্বল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের একটি উপায়, এই ধারণার ঊর্ধ্বে তাঁহারা উঠিতে পারেন নাই। ফলে সনন্দ অনুসারেই কোন কোন প্রকার যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও অপরাপর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাধা ছিল না। এই সহজাত সাংবিধানিক দুর্বলতা লীগের সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল।

সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা

(২) সাংগঠনিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, লীগে প্রধানত ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গেরই প্রাধান্য ছিল অথচ প্রথম যুদ্ধাবসানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইওরোপীয় গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইওরোপের বহির্দেশীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সহিতও জড়িত হইয়া

সাংগঠনিক

* Morganthau : Politics among Nations, Chap. I.

গিয়াছিল। মূল ৩১টি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের মাত্র ১০টি ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্র। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই ত্রুটিও উহার পতনের অন্যতম কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

ইহা ভিন্ন, সনন্দের ১৭নং শর্তে লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-কে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। লীগের সদস্য না হইলেও লীগ তাহাদের বিরোধে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭নং শর্তে এ-কথাও বলা হইয়াছিল যে, লীগের সদস্যপদ বহির্ভূত কোন রাষ্ট্র যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে লীগ কাউন্সিল সেই রাষ্ট্রকে যে-নির্দেশ দিবে তাহা লীগের সদস্যপদভুক্ত রাষ্ট্রবর্গের ন্যায়ই মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। অন্যথায় লীগ উহার সনন্দের ১৬নং শর্তে বর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে। এইভাবে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় রাষ্ট্রের উপর লীগের কর্তৃত্ব ১৭নং শর্তে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার ন্যায় লীগের সদস্যপদ বহির্ভূত রাষ্ট্রের উপর লীগের নির্দেশ কার্যকরী করা সম্ভব হইত কি? সেই চেষ্টা করিলে লীগকে এক বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইত, বলা বাহুল্য। সুতরাং ১৭নং শর্তের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব লীগের উপর ন্যস্ত করা সত্ত্বেও উহার কোন প্রকৃত মূল্য ছিল না।

(৩) রাজনৈতিক কারণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী। ফলে লীগের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ন্যায্য-নীতি কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং আন্তর্জাতিক অব্যবস্থা বা বিরোধ দূরীকরণের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক

লীগের সনন্দ অনুসারে লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যগণ কেবলমাত্র বিজয়ী মিত্র শক্তিবর্গের মধ্য হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। পরাজিত জার্মানি উহাতে প্রথমে স্থান পায় নাই। ইহা ভিন্ন, ভার্সাই-এর চুক্তির অংশ হিসাবে লীগ সনন্দকে সন্নিবিষ্ট করা, বিজয়ী শক্তিবর্গ কর্তৃক প্যারিসের তথা ভার্সাই-এর চুক্তি অনুসারে যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা করিয়াছিল, উহার স্থিতাবস্থা (Status Quo) বজায় রাখা-ই লীগের প্রধান দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার এই প্রকার দায়িত্ব উহার সময়ানুবর্তিতার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। লীগ সেজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামরিক নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) ছিল লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর একটি মূলনীতি। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ইংলন্ড, আমেরিকা, জাপান

ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধ-জাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ইংলণ্ড ছোট যুদ্ধ-জাহাজের এবং ফ্রান্স সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হয় নাই। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্স আহূত হয়। এই কনফারেন্সে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অন্তত ফ্রান্সের সম-পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জার্মানি এই অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্পকাল পরেই ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করিয়া দেশের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধের ফলেই পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা : ওয়াশিংটন কনফারেন্স ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্স

নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা

অধ্যায় ২২

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ইওরোপ

(Europe Between the Two World Wars)

যুদ্ধোত্তর ইতালি : ফ্যাসিজম্-এর উত্থান (Post-War Italy : Rise of Fascism) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক একতালাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন ইতালির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিভিন্ন অংশের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয় জাতিকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিল। জাতীয় মর্যাদা বা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কিছুই ইতালীয় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। ইতালীয়গণ ছিল যেমন স্ব-স্ব প্রধান তেমনি হুজুগপ্রিয়। অধ্যবসায় ও নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষে যে-সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেগুলির কিছুই তাহাদের ছিল না।

ঐক্যবদ্ধ ইতালির জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধের অভাব

জাতির এরূপ অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফল মিলিত হইবার ফলে ইতালিতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যে স্বার্থনাশ হইয়াছিল এবং ইতালিকে যে-পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেই তুলনায় প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন হইতে ইতালি অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল। ফলে, ইতালীয়দের মনে প্যারিস শান্তি-সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতালীয় জাতির মনোভাব যখন এইরূপ, তখন যুদ্ধোত্তর সমস্যা-প্রসূত অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা এক দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মজুরী বাড়াইবার জন্য ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির দুর্দশা

এইরূপ পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ফলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রাশিয়ার ন্যায় ইতালিও উগ্র সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা সকলেরই মনে জাগিতেছিল। 'লেনিন দীর্ঘজীবী হউন' (Long live Lenin) 'রাজার পতন হউক' (Down with the king) প্রভৃতি ধ্বনি ইতালির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিতেছিল।

সমাজতান্ত্রিক প্রচার-কার্যের প্রভাব

বিপ্লবী পন্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকগণ জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল।

বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কৃষকরা দখল করিয়া লইল। শহর এলাকার শিল্পপতিগণ মজুরী হ্রাস না করিলে এবং শ্রমিকরা অধিক সময় কাজ না করিলে কারখানা চালু রাখা অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন: কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিক ও কৃষকরা তাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোর-জবরদস্তি দ্বারা কারখানা বা জমি দখল করা গেলেও সেগুলি পরিচালনা করা যে ততটা সহজ নহে, ইহা তাহারা উপলব্ধি করিল। অনভিজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকগণ ক্রমেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষক-মজদুর সরকার স্থাপন ও পরিচালন তেমন সহজ হইবে না। প্রচলিত পার্লামেন্টারি প্রথা যেমন দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজদুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অনুরূপ অক্ষম হইবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া ইতালিবাসী পুনরায় একটি কার্যকরী সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সমাজ ও যুবসমাজ ইতালির অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সরকারের আমূল পরিবর্তনে পক্ষপাতী ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নূতন কোন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক, এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট (Fascist) দলের উত্থান অতি সহজ হইল। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং শাসনব্যবস্থায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুসোলিনি।

কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন

কৃষক মজদুরদের অকর্মণ্যতা

সরকারের প্রতি শিক্ষক ও যুবসমাজের

মুসোলিনির নেতৃত্ব

বেনিটো মুসোলিনি (**Benito Mussolini**)**:** ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমানা (**Romagna**) নামক স্থানে বেনিটো মুসোলিনির জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কর্মকার। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। মাতার ইচ্ছানুসারে বেনিটো মুসোলিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া নর্মাল ট্রেনিং পাস করেন এবং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। মুসোলিনির উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পূর্ণ হওয়ার কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে আরও জ্ঞানার্জনে তিনি রত থাকেন এবং বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কিছুকাল থাকিবার পর এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সরকারের বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সরকারী আদেশে মুসোলিনি সেই দেশ ত্যাগ করিয়া ইতালিতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্যজীবন

ইতালিতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণ উদ্যমেই চালাইতে লাগিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ট্রিপোলিটানিয়া দখলের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাহার বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এজন্য তাঁহাকে অল্পকালের জন্য

তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ

আটক রাখা হয়। পর বৎসর (১৯১২) মুসোলিনি Avanti নামে এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও মুসোলিনি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মুসোলিনি ইতালির পক্ষে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতালীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। সমাজতান্ত্রিকগণ যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে ছিল না। সুতরাং মুসোলিনি যুদ্ধে যোগদানের যুক্তি সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে Avanti নামক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়। মুসোলিনি নিজে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য Il Popolo d' Italia নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। আঘাত-প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সামরিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন এবং সরকারের সহায়তায় পুনরায় Il Popolo d' Italia পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার বাগ্মিতা জনসাধারণের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

যুদ্ধোত্তরকালে মুসোলিনির কার্যাদি

ফ্যাসিস্ট দলের উৎপত্তি

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সেনাবাহিনী হইতে যুদ্ধশেষে কর্মচ্যুত সৈনিকদের এবং অপরাপর যাঁহারা দেশের মঙ্গলসাধনে আগ্রহান্বিত এইরূপ ব্যক্তিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন এক বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সমাজের প্রতি স্তর হইতেই সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ, শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর, মূলধনীদের উপর কর, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সেনেট বিলোপ, জাতীয় সভা আহ্বান, গোলাবারুদের কারখানা জাতীয়করণ এবং রেলপথ প্রভৃতি কোন শিল্প শ্রমিকদের পরিচালনাধীনে স্থাপন প্রভৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈনিকদের জন্যই প্রচার করা হইতে লাগিল। মুসোলিনি যে সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, উহার অধিকাংশ সভ্যই Fasci'd azione নামে এক সংঘের সহিত জড়িত ছিল। এই নাম হইতেই ফ্যাসিস্ট (Fascist) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দলের সহিত ফ্যাসিস্টদের বিরোধ

মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট দল আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় শাসনব্যবস্থা তখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ফ্যাসিস্ট দল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নিজ হইতেই গ্রহণ করিল। যেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা বা গোলযোগ দেখা দিল সেখানেই ফ্যাসিস্ট দল বলপূর্বক তাহা দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট বিপ্লব-বিরোধী ফ্যাসিস্টগণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্টদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল।

১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুদ্ধ এই সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

নিটি ও গিওলিটির মন্ত্রিত্ব

যুদ্ধোত্তর ইতালির শাসনভার ছিল প্রথমে মন্ত্রী নিটি (Niti) এবং পরে মন্ত্রী গিওলিটি (Gioliti)-এর অধীনে। কিন্তু ইঁহারা কেহই দেশের অরাজকতা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের যুদ্ধোত্তর দুর্দশারও কোন উপশম করিতে তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করিলে সরকার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট্ দল সামরিক কুচ্কাওয়াজ করিত এবং কাল পোশাক (Black shirt) পরিত। সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক কুচ্কাওয়াজ তাহাদিগকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ফ্যাসিস্ট্ দলই জয়লাভ করিল। এইভাবে ফ্যাসিস্ট্ দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মুসোলিনির 'Coup d' etat'

এদিকে ইতালীয় সরকারের দুর্বলতা দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইলেন। মুসোলিনি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। তিনি এইভাবে শাসন-ব্যবস্থা হস্তগত করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ইতালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্ বাহিনীসহ রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল মুসোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না।

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতালাভ

তিনি মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনি তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ইতালির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে মুসোলিনিই ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন, তাঁহার উপাধি হইল 'ইল দুচে' (Il Duce)। রাজা স্বভাবতই ক্রমে নেপথ্যে সরিয়া গেলেন।

জনমতের সমর্থন

ফ্যাসিস্ট্ দলের শাসনক্ষমতা লাভের পশ্চাতে জনমতের সক্রিয় সহায়তা না থাকিলেও, জনমত উহার বিরোধী ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রচলিত শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট্ দল জনস্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিল; সুতরাং মুসোলিনি

যখন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন জাতির সমর্থন যে তাঁহার পশ্চাতে ছিল, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।*

মুসোলিনির ঘোষণা হইতেই ফ্যাসিস্ট্ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন—অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধিই হইবে ফ্যাসিস্ট্ শাসনের মূল উদ্দেশ্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তি রাষ্ট্র তথা সমষ্টির স্বার্থরক্ষার্থে নিজেকেই সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিবে। সমষ্টি ভিন্ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থ স্বীকৃত হইবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হইবে ; শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না এবং এইজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের পরিদর্শনাধীনে থাকিবে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা Laissaze faire নীতি স্বভাবতই রহিল না। ধর্মের দিক দিয়াও মুসোলিনি ঐক্য নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ফ্যাসিজম্ তথা মুসোলিনির উদ্দেশ্য ও নীতি :

অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন – পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মর্যাদা অর্জন

ধর্মবিষয়ে ঐক্য নীতি

অভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যাদি (Internal Reforms) : (১) শান্তি ও শৃঙ্খলার-ই তখন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনি সৎ এবং অসদুপায়ে পার্লামেণ্টে সমাজতান্ত্রিক দলের বিরোধিতা দমন করিলেন। প্রয়োজনবোধে গোপন হত্যা, পদচ্যুতি ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারের বিরোধী দল বা ব্যক্তি-মাত্রেরই দমন সম্ভব হইল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট্ দল ভিন্ন অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলের অবসান করা হইল।† এইভাবে দেশে সরকারের বিরোধী কোন দল বা শক্তি রহিল না। দেশের অরাজকতা দূর হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া মুসোলিনি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে মনোযোগ দিলেন। (২) ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান করা সম্ভব হইল। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসর সরকারী আয় হইতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হইতে লাগিল। (৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন শুরু হইল। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি টেক্‌নিক্যাল বোর্ড স্থাপন করা হইল। এই বোর্ড নূতন নূতন কারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করিতে লাগিল। দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান, জনকল্যাণকর সরকারী

শৃঙ্খলা স্থাপন

সরকারী বাজেট উদ্বৃত্ত

শিল্পোন্নয়ন

*"It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had not enjoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant section of public opinion." —Riker, p. 757.

† "All parties must end, must fall. I want to see a panorama of ruins about me—the ruins of other political forces—so that Fascism may stand alone, gigantic and dominant."—*Mussolini*, Quoted by Langsam, p. 341.

পরিকল্পনা গ্রহণ, শ্রমিকদের মোট শ্রমের ঘণ্টা অর্থাৎ সময় হ্রাস ইত্যাদি নানা উপায়ে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। (৪) শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী স্থির করিয়া দেওয়া হইল। জিনিস-পত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়া এবং গম, তুলা, তামাক প্রভৃতি চাষের উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা যেমন পূর্বাপেক্ষা সহজ করা হইল, বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজনও তেমনি হ্রাস করা সম্ভব হইল। (৫) বিদেশ হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করিয়া, নূতন জমি আবাদ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নানাপ্রকার উৎসাহ দান করিয়া দেশকে খাদ্যদ্রব্যাদি ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইল। (৬) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারী সাহায্যে জাহাজ-কোম্পানী খোলা হইল। বলকান অঞ্চল, রাশিয়া ও অপরাপর দেশের সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করিয়া সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ প্রস্তুতের তিনটি কারখানাকে একত্রিত করিয়া এক বিশাল কারখানায় পরিণত করা হইল। ইতালীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলি নিজ দেশ, এমন কি, রাশিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত করিতে লাগিল। (৭) ইলেক্‌ট্রিক ও রেডিও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর খুব উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া ইতালীয় মোটর শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইল। (৮) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়া ইতালির অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভিন্ন, সিল্ক, রেয়ন প্রভৃতি শিল্পেও অপরাপর দেশ অপেক্ষা ইতালি অগ্রণী হইয়া উঠে। (৯) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় শিল্পোন্নয়নের ফলে ক্রমে শিল্পের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া পড়ে। (১০) ইতালীয়দের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। ফ্যাসিস্ট্ সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করিয়া শিক্ষার প্রসার সাধন করেন। কিন্তু এই শিক্ষার মূলনীতি ছিল ফ্যাসিস্ট্ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা। সুকুমার শিল্পের উৎসাহ ফ্যাসিস্ট্ সরকার দিয়াছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল তিনটি : 'Believe, Obey, Fight'. (১১) ধর্মের ব্যাপারে মুসোলিনি রাষ্ট্র ও পোপের মধ্যে দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া চার্চকে ফ্যাসিস্ট্ সরকারের সমর্থকে পরিণত করেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য বিধান করা ছিল মুসোলিনির নীতি। (১২) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি

মজুর শ্রেণীর উন্নতি সাধন

খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে উৎসাহদান

জাহাজ নির্মাণ

ইলেক্‌ট্রিক, রেডিও ও মোটর শিল্পের উন্নতি

জলবিদ্যুৎ, সিল্ক, রেয়ন উৎপাদন

বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধি

শিক্ষার বিস্তার : শিক্ষার নীতি— 'Believe, Obey Fight'

ফ্যাসিস্ট সিন্ডিক্যালিজম (Fascist Syndicalism) নামে অর্থনীতি-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করেন।* পূর্বেকার পার্লামেন্ট-এর পরিবর্তে তিনি 'কর্পোরেশন' ও 'ফ্যাসিও' (Fascios)-এর প্রতিনিধিবর্গের এক চেম্বার বা সভা স্থাপন করেন। এই সভার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৮২। ফ্যাসিও নামক ফ্যাসিস্ট দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মোট এক-তৃতীয়াংশ এবং কর্পোরেশন নামক বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য লইয়া এই চেম্বার গঠন করা হয়। কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মজুর ও মালিক উভয় শ্রেণী হইতেই প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইত। এইভাবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা গঠিত চেম্বারের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করিয়া মুসোলিনি কমিউনিস্ট মতবাদের প্রত্যুত্তর দিলেন। এই চেম্বারের বিভিন্ন কমিটি ছিল। এই সকল কমিটি সরকারকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিত। আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অবশ্য সরকারের হাতেই রাখা হইয়াছিল।

পোপের সহিত ধর্ম-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা

'ফ্যাসিস্ট সিন্ডিক্যালিজম' (১৯৩১)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ফ্যাসিস্ট সরকারের জনকল্যাণকর কার্যাবলীর স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। শিল্প, কৃষি, জাতীয় উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া ফ্যাসিস্ট সরকারের দান নেহাত কম ছিল না। জাতীয়তাবোধও এইরূপ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। স্বমত প্রকাশের অধিকার এই শাসনাধীনে কাহারোই ছিল না। সর্বদা সন্দেহ এবং গোয়েন্দার তদন্তের ভয়ে ভীত থাকিয়া, জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছিল, বলা বাহুল্য। সরকারী মতের বিরোধিতা করা কিংবা সরকারী মত ভিন্ন অপর যে-কোন মত প্রকাশ করা ছিল বিপজ্জনক।† শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিবার নীতি ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছিল। জনকল্যাণকর হইলেও সর্বাত্মক স্বৈরাচার চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই ঘৃণা অর্জন করিয়াছিল। মুসোলিনির আমলে বহু সহস্র ইতালিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল।

ফ্যাসিজমের গুণ

ফ্যাসিজমের অপগুণ

প্যারিসের সম্মেলনে ইতালি ট্রেনটিনো বা টাইরল এবং উহার নিকটবর্তী জার্মান

*"He (Mussolini) has established civil and political order, put industry on its feet, increased production and the general prosperity of the country, completed and projected vast land reclamation scheme, undertaken public works of many kinds, introduced social welfare measures of great variety at the price of an efficient and at times repressive autocracy, of a censorship of public opinion, and of abolition of Parliamentary government and of economic freedom to burgain." —Ketelbey, p. 453.

† "Fascism tolerates no difference of opinion."—*Mussolini,* Vide, Rikes, p. 759.

ভাষাভাষী প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক অস্ট্রিয়ানকে ইতালির অধীনে স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন ইতালীয় সরকার এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনি এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে ইতালীয় করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন।* এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ইতালীয় ভাষা জোর করিয়া চাপান হইল। উচ্চকর্মচারিপদ মাত্রেই ইতালীয়দের দেওয়া হইল। নদীর নাম, স্থানের নাম ইত্যাদি সব কিছু পরিবর্তন করিয়া ইতালীয় নামকরণ করা হইল। এমন কি, পারিবারিক নামও ইতালীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইল। এইভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও ভাষার উপর আঘাত করিলে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। মুসোলিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানিকে ইতালির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া টেনটিনো বা টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ানদের বিষয় লইয়া কোনপ্রকার আন্দোলন করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। অপর দিকে হিটলার জার্মানির কর্তৃত্ব লাভ করিলে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইল (১৯৩৯)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে জার্মানিতে চলিয়া যাইতে পারিবে। এইভাবে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত ইতালির বিরোধ দূরীভূত হইল।

টেনটিনোর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলপূর্বক ইতালীয় করিবার অপচেষ্টা

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত চুক্তি

পররাষ্ট্র-নীতি : মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট সরকারের পররাষ্ট্র-নীতির মূল কথাই ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। মুসোলিনি ইতালিকে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। তিনি ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্টগণ যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসোলিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতি জাতির শক্তির প্রাচুর্যের প্রমাণস্বরূপ। এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই জল, স্থল ও বিমানবাহিনী অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হইল। মুসোলিনি স্বয়ং এই তিন বিভাগেরই অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য : ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

স্থল, জল ও বিমান বাহিনী বৃদ্ধি

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনি সর্বপ্রথম প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে (১৯১৯) ইতালির প্রতি যে-অবিচার করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ইতালির শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী গঠন করিয়াই মুসোলিনি তাঁহার নীতি কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক অবিচারের প্রতিকার : সাম্রাজ্য বিস্তার

* "We shall make them (the German-speaking Austrians) Italians."—*Mussolini*, Vide, Langsam, p. 352.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছিল এই কারণে বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এদিকে ইতালির অভ্যন্তরীণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং প্রধানত জীবিকা অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফরাসী সরকার এই সকল ইতালীয়কে ফরাসী নাগরিকত্ব দান করিয়া আরও ইতালিবাসীকে ফ্রান্সে চলিয়া আসিবার উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ফ্রান্সের সহিত ইতালির মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী ইতালি যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় নাই, সেইজন্যও ইতালি ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিত। ফরাসী-অধিকৃত স্যাভয়, নিস্, কর্সিকা ও টিউনিশিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালির দাবি-ই অধিক, এই কথাও ইতালীয়গণ মনে করিত। এই সকল কারণে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। ইতালির সহিত ফ্রান্সের মিত্রদেশ যুগোস্লাভিয়ার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ইতালি ও ফ্রান্স যুদ্ধে প্রায় অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিয়াছিল। উভয় সীমান্তেই সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই দেশে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় নাই।

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্য

মুসোলিনি পূর্ব-ইওরোপে ইতালির ক্ষমতা দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (Dodecanese Islands), ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাইউম্ (Fiume) ইতালির অধিকারে আসে। ইহা ভিন্ন মধ্য ও পূর্ব-ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত ইতালি সামরিক, বাণিজ্যিক ও মিত্রতামূলক চুক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়।

পূর্ব-ইওরোপে ইতালির শক্তিবৃদ্ধি

ইহার পর ইতালি আফ্রিকায় অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হয়। প্যারিস সম্মেলনে ইতালি উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পায় নাই স্মরণ করিয়া ইংলণ্ডের উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঞ্জিয়ার নামক স্থানের ম্যাণ্ডেট্ (Mandate) ইতালিকে দেওয়া হইল। সাইরেনেইকা (Cyrenaica) ও মিশরের মধ্যে সীমা নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে উহার সমস্যা ইতালির সপক্ষে মীমাংসিত হইল।

ট্যাঞ্জিয়ার-এর Mandate: সাইরেনেইকা সমস্যা

এইভাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি বলপূর্বক রাজা হেইলি সেলাসির (Haile Selassie) রাজ্য ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইলেন। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ ইতালিকে নিরস্ত্র করিতে সমর্থ হইল না। মুসোলিনি এক ঘোষণা দ্বারা ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, ইথিওপিয়া ও ইরিট্রিয়া ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইলেন।

ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৬)

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমে ইতালি ও ইংলণ্ডের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আবিসিনিয়া দখল করিবার পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত ইতালির মনোমালিন্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে মুসোলিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধির

জন্য জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। জার্মানি ইতিপূর্বেই জাপানের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইয়াছিল। ইতালির সহিত জার্মানির মিত্রতা চুক্তি সম্পাদিত হইলে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এই অক্ষশক্তিবর্গ (Axis Power) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একই পক্ষে থাকিয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

জার্মানি, জাপান ও ইতালির মিত্রতা

১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ইতালীর সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য টিউনিস্ দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্রান্সের দৃঢ়তায় অবশ্য তিনি টিউনিস্ দখল করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ঐ বৎসর মুসোলিনি আলবানিয়া দখল করিয়া ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে আলবানিয়ারও রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

আলবানিয়া দখল

রাশিয়া (Russia)

রুশ-বিপ্লব, ১৯১৭ (The Russian Revolution, 1917): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই বিপ্লব বর্তমান পৃথিবীর বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতে দুইটি মূল কারণ বিদ্যমান ছিল: (১) জারতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার অক্ষমতা, (২) রুশ জনসাধারণের চিন্তাধারার উপর পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব। এই দুই মূল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের আলোচনার মাধ্যমেই রুশ-বিপ্লবের প্রকৃতি ও গতি অনুধাবন করা সহজ হইবে।

রুশ-বিপ্লবের মূলত দুইটি কারণ:
(১) জারতন্ত্রের অক্ষমতা
(২) জনসাধারণের মানসিক চেতনা

কোন বিপ্লবই কোন একটি বা একই প্রকার কারণে সংঘটিত হয় না। বিপ্লবের পশ্চাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক নানা প্রকার কারণ থাকে। রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতেও অনুরূপ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত মূল কারণ এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলির আভাস পাওয়া যায়।

নানাবিধ কারণের ফলে বিপ্লব সংঘটিত

জারতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার অক্ষমতা জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (১৯০৪-১৯১৭) সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসন যেমন ছিল স্বৈরাচারী তেমনই ছিল অকর্মণ্য। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একেবারে অসহনীয়। রাশিয়ার প্রজাহিতৈষী জারগণ দেশের উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় নিকোলাসও ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেমিক ও প্রজাবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রধান ত্রুটি-ই হইল এই যে, যখনই রাজা বা জারের কর্মকুশলতার অভাব দেখা দিবে তখনই উহার পতন ঘটিবে। ফরাসী

(১) রাজনৈতিক: জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা: দ্বিতীয় নিকোলাস

বিপ্লব হইতেও এই শিক্ষাই পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রজাহিতৈষণা ও দেশপ্রেম তাঁহার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতাকে পূরণ করিতে পারিল না। তিনি ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ, তদুপরি অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি ছিলেন তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার সম্পূর্ণ করায়ত্তে। রাণী আলেকজান্দ্রা নিজে ছিলেন রাসপুটিন (Rasputin) নামক এক সাইবেরিয়াবাসী ধর্মযাজকের প্রভাবাধীন। রাসপুটিনের প্রভাব শাসনকার্যে এবং শাসন-নীতিতেও প্রতিফলিত হইত। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর ন্যায় দ্বিতীয় নিকোলাসও নিজ রাণীর সর্বনাশাত্মক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। ফরাসীরাজের ন্যায় তিনিও স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। নিকোলাস বাধ্য হইয়া ডুমা (Duma) নামে এক পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নিকোলাসের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী শাসন চালু রাখার কোন অসুবিধা হইল না। পার্লামেণ্টের বিরোধী পক্ষ ছিল 'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' (Social Democratic Party)। এই দলের একাংশের নাম ছিল 'বলশেভিক'। ক্রমে এই বলশেভিকগণই শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই দলের শক্তি ও সংগঠন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

রাণী ও রাসপুটিনের প্রভাব

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ : (ডুমা) পার্লামেণ্ট গঠন

বলশেভিক দল

সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অব্যবস্থা ও অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ। কয়েকটি বৃহৎ শহর ভিন্ন অপর কোথাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া কিছু ছিল না। প্রতি এক হাজার রুশের মধ্যে ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, ১২৫ জন ছিল ব্যবসায়ী ও শহরের বাসিন্দা এবং অবশিষ্ট ৮ শতেরও অধিক ছিল কৃষক। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার 'সার্ফ-প্রথার' (Serfdom) উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মির' (Mir) নামক যে গ্রাম-সমিতির উপর জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। গ্রামের কৃষকদের ভূ-সম্পত্তি সমগ্র গ্রামবাসীর যুগ্ম সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং প্রয়োজন হইলেও কোন কৃষক নিজ জমি বিক্রয় করিতে পারিত না। এই অসুবিধা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দূর করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষকদের সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক কৃষকই স্বাধীনভাবে জমি চাষ করিতে সক্ষম হইল না, কেহ কেহ জমি বিক্রয় করিয়া দিল। এইভাবে কৃষকদের দুরবস্থা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(২) সামাজিক : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা কৃষক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য

(৩) অর্থনৈতিক : কৃষক শ্রেণীর দুর্দশা

শ্রমজীবীদের অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা মোটেই ভাল ছিল না। শিল্পোন্নতির অত্যাচারী ও প্রাচীনপন্থী সরকারের অধীনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা ছিল না। কোনপ্রকার ধর্মঘট করা বা ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল। বলপূর্বক বহু ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণ এই অসহনীয় অবস্থায় নীরবে কালাতিপাত করিতেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচার এইভাবে অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত পঁচিশ লক্ষ রুশ মজুরের উপর স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের নামে রাশিয়ার মজুর সম্প্রদায় ধর্মঘট ইত্যাদি করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দান করিয়াছিল। সরকারী অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া তাহারা মস্কো, সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ধর্মঘট ও মারামারি করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রুশ শ্রমিক-সমাজ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

শ্রমজীবীদের দুরবস্থা

শ্রমিক সম্প্রদায়—সমাজতান্ত্রিক প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে রুশ শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও রুশগণ ইওরোপের অপরাপর দেশ হইতে পশ্চাৎপদ ছিল। কৃষক ও মজুর শ্রেণী-গঠিত রুশ জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত। সমগ্র ইওরোপের মধ্যে রাশিয়ায় অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ভড্কা (Vodka) নামক একপ্রকার মদ সকলেই পান করিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মাদক পানীয় প্রভৃতির ফলে রুশ জনসাধারণ—অর্থাৎ কৃষক ও মজুর শ্রেণী অতিশয় নিম্নস্তরের জীবনযাপন করিত। সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে ক্রমেই ইহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দলের একাংশ বল্‌শেভিক নামে পরিচিত ছিল। 'বল্‌শেভিক' (Bolshevik) কথাটির মূল অর্থ হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপর পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল 'মেন্‌শেভিক' (Menshevik) নামে পরিচিত ছিল। এইভাবে রাজনৈতিক চেনতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

(৪) শিক্ষা-বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকিলেই বিপ্লব সৃষ্টি হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল অভাব-অভিযোগের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হওয়া চাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, অনুরূপ মানসিক প্রস্তুতি বিপ্লব-মাত্রেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি করিলেন রুশ সাহিত্যসেবী গোর্কি, টলস্টয়, ডস্‌টিয়েভ্‌স্কি, তুর্গেনিভ, আইভান প্যাভ্‌লভ্ প্রভৃতি। এই সকল সাহিত্যসেবীর রচনার প্রভাবে জনসাধারণের মানসিক চেতনা বৃদ্ধি পাইবার ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তাহাদের দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের গ্রন্থ পাঠের ফলে

(৫) মানসিক : গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ্, আইভান প্যাভ্‌লভ্ ও ডস্‌টিয়েভ্‌স্কির রচনা ও বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের প্রভাব

রাশিয়ার জনসাধারণ, এমন কি, অভিজাত ও মালিক শ্রেণীর মধ্যেও অত্যাচারী জারতন্ত্রের অবসানের আগ্রহ দেখা দিল।

এইভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দেশের সর্বত্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ দেখা দিল এবং এই বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাড্ শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন-কালে দাঙ্গা শুরু হইল। ক্রমে এই দাঙ্গা বিপ্লবে রূপলাভ করিল। শ্রমিকগণ কারখানার কাজ ত্যাগ করিয়া ধর্মঘট শুরু করিল। এই ব্যাপক দাঙ্গা ও ধর্মঘট দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিক বা দাঙ্গাকারীদের দমন না করিয়া বিপ্লবাত্মক কার্যের সহায়তা করিতে লাগিল। এইভাবে জারতন্ত্রের অবসান যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ 'সোভিয়েট' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই 'সোভিয়েট'-এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত করিয়া দেশে কার্যকরী ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা।

(৬) প্রত্যক্ষ কারণ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ পরাজয়—জনসাধারণের দুর্দশা

এই সময়ে অকর্মণ্য জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ডুমা বা পার্লামেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করে। জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। শূন্য জারপদে কাহাকেও বসান হইল না, সুতরাং বাহ্যত রাশিয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

জারতন্ত্রের পতন: অস্থায়ী সরকার গঠন

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা (Problems of the Provisional Government): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ফলে জনসাধারণের হাতে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হয় নাই। ইহার জন্য একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

অস্থায়ী সরকার ডুমা (Duma) অর্থাৎ পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল সোভিয়েট-এর হস্তে। অস্থায়ী সরকারের নেতা অধ্যাপক মিলিন্‌কভ্ উদারনৈতিক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় সংবিধান-সভা কর্তৃক রাশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতিতে যোগদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু এই সকল উদারনৈতিক সংস্কারের ফলেও দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি ঘটিল না। ঐ সময়ের প্রধান প্রয়োজনই ছিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। অর্থনৈতিক কারণই ছিল রুশ-বিপ্লবের প্রধান কারণ, কিন্তু এ-বিষয়ে দ্রুত কোন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। ইহা ভিন্ন অস্থায়ী সরকার অভিজাত

অস্থায়ী সরকারের উদার-নীতি: অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিপ্লব: জনসাধারণের অসন্তুষ্টি

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সোভিয়েট-এর সদস্যগণ ছিলেন প্রোলিট্যারিয়েট শ্রেণীভুক্ত। স্বভাবতই উদার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে রুশ বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব হইল না। সোভিয়েট ও অস্থায়ী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই সরকারের পতন ঘটাইল। সরকার পক্ষ চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য দেশের ভূমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন অনুকরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে। অথচ জনসাধারণের দাবি ছিল 'শান্তি, খাদ্য ও জমি'। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দ্রুত উন্নতি সাধনের সুযোগ ছিল না। জনসাধারণেরও ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল না। ফলে, ব্যাপকভাবে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হইল। সমগ্র দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। এই সুযোগে পোল ও ফিনগণ রাশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল।

ব্যাপক অরাজকতা : ফিন ও পোলদের রুশ রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ

এমন সময়ে মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন ও গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিতে। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মেনশেভিকদের বিরোধী পক্ষ বলশেভিক দলের নেতা লেনিন, ট্রট্স্কি প্রভৃতি যুদ্ধ-পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রোলিটারিয়েটদের শাসন স্থাপন করা। যাহা হউক, কেরেনস্কি সাময়িকভাবে সাফল্যের সহিতই অভ্যন্তরীণ শাসন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া চলিলেন। কিন্তু বলশেভিকদের প্রচারকার্যে প্রভাবিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেশের অভ্যন্তরেও প্রোলিট্যারিয়েট শাসন স্থাপনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিলে জার্মানবাহিনী সহজেই রুশ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রিগা (Riga) নামক স্থানটি দখল করিয়া লইল। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই কেরেনস্কির জনপ্রিয়তা সমূলে বিনষ্ট হইল; বলশেভিক দল এই সুযোগে দেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হইল (নভেম্বর ৬, ৭, ১৯১৭)।

মেনশেভিক নেতা কেরেনস্কি কর্তৃক শাসনব্যবস্থা হস্তগত

কেরেনস্কির শাসন-ব্যবস্থার পতন : বলশেভিক শাসন স্থাপন

নভেম্বর বিপ্লব, ১৯১৭

বলশেভিক শাসন (Bolshevik Government) : বলশেভিক সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়কার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল : (১) বিপ্লবকে স্থায়ী করা এবং বিপ্লবের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা, (২) মার্কসবাদকে কার্যকরী করা, (৩) বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা।

বলশেভিক সরকারের সমস্যা

নব-প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারের নেতা ছিলেন ট্রট্স্কি ও লেনিন। তাঁহারা বিপ্লবের সুফলগুলি যাহাতে স্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন, মানুষে মানুষে সমতা স্থাপন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য দূর করিবার জন্য জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেরই রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না। সমষ্টির কল্যাণের জন্য সম্পত্তি মাত্রেরই জাতীয়করণ করা হইল। কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতি কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। সরকারী ঋণ বাতিল করিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা হইল। দেশে শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না। প্রত্যেকের শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হইল। সমগ্র রুশ জাতি হইল শ্রমিকের জাতি এবং রুশ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকের নিয়োগকর্তা। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্র-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শোষণমুক্ত শ্রেণীভেদহীন এক সমাজের স্থাপনা করা হইল। সর্বসাধারণ্যে বলশেভিক সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল।

সম্পত্তি জাতীয়করণ

শ্রেণী ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন

কিন্তু সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহারা স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ বলপূর্বক দমন করা হইল। এই সূত্রে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাসও ঐ সময়ে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

বিদ্রোহ দমন : বহু ব্যক্তির প্রাণনাশ

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বলশেভিক সরকার শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনই ছিল তখনকার সর্বপ্রধান সমস্যা। বৈদেশিক যুদ্ধে শক্তি এবং সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া অভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানের জন্য বলশেভিক সরকার জার্মানির সহিত ব্রেস্ট্-লিট্ভস্কের (Brest Litvosk) সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে বহু স্থান ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু জাতির স্বার্থের খাতিরে বলশেভিক সরকার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিটার-দি গ্রেটের পরবর্তী কালে যে-সকল স্থান রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রায় সব কিছুই এই সন্ধির শর্তানুসারে ফিরাইয়া দিতে হইল। বৈদেশিক যুদ্ধের এইভাবে অবসান ঘটাইয়া বলশেভিক সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-কার্যে অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন।

বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান : ব্রেস্ট্-লিট্-ভস্কের সন্ধি

কিন্তু বলশেভিক সরকারের সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদ আসিল বাহির হইতে।

বলশেভিকগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র স্থাপিত হউক, এই ইচ্ছা করিত। তাহাদের প্রচারের আন্তর্জাতিক আবেদন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক দেশেই তখন অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছিল। এমতাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য এবং রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য অপরাপর দেশের জনসাধারণকেও প্রভাবিত করা স্বাভাবিক ছিল। ইওরোপীয় শক্তি-মাত্রই এই কারণে প্রমাদ গণিল। তাহারা রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ বিপ্লব-বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার গোপন চেষ্টা করিতে লাগিল। এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেরেনস্কি, করনিলভ্, ডেনিকিন্ ও র‍্যাঙ্গেল। ইংলণ্ড, জাপান ও ফ্রান্স রুশ-বিপ্লব দমন করিবার জন্য রাশিয়ায় সৈন্য পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। কিন্তু বলশেভিক সরকারের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকায় এই অপচেষ্টায় রাশিয়ার কোন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার কৃষক-মজুরদের সহায়তা এবং বিপ্লব-বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যের অভাব বলশেভিক সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিল। বিদেশী আক্রমণ স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের চেষ্টা ঐ সকল দেশের জনসাধারণ সমর্থন না করায় ক্রমেই সৈন্য পাঠাইয়া রুশ-বিপ্লব দমনের আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ সৈন্য রাশিয়া হইতে অপসারণ করিল। বলশেভিক বিপ্লব-বিরোধী দলগুলিকে দমন করা বলশেভিক সরকারের পক্ষে তখন আর কঠিন হইল না। ফলে রুশ-বিপ্লব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। বিদেশী সরকারগুলি অবশ্য বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করিলেন না। ক্রমে পরিস্থিতির চাপে বলশেভিক সরকার ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বলশেভিকদের আন্তর্জাতিক আবেদন : ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান কর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ

বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ : রুশ-বিপ্লবের জয়

লেনিন, ১৮৭০—১৯২৪ (Lenin, 1870-1924) : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিক দলের নেতা ট্রটস্কি ও লেনিন কেরেনস্কি শাসনের অবসান ঘটাইয়া বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন করেন।

ভ্লাডিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ সর্বসাধারণ্যে লেনিন নামেই পরিচিত। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল কাজান প্রদেশের সিন্‌বিরস্ক্ নানক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহা বিপ্লবী পরিবার হিসাবে খ্যাত ছিল। লেনিনের ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জারকে হত্যা করিতে গিয়া ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার অপর এক ভ্রাতা ও দুই ভগিনী পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। লেনিন নিজেও পুলিশের নজর এড়াইতে পারেন

লেনিনের বাল্যজীবন ও শিক্ষা

নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়া কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই এক ছাত্র-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পর অবশ্য তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মার্কস্-এর 'ক্যাপিটাল' পাঠ করিয়া একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পন্থাতেই রুশ জাতির প্রকৃত মুক্তিসাধন সম্ভব, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। লেনিন একটি বিপ্লবী দলের সভ্য হন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

নির্বাসন দণ্ড ভোগের পর তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে গমন করেন। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক রুশ-বিপ্লবের সময়ে তিনি অল্পকালের জন্য রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জার্মানি, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সহিত পরিচিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রুশ 'সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক' দলের এক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে লেনিন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সুদৃঢ় সংগঠন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবমুক্ত প্রোলিট্যারিয়েট-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। অপর এক দল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এমন কি যে-কোন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক দলে সভ্য করিবার যুক্তি দেখাইলেন। ভোটে লেনিনের মতই গৃহীত হইল। এই সময় হইতেই লেনিনের মতে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'বলশেভিক' নামে পরিচিত হইল। বিরোধী পক্ষ 'মেনশেভিক' বা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করিল।*

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক দলের অধিবেশন : বলশেভিক ও মেনশেভিক দলের উদ্ভব

লেনিন জীবনে দারিদ্র্যের কষ্ট কোনদিনই অনুভব করেন নাই, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত কর্মদক্ষতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সুদৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে বিপ্লবী দলের নেতৃপদের যোগ্য করিয়াছিল। তিনি নিজ নীতি অনুসরণে কোন বাধা-বিপত্তিই মানিতেন না, প্রয়োজনবোধে তিনি কূট-কৌশলের সাহায্য গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। ধনতন্ত্র তাঁহার নিকট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সর্বনাশাত্মক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইত। বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রের অবসান সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

লেনিনের চরিত্র ও নীতি

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিলে জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। জার্মান সরকার লেনিনের প্রতি

* '*Bolsheviki* from *bolshinstvo*, meaning 'majority'. *Mensheviki* from *menshinstvo* meaning 'minority''. Vide, Langsam, p. 542.

সহানুভূতিবশত তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। জার্মানি সরকার চাহিয়াছিলেন যে, লেনিন স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করিলে রাশিয়ার বিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির জয়লাভের আশাও বৃদ্ধি পাইবে।

লেনিনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯১৭

রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া লেনিন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া বলশেভিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করেন। এই বিপ্লবে ট্রট্স্কি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

বলশেভিক বিপ্লব

বলশেভিক শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন লেনিন। তাঁহার আমলে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহুবিধ মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। সম্পত্তি জাতীয়করণ নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া বলশেভিক সরকারকে এক দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। কৃষকগণ জমিদারদের সম্পত্তি দখল করিতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু সেই জমি নিজ সম্পত্তি হিসাবে রাখিবার জন্যই তাহারা ব্যগ্র হইল। তাহারা নিজ নিজ জমি চাষ করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসল নিজ হস্তে রাখিয়া নিজ নিজ সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধি করিতে চাহিল। উদ্বৃত্ত ফসল সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে তাহারা মোটেই রাজী হইল না। সরকার এ-বিষয়ে জোর করিলে কৃষকগণ উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা গেল। ঐ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষত আমেরিকার সাহায্যে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিল।

বলশেভিক সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যা

কৃষির অবনতি

দুর্ভিক্ষ

শিল্পক্ষেত্রেও একইরূপ দুরবস্থা দেখা দিল। বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণ করা হইয়াছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় তখন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে শিল্পোৎপাদনে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। উৎপন্নের পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর দাম দিন-দিনই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

শিল্পের অবনতি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন রেলপথও প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল। রেল-এঞ্জিনের শতকরা ৬০ ভাগ যুদ্ধকালীন পরিবহনের চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে, দেশের একস্থান হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বা শিল্প-সামগ্রী অপর স্থানে পরিবহনের অসুবিধায় সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বভাবতই জিনিসপত্রের দাম ভীষণভাবে বাড়িয়া গেল। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির দরুনও মূল্যস্তর সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল। কৃষকগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে শিল্প-সামগ্রী অথবা ধাতু-নির্মিত মুদ্রা দাবি করিল। কাগজী মুদ্রা গ্রহণে তাহারা রাজী হইল না। সরকার আইনের বলে কৃষকদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত শস্য

পরিবহন-ব্যবস্থা অচল

মূল্যস্তর বৃদ্ধি

গ্রহণের চেষ্টা করিলে সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষি ও শিল্পের এইরূপ দুরবস্থায় জনসাধারণ স্বভাবতই বলশেভিক শাসন-বিরোধী হইয়া উঠিল। 'সোভিয়েট সরকারের পতন হউক' এই ধ্বনি দেশের সর্বত্র উত্থিত হইল।*

লেনিন তাঁহার 'খাঁটি কমিউনিজম' (Pure Communism)-পরীক্ষা তেমন সফল হইল না দেখিয়া এক নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহা ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ('New Economic Policy' NEP 1921—1928) পরিস্থিতির খাতিরে যতদূর পর্যন্ত কমিউনিজম কার্যকরী রাখা সম্ভব হইল কেবলমাত্র ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।† এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক কার্যকরী সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।

লেনিনের নূতন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) গ্রহণ

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় (১) কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হয়। এই কর মিটাইবার পরও যদি কোন কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত শস্য রহিয়া যায় তাহা হইলে উহা খোলা বাজারে বিক্রয় করিবার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। (২) ব্যক্তিগতভাবে খুচরা কারবার চালনার অসুবিধা দূর করা হয়। কয়েকটি বিশেষ নীতি মানিয়া চলিলে যে-কেহ এইরূপে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তবে মূল্যস্তর যাহাতে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা না হয়, সেজন্য সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ক্রেতাদের সমবায়-সমিতি স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হয়। (৩) ২০ জন শ্রমিকের নিম্নসংখ্যক শ্রমিক যে-সকল কারখানায় কাজে খাটান হইত সেগুলিকে মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৪) ব্যাংক ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা হয়। (৫) বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিবার জন্য বিদেশী মূলধনীদিগকে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহাদের মূলধনে গঠিত শিল্প নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে না, এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৬) সরকারী খাদ্যভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয়ের পরও প্রয়োজনবোধে খোলা বাজার হইতে অধিক পরিমাণ শস্য-ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরী ক্রমবর্ধমান হারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। (৭) শ্রমিক-মাত্রেরই বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার নীতি পরিত্যক্ত হয়। (৮) শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (NEP) মূলনীতি

* 'Cries of 'Down with the Soviet Government' became more and more frequent and vehement in 1920 at the meetings of the workers and peasants." Langsam, p. 567.

† "As much communism as the exigencies of the situation would permit and no more." Lenin, vide, Langsam, p. 568.

নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী সমিতি গঠন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোগ ও সমবায়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির এক দ্রুত উন্নয়ন শুরু হইল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও বেশী উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে জমি ভাড়া দেওয়া বা গ্রহণ করা এবং শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে, অনেকে অপরের জমি ভাড়া করিয়া ফসল উৎপাদন শুরু করিল। এই ব্যবস্থার ফলে পুনরায় কৃষকদের মধ্যে গরীব, সচ্ছল ও অর্থশালী, এই তিন শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। এই কারণে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার গরীব কৃষকদিগকে করদান হইতে অব্যাহতি দিলেন। মোট ৩৫% কৃষক ইহাতে করভার হইতে মুক্ত হইল। অপর ৫৩ ভাগের উপর অতি সামান্য পরিমাণ কর স্থাপন করা হইল।

জাতীয় উন্নয়নে সরকারী উৎসাহ দান

অবশিষ্ট ১২ ভাগের উপর অত্যধিক পরিমাণে করভার স্থাপন করা হইল। এই শেষোক্ত কৃষকগণ 'কুলাক্' (*Kulaks*) নামে পরিচিত ছিল। করভার পুনর্বণ্টনের ফলে কৃষকদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য অনেকাংশে দূর হইল।

কৃষকদের আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা NEP গ্রহণের ফলে বলশেভিক শাসনের প্রথম দিকে যে-অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা বহু পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হইল। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় এক শতেরও বেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার শিল্প গঠনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল। NEP যখন চালু ছিল, তখন সরকারী 'বুরো' (Bureaus) মারফত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এক পরিসংখ্যান (Statistics) গ্রহণ করা হইল। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রথম রুশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

NEP-এর সুফল

লেনিনের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Lenin): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে লেনিন শান্তি-স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রেস্ট্-লিট্ভস্কের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার রাজ্য কতক হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও দেশের ও জনগণের স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

লেনিন বিশ্বগ্রাসী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল' বা কমিণ্টার্ণ (The Third International or Comintern)-এর অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট্ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হইল মস্কো। সোভিয়েট সরকার এবং কমিণ্টার্ণ ইওরোপীয় দেশগুলি হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইলেন, এমন কি, পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। কমিউনিস্ট্ নীতি এবং কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়া তুরস্ক ও চীন দেশে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল, তাহা সবই

লেনিনের আমলে পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল। রুশ সরকার এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। পারস্য ও আফগানিস্তানে রুশ দূতগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইলে এক ব্রিটিশ মিশন রাশিয়ার নিকট পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে রুশ দূতগণের অপসারণ দাবি করিল।* ইহা ভিন্ন, অপরাপর বহু দাবিও উত্থাপন করা হইয়াছিল। রুশ-বিপ্লবকে বিফলতায় পর্যবসিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী সৈন্যগণ যখন রাশিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যে-সকল ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল সেজন্যও ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইল। সোভিয়েট সরকার প্রত্যুত্তরে ককেশাস অঞ্চল, সুদূর প্রাচ্য (Far East), মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের সোভিয়েট-বিরোধী কার্যকলাপের কথা জানাইলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের দাবি প্রত্যাহার করিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত মনোমালিন্য

সোভিয়েট সরকারের অপর সমস্যা ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ। ইহারও সুযোগ আসিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে 'লেবার পার্টি' বা শ্রমিক দল (Labour Party) ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-বিরোধী নীতি কতক হ্রাস পাইল। ঐ বৎসরই মুসোলিনি সোভিয়েট সরকারকে আইনত স্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েট সরকারকে আইনত স্বীকার করিলে ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। এই বৎসরই (১৯২৪) রুশ-বলশেভিজমের জনক লেনিনের মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ড, ইতালি, নরওয়ে, গ্রীস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কর্তৃক সোভিয়েট সরকার স্বীকৃত

লেনিনের মৃত্যুর পর বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লইয়া লিওন ট্রট্স্কি ও কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল যোসেফ স্টালিনের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবে ট্রট্স্কির দান নেহাত কম ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাবান সংগঠক। লাল ফৌজ তাঁহারই চেষ্টায় এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ট্রট্স্কির মত ও কর্মপন্থা লেনিনের মত ও কর্মপন্থা হইতে ভিন্ন ছিল। লেনিনের জীবদ্দশায়ই ট্রট্স্কির লেনিন-বিরোধী কার্যকলাপের

ট্রট্স্কি-স্টালিন বিরোধ

* "These included the withdra[illegible] of the Soviet diplomatic representatives in Persia and Afghanistan, apologies from the Soviet Government for alleged anti-British activities by these representatives......". "The Soviet Government in reply pointed out the apocryphal character of the evidence quoted in the Note, and reminded the British Government that it had ample documentary evidence of anti-Soviet activities by British agents in the Caucasus, Central Asia and the Far East."

—*A History of the U. S. S. R.*, Rothstein, p. 161.

পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরসাধক স্টালিনের ও ট্রট্স্কির প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হইল।

ট্রট্স্কি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপেক্ষা পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু স্টালিন দেখিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ইওরোপীয় দেশগুলিতে কমিউনিজম্ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা অপেক্ষা বলশেভিক দলের সমগ্র শক্তি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে নিয়োজিত করাই উচিত হইবে। ইহা ভিন্ন, স্টালিন ছিলেন কৃষক পরিবার-সম্ভূত। তিনি কৃষকদিগকে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার জন্য NEP অর্থাৎ নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত ব্যক্তিগত মালিকানার সহিত সমাজতান্ত্রিকতার যোগাযোগ আরও কিছুকাল রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ট্রট্স্কি সাধারণ কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সেরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা অপেক্ষা ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-সৃষ্টি অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা বা মূলধনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে মুহূর্তকালও বিলম্বের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্টালিন বিদেশী মূলধনের সাহায্যে রাশিয়ার শিল্পের উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কি বিদেশী মূলধনীদের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে করিতেন।

ট্রট্স্কি ও স্টালিনের মধ্যে মতের পার্থক্য

ক্যামেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্-এর সহায়তায় স্টালিন ট্রট্স্কিকে যুদ্ধমন্ত্রীর (Commissar for War) পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কিন্তু স্টালিনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মূলধনীদের সহিত যে-চুক্তি সম্পাদন করিতে হইয়াছিল এবং কৃষকদের উন্নতি বিধানের জন্য যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দানের প্রয়োজন ছিল, তাহা কমিউনিজমের পরিপন্থী মনে করিয়া ক্যামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, বুখারিন্ প্রভৃতি স্টালিনের বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্টি কংগ্রেসের লেনিনপন্থী সংখ্যাধিক্যের সহায়তায় এই দুই বিরোধী নেতাকেও অপসারণ করা সম্ভব হইল। ক্রমে ট্রট্স্কিপন্থী সকলকেই কমিউনিস্ট্ পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কিকে রাশিয়া হইতে নির্বাসিত করিয়া স্টালিন নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। নির্বাসিত অবস্থায়ই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কির মৃত্যু হয়।

ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্-এর পতন

যোসেফ্ স্টালিন, ১৮৭৯-১৯৫৩ (Joseph Stalin, 1879-1953) : ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর টিফলিস্ প্রদেশে গোরি নামক শহরে যোসেফ্ স্টালিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভিসারিওন্ আইভানোভিচ্ যুগাশভিলি ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়-সম্ভূত। তিনি মুচির কাজ করিতেন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে দরিদ্র জনসাধারণ হইতেও ধর্মযাজক হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইলে স্টালিনের পিতা

তাঁহাকে টিফলিসের এক ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই স্টালিন সোশিয়েল ডিমোক্রেটিক দলের সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। স্টালিনের অবশ্য যাজক হওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাইবেল অপেক্ষা মার্কস্-এর গ্রন্থাদিই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। সুতরাং ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না। তিনি সর্বান্তঃকরণে মার্কসবাদ কিভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ঐ সময় শ্রমিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের ফলে অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্টালিন এই সকল আন্দোলনের পশ্চাতে যে-সকল গোপন বিপ্লববাদী সমিতি ও দল ছিল, সেগুলির দিকে আকৃষ্ট হইলেন। পনর বৎসর বয়সে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হইলেন।

স্টালিনের বাল্যজীবন

স্টালিন ছিলেন নির্ভীক, গম্ভীর প্রকৃতির দৃঢ়চেতা পুরুষ। নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তিনি করিতেন না। বিপজ্জনক কার্যাদি সম্পাদনে তাঁহার ন্যায় অপর কেহ এতখানি পারদর্শী ছিল না। এজন্য বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 'স্টালিন' কথাটির অর্থ হইল 'ইস্পাত'—তাঁহার চরিত্রের সহিত তাঁহার এই নামের সামঞ্জস্য ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে-সকল সোশিয়েল ডিমোক্রেট লেনিনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্টালিন ছিলেন অন্যতম। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি লেনিনের অনুগত সহচর ছিলেন।

চরিত্র

স্টালিন দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান নেহাত কম ছিল না। কিন্তু মার্কসবাদী গ্রন্থাদি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। স্টালিন ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষিত মার্কসবাদী।* ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টিফলিসের রেলকর্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্র (Study Circle) পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা

১৯০২ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্টালিন ছয় বার ধরা পড়িয়াছিলেন এবং ছয় বারই নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। পাঁচ বার তিনি নির্বাসনকেন্দ্র হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ষষ্ঠ বার তাঁহাকে আর্কটিক অঞ্চলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জারতন্ত্রের পতনের পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সরকার-হস্তে নির্যাতন

বলশেভিক বিপ্লব সাধনে স্টালিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার ও বলশেভিক দলের সংগঠন সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রচারপত্র রচনা,

* "Stalin became an educated Marxist". *A Short Biography of Stalin*—Foreign Languages Publication, Moscow, 1951, p. 8.

অর্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রকার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর (৬, ৭) মাসের বলশেভিক বিপ্লবে স্টালিন তাঁহার সামরিক ক্ষমতারও পরিচয় দান করিয়াছিলেন। নবগঠিত শাসনব্যবস্থায় স্টালিন Commissar of Nationalities নিযুক্ত হইলেন।

স্টালিনের সংগঠন-ক্ষমতা

এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়াই তিনি ট্রানস্-ককেশিয়ার রিপাব্লিকের ঐক্যসাধন এবং U.S.S.R.-এর সংগঠন সম্পন্ন করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, সেই বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

বলশেভিক বিপ্লবকে বানচাল করিবার জন্য রাশিয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় যে অন্তর্যুদ্ধের (Civil War) সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে লেনিন স্টালিনকে

সামরিক দক্ষতা

সর্বাপেক্ষা কঠোর এবং কঠিন সামরিক দায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। যেখানেই জটিল সামরিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইত সেখানে স্টালিনকে প্রেরণ করা হইত।*

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা দমন করিয়া স্টালিন লেনিন-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পন্থা এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য

গোসপ্ল্যান বা স্টেট্ প্ল্যানিং কমিশন: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯২৮-১৯৩৩)

গ্রহণের নীতি চালু রাখিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও পরিদর্শনাধীনে রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। NEP-এর স্থলে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের মধ্যে (১৯২৮-৩৩) নির্ধারিত লক্ষ্যে পোঁছিয়া রুশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইল। গোসপ্ল্যান বা স্টেট্ প্ল্যানিং কমিশন (*Gosplan* or State Planning Commission) এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং উহা কার্যকরী করিবার দায়িত্বও এই কমিশনের উপর ছিল। উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন, মূলধনের ব্যবস্থা, শিল্প, কৃষি, পরিবহন সব কিছুই ছিল এই কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষ।

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা ৫৫ ভাগ ফসল বৃদ্ধি করা এবং এই কারণে সাড়ে পাঁচ কোটি একর জমি যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে স্থাপন

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

করা স্থির হইল। রাশিয়ার কৃষকদের অধীন মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ এইভাবে যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনিবার ব্যবস্থা হইল। কয়লা এবং তেলের উৎপাদন দ্বিগুণ করা, বৈদ্যুতিক শক্তি অন্তত তিন গুণ বৃদ্ধি করা এবং শিল্পোৎপাদন মোট চার গুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইল। শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

---

* "Whenever confusion and panic might at any moment develop into helplessness and catastrophe, there Comrade Stalin was always sure to appear." —Voroshilov, Vide, *Joseph Stalin*—A Short Biography, pp. 68, 69.

টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন, বিদেশী শিল্প-শিক্ষকদের আমন্ত্রণ, নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ, মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষ্টিমূলক আনন্দদানের জন্য প্রতি গ্রামে সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান স্থাপনও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অংশ হিসাবে গৃহীত হইল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে জনগণের আগ্রহ

এই অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন একমাত্র সর্ব-সাধারণের অক্লান্ত শ্রমের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সিনেমা, রেডিও, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র রুশ জাতির মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ইচ্ছা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুফল

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের পূর্বেই সম্পন্ন করা হইল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার ফলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় রাশিয়ার কয়লা ও খনিজ তৈলের উৎপাদন দ্বিগুণ হইল। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনও ঠিক অনুরূপ বৃদ্ধি পাইল। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন তিন গুণে পরিণত হইল। দেশের সর্বত্র বিশাল বিশাল শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রেল-এঞ্জিনের কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা, মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা, ঔষধ প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান, নূতন নূতন কয়লার খনি, ট্রাক্টর প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। মানুষের শ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নের এক চরম দৃষ্টান্ত রাশিয়া স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরিকল্পনা গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে মোট এগার শত মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষির উন্নতি : কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কৃষির ক্ষেত্রেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমভাবেই ফলপ্রসূ হইল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট কৃষি-জমির শতকরা ২০ ভাগ যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মোট ষাট শতাংশ কৃষি জমি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসিয়াছিল। রাষ্ট্র-পরিচালিত বিরাট বিরাট কৃষি-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছিল। যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে কুলাক্ নামক বিত্তশালী কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য নাশ হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী ঋণদান, করহ্রাস, পুরস্কার ইত্যাদি নানা প্রকার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল।

শিক্ষার উন্নতি : রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়াও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ধনতান্ত্রিক শিক্ষার স্থলে সাম্যবাদী শিক্ষার বিস্তার দ্বারা ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি দূর করিবার জন্য কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে স্কুল, টেক্‌নিকাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিশুর পক্ষে মোট সাত বৎসরের জন্য স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করা ছিল বাধ্যতা-মূলক। ফলে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৩ জন

সেখানে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৯ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জাতীয় জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোন স্থান আছে বলিয়া কমিউনিস্ট্‌গণ বিশ্বাস করেন না। মার্কস্‌বাদ বস্তুতান্ত্রিকতার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছে। ফলে, রাশিয়ার ধর্মবিষয়ে উৎসাহ দান দূরের কথা, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় যাদুঘরে পরিণত করা হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্‌ পার্টির সভ্যদিগের চার্চে প্রার্থনায় যোগদান করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। জারতন্ত্রের প্রধান সহায়ক ছিল রুশ চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়। এই কারণে চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইয়াছিল। কমিউনিজমের ধর্ম-বিরোধিতার প্রধান যুক্তি হইল এই যে, ধর্ম মানুষকে আফিংয়ের ন্যায় নির্জীব করিয়া রাখে। স্বর্গরাজ্যে ভগবানের নিকট হইতে যথাযথ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ইহজগতে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার কথাই ধর্মে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'আফিংয়ে'র নেশা ভাঙ্গিয়া দিলেই মানুষ নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে।* এই কারণেই রাশিয়ায় ধর্ম সম্পর্কে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

চরম ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য স্বভাবতই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের উৎসাহ সৃষ্টি করিল। কিন্তু এইবার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির গুণও যাহাতে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ সেগুলি যাহাতে প্রথম স্তরের সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পজ্ঞান ও টেক্‌নিক্যাল জ্ঞানের দিক দিয়াও রাশিয়া যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে, সেই চেষ্টাও করা হইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জানুয়ারি, ১৯৩৩ হইতে ডিসেম্বর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শিল্পোৎপাদন প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইবার চেষ্টা চলিল। কৃষির জন্য সার উৎপাদন দশগুণ, মোটর গাড়ীর প্রস্তুতের সংখ্যা সাতগুণ, ইস্পাত ও কয়লা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। ইহা ভিন্ন, টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ (৪৬·১%), চিনি ও বস্ত্রশিল্প শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, নিরক্ষরতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ অবসান এবং বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুকেই সাত বৎসর কাল পলিটেক্‌নিক্যাল শিক্ষা (Polytechnical education) দানের ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)

* 'Religion is the opiate of the people.'—*Lenin*.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৮-১৯৪২) কার্যকরী করা হইল। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল অতীত হইলে রাশিয়া শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম-ইওরোপের সকল দেশ অপেক্ষাই অধিকতর ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার অবসান, ব্যক্তি-মাত্রেরই ক্রয়ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়া পৃথিবীর শিল্পোৎপাদক দেশের অন্যতম হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৩৮-১৯৪২ : প্রথম স্তরের শিল্পোৎপাদক দেশে পরিণত

স্টালিনের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Stalin): আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্টালিন শান্তি বজায় রাখিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি এবং বৈদেশিক সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং স্টালিন কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-নীতি ত্যাগ করিয়া জাতীয় গণ্ডির মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নতিই পৃথিবীর নিকট কমিউনিজমের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

রাশিয়ার উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার নীতি

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লেবার পার্টি বা শ্রমিক দলের (Labour Party) মন্ত্রিসভার পতনের পর বল্ডুইন-এর রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার অধীনে ইঙ্গ-সোভিয়েট ঋণ-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের আশা বিনষ্ট হইল। ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি বল্‌শেভিক দলের বিরোধিতায় বানচাল হইল। ফ্রান্সের শৌখিন সামগ্রী বল্‌শেভিক দল রাশিয়ায় আমদানি করিবার পক্ষপাতী ছিল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, উহা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতির পূর্বাভাস মাত্র। এই কারণে রাশিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সহিত 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ধর্মঘট দেখা দিলে রাশিয়ার বল্‌শেভিক ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটী শ্রমিকদের অর্থ-সাহায্য দান করে। এইসূত্রে ক্রমে ইঙ্গ-সোভিয়েট মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক আদান-প্রদান (Diplomatic relations) বন্ধ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পুনরায় লেবার পার্টি মন্ত্রিত্ব লাভ করিলে রাশিয়ার সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য

তুরস্ক ও জার্মানির সহিত 'অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ডের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ নাশ (১৯২৭): কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন (১৯২৯)

এদিকে ফ্রান্সের সহিতও রাশিয়ার মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। রাশিয়া ফ্রান্সের শৌখিন সামগ্রী ক্রয় না করায় এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-শত্রু জার্মানির সহিত রাশিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ফ্রান্স ক্রমেই সোভিয়েট বিরোধী হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পোয়েনকেয়ার (Poincare) ফ্রান্স হইতে রুশদূতের অপসারণ দাবি করেন। ঐ বৎসরই চীন দেশের জাতীয়তাবাদী দল পিকিং-এর সোভিয়েট দূতাবাস আক্রমণ করে এবং পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা করা হয়। এই সকল ঘটনার ফলে স্বভাবতই রাশিয়ায় এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। রাশিয়া নিজ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পারস্য, ল্যাটভিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact), কেলগ্ চুক্তি (Kellogg pact) প্রভৃতি স্বাক্ষর করে। তুরস্ক ও ইতালির দ্বন্দ্বে রাশিয়া মধ্যস্থতা করিয়া সেই মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া জার্মানির নিকট হইতে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সোভিয়েট-ইতালি-জার্মানি-তুরস্ক মৈত্রী বৃদ্ধি পাইলে ফ্রান্স ক্রমেই রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন, রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের সুযোগ হইতেও ফ্রান্স বঞ্চিত ছিল।* এই কারণে ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইওরোপীয় শক্তি-সংঘ গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া সস্তা দরের সামগ্রী দ্বারা ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনাশের চেষ্টা করিতেছে, এই অভিযোগ ফ্রান্স উত্থাপন করিলে আমেরিকা ও ব্রিটেন উহার সমর্থন করে। এই সকল দেশ রাশিয়া হইতে গম, তুলা ও কাঠ আমদানি বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সকল দেশের নীতি পরিবর্তিত হইল। হিটলারের অধীনে জার্মানি কমিউনিস্ট-বিরোধী হইয়া উঠিলে এবং বিশেষত হিটলার 'সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী' এই ঘোষণা করিলে সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রী শিথিল হইয়া পড়িল। তদুপরি জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইলে আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন রাশিয়া অধিকতর লাভজনক মনে করিল। অপর দিকে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও রাশিয়ার ন্যায় শিল্পোন্নত দেশকে বাদ দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালনার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া রাশিয়ার সহিত নিছক আদর্শগত

ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য, চীনে সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত, পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা

রাশিয়ার ভীতি : পারস্য ও ল্যাটভিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি, কেলগ্ চুক্তি, জার্মানির সহিত মৈত্রী

ফরাসী ইংলণ্ড-আমেরিকার অর্থ-নৈতিক বিরোধিতা

ইওরোপীয় দেশগুলির সোভিয়েট নীতির পরিবর্তন

* "The Paris Government was alarmed at the growing Russian-German-Italian-Turkish friendship and disgruntled over France's inability to capture profitable Soviet foreign trade." —Langsam, p. 594.

স্বন্দের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিতে চাহিল না। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জেনিভা কনফারেন্সে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পরস্পর মৈত্রীর পথ আরও সহজ হইয়া উঠিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় ফরাসী-সোভিয়েট 'অনাক্রমণ চুক্তি' সম্পাদনে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রাশিয়ার সহিত কুট-নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন। উভয় পক্ষে সরকারীভাবে যে-সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইল তাহাতে উভয় দেশই পরস্পর স্বার্থের হানি করিবে না, এই প্রতিশ্রুতি দান করিল।

ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি, মার্কিন-সোভিয়েট মৈত্রী

জার্মানি ও জাপানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি রাশিয়ারও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর শক্তিবৃদ্ধি স্বভাবতই কামনা করিত। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ করিলে পর বৎসরই (১৯৩৪) রাশিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য হিসাবে গৃহীত হয়। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে তথাকার প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক প্রজা-তন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া সাহায্য দান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। এদিকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক্ চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হিট্‌লারকে সুদেতেনল্যান্ড দান করিলে রাশিয়া এককভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতি রাশিয়ার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিট্‌ভিনোভ্-এর পদত্যাগ এবং মলোটভ্-এর ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। লিট্‌ভিনোভ্ ছিলেন রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপীয় নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষপাতী। তাঁহার পদত্যাগের পর এই নীতি স্বভাবতই পরিত্যক্ত হইল। ইহার ফল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে সোভিয়েট-জার্মান 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non aggression Pact)-তে পরিলক্ষিত হয়।

রাশিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্‌সের সদস্য হিসাবে গৃহীত (১৯৩৪)

মিউনিক্ চুক্তি (১৯৩৮): রুশ-নীতির পরিবর্তন

সোভিয়েট-জার্মান 'অনাক্রমণ চুক্তি' (১৯৩৯)

সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতি, ১৯১৭-'৩৯ (Soviet Foreign Policy, 1917-'39): বিপ্লবী রাশিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার প্রভাব, পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে মার্কস্-লেনিন মতবাদ, রাশিয়ার ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক প্রয়োজন এবং বিপ্লব-প্রসূত সমস্যাসমূহ—সব কিছু মিলিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণ করিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি জার-শাসিত রাশিয়ার আমলের উদ্দেশ্য ও আদর্শের অনুসরণ ভিন্ন কিছু নহে। এমন কি, স্বয়ং কার্ল

সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র

মার্কস্ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রুশ পররাষ্ট্র-নীতি অপরিবর্তনশীল। রুশ পদ্ধতি, কৌশল ইত্যাদি সকল কিছুর পরিবর্তন ঘটিলেও পৃথিবীব্যাপী রুশ আধিপত্য বিস্তারের যে রুশ-নীতি তাহার পরিবর্তন ঘটিবে না।* রাশিয়ার জারতন্ত্রের প্রতি মার্কসের বিরূপ মনোভাব এবং বিপ্লব প্রথমে জার্মানিতে শুরু হইবে, তাঁহার এই বিশ্বাস কার্ল মার্কস্‌কে ঐ ধরনের মন্তব্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল।

জার-শাসিত রাশিয়ার মূলনীতির অনুসরণ

বস্তুত জার-শাসিত রাশিয়া ঐ ধরনের পররাষ্ট্র-নীতিই অনুসরণ করিতেছিল। বাল্টিক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার, বলকান অঞ্চলে অধিকার স্থাপন, কনস্টান্টিনোপল্ কুক্ষিগত করা, মাঞ্চুরিয়া ভাগ করিয়া লওয়া, মঙ্গোলিয়ায় অনুপ্রবেশ, পারস্যের উত্তরাংশে এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং ভারতবর্ষকে আক্রমণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা জার-শাসিত রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। সোভিয়েট শাসনে রাশিয়া জার আমলে পররাষ্ট্র-নীতির মূল ধারা অপরিবর্তিত রাখিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কমিউনিজমের আদর্শের দিক দিয়াও সর্ব পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের নীতি এবং সেজন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সৃষ্টির নীতি সোভিয়েট রাশিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ—এই দুইয়ে দ্বন্দ্বের কথা

বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ বা কমিউনিজম্ প্রসারের আদর্শ

কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোতে বহু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্ মতবাদের এই মৌলিক নীতির সরাসরি প্রভাব সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট্ বিপ্লব এবং বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে রুশ লাল ফৌজ (Red Army) উহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে, এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, কমিউনিস্ট্ মতবাদে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, শান্তির মাধ্যমে পুঁজিবাদকে উৎখাত করা সম্ভব নহে। এজন্য প্রয়োজন রক্তাক্ত বিপ্লবের। এই সকল নীতি এবং বিশেষভাবে লেনিন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পাশাপাশি সাম্যবাদী রাশিয়ার অবস্থান কোন অবস্থায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না—এই দুই প্রকার রাষ্ট্র-পদ্ধতির একটির অবসান একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য সোভিয়েট রাশিয়া ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী,

পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস

লেনিনের এই ঘোষণা পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে এক তীব্র ঘৃণা ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী যুগে এই সকল কারণে সোভিয়েট রাশিয়া ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, ভীতি ও

* "The policy of Russia is changeless. Its methods, tactics, its manoeuvres may change but the pole star of its policy—the world domination—is a fixed star" —*The Relations of Nations*, Hartmann, p. 470.

শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিপ্লবী সরকার কর্তৃক জারদের আমলে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ বাতিল এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ অস্বীকার পাশ্চাত্য দেশসমূহে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থায়িত্ব লাভ করিল। কিন্তু পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া সন্দেহ ও বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত রহিল। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া আধুনিক ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতির মূল ধারাকেই অস্বীকার করিয়াছিল। ইওরোপীয় দেশসমূহের আধুনিক কালের রাষ্ট্রনীতির মূল ধারা বা নীতিই হইল শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন বিদ্রোহ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে না বা উৎসাহ দিবে না। যুদ্ধের কালে এই নীতির ব্যতিক্রম হইলেও শান্তির কালে পররাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বা বিদ্রোহাত্মক মনোভাব জাগাইবার চেষ্টা করিবে না।* কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সাম্যবাদের সর্বজাগতিক আবেদনে বিশ্বাসী। সেজন্য তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা, চিঠিপত্রাদি ও প্রচারের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্যবাদ বিস্তারের সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলেন।†

সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদী প্রচার ইওরোপীয় আধুনিক রাষ্ট্রনীতির মূল সূত্র-বিরোধী

ইহা ভিন্ন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রের অবসান না ঘটিলে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্যবাদ স্থায়িত্বলাভ করিবে না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াও সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃবর্গ সাম্যবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। এজন্য অপরাপর রাষ্ট্রে প্রচারকার্য চালান প্রয়োজন হইল। স্বাভাবিকভাবেই ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই অবস্থায় সাম্যবাদী প্রচার জনসাধারণের মনকে সহজেই প্রভাবিত করিতে পারিবে, এই ভীতিও ইওরোপীয় দেশগুলিকে শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। স্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে প্রথমে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইল না।

ইওরোপীয় দেশসমূহে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতার কারণ

এমতাবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর অপরা-

---

* "To undermine security of another state by spreading disaffection among its subjects, was an expedient which might be justified in times of war, but which was altogether contrary to the idea of normal relations. Soviet theory boldly rejected these fundamental assumptions." —Carr, pp. 72-73.

† "So proud, however, were the Russian Revolutionaries of their methods, that they largely neutralised their effects by the extreme frankness with which they were in the habit of discussing them." —Gathorne Hardy, *International Affairs*, p. 105.

পর দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান যেভাবে ব্যাহত হইয়াছিল, উহার অবসান ঘটান সোভিয়েট সরকারের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সোভিয়েট সরকার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্যবাদের স্থলে 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' (New Economic Policy = NEP) চালু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একই কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরেই সোভিয়েট ইউনিয়ন অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তাই আমরা ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে দেখিতে পাই। পর বৎসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জের চেষ্টায় প্রথমে কেনেস এবং পরে জেনোয়াতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হইল। ল্যয়েড্ জর্জ ভাবিয়াছিলেন যে, জেনোয়া সম্মেলনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া জারদের আমলের বৈদেশিক ঋণ স্বীকার না করায় ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কোনপ্রকার আলোচনায় অংশ গ্রহণে রাজী হইল না। ফলে সোভিয়েট রাশিয়া ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে কোনপ্রকার মৈত্রী স্থাপনে বাধার সৃষ্টি হইল। এমতাবস্থায় রুশ প্রতিনিধি জার্মানিকে দলে টানিতে চেষ্টা শুরু করিলেন এবং সম্মেলনের বাহিরে জার্মানির সহিত "র‍্যাপালো চুক্তি" (Rapallo Pact) স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হইলেন। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এই চুক্তির শর্তাদির তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না বটে, কিন্তু এই চুক্তি দ্বারা জার্মানির ন্যায় বৃহৎ শক্তি কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যত স্বীকৃতির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অপর কোন রাষ্ট্র সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। র‍্যাপালোর চুক্তি একদিকে যেমন রুশ-জার্মান শক্তিবর্গের মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে উভয় দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানিকে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার অদূরদর্শিতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

কেনেস ও জেনোয়া সম্মেলন (১৯২২)

র‍্যাপালোর চুক্তি (১৯২২)

র‍্যাপালোর চুক্তি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপ

যাহা হউক, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শ্রমিক দল শাসনক্ষমতা লাভ করিলে সোভিয়েট সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হইল। ঐ বৎসরই এক ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার পারস্পরিক দেনাপাওনা নাকচ করা হইল এবং উপযুক্ত গ্যারাণ্টির বিনিময়ে ইংলণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঋণদানে স্বীকৃত হইল। কিন্তু সেই সময়ে ব্রিটেনে সোভিয়েট প্রচার-কার্যের বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল যে, ব্রিটিশ জনমত বিশেষভাবে

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সোভিয়েট সরকারের স্বীকৃতি : ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (১৯২৪)

রক্ষণশীল দলের কঠোর সমালোচনার ফলে শ্রমিক শাসনের পতন ঘটিল। নূতন নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পুনরায় শাসনভার পাইল।

ইতালি: ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ কর্তৃক সোভিয়েট সরকারের স্বীকৃতি (১৯২৪)

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েট সরকার স্বীকৃত হইলে ইতালি, ফ্রান্স, জাপান এবং আরও কয়েকটি দেশ সোভিয়েট সরকারকে স্বীকৃতি দিল। ঐ বৎসর হইতে বিশেষভাবে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট সরকার সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের উপর আর ততটা জোর দিল না। ইহার ফলে অপরাপর দেশের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার আদান-প্রদানের পথ সহজ হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্যদিকে সোভিয়েট কূটনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবহেতু পরিস্থিতির কতক অবনতি ঘটিল।

সোভিয়েট সরকারের কূটনৈতিক অদূর-দর্শিতা—দুইমুখো নীতি

সোভিয়েট রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদ প্রচারকার্য উৎসাহিত করিতে লাগিল অথচ অপর দিকে সেই সকল দেশ হইতে নানা-প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা আদায় করিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা চালাইতে লাগিল।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো সম্মেলন ও লোকার্ণো চুক্তি আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সমতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন উহাকে সাম্রাজ্য-বাদী চক্রান্ত আখ্যা দিল। অবশ্য জার্মানির পূর্ব সীমান্ত রেখার প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া লোকার্ণো চুক্তি জার্মানিকে ইচ্ছামত উহা পরিবর্তন করিবার পথ খোলা রাখিয়াছিল—রাশিয়ার এই বক্তব্য যুক্তির দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য ছিল, বলা যাইতে পারে। পর বৎসর (১৯২৬) সোভিয়েট রাশিয়ার অদূর-দর্শিতার আরও একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। ঐ বৎসর ব্রিটেনে খনি-শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হইলে সোভিয়েট সরকার শ্রমিকদের অর্থসাহায্য দিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বভাবতই ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার যে-সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল, তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। শুধু ব্রিটেন কেন সোভিয়েট সরকারের নীতি ফ্রান্সের সহিতও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েট সরকার ফ্রান্স হইতে কোন কোন সামগ্রী আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দিলে, ফ্রান্সের নিকট রাশিয়ার ঋণ অস্বীকার করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে ধনতান্ত্রিক দেশ হইতে লাল ফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিবার কথা ঘোষণা করিয়া ফ্রান্সকে শত্রুতে পরিণত করিল। পরিস্থিতি এমন হইয়া উঠিল যে, ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিল। উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার কূটনৈতিক অসাফল্য প্রধানত কমিনটার্ণের অর্থাৎ তৃতীয় ইন্টারন্যাশন্যাল (Third International)-এর সাম্যবাদী প্রচারের ফলেই ঘটিয়াছিল।*

সাম্যবাদী প্রচার-কার্যের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোমালিন্য

তৃতীয় ইন্টার-ন্যাশন্যালের প্রচার-কার্য সোভিয়েট কূট-নৈতিক বিফলতার কারণ

* Gathorne Hardy, p. 108.

এদিকে রুশ সাম্যবাদী প্রচারকার্য ইওরোপীয় দেশসমূহে অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েট সরকারকে এ-বিষয়ে সাবধান করা সত্ত্বেও কোন ফল হইল না। উপরন্তু লণ্ডনের সোভিয়েট দূতাবাসের ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্রিটেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ করিয়া দিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য দূতকে ব্রিটেন ছাড়িয়া যাইবার আদেশও ব্রিটিশ সরকার দিলেন। ঐ বৎসরই (১৯২৭) পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত হত্যা এবং চীনে সোভিয়েট দূতাবাস আক্রমণ সোভিয়েট সরকারের অস্বস্তির কারণ হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ্‌কে কমিউনিস্ট্ পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইলে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী প্রচারের তীব্রতা অনেক হ্রাস পাইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে সাম্যবাদের প্রয়োগ ও বিস্তার সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। ট্রট্স্কি মনে করিতেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে রাশিয়া এককভাবে সাম্যবাদী আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। এজন্য পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্যবাদী বিপ্লব সৃষ্টি করা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান নীতি হওয়া উচিত। ইহাতে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি যদি বিলম্বিত হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে স্টালিন রাশিয়ার অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম সাম্যবাদের পূর্ণ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া হইতে ট্রট্স্কির বহিষ্কার সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সোভিয়েট রাশিয়া সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রসার ও প্রয়োগে ততটা মনোযোগী নহে।

সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির রূপান্তর—স্টালিন-ট্রট্স্কি বিরোধ

ট্রট্স্কির বহিষ্কার

পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও তুরস্কের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড, পারস্য, আফগানিস্তান, রুমানিয়া, তুরস্ক, ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করিতে রাশিয়া সমর্থ হইল। চীন দেশের সহিতও ঐ বৎসরই কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ইওরোপ ও প্রাচ্যাঞ্চলের দেশগুলির সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার চুক্তি

ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তি সোভিয়েট সরকারের সমর্থন লাভ করে নাই। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ভার্সাই চুক্তির অপরিবর্তনশীলতা (Status Quo) নীতির পক্ষপাতী ছিল না বটে, কিন্তু জার্মানির সম্ভাব্য বিস্তার-নীতি রোধের উপায় হিসাবে ভার্সাইয়ের চুক্তির শর্তগুলি অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজন, এ-কথা সোভিয়েট রাশিয়া উপলব্ধি করিল। রাশিয়া Status Quo নীতির সমর্থক

সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তি সমর্থন

হইয়া উঠিল। ইহা ভিন্ন পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত যুগ্মভাবে জার্মানির অভ্যুত্থান রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও রাশিয়া উপলব্ধি করিল। এজন্য লীগ-অব্-ন্যাশন্সের শর্তাদি রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে লীগের সদস্যপদভুক্ত করা হয়।

যুগ্ম-নিরাপত্তা নীতির সমর্থন : লীগের সদস্য পদভুক্ত

সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কের উপরি-উক্ত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ফরাসী-রুশ সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। রাশিয়া কর্তৃক র‍্যাপালোর চুক্তি স্বাক্ষর, ফ্রান্স হইতে জার আমলে গৃহীত ঋণ অস্বীকার, পক্ষান্তরে ফ্রান্স কর্তৃক জারতন্ত্রের সমর্থকদের আশ্রয় দান, রাশিয়ার শত্রু দেশ পোল্যান্ড ও রুমানিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়া কর্তৃক সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব দান প্রভৃতি দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু হিট্লারের নেতৃত্বে জার্মানিতে নাৎসীবাদ এবং ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান এবং জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্সের নির্দেশেই রুমানিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েট সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পর বৎসর (১৯৩৫) চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার পরস্পর সাহায্যের এক মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অপর দিকে জাপানের আগ্রাসী নীতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া বহির্মঙ্গোলিয়ার সহিত পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯৩৬)।

নাৎসী জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট্ ইতালির অভ্যুত্থান

রুশ পররাষ্ট্র-নীতির প্রয়োজনীয়তা

জাপানের আগ্রাসী নীতি—রুশ-বহির্মঙ্গোলীয় সামরিক চুক্তি

এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-নীতি যখন অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলে ফ্রান্স এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের উদাসীনতা রাশিয়ার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। ইহার পর রাইন অঞ্চল জার্মানি দখল করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তাহা প্রতিহত করিবার কোন প্রকার ইচ্ছা পরিলক্ষিত না হইলে রাশিয়ার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। তদুপরি জার্মানি, ইতালি ও জাপান এই তিনটি অক্ষ শক্তির (Axis Power) মধ্যে কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর এবং হিট্লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকার কালে ইঙ্গ-ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা সোভিয়েট সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এমতাবস্থায় মিউনিক চুক্তি (Munich Pact) স্বাক্ষর করিয়া (১৯৩৮) ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি হিট্লারকে চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করিতে দিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যে রাশিয়ার নিরাপত্তার কথা মোটেই ভাবিতেছে

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির নিষ্ক্রিয়তা সোভিয়েট রাশিয়ার ভীতির কারণ

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি কর্তৃক জার্মানির আগ্রাসী নীতির পরোক্ষ সমর্থন—মিউনিক চুক্তি : রাশিয়ার ভীতি

না, সে-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময়ে জার্মানিকে যুগ্মভাবে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এক ত্রি-শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ না করায় রাশিয়ার সন্দেহ ও ভীতি চরমে পেঁছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাশিয়াকে জার্মানির সহিত মিত্রতাবন্ধ হইতে হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানির সহিত অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করিয়া অন্তত কিছু কালের জন্য জার্মানির প্রকাশ্য শত্রুতা হইতে রক্ষা পাইবার এবং সেই সুযোগে সামরিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিল। হিট্‌লারও রাশিয়াকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ হইতে পৃথক রাখিতে সচেষ্ট ছিল। অনাক্রমণ চুক্তিতে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হইলে ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে হিট্‌লার পোল্যান্ড আক্রমণ করিলেন, ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

সোভিয়েট ও জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

জার্মানি (Germany)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি: নাৎসী দলের উত্থান (Post-war Germany: Rise of Nazism): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির চরম পরাজয়ের ফলে জার্মানির রাজ্যসীমা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই হ্রাস পাইল না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নাশ হইল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক গভীর হতাশা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে শাসনব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম যুদ্ধে পরাজয়ের সময় হইতে ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন। অভ্যন্তরীণ অরাজকতা দেখা দিলে, তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া হল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসান হইল। জার্মানি একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। সাময়িকভাবে 'কাউন্সিল অব্ পিপল্‌স কমিসার' (Council of People's Commissar) নামে এক কার্যনির্বাহক সমিতির উপর জার্মানির শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই সমিতি প্রধানত সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত ছিল। সমিতির যুগ্ম সভাপতি হইলেন ফ্রেডারিক ইবার্ট ও হ্যাসি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলের বহু সরকারী কর্মচারী তখনও কাজে বহাল রহিলেন। একমাত্র কমিউনিস্ট্ দল এই নবগঠিত সরকারের সহিত সহযোগিতায় রাজী হইল না। জার্মানির কমিউনিস্ট্‌গণ 'স্পার্টাকাস্' (Spartacus) নামে পরিচিত ছিল। নবগঠিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির দুরবস্থা: কাইজারের পলায়ন—জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত

সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

সরকার জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইলেন। দেশের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংবিধান-সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে, এই আশ্বাস দেওয়া হইল। 'স্পার্টাকাস্' দল তাহাদের নেতা লাইবনেক্‌ট্ (Liebnecht)-এর অধীনে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিজম্ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিলে ইবার্ট তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। লাইবনেক্‌ট্-এর প্রধান সহচর ছিলেন রোসা লাক্সেমবুর্গ। তাঁহারা এক সশস্ত্র আন্দোলন চালাইতে গিয়া পরাজিত এবং সরকার কর্তৃক ধৃত হইলেন এবং জেলখানায় লইয়া যাওয়ার পথে বিরোধী পক্ষের উত্তেজিত সমর্থকগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে 'স্পার্টাকাস্' দল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা বিফল হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক সপ্তাহ গোলযোগের পর স্পার্টাকাস্‌দের পতন ঘটিলে ১৯শে তারিখ জাতীয় সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

"স্পার্টাকাস্"

'স্পার্টাকাস্' দলের পতন

সমগ্র জার্মানির ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট ৩২ কোটি নাগরিকদের মধ্যে মোট ৩ কোটি স্ত্রী-পুরুষের ভোটে জাতীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইলেন। মোট ৪২১টি আসনের মধ্যে 'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক' দল ১৬৩টি আসন লাভ করিল, সেণ্ট্রিস্ট্ বা খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাট্‌স্ ৮৮, ডেমোক্রেটিক দল ৭৫, ন্যাশন্যালিস্ট্ দল ৪২, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ দল ২২ এবং পিপল্‌স পার্টি ২১টি আসন প্রাপ্ত হইল। বাকী দশটি আসন অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অধিকারে আসিল। স্পার্টাকাস্ দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল না।

জাতীয় সভার গঠন

এই জাতীয় সংবিধান-সভা (Weimar) নামক স্থানে অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করিল। এই সংবিধান পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং উইমার অধিবেশনে উহা গৃহীত হইতে অধিক সময় লাগিল না। এই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থির হইল। একটি দুই-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। ঊর্ধ্বকক্ষের নাম হইল 'রাইক্‌স্ট্যাডাট্' (Reich-stadt) এবং নিম্নকক্ষের নাম হইল 'রাইক্‌স্ট্যাগ্' (Reichstag)। ঊর্ধ্ব-কক্ষ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইবে আর নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবেন। ফ্রেডরিক ইবার্ট (Friedrich Ebert) এই শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

উইমার সভার কার্যাদি ঃ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ ঃ ইবার্ট প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

উইমার জাতীয় সভার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি সম্পাদন। মিত্রপক্ষের চাপে জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উইমার সভা সন্ধির শর্তাদি অনুমোদন করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন।

ভার্সাই-এর সন্ধি স্থাপন

জাতীয় সভার অপর সমস্যা ছিল বিরোধী দলগুলিকে দমন। ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলির কঠোরতা এবং মিত্রপক্ষের হস্তে জার্মান জাতির অপমান জার্মানির সর্বত্র এক ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ সার উপত্যকা (Saar Valley) সাময়িকভাবে জার্মানির হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ইবার্টের শাসনের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানির দেশপ্রেমিক সৈনিক-সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সহ্য করিতে রাজী ছিল না। ফলে, নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাইবার গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর উল্‌ফ্‌গ্যাং ক্যাপ্‌ (Dr. Wolfgang Kapp) এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লুডেনড্রফ্‌ (General Ludendroff) বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

উল্‌ফ্‌গ্যাং ও লুডেন-ড্রফের বিফলতা

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহাত্মক কার্যাদি দমন ভিন্ন বিজেতা শক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানির উপর যে এক বিশাল ক্ষতিপূরণের ভার চাপান হইয়াছিল, তাহার সংস্থান করা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির উপর যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব চাপান হইয়াছিল। এইরূপ অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অযৌক্তিকতা এবং উহা দিবার অক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়াও জার্মানির কোন ফল হইল না। ফলে, সামান্য কিছু অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার পরই জার্মানি অক্ষমতাহেতু ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিল। ফ্রান্স জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির রুহ্‌র (Ruhr) অঞ্চল দখল করিল। এই সূত্রে ঐ অঞ্চলে এক ব্যাপক ধর্মঘট ও অরাজকতার সৃষ্টি হইল। রুহ্‌র অঞ্চল ছিল জার্মানির সর্বাপেক্ষা অধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল। ফ্রান্সের রুহ্‌র অঞ্চল দখলের প্রত্যুত্তরস্বরূপ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহ বন্ধ হইয়া গেলে জার্মানির জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। এই জাতীয় সংকটে স্ট্রেসম্যান (Stresemann) নামে একজন বিচক্ষণ জার্মান নেতা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্মঘট প্রভৃতি বন্ধ করিয়া কলকারখানা পুনরায় চালু করাইলেন। এদিকে জার্মানির নিকট হইতে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে এবং কিভাবে তাহা আদায় করা হইবে, সেই প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ব্রিটিশ, ফরাসী, ইতালীয় ও বেলজিয়াম সরকার একটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission) স্থাপন করিলেন। মার্কিন সরকারও এই কমিশনে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। চার্লস্‌ ডাওয়েস্‌ (Charles Dawes) নামে একজন মার্কিন অর্থনীতিক এই কমিশনের সভাপতিত্ব করিলেন। এই কমিশন

জার্মানির পক্ষে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা

ফ্রান্স কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল

ক্ষতিপূরণ কমিশন: 'ডাওয়েস্‌ প্ল্যান'

'ডাওয়েস্ প্ল্যান' (Dawes Plan) নামে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। ইহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্প অল্প কিস্তিতে জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল। জার্মানি ডাওয়েস্ প্ল্যান গ্রহণ করিলে ফরাসী সৈন্য রুহ্‌র অঞ্চল ত্যাগ করিল।

রুহ্‌র হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ

জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারণ লইয়া তখনও আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ফ্রান্স ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকার্ণো চুক্তি' (Locarno Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। এই সমস্যার সমাধানের ফলে জার্মানি লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান রাষ্ট্রপতি ইবার্টের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার স্থলে হিণ্ডেনবুর্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

লোকার্ণো চুক্তি (১৯২৫): জার্মানি-বেলজিয়াম, জার্মানি-ফ্রান্সের সীমা নির্ধারণ

রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতক শান্ত হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থা দিন-দিনই দুর্দশার চরমে পেঁছিতেছিল। ডাওয়েস্ প্ল্যান অর্থনৈতিক বিষয়ে কতক সুবিধা করিয়া দিলেও ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ জার্মানির অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধন না করিয়া আদায় করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই জার্মানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাসের দাবি জানাইল। মিত্রপক্ষ (The Allies) আওয়েন ইয়ং (Owen Young) নামে একজন অর্থনীতিকের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশনেরও দায়িত্ব ছিল জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সমস্যার সমাধান করা। আওয়েন কমিশন ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে (১) অবশ্য দেয় এবং (২) পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন জার্মানিকে দীর্ঘ ৫৯ বৎসর ধরিয়া কিস্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিবার সুযোগ দেওয়া হইল এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে জার্মানির উপর কোন প্রকার বিদেশী পরিদর্শন-ব্যবস্থা থাকিবে না, এই সুপারিশও করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইয়ং প্ল্যান কার্যকরী হইল এবং জার্মানি মার্কিন সরকারের নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের কিস্তি দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র এক ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা (Economic depression) দেখা দিলে মার্কিন সরকার জার্মানিকে ঋণদানে অক্ষমতা জানাইলেন। ফলে, জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য জার্মানির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল।

আওয়েন ইয়ং প্ল্যান

অর্থনৈতিক মন্দা: জার্মানির ক্ষতিপূরণ দান বন্ধ

জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা: নাৎসী দলের উত্থান (Economic prostration of Germany: Rise of Nazism): প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জার্মানির

আর্থিক দুর্দশা অপরাপর দেশ অপেক্ষা বহুগুণে বেশী ছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশার সীমা ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যে-অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জনসাধারণের দুর্দশার সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের প্রভাব সহজেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময়ে এডলফ্ হিট্লার নামক একজন প্রাক্তন সৈনিক ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ বা নাৎসী (National Socialist or Nazi) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জনসাধারণের চরম দুর্দশার সুযোগ লইয়া হিট্লার ও তাঁহার অনুচরবর্গ সহজেই নাৎসী দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। জনসাধারণ তখন যে-কোন প্রচারকার্যেই কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত ছিল।

অর্থনৈতিক দুর্দশা : নাৎসী দলের সৃষ্টি

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্লার লুডেন-ড্রফ্-এর সহযোগিতায় বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হয় এবং হিট্লার ও তাঁহার অনুচরদের অনেকে কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে হিট্লার একজন হতাশ রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ভিন্ন কিছুই ছিলেন না। কারাবাসেই হিট্লার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেঁইন ক্যাম্ফ্' (Mein Kampf) রচনা করেন।

হিট্লারের শাসন-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ব্যর্থ

নাৎসী দলের সদস্য সংখ্যা এদিকে দিন-দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। হিট্লার ছিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতায় এক সম্মোহনী শক্তি ছিল। জার্মান জনসাধারণের কাছে তাঁহার আবেদন ছিল অত্যন্ত সহজবোধ্য। জার্মানির যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ সব কিছুর জন্য ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তি, মার্কস্বাদী ও ইহুদিদের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণকারী মূলধনীদের কার্যাদি দায়ী, এ-কথা তিনি জনসাধারণকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন। জার্মানির রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন জার্মান সমাজ, অর্থনীতি এবং জার্মানদের জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার উপর সমানভাবে নির্ভরশীল, এই বিশ্বাস তিনি জার্মান জাতির মনে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। এজন্য ইহুদি তথা আর্য-জাতিসম্ভূত নহে এমন সকলকে জার্মানি হইতে বিতাড়ন প্রয়োজন এ-কথা তিনি সকলকে বুঝাইলেন।* ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাৎসী দলের সমর্থক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দলের প্রতিনিধিগণ রাইকস্ট্যাগ্-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হন।

রাইকস্ট্যাগে নাৎসী দলের সংখ্যাধিক্য : হিট্লার চ্যান্সেলর-পদে নিযুক্ত :

ফলে, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিট্লারকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার অল্পকাল পরে হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিট্লার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট উভয় পদই স্বয়ং গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ক্রমেই নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে

হিট্লারের সর্বাত্মক ক্ষমতা লাভ

*"*The Hutchinson's History of the World.*" p. 963.

থাকেন। তিনি জাতির প্রতিনিধি-সভা রাইকস্ট্যাগকে শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত করান। ফলে হিট্‌লার জার্মানির শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে সমর্থ হন। তিনি জার্মানির 'ফুহ্‌রার' (Fuhrer) বা প্রধান নেতার উপাধি ধারণ করেন।

হিট্‌লার ছিলেন ইহুদি ও কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী। এই দুইয়ের উপর তিনি গোপনে নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু ইহুদি জার্মানি ত্যাগ করিয়া অপরাপর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও ইহুদি-বিতাড়নের বর্বরতা হইতে রক্ষা পান নাই। কমিউনিস্ট্‌গণকেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিট্‌লারের আদেশে জার্মানিতে মার্কসবাদের প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। শ্রমিকদের ট্রেড্‌ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কমিউনিস্ট্‌-পন্থীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। দেশে নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য হিট্‌লার নিজ দলের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে হয় কয়েদ করিলেন নতুবা দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন। এইভাবে তিনি নিজ ক্ষমতাকে জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন।

ইহুদি ও কমিউনিস্ট্‌ দলন

অর্থনৈতিক এবং অপরাপর ক্ষেত্রে নাৎসী পরিকল্পনা ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি জার্মান জনসাধারণের মনোগ্রাহী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ও দোকানদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশাল বিশাল বিক্রয়কেন্দ্রগুলিকে সরকারের আওতায় আনা হইল। করভারের বৃহদাংশ ধনিক শ্রেণীর উপর চাপান হইল। ইহা ভিন্ন অন্যোপার্জিত সম্পত্তি ভোগ করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া, বেকারী দূর করিয়া নাৎসী সরকার জনপ্রিয়তা অর্জন করিল। শ্রমিক এবং মালিকদের একত্রে 'জার্মান লেবার ফ্রন্ট' (German Labour Front) নামে এক সংস্থার অধীনে আনা হইলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ যেমন হ্রাস পাইল, শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য অল্প খরচায় বিভিন্ন জায়গায় ছুটি কাটাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইল।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হিট্‌লার চাহিয়াছিলেন সমগ্র জার্মান জাতিকে অধিকতর সংহতিসম্পন্ন করিয়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতে। এইজন্য তিনি প্রথমে প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা বা ডায়েট্‌ (Diet) উঠাইয়া দিয়া শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সমগ্র দেশের শাসনভার নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অপরাপর সংস্কার সাধনে মনোযোগ দিলেন। তিনি শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি প্রভৃতি সবকিছুর উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ (Autarchy) করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। বিদেশ হইতে আমদানি যথাসম্ভব কমাইয়া দিয়া রপ্তানির পরিমাণ বাড়ান হইল।

দেশে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও অপরাপর সংস্কার

উত্তরাধিকারের আইন পরিবর্তন করিয়া কৃষি-জমি যাহাতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা না হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হইল। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল, পশম, রবার, কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কৃত হইল। পরিত্যক্ত লোহা পরিশোধন করিয়া এবং পুরাতন লৌহ খনি হইতে যথাসম্ভব লোহা তুলিয়া উন্নয়নের কাজে লাগান চলিল। দেশের কাঁচামাল যাহাতে কোনভাবে নষ্ট না হইতে পারে, সেজন্য কাঁচামালের রেশনিং (Rationing) ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংখ্যা বাড়াইয়া একদিকে যেমন দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হইল, তেমনি অপর দিকে দেশের বেকার-সমস্যা বহু পরিমাণে লাঘব করা হইল।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন। জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলমাত্রকেই তিনি জার্মানির সহিত সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করায় জার্মানিকে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে Disarmament Conference হইতে জার্মানি বাহির হইয়া আসে এবং লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। Disarmament Conference-এ ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জার্মানি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিবার দাবি করে, অপর দিকে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য জার্মানি অন্তত ফ্রান্সের সম-পরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিতে চাহে। এই সূত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মানি এই সম্মেলনের অধিবেশন ত্যাগ করে। ইহার অব্যবহিত পরে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া জার্মানি নিজ ইচ্ছামত সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার ভার্সাই শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করিয়া যে-সকল শর্ত সংযোজন করা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ্যে অমান্য করেন এবং জার্মানিতে সামরিক বৃত্তি পুনরায় বাধ্যতামূলক করেন। এই সকল কার্য হইতেই জার্মানির ভবিষ্যৎ পন্থা কি হইবে ধারণা করা যায়।

জার্মানির Disarmament Conference ও লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি অমান্য করিয়া রাইন অঞ্চলটি দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তভঙ্গের পরও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিক হইতে কোন তীব্র প্রতিবাদ হইল না দেখিয়া হিট্‌লার তাঁহার আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক রাইন অঞ্চল দখল (১৯৩৬)

ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হিট্‌লার তথা নাৎসী জার্মানির অভ্যুত্থান

ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনাশ করিয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনের সেই সময়কার জার্মানি-ভীতি হইতে এ-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। হিট্‌লারের নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী জার্মানির সহিত মিত্রতার নীতি অনুসরণ করাই উচিত এই ধারণা যে ব্রিটেনকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি হইতে অনুমান করা যায়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ব্রিটেনের মোট নৌশক্তির ৩৫ শতাংশ গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এ-কথা ব্রিটেন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অথচ ইহার কয়েক মাস পূর্বে স্ট্রেসা নামক স্থানে এক সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি জার্মানির ভার্সাই-এর চুক্তির অবমাননার বিরোধিতা করিয়াছিল। ব্রিটেন ও জার্মানির নৌচুক্তি স্বভাবতই জার্মানির মনোবল যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিল, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতাও তেমনি প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এইরূপ বিচ্ছিন্নতা জার্মানিকে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইতে সাহায্য করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনাশ

ব্রিটেনের হিট্‌লার তোষণ-নীতি

ইওরোপ তথা পৃথিবীর ভারসাম্য জার্মানির শক্তি সঞ্চয়ের ফলে যে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইওরোপীয় এমন কি, সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে জার্মানির সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার নীতির মধ্যে দেখা গিয়াছিল। হিট্‌লার ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত পঁচিশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির প্রতি অতি নম্রনীতি অনুসরণ করিতে থাকে। কারণ জার্মানি সেই সময়ে ইওরোপের যে-কোন শক্তিকে যে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা রাখে হিট্‌লারের অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যে সেই পরোক্ষ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল।

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জার্মান-ভীতি—ফলে নম্রনীতি অনুসরণ

হিট্‌লার জার্মানিকে যে নিরঙ্কুশভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা একদা হিট্‌লারের বিরুদ্ধে স্ট্রেসা সম্মেলনে যোগদানকারী মুসোলিনির জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহার পর জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক গোপনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাহায্যদান এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সহিত মিত্রতা-স্থাপন প্রভৃতি হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মানি যে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়। হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ইওরোপ তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা একদিকে ইতালি ও জাপানের হিট্‌লারের সহিত মিত্রতা অপর দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির অসহায় ভাব এবং জার্মানির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

হিট্‌লারের সহিত মুসোলিনির মিত্রতা

পৃথিবীর ভারসাম্য বিনাশপ্রাপ্ত : জাপানের জার্মানির সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে কমিউনিস্ট্ প্রভাব-বৃদ্ধি প্রতিহত করিবার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Franco) কমিউনিস্ট্-বিরোধী এক বিদ্রোহ সৃষ্টি

করেন। স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার ছিলেন কমিউনিস্ট্-প্রভাবিত। সুতরাং কমিউনিস্ট্ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ব্যক্তি-মাত্রেই স্পেনীয় সরকারের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ফ্যাসিস্ট্ ইতালি ও নাৎসী জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো স্পেনীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্যুদ্ধে জয়ী হইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ স্বৈরাচারী একক-অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্র এই দুই রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বস্বরূপ ছিল। এই দ্বন্দ্বে স্বৈরতন্ত্রের জয় হওয়ায় হিট্লার ও মুসোলিনির সমর্থক আর একটি তৃতীয় শক্তির সৃষ্টি হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐ সময়ে মতানৈক্য থাকায় এই দুইয়ের কেহই স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে কোন পক্ষকেই সমর্থন করিল না।

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ

হিট্লার ও মুসোলিনির নীতির জয়লাভ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি বিশেষ ঘটনা হইল জার্মানি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন। জার্মানি জাপানের সহিত এক কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করে। পর বৎসর (১৯৩৭) ইতালি এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলে জার্মানি-জাপান-ইতালি এই তিন দেশের মধ্যে এক মৈত্রী স্থাপিত হইল। বিরুদ্ধ পক্ষ তখন ছিল ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড।

জার্মানি-জাপান-ইতালি মৈত্রী

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্লার জার্মানির সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জার্মানির শক্তি-শকট চালনায় তাঁহার আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সামরিক নেতৃবৃন্দমাত্রেই তাঁহার প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। ঐ বৎসরই হিট্লারের ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়ার নাৎসী দলভুক্ত ব্যক্তিগণ এক দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে হিট্লার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সুচ্নিগ্ (Schuschnigg)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নাৎসী দলভুক্ত অস্ট্রিয়ানদের মধ্য হইতে কয়েকজন মন্ত্রীকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। সুচ্নিগ্ হিট্লারের প্রস্তাবে রাজী হইলেন, কিন্তু অস্ট্রিয়া তাহাতেও জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না। অল্পকালের মধ্যেই হিট্লার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের কালে হিট্লার ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিল। এই কারণেই তিনি ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিট্লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল

অস্ট্রিয়ার পর হিট্লারের দৃষ্টি পড়িল চেকোস্লোভাকিয়ার উপর। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল ছিল জার্মান-অধ্যুষিত। হিট্লার ঐ অঞ্চলে তাঁহার 'পঞ্চম-বাহিনী' (Fifth column) অর্থাৎ অর্থভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানির সহিত সংযুক্তির এক দারুণ আন্দোলন শুরু করাইলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে হিট্লার সুদেতেন অঞ্চল (Sudetenland) জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি আরও দুই দিক হইতে

হিট্লার কর্তৃক সুদেতেন অঞ্চল দাবি

আসিল। দানিউব নদীর তীরবর্তী দশ লক্ষ ম্যাগিয়ার হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে টেশেন ('Teschen) দাবি করিল। এমতাবস্থায় হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার সীমায় সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলে চেকোস্লোভাকিয়া সরকার ফ্রান্সের সহায়তা চাহিলেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয় দেশই প্রয়োজনবোধে চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলে এক বিরাট যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিলি চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) ইওরোপে শান্তিরক্ষার্থে জার্মানির মিউনিক্‌ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লারের সহিত সুদেতেন সমস্যা সম্পর্কে আপসের আলোচনা করিলেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার (Daladiar) তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়া সরকারকে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন।* ইঙ্গ-ফরাসী এই তোষণ-নীতি হিট্‌লারের দাবি আরও বাড়াইয়া দিল। তিনি সুদেতেন অঞ্চল পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। এই অবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্থির করিল যে, জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদান করিবে। চেম্বারলেন শান্তিরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে মুসোলিনির নিকট মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মুসোলিনির চেষ্টায় হিট্‌লার, চেম্বারলেন, দালাদিয়ার ও মুসোলিনির এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিরূপণ করা হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার সরকারের কোন প্রতিনিধিকে উহাতে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। এই বৈঠকে হিট্‌লার সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এই বৈঠকের মীমাংসা-সংবলিত একটি দলিলও প্রস্তুত হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসহ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। ফলে, চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেশেন দাবিও চেকোস্লোভাকিয়াকে মানিতে হইল। দক্ষিণ দিকে ম্যাগিয়ার-অধ্যুষিত অঞ্চলটিও হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্য বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি-প্রচেষ্টা

হিট্‌লারের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা

মুসোলিনির মধ্যস্থতায় মিউনিক্‌ চুক্তি (১৯৩৮)

চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি

* "This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary 'surgical operation'." *International Relations between the two World Wars*, E. H. Carr, p. 270.

মিউনিক্ চুক্তিকে (Munich-Pact) ইঙ্গ-ফরাসী কুটনৈতিক পরাজয় ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। আর এই চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তির একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময়লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মিউনিক্ চুক্তি : ইঙ্গ-ফরাসী কুটনৈতিক পরাজয়

মিউনিক্ চুক্তি মানিয়া চলা হিট্লারের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি চেক-শাসনাধীন অবশিষ্ট প্রায় আড়াই লক্ষ জার্মানদের নিরাপত্তার অজুহাতে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট হ্যাচা (Hacha)-কে এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া তিনি হ্যাচা-কে বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া নামক প্রদেশ দুইটি, অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ, জার্মানির রক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া এইভাবে জার্মানির কবলে আসিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার

হিট্লার চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডান্জিগ্ বন্দরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অবশিষ্টাংশের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একখণ্ড জমিও (Corridor) দাবি করিলেন।

মেমেল দখল, পোল্যাণ্ড হইতে ডান্জিগ্ ও একখণ্ড সংযোজক ভূমি দাবি

হিট্লারের মিউনিক্ চুক্তি ভঙ্গ এবং তাঁহার অপরিতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে হিট্লার-তোষণ-নীতি পরিত্যাগে বাধ্য করিল। পোল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিবে স্থির হইল। পোল্যাণ্ড হিট্লারের দাবি অগ্রাহ্য করিলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

পোল্যাণ্ড কর্তৃক হিট্লারের দাবি অগ্রাহ্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

স্পেন (Spain)

স্পেন : একক-অধিনায়কত্বের উত্থান (Spain : Rise of Dictatorship) : সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে স্পেনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক ব্যাপক অরাজকতা, দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা দেখা দিল। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠিল। তদুপরি অন্যায়ভাবে করভার বণ্টনের ফলে সাধারণ শ্রেণীর লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার

স্পেনের দুরবস্থা

উপক্রম হইল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের একদেশদর্শিতা রাজনৈতিক অবস্থারও চরম অবনতি ঘটাইল।

আমেরিকার হস্তে পরাজয় (১৮৯৮)

এইরূপ অবস্থায় ক্রমেই স্পেন যখন অতিশয় দুর্বল দেশে পরিণত তখন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার হস্তে পরাজিত হইয়া আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিও স্পেন হারাইল। ১৮৯৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসর স্পেনের জাতীয় জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অরাজকতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ, পুলিশের অত্যাচার, ধর্মঘট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা লইয়া স্পেনীয়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ত্রয়োদশ আল্‌ফোন্‌সো (Alfonso XIII) তখন স্পেনের রাজা (১৮৮৬-১৯৩১)। আল্‌ফোন্‌সোর মাতা ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান রাজকন্যা, অপর দিকে, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ রমণী। এমতাবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আল্‌ফোন্‌সোর পক্ষে সহজ ছিল না। রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী স্পেনীয়গণ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। ইংলণ্ড কর্তৃক জিব্রাল্টার অধিকার করিয়া রাখা স্পেনীয়দের ইংরেজ বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ ছিল। অপরাপর অনেকে মিত্রপক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে মতানৈক্য দেখা দিলে স্পেনীয় পার্লামেন্ট (Cortes) যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। নিরপেক্ষ থাকিবার ফলে যুদ্ধরত শক্তিবর্গ নানা প্রকার যুদ্ধসামগ্রী স্পেন হইতে ক্রয় করিতে লাগিল এবং যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্পেনের রপ্তানি-বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন: অর্থনৈতিক উন্নতি

কিন্তু স্পেনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভেদ তখনও লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে দেশের শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা দিন-দিন বাড়িয়া চলিল। যুদ্ধোত্তর পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট দশটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল এবং দশটিরই পতন ঘটিয়াছিল। এই শাসনতান্ত্রিক অবস্থার মূল কারণ ছিল: (১) শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা, (২) শাসনব্যবস্থায় সামরিক নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপ, (৩) স্পেনীয় মরক্কোর বিদ্রোহ এবং (৪) বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের স্থানীয় স্বাধীনতা লাভের মনোবৃত্তি। ক্যাটালোনিয়া নামক স্থানে এই মনোবৃত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক অব্যবস্থা

ক্যাটালোনিয়াবাসিগণের স্বাধীনতা-দাবি এবং স্পেনীয় মরক্কোতে বিদ্রোহীদের হস্তে স্পেনীয় সৈন্যের পরাজয় ক্রমেই স্পেনীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতিসহ বার হাজার স্পেনীয় সৈন্য

মরক্কোর বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলে স্পেনে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। স্পেনীয় পার্লামেণ্ট মরক্কোতে স্পেনীয় সৈন্যের ব্যাপক হত্যা সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হইলে সরকার ইহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিলেন। পার্লামেণ্ট ও স্পেনের সংবাদপত্রগুলি রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করিলে সরকার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। নূতন নির্বাচনের ফলে গঠিত পার্লামেণ্ট পূর্বেকার পার্লামেণ্ট-এর ন্যায়ই সরকার-বিরোধী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ছিল। এমন সময় স্পেনে ধর্মঘট, প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি দেখা দিলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন জেনারেল প্রিমো-ডি-রিভেরা (Captain General Primo de Rivera) স্পেনের শাসনব্যবস্থা বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। আটজন জেনারেল, একজন এ্যাডমিরাল ও নিজে এই দশজন সদস্যের একটি ডিরেক্টরি তিনি স্থাপন করিলেন। রাজা আলফোনসোর অনুমতিক্রমেই এই সামরিক Coup d' etat সম্পাদন করা হইয়াছিল।

মরক্কোর বার হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ : ব্যাপক বিক্ষোভ

প্রিমো-ডি রিভেরা কর্তৃক শাসনক্ষমতা অধিকার

প্রিমো-ডি-রিভেরার একক-অধিনায়কত্ব (Dictatorship of Primo de Rivera): ১৯২৩-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিমো-ডি-রিভেরা স্পেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই তিনি স্পেনীয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির সাহায্যে বিচার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সব কিছু তিনি উঠাইয়া দিয়া এক কঠোর শাসনব্যবস্থা চালু করিলেন। সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার শাসননীতির মূল কথা ছিল: 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম' ('Country, Monarchy, Religion')। স্পেনীয় জনসাধারণ রিভেরা-প্রবর্তিত একক-অধিনায়কত্বের (Dictatorship) প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল না। তাহারা এই একক-অধিনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র উভয়েরই অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করিলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরা জনমতের সমর্থন লাভের জন্য সামরিক আইনের (Martial Law) প্রয়োগ উঠাইয়া দিলেন। তিনি সমুদ্রবাহী বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য-পোত নির্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাচীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিবিধান, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি নানা প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যেরও তিনি উৎসাহ দিলেন। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও ধর্মঘট ইত্যাদির মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হইল। ক্যাটালোনিয়াবাসীদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের বিভিন্ন শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশী সামগ্রী আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ন্যাশন্যাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী (National Advisory Assembly) নামে একটি জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন।

রিভেরার নীতি 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম'

রিভেরা সরকারের কার্যাদি

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইল। (১) ইতালির সহিত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্পেন ও ইতালির মধ্যে যে-কোন একটি তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর শক্তি সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল। (২) স্পেনকে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌সের কাউন্সিল-এ স্থায়ী সদস্যপদ না দেওয়ায় স্পেন লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। (৩) মরক্কো পরিস্থিতিও আয়ত্তাধীনে আসিল।

রিভেরার পররাষ্ট্রীয় নীতির সাফল্য

কিন্তু উপরি-উক্ত দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ হ্রাস পাইল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলন্দাজবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরই ক্যাটালোনিয়ায় এক স্বাধীন সরকার স্থাপনের চেষ্টা চলিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরাকে পদচ্যুত করিবার এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল। ইহার পর হইতে গোলন্দাজ-বাহিনীর বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, ব্যাপক অরাজকতা প্রভৃতির ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিমো-ডি-রিভেরা পদত্যাগ করিলেন।

রিভেরার পদত্যাগ

রাজা আল্‌ফোন্‌সো ও তাঁহার নবগঠিত মন্ত্রিসভা স্পেনবাসীর সমর্থন লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ন্যাশন্যাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় পার্লামেন্টের নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। রিভেরার আমলে যে-সকল অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করা হইল। কিন্তু এই সকলের ফলেও দেশে প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির উপশম হইল না। 'রাজতন্ত্রের পতন হউক!' ধ্বনি দেশের সর্বত্র উত্থিত হইতে লাগিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ রাজতন্ত্র সেনাবাহিনীর অধিকাংশের আনুগত্য, জমিদার শ্রেণীর সহায়তা, ক্যাথলিক চার্চের সহায়তা এবং প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষপাতী দলের অভ্যন্তরীণ বিভেদের দরুনই কোনক্রমে রক্ষা পাইল। কিন্তু পর বৎসর (১৯৩১ খ্রীঃ) সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ প্রায় সর্বত্রই জয়ী হইলেন। ইহা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলও প্রতিনিধি-নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিল। ফলে, প্রজাতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কিন্তু এই বৎসরই আকস্মিকভাবে রাজা আল্‌ফোন্‌সোকে বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। ফলে স্পেনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।

রাজা আল্‌ফোন্‌সো কর্তৃক জাতীয় সমর্থন লাভের চেষ্টা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রাধান্য : আল্‌ফোন্‌সোর পদত্যাগ

নূতন অস্থায়ী সরকার (Provisional Govt.) ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সংবিধান সভার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চার্চের সংস্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দেশে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নূতন সরকারকে শাসন-পরিচালনার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্র-বিরোধী রাজতন্ত্রী দল এবং কমিউনিস্ট্‌গণ অরাজকতার সৃষ্টি করিতে চাহিলে সরকার

অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপ

বলপূর্বক ইহাদের দমন করিলেন। অপর দিকে ক্যাটালোনিয়াবাসীদিগকে জাতীয় ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে এইরূপ কোন কিছু না করিতে অনুরোধ জানান হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেই সংবিধান-সভা তথা পার্লামেন্টের নির্বাচন হইল। রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্ প্রভৃতি পাঁচিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন এবং রাজতান্ত্রিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

সংবিধান-সভার নির্বাচনে রাজতন্ত্রের পরাজয়

অস্থায়ী সরকারের পরিচালক নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora) স্পেনের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, সরকারী ব্যয়-সঙ্কোচ, সরকারী কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ধর্মবিষয়ে স্পেনীয় সংবিধান-সভা জেসুইট্ যাজকদের বহিষ্কার, রাষ্ট্রীয় ধর্মের (State religion) অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, এই নীতির অবসান করিলে জামোরা প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর ম্যানুয়েল আজানা (Manuel Azana) প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন। পার্লামেন্ট ভূতপূর্ব রাজা আলফোন্সোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল এবং তাঁহার স্পেনে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি, শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইল। ক্ষতিপূরণ দান করিয়া যে-কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে, এই নীতি গ্রহণ করা হইল। সমাজের ব্যক্তি-মাত্রেরই শ্রম অবশ্যকরণীয়, এই ধারণার সৃষ্টি করা হইল। শ্রমিক, কৃষক, মৎস্যজীবী সকলকেই রাষ্ট্র রক্ষা করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে স্পেন ক্রমেই এক সমাজ-তান্ত্রিক দেশে পরিণত হইতে চলিল। স্পেনীয় সংবিধান-সভা নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora)-কে পুনরায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিল। ম্যানুয়েল আজানা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান-সভা-ই স্পেনের পার্লামেন্টে পরিণত হইল। স্পেনীয় পার্লামেন্টের সাধারণ পরিদর্শনাধীনে ক্যাটালোনিয়াকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা এবং নিজস্ব প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইল

সংবিধান-সভার কার্যাদি

স্পেনের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকিলেও রাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্, ফ্যাসিস্ট্ প্রভৃতি বিভিন্ন দল সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র শুরু করিতে নিরস্ত হইল না। ক্যাটালোনিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং বাস্ক্ প্রদেশ স্পেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করিল। স্পেনীয় সরকার সামরিক সাহায্যে বহু রক্তপাতের এবং অর্থব্যয়ের ফলে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইলেন। ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনাধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এই

১৯৩৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থা

সময়ে আলেজান্ড্রো লেরোক্স (Alejandro Lerroux) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার দুর্বলতা এবং মন্ত্রিগণের ঘন ঘন পরিবর্তন কোন স্থায়ী শাসননীতি গ্রহণের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট জামোরা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন (১৯৩৫) এবং এক নূতন সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিলেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সাধারণ নির্বাচন

নূতন পার্লামেণ্টে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। আজানা এই বামপন্থীদের সম্মিলিত দলের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হইলেন। আজানা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং ক্যাটালোনিয়ায় স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সত্তর হাজার কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া হইল। কিন্তু অবশিষ্ট কৃষকগণ আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে রাজী হইল না। তাহারা বলপূর্বক জমিদারের ভূ-সম্পত্তি দখল করিতে লাগিল। উগ্র বামপন্থিগণ রাজতান্ত্রিকদের সম্পত্তি, চার্চ, কনভেণ্ট প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট জামোরাকে বামপন্থী-বিরোধী মনোভাবের জন্য অপসারণ করা হইল। আজানা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন আর ক্যাসারে কুইরোগা (Casares Quiroga) প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই (১৯৩৬) স্পেনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এক দারুণ বিদ্বেষ দেখা দিল। বামপন্থী সরকার পক্ষ ফ্যাসিস্টবাদে বিশ্বাসী অনেককে কয়েদ করিলেন। ক্রমে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজনীতিতে কোনপ্রকার অংশগ্রহণকারী সামরিক কর্মচারিগণকে সরকার অবসর গ্রহণে বাধ্য করিলেন। ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী যাঁহারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল নতুবা কোন দূরবর্তী স্থানে বদলি করা হইল। জেনারেল ফ্রাংকোকে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হইল। জুলাই মাসের ১২ই তারিখে মাদ্রিদের একজন পুলিশ সার্জেণ্ট—যোসিডেল ক্যাস্টিলো (Josedel Castillo)-কে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারের উপর আরোপ করা হইলে ১৭ই জুলাই মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে স্পেনে এক দীর্ঘ অন্তর্যুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) সূচনা হয়। জেনারেল ফ্রাংকো ক্যানারী দ্বীপ হইতে মরক্কোয় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

নূতন পার্লামেণ্টে বামপন্থীদের প্রাধান্য : জামোরার অপসারণ

আজানা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত : ক্যাসারে কুইরোগা প্রধানমন্ত্রী

ক্যাস্টিলোর হত্যা

মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় বাহিনীর বিদ্রোহ

স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট দেশগুলি স্পেনীয় সরকারকে সহায়তা দান করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল। উভয় পক্ষই কোনপ্রকার সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল না। জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনি ফ্রাংকোকে সাহায্য-সহায়তা দানে ত্রুটি করিলেন না। ১৯৩৯

জেনারেল ফ্রাংকোর সাফল্য

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট আজানা পদত্যাগ করিলেন। ফ্রাঙ্কো স্পেনের শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। হিট্‌লার ও মুসোলিনির সম-পর্যায়ে একটি একক-অধিনায়কত্ব স্পেনেও স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War II): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সম্মেলন প্রকৃত শান্তি না আনিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধবিরতি সাধন করিয়াছিল। পরবর্তী কুড়ি বৎসর সেই হেতু শান্তির যুগ অপেক্ষা যুদ্ধবিরতির যুগ হিসাবেই বিবেচ্য। এই কয়েক বৎসরে পৃথিবীর তথা ইওরোপীয় ঘটনাবলী এক অধিকতর সর্বনাশাত্মক যুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে আগাইয়া দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতের উপশম হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইল। অচিরে অগণিত নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ ও সৈনিকের রক্তে পৃথিবী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধের বীভৎসতার দ্বিতীয় পরিচয় লাভ করিল।

১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ যুদ্ধবিরতির যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানির ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ দলের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী লোক-অধ্যুষিত স্থান জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা, ইওরোপের উপর একক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ইওরোপকে এবং ক্রমে সমগ্র পৃথিবীকে জার্মানির এক বিশাল উপনিবেশে পরিণত করা* এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করা ছিল সোশিয়েলিস্ট্ তথা নাৎসী সরকারের উদ্দেশ্য। ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তিতে জার্মানিকে চিরকালের মত হৃতমর্যাদা ও দুর্বল করিয়া রাখিবার ইচ্ছা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর অংশের সংযোগ নাশ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্মানি কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের নীতির বিরোধিতা করিয়া জার্মানির ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তদুপরি ষোড়শ শতাব্দী হইতে সামরিক শক্তি হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান রাষ্ট্রের নৌবল ও সৈন্যবল অত্যধিকভাবে হ্রাস করিয়া জার্মানির জাতীয় মর্যাদায় যে-আঘাত হানা হইয়াছিল, তাহা জার্মান জাতির পক্ষে দীর্ঘকাল মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। পদানত, পরাজিত জার্মানির উপর মিত্রশক্তিবর্গ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতে এই শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি জার্মান জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

জার্মানির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

*..."He planned to turn the world into a German Colony.', *Hitler's Second Book* (Vide, a news item from Munich published in the A. B. Patrika, Mrch 18, 1961).

ইহা ভিন্ন, যুদ্ধোত্তর কালে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক মোতায়েন সৈন্য কর্তৃক জার্মান সাধারণের প্রতি রূঢ় আচরণ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানিতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, উহার প্রতি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহানুভূতির অভাব জার্মানির গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার কোন সুযোগ দান করে নাই। ফলে, জার্মানিতে একক প্রাধান্যের উদ্ভব ঘটিয়া জার্মান জাতি ক্রমেই এক অনমনীয়, উদ্ধত এবং সর্বাত্মক প্রাধান্যের নীতি অনুসরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতার সুযোগে একক-অধিনায়কত্বের উদ্ভব ও সর্বাত্মক প্রাধান্য নীতির অনুসরণ

দ্বিতীয়ত, জার্মানি যখন নাৎসী দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিতে শুরু করিয়াছিল, সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের দুর্বলতা প্রদর্শন নাৎসী নেতার সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি রাইন নদীর তীরবর্তী নিরপেক্ষ অঞ্চল দখল করে, কিন্তু ইহার কোন প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে দেখা যায় নাই। ইহা ভিন্ন, জাপানের সহিত জার্মানির কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর এবং জার্মানির সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স কতকটা প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিল। ইহাও জার্মানির প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের তোষণমূলক নীতি অনুসরণের অন্যতম যুক্তি হিসাবে বিবেচ্য। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, মিউনিক্ চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক দখলের স্বীকৃতি, জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার, মেমেল বন্দর দখল প্রভৃতি স্বীকৃতি জার্মানির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণেরই ফলস্বরূপ। জার্মানি ভিন্ন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) জয় প্রভৃতিও ঐ একই নীতির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব্-ন্যাশনস্-এর দুর্বলতা লীগের প্রভাবশালী সদস্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি, জাপান ও ইতালি তোষণেরই ফল, বলা বাহুল্য। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে ব্রিটেন বা ফ্রান্স দণ্ডায়মান না হইবার ফলেও হিট্‌লার ও মুসোলিনির একক-অধিনায়কত্ব-নীতি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। গণতন্ত্রের এই নৈতিক পরাজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জার্মানি-জাপান কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি (Anti-Comintern Pact) ইতালি গ্রহণ করিলে জার্মানি-জাপান-ইতালি অক্ষ-শক্তি (Axis Powers) চুক্তি সম্পূর্ণ হয়। বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গের মৈত্রী একক প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদী

জার্মানি, ইতালি, জাপান তোষণ: ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতা

বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গ

নীতিরই বাহ্য প্রকাশ, বলা বাহুল্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে যখন জার্মানি ডানজিগ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিল, তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনমতের চাপে এবং জার্মানির রাজ্যলিপ্সা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধাদানে কৃতসংকল্প হইল। পক্ষান্তরে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির যুদ্ধ শুরু করিবার পথে শেষ বাধা দূরীভূত হইল এবং জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, পোল্যাণ্ড আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক-অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্রের পরস্পর আদর্শগত দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর প্রধান শক্তিবর্গ তখন এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানি, ইতালি, জাপান, অক্ষ-শক্তিবর্গ একক-অধিনায়কত্ব, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের ধারক ছিল, আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অন্যরূপ। গণতন্ত্র ও একক-অধিনায়কত্ব উভয়ই ছিল সাম্যবাদের শত্রু। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যে-শত্রু হইতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে উহার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে কিছুকাল যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শেষে একক-অধিনায়কত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষেও রুশ সাহায্য তখন প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত গণতন্ত্র ও একক-অধিনায়কত্বের আদর্শগত দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচ্য। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বই ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

একক-অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

চতুর্থত, জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল এবং সেই সূত্রে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ লীগের দুর্বলতা সর্বসমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। অনুরূপ, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল এবং তাহা প্রতিহত করিতে লীগের অকর্মণ্যতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অপরাপর শক্তিবর্গের দুর্বলতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া জার্মানি-ইতালি-জাপানের ঔদ্ধত্য এবং আত্মপ্রত্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল দেশে নিজ শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা তাহাদিগকে স্বভাবতই যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপান ও ইতালি কর্তৃক যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা

পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন কারণ জার্মানির নেতা হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস নীতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (ক) ভার্সাই-এর সন্ধির সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করিয়া হিট্‌লার অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তথা অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এ-বিষয়ে নির্লিপ্ততা হিট্‌লারের ঔদ্ধত্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি করিল। মুসোলিনি জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাসের প্রতিবাদ করিলেন না, কারণ তিনি আবিসিনিয়া দখলে হিট্‌লারের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস নীতি : যুদ্ধের আসন্ন কারণ
(ক) অস্ট্রিয়া দখল

(খ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দাবি করিলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল জার্মান জাতির লোক। ঐ বৎসর মিউনিক্ চুক্তি (Munich Pact) দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি সুদেতেন অঞ্চল জার্মানিকে দান করিতে চেকোস্লোভাকিয়াকে সম্মত করাইল। জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার রক্ষার্থে অগ্রসর হইতে রাজী ছিল। কিন্তু মিউনিক্ চুক্তিতে ইঙ্গ-ফরাসীর জার্মান-তোষণ নীতিতে রাশিয়া স্বভাবতই সন্দিহান হইয়া উঠে। (গ) সুদেতেন অঞ্চল দখলের ছয় মাসের মধ্যেই হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশের উপরও আধিপত্য বিস্তার করেন। এইভাবে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতার সুযোগে হিট্‌লারের রাজ্যলিপ্সা দিন-দিনই বাড়িয়া চলে। তিনি লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। (ঘ) তিনি পোল্যাণ্ডের ডান্‌জিগ্ বন্দরটি এবং পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অন্য অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একখণ্ড সংযোগভূমি (corridor) দাবি করেন।

(খ) মিউনিক্ চুক্তি —সুদেতেন অঞ্চল

(গ) চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার, লিথুয়ানিয়া হইতে মেমেল দখল

(ঘ) পোল্যাণ্ড হইতে ডান্‌জিগ্ ও সংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি

এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একটি আত্মরক্ষা-মূলক পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করে। মিউনিক্ চুক্তির সময় হইতে সন্দিগ্ধ রাশিয়া ঐ সময়ে জার্মানির সহিত এক 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করে। জার্মানির পক্ষে এই চুক্তি যেমন কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক, অপরপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র-পক্ষের দিক হইতে ইহা ছিল তেমনি এক চরম কূটনৈতিক পরাজয়।

ইঙ্গ-ফরাসী-পোল চুক্তি রুশ-জার্মান 'অনাক্রমণ চুক্তি'

এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানি পোল্যাণ্ডের উপর দাবি পূরণের জন্য চাপ দেয়। পোল্যাণ্ড এই সকল দাবি পূরণে অস্বীকৃত হইলে হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ : ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

ইওরোপ ১৯৩৯
জার্মানি ও জার্মান মিত্রশক্তিবর্গ
মিত্রশক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি)
মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক সংরক্ষিত অঞ্চল
রাশিয়া
ফিনল্যান্ড
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
সুইডেন
নরওয়ে
ডেনমার্ক
গ্রেট ব্রিটেন
হল্যান্ড
জার্মানি
পোল্যান্ড
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
যুগোস্লাভিয়া
ফ্রান্স
স্পেন
পর্তুগাল
তুরস্ক
আলজিরিয়া
টিউনিসিয়া
মরক্কো

জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বটে, কিন্তু এই আক্রমণ যদি কেবল পোল্যাণ্ড জয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিত, তাহা হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ দেশ। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। পোল্যাণ্ড লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তি অমান্য করিয়া চলিয়াছিল। এই সকল কারণে জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অসন্তুষ্টির কারণ হইত না, কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণ হিট্লারের অপরিতৃপ্ত রাজ্যগ্রাস-স্পৃহার অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এই রাজ্যগ্রাস নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়াই ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত একযোগে জার্মানিকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইবার কারণ

অধ্যায় ২৩

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

(Science, Literature & Culture in the late 19th and early 20th Centuries)

বিজ্ঞান (Science) ঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে ঊনিবিংশ শতকে বিজ্ঞান অনেকটা উপযোগধর্মী (utilitarian) হইয়া উঠিয়াছিল। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা সবই মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহার যাহাতে করা যায় সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

উপযোগধর্মী বৈজ্ঞানিক গবেষণা

পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) ঃ পদার্থবিজ্ঞানীরা শিল্পের প্রয়োজন ও সমস্যা মিটাইবার উদ্দেশ্যে থারমোডায়নামিক্স (Thermodynamics), অপটিক্স, ম্যাগ্নেটিজম্ ও ইলেক্ট্রিসিটি বিষয়গুলির উপর গবেষণা শুরু করেন। থারমো-ডায়নামিক্স অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করিয়া যন্ত্র চালাইবার পদ্ধতির উপর দুইজন ইংরেজ জেমস্ জোল এবং উইলিয়ম টম্সনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। জার্মান অধ্যাপক হেল্ম্হোলৎস্ (Helmholtz), জেমস্ ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরাও থারমোডায়নামিক্স গবেষণার দ্বারা তাপ ব্যবহার করিয়া যন্ত্র চালাইবার পন্থা আবিষ্কার করেন।

থারমোডায়নামিক্স

অপ্টিকস্ (Optics) বা দৃষ্টি ও আলোকবিদ্যার ব্যাপারে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অধীনে কর্মরত জনৈক ফরাসী এঞ্জিনীয়ার আলোকের গতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশ করেন। অপর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী জীন ফোকল্ট্ (Jean Foucault) এই মতবাদের উপর গবেষণা করিয়া আলোর গতি সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশ করেন। এই সূত্রেই ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে চশমা, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ এবং অন্যান্য নানা প্রকার গবেষণা যন্ত্রের কাচ প্রস্তুতের সফল গবেষণা সাধারণ মানুষের চশমার প্রয়োজন যেমন মিটাইয়াছিল, তেমনি রাসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল।

আলোক-বিজ্ঞান

বিভিন্ন প্রয়োজনের কাচের আবিষ্কার

ঊনবিংশ শতকের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিদ্যুতের আবিষ্কার। ফ্রাঙ্কলিন, গ্যালভানি ও ভোল্টা অষ্টাদশ শতকে

বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণা যতদূর আগাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর এম্‌পিয়ার, ওহ্‌ম এবং মাইকেল ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার করিবার সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিল।

বিদ্যুতের আবিষ্কার শিল্পোন্নয়নের সহায়ক

ঊনবিংশ শতকের নবম দশকে হাইন্‌রিক হার্টজ, ম্যাক্সওয়েলের গবেষণার উপর অনেকটা অগ্রসর হইলে মার্কোনি ওয়ারলেস অর্থাৎ বেতার টেলিগ্রাফ্‌ আবিষ্কার করেন। ১৮৯০-এর পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে যোসেফ্‌ টম্‌সন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হেণ্ডিক্‌ লোরেঞ্জ কর্তৃক বিদ্যুৎ পরমাণু (Electronics), পরমাণু (Atoms) এবং অণু (Molecules) প্রভৃতি সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

ইলেক্‌ট্রনিক্স, এটমস্‌, মলিকিউলস্‌

প্রায় ঐ সময়েই (১৮৯৫) জার্মান বিজ্ঞানী রঞ্জন (Rontgen) রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স্‌রে আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর মানুষের যেমন উপকার করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর ফ্রাসী বিজ্ঞানী পিয়েরি কুরী ও তাঁহার স্ত্রী মাদাম কুরী রেডিয়াম (radium) আবিষ্কার করেন এবং উভয়ে মিলিতভাবে তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) সংক্রান্ত এক নূতন বিজ্ঞান শাখা আবিষ্কার করেন।

রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কার (১৮৯৫)

রেডিয়াম আবিষ্কার (১৮৯৮)

রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)ঃ পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব যেমন নূতন নূতন আবিষ্কারের উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি ঊনবিংশ শতকে রসায়নশাস্ত্রকেও উৎসাসিত করিয়াছিল। জন ডেল্‌টন নামে মানচেস্টারের জনৈক স্কুল শিক্ষক পরমাণু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হন। প্রাচীনকালে গ্রীকরা এবং পরবর্তী কালেও অনেকে পরমাণু সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেল্‌টন প্রথম প্রমাণ করেন যে, দ্রব্যমাত্রই পরমাণু দ্বারা গঠিত। ইতালীয় বিজ্ঞানী কাউণ্ট আভোগেড্রো 'অণু' (molecules) আবিষ্কার করেন। মাইকেল ফেরাডে, লোরেঞ্জ্‌, যোসেফ্‌ টম্‌সন প্রমাণ করিলেন যে, প্রত্যেক পরমাণু-ই বৈদ্যুতিক অণু (electrons) দ্বারা গঠিত।

'এটম' বা পরমাণু

অণু (Molecules)

ঊনবিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক আবিষ্কার হইল কৃত্রিম উপায়ে জৈব রাসায়নিক বস্তু যেমন ইউরিয়া প্রস্তুতের উপায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল মানুষের বা জন্তুর শরীর হইতে ইউরিয়া নির্গত হয়, সেই কারণে কৃত্রিম উপায়ে সেই জৈব পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইউরিয়ার আবিষ্কারে সেই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

জৈব রসায়ন

রসায়নশাস্ত্র ঊনবিংশ শতকে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রেও নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়া শিল্পের নানা ক্ষেত্রে এক অভুতপূর্ব উন্নতি আনিয়াছিল। সুতা রং করা,

বস্ত্রাদিকে সাদা করা, পেট্রোলকে পরিশোধন করা, রবারের বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রের অবদান বিস্ময়কর। রাসায়নিক গবেষণা কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যার পরিপূরক হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে নাই, জীবন বিজ্ঞান, ঔষধ প্রস্তুত, শল্য চিকিৎসা নানা ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ক্রমে এঞ্জিনীয়ারিং-এর এক নূতন শাখা হিসাবে উদ্ভূত হয়।

রসায়নশাস্ত্রের গবেষণার গুরুত্ব নানা ক্ষেত্রে

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগের পূর্বাবধি যে-সব বিজ্ঞানকে অংক, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যাইত না, সেগুলিকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী, জীব ও উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দিকে উদ্ভিদ্-বিদ্যা (Botany), প্রাণি-বিদ্যা (Zoology), ভু-বিদ্যা (Geology), খনিজ-বিদ্যা (Mineralogy) প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে ফরাসী বিজ্ঞানী জন্ বেপ্‌টিস্ট দ্য লামার্ক, জার্মান বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফন্ হাম্‌বল্ট্ এবং সুইস বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান

ভু-বিদ্যাকে পৃথক একটি বিজ্ঞানে উন্নীত করিবার ক্ষেত্রে স্কটীশ বিজ্ঞানী চার্লস্ লায়েলের অবদান সর্বাধিক। তিনি পৃথিবীর ভু-প্রকৃতি, আগ্নেয়গিরির কারণ, নদী শুষ্ক হইয়া যাইবার কারণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। ভু-বিদ্যার ক্ষেত্রে লায়েলের আবিষ্কারের সহিত জীবাশ্ম (fossils) সংক্রান্ত বিজ্ঞান যুক্ত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্ম হইতে পৃথিবীর মাটির গঠন ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জীবাশ্ম-বিজ্ঞান (Palaeontology) নামে এক নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানী আগাসিজ-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের সূত্রেই প্রাচীন মানুষের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস, আদিম মানুষের দেহসৌষ্ঠব প্রভৃতি ইহার ফলেই জানা গিয়াছে। 'নিয়ানডারথাল' (Neanderthal), 'ক্রোম্যাগনন' জাতির লোকের বসবাসের বিস্তৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হইয়াছে।

ভু-বিদ্যা (Geology)

জীবাশ্ম-বিজ্ঞান (Palaeontology)

উদ্ভিদ্-বিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় স্থাপন করেন জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রিড্ ট্রেভিরেনাস। তিনি এ-কথা সর্বপ্রথম বলেন যে, 'জুফাইটস্' (Zoophytes) অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জাতীয় এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী হইতে ক্রমবিবর্তনের ফলে উন্নত ধরনের জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই বিবর্তন পারিপার্শ্বিক ভু-প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে উদ্ভিদ্-বিদ্যার উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে হইতে থাকে।

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

থিয়োডোর সোয়ান অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ-কথা প্রমাণ করেন যে,

প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিবর্তন নির্ভর করে জীবকোষের উপর। এই জীবকোষ বা Cell-দ্বারাই প্রাণ আছে এরূপ সব কিছুরই শরীর গঠিত। এই জীবকোষ-মতবাদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরবর্তী গবেষণার ফলে জীবকোষের মূল উপাদান হইল প্রোটোপ্লাজম্, এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

জীবকোষ মতবাদ (Cell Theory)

চার্লস্ ডারউইন (Charles Darwin) : প্রকৃতি-বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ইয়েল এবং মেলথাস্-এর মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া এবং ওয়ালেস নামে জনৈক ইংরেজ বিজ্ঞানীর চিন্তাধারার সহিত নিজ মতবাদের মিল দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিখ্যাত ক্রমবিবর্তনের (Evolution) মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতবাদের মূল কথাই হইল এই যে, প্রাণিজগতে ক্রমবিবর্তনের ফলে আজকের উন্নত ধরনের জীব, মানুষের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহার মূল কারণ হইল, একই জাতির প্রাণীর মধ্যে একটি শাখার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যাহার ফলে সেই শাখার প্রাণীরাই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সুযোগ সর্বাধিক গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী কালে আরও উন্নত বংশধর সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারে। যাহাদের এই বৈশিষ্ট্য থাকে না, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া যায় বা নিঃশেষ হইয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতি প্রাণীদের কোন্ শাখা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিবে তাহা স্থির করিয়া দেয় প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনই ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদ নামে প্রতিষ্ঠিত।

ক্রমবিবর্তনের মতবাদ

প্রাকৃতিক নির্বাচন

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চার্লস্ ডারউইনের বা ওয়ালেসের অনেক পূর্বেই লামার্ক এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিয়াছিলেন। চার্লস্ ডারউইনের দুইজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন টমাস হাক্সলে এবং জার্মানির আর্ণস্ট হেকেল। হাক্সলে ডারউইনের মতবাদের সমর্থন করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলেই অতি নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এই মতবাদ জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। হেকেল আরও একধাপ আগাইয়া গিয়া মানুষ সামান্য প্রাণকোষ (Protoplasm) হইতে কিভাবে ২৬টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া প্রকৃত মানুষে পরিণত হইয়াছে সেই বংশানুক্রমিক তালিকা (Genealogical Tree) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

হাক্সলে ও হেকেল

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চার্লস্ ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদ সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিংশ শতকে বহু জীব-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন জীব-শ্রেণীর উৎপত্তি এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ক্রমবিবর্তনের মতবাদ এখনও সুস্পষ্ট নহে বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন। মেণ্ডেলের বংশ-পরম্পরায়

ডারউইনের মতবাদের অস্পষ্টতা

বৈশিষ্ট্যের তারতম্য মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস মরগ্যান বংশানুক্রমের অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান জীন (Gene) বা ক্রমোসোম (Chromosome)-এর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাণীর জীন বিভিন্ন সংখ্যক। মানুষের জীনের সংখ্যা ২৪। এই সব জীনের সম্ভাব্য সকল রকম বিনিময় বা বিন্যাসের (Permutation-combination-এর) ফলে মানুষের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এই কারণে সম্পূর্ণ একই রূপ বা একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুই ব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই না।

'জীন' (Gene) প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণ

ক্রমবিবর্তনের মতবাদ সমাজ-বিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় প্রযুক্ত হয়। ফলে প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান এক-একটি বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঊনবিংশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস, রোম, মিশর, মেসোপটামিয়া, প্যালেস্টাইন, ভারতবর্ষ, গ্রীস, ক্রীট, কার্থেজ, মেক্সিকো প্রভৃতির প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা সম্ভব হয়। লায়েলের ভু-বিদ্যা এবং ডারউইনের প্রাণী-জগতের ক্রমবিবর্তনের মতবাদ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সার্থকভাবে কাজে লাগাইয়াছিলেন। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ক্রমবিবর্তনের মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সহজ হইয়াছিল। এইভাবে প্রত্নতত্ত্ব মানুষের প্রাচীনত্ব এবং নৃতত্ত্ব মানুষের আদিম অবস্থা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান সংগ্রহ ও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্রমবিবর্তনের মতবাদ সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে সহায়ক

ডারউইনের বিবর্তনের মতবাদকে কাজে লাগাইয়া তাঁহারই সম্পর্কিত ভ্রাতা ফ্রান্সিস গ্যালটন বংশানুক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূত্র (Doctrine of Heridity) প্রচার করেন। তাঁহার গবেষণার ফলশ্রুতি ছিল প্রজননতত্ত্ব (ugenics) বিজ্ঞানের জন্ম। গ্যালটন বুদ্ধিমান ও যোগ্যতাসম্পন্ন (Intelligent and Fit) মানুষের বংশ-বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিহীন ও অযোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়া মানব সমাজকে ক্রমেই উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া চলিবে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে অতি-মানব বা শ্রেষ্ঠ মানবে রূপান্তরিত করা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

গ্যালটনের প্রজননতত্ত্ব —বিবর্তন মতবাদের উপর নির্ভরশীল

ক্রমবিবর্তন মতবাদ যখন মানুষ ক্ষুদ্রতম জীবকোষ (Protoplasm) হইতে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই 'মানুষ ভগবান-সৃষ্ট' এই ধর্মমত অনেকেই আর বিশ্বাস করিলেন না। হাক্সলে ও হেকেলের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ফলে জড়বাদের (materialism) প্রাধান্য দেখা দিল। হারবার্ট স্পেনসার তাঁহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সুস্পষ্টভাবেই বলিলেন যে, জৈব-ই হউক আর অ-জৈবই হউক সবই বিবর্তনের ফলস্বরূপ। স্পেনসার মানব-সমাজ জীবদেহের মতই বিবর্তনশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবে বিবর্তনের মতবাদ সমাজ ও সমাজবিদ্যা (Society & Social Science) উভয়ের উপরই প্রযুক্ত হইতে থাকে। কোথ্ (Comte) সমাজবিদ্যাকে প্রকৃতিবিদ্যার-ই অন্যতম বলিয়াছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই

জড়বাদে বিবর্তনের মতবাদের প্রভাব

প্রকৃতিবিদ্যা যেমন বিবর্তনধর্মী তেমনি সমাজকেও বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল বলিয়াছেন।

সিগ্‌মাণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud): ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে আরও একটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। ইহা হইল মনোবিজ্ঞান (Psychology)। আইভান পাব্‌লভ নামে একজন রুশ বিজ্ঞানী পশু এবং মানুষ উভয়েরই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া আচরণ-মতবাদ (Behaviourism) প্রচার করেন। তাঁহার মতে বাহির হইতে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার কিছু বোঝা সম্ভব নহে। কিরূপ পরিস্থিতি অথবা কিরূপ উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষ কিরূপ ব্যবহার করে, তাহাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আচরণ-মতবাদের সবটাই গ্রহণ না করিলেও শিশুদের মানসিকতা, কার কি বিষয়ে অধিক প্রবণতা আছে, এই সব বুঝিবার ক্ষেত্রে এই মতবাদের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে।

আচরণ-মতবাদ (Behaviourism)

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনেন সিগ্‌মাণ্ড ফ্রয়েড নামে একজন অস্ট্রীয় ইহুদি। চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়া শেষ করিয়া তিনি স্নায়ু-চিকিৎসার খ্যাতি অর্জন করেন এবং মনোবিশ্লেষণের (Psycho-analysis) মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করিতে থাকেন। তাঁহার মতে আমাদের অতি সাধারণ ব্যবহার, ভুল-ত্রুটি বা আমাদের সর্বাধিক প্রিয় বা মূল্যবান আদর্শ সব কিছুই আমাদের সহজাত প্রকৃতির ফল। এই সহজাত প্রকৃতি (instinct) আমাদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এই সহজাত প্রকৃতি যদি কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা উহার কোন বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে আমরা মানসিক রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ি। ফ্রয়েডের মতে আমাদের সচেতন মনের পশ্চাতে একটি অচেতন মন আছে। এই অচেতন (unconscious) মনের প্রভাব আমাদের সচেতন (conscious) মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহা ভিন্ন, আমাদের মনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এই সকল প্রভাবের মধ্যে দমনের (repression) ফল, অর্থাৎ কোন কিছুর স্বাভাবিক প্রসার যদি দমিত হয়, তাহা হইলে সেই মানসিক দ্বন্দ্ব নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যৌন প্রবৃত্তি দেখা দেয়। মনোবিশ্লেষণের অর্থাৎ অতি বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে যদি মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনের বিস্মৃত ঘটনাগুলিকে জাগাইয়া তোলা যায়, তাহা হইলে তাহার মনের মধ্যে কি বা কোন্ প্রভাব ও প্রবৃত্তিটি দমিত হইয়া আছে, তাহা বিশ্লেষিত হইতে পারে। এইভাবে তাহার মনের রোগ দূর করা সম্ভব।

ফ্রয়েডের মতবাদ

মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মানসিক রোগের চিকিৎসা

বিংশ শতকে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্রমে তাঁহার মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) কেবলমাত্র জীবিত মানুষই নহে, মৃত ব্যক্তিদের জাতি, সমাজ সব কিছুর চিন্তাধারা বা কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা চলে।

ফ্রয়েডের অবদান

কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে মতান্তর শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রয়েডের মতবাদের অন্ধ, অনঢ় চরিত্রের কতকটা পরিবর্তন করিয়া মনোবিশ্লেষণ শুরু হয়। তথাপি বর্তমান কালের মনোরোগ চিকিৎসাবিদ্যা, সামাজিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা ফ্রয়েডের নিকট ঋণী, এ-কথা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতকে বিজ্ঞানের বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি (Revolutionary Development of Science in the 20th Century) : বিংশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics) ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য, পদার্থ বিজ্ঞানে পরিবর্তন রসায়ন, শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা সব-কিছুকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছিল।

পদার্থ-বিজ্ঞানে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন

পদার্থ-বিজ্ঞানের বিপ্লবের তিনটি কারণ ছিল। ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর 'কোয়ান্টাম থিওরী' (Quantum Theory), এলবার্ট আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতা সূত্র' (Principle of Relativity) এবং সার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ও নীলস্ বোহ্র (Neals Bohr)-এর পরমাণুর গঠন ও কাজ —এই তিনটি মৌলিক গবেষণা পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লব আনিয়াছিল। পূর্বেকার বহু কিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র এখন আর প্রচলিত ছিল না। কারণ সেগুলির পরিবর্তে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত হইয়াছিল। এর ফলে পদার্থবিদ্যায় যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রভেদ অনেকটা দূর করিয়া অন্যান্য বিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

তিনটি কারণ ঃ কোয়ান্টাম মতবাদ, পারমাণবিক গবেষণা, আপেক্ষিকতার মতবাদ ঃ প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, রাদার-ফোর্ড, নীলস্ বোহ্র

শিল্প ও সাহিত্য (Art & Literature) : বিংশ শতকের চতুর্থ দশক হইতে ইওরোপের রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে এক মোহভঙ্গের যুগ শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে ঊনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের কিছুকাল অবধি যে উদার, জ্ঞানদীপ্ত (enlightened) সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে যেন এক মোহ-মুক্তি ঘটিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাজের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ব্যক্তি তখন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কৃষিশিল্পে এক অতি ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হইল। ব্যক্তি এখন বৃহৎ শিল্প-ব্যবস্থার ব্যাপক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় বিরাট লোকসংখ্যার এক অতি নগণ্য অংশমাত্র। বসবাস, চলাফেরা সর্বত্রই ব্যক্তি এখন সমষ্টির মধ্যে লীন। সমষ্টির জন্য ছকে বাঁধা শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমষ্টির জন্য প্রচারিত সাংবাদিকতা এবং সমষ্টির জন্য আয়োজিত ক্রীড়া বা আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থায় সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি এখন সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট।

সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির বিলোপ

মোহ-মুক্তি কেবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা সব কিছুর বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। একনায়কত্বই তখনকার রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই একনায়কত্ব রুশ কমিউনিস্ট ব্যবস্থা, ইতালি বা জার্মানির ফ্যাসিবাদে দেখা দিয়াছিল। এই একনায়কত্ব অষ্টাদশ শতকের প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের সমগোত্রীয় ছিল বলা যাইতে পারে।

ব্যাপক মোহ-মুক্তি : গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা : রুশ কমিউনিজম্, ইতালীয় জার্মান ফ্যাসিবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে যে-অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির পক্ষে ভোগ করিবার আর সুযোগ রহিল না। কমিউনিস্ট রাশিয়া ও ফ্যাসিস্ট ইতালি এবং জার্মানির ব্যক্তি-স্বাধীনতা সীমিত হইয়া পড়িল। যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার, পুলিশী নজর, দেশের বাহিরে যাওয়া বা বাহির হইতে কাহারো আসার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, ইহা ভিন্ন, সেমিটিক জাতির (ইহুদি) উপর অত্যাচার সব কিছু ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভীষণভাবে সঙ্কুচিত করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিলোপ : ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কোচন

একনায়কত্বের অধীনে শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা অবশ্য পূর্ববৎ চলিতেছিল। কিন্তু এই শিক্ষার ফলে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় নাই। ইওরোপের সর্বাধিক স্বল্প-শিক্ষিত রুশেরা যেমন কমিউনিস্ট যৌথ একনায়কত্ব মানিয়া লইয়াছিল, তেমনি ইওরোপের সর্বাধিক শিক্ষিত জার্মান জাতি হিট্‌লারের একনায়কত্ব নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছিল।

শিক্ষার ফলেও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভাব

সুতরাং ইহা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভরশীল গণতন্ত্রের ক্রম-অবসান, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কোচন, শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে বুদ্ধি-সম্পন্ন, সমালোচক মনোবৃত্তি সৃষ্টির অক্ষমতা, আন্তর্জাতিকতার উপর জাতীয় স্বার্থের স্থান এবং জাতীয় স্বার্থের উল্লেখ করিয়া একনায়কত্বকে সুদৃঢ় করা, এই সবই ছিল নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য।

নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য

নূতন যুগের নূতন ধারণা শিল্পকলা ও সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পাইল। চিত্রকলার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ছিল সেই সময়কার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে পূর্বেকার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির—বাস্তবকে রূপদান (Impressionism)—স্থলে এক নূতন বিপ্লবী শিল্পরীতির উৎপত্তি ঘটিল। এই নূতন শিল্পধারা প্রাচীন শিল্প আদর্শ ও বাস্তব রূপদান পদ্ধতির (Classicism and Impressionism) বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী ভাবের প্রকাশ শুরু করিয়াছিল। সীজেন, ভ্যান গফ্, গোগিন এই নূতন চিত্রশৈলীর উদ্‌গাতা। হেনরি ম্যাটিস এবং পাবলো পিকাসো এই নূতন চিত্রকলার সর্বাধিক

ইম্প্রেশনিজম্-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

উল্লেখযোগ্য দুই শিল্পী। ইঁহারা চিত্রশিল্পে পূর্ব-প্রচলিত রীতি-বিরোধী এক সম্পূর্ণ নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। ম্যাটিস তাঁহার বিষয়বস্তু সভ্য সমাজের আওতার বাহির হইতে গ্রহণ করিতে শুরু করেন। পলিনেশিয়ান, আফ্রিকার নিগ্রো, মেক্সিকোর রেড্-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি তিনি চিত্রকলার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন।

ম্যাটিস ও পাবলো পিকাসো

স্পেনের ক্যাটালোনিয়ার মূল অধিবাসী পাবলো পিকাসো সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। শহর জীবনের বিষাদগ্রস্ত, অস্বাস্থ্যকর দিক হইতে বিষয়বস্তু লইয়া পিকাসো তাঁহার চিত্রকলাকে এক নূতন রূপদান করিয়াছিলেন। তিনি অতি সাধারণ জিনিসপত্র যেমন, বোতল, বাদ্যযন্ত্র, ফল রাখার পাত্র প্রভৃতিকে চিত্রে এক অতি-বাস্তব রূপদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শিল্পরীতিতে অঙ্কিত মূর্তি জ্যামিতিক রেখাচিত্রের আভাস দিত, এই কারণে এই রীতি কিউবিজম্ (Cubism) নামে পরিচিত হয়। তাঁহার এই অঙ্কন-পদ্ধতি সেই সময়ে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং অনেক চিত্র-শিল্পী উহার অনুকরণ করিতে শুরু করেন। পরবর্তী কালে অবশ্য পিকাসো প্রকৃতিবাদী শিল্পরীতিতে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহার 'কিউবিজম্' ফ্রান্সে চলিতে থাকে এবং ক্রমে 'ফিউচারিজম্' অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাদী শিল্পরীতি 'লিরিসিজম্' চিত্রের মধ্য দিয়া সঙ্গীতের সহিত চিত্রের সমধর্মিতা প্রকাশ করা এবং 'পপুলারিজম্' অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কোনপ্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই যেরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ চিত্র আঁকিতে পারে, এইসব বিভিন্ন শিল্পরীতি ফ্রান্সে দেখা দেয়। ইহা ভিন্ন, প্রচলিত যুক্তিবাদী পদ্ধতির চিত্রের স্থলে যাহা মনে উদয় হইল তাহা অথবা স্বপ্ন—এই সকল অতি-বাস্তব শিল্পরীতি (Sur-realism)-ও তখন চালু হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন শিল্পরীতি হইতে সেই সময়কার শিল্প যে এক বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পিকাসো ও তাঁহার কিউবিজম্

ফিউচারিজম্, লিরিসিজম্, পপুলারিজম্ শিল্পরীতি

সার-রিয়েলিজম্

চিরাচরিত প্রথার চিত্রাঙ্কন যে তখন ছিল না এমন নহে। ইংলণ্ডের উইলিয়াম অরপেন (William Orpen)-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ্য। মার্কিন চিত্র-শিল্পী জর্জ বেলোজ (George Ballos) বাস্তববাদী শিল্পরীতি এবং নূতন শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এক অভিনব শিল্পাঙ্কন জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

চিরাচরিত বাস্তববাদী চিত্রাঙ্কন

'কমার্শিয়াল আর্ট' ও 'কার্টুন' (Commercial Art and Cartoon) অর্থাৎ বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞাপনকে মনোগ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য কমার্শিয়াল আর্ট সেই সময়ে ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে যে-কোন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও জনসাধারণকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে 'কার্টুন' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফরাসী চিত্র-শিল্পী ফোরেইন এবং ব্রিটিশ চিত্র-শিল্পী সার বার্নার্ড প্যাট্রিজের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কমার্শিয়াল আর্ট ও কার্টুন

স্থাপত্য শিল্পে সেই যুগে কতকটা রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হয়। চিরাচরিত স্থাপত্য শিল্পরীতি, প্রাচীন গ্রীস ও রোমান স্থাপত্য পদ্ধতি বা গথিক স্থাপত্য-রীতির অনুসরণ বিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল। উদাহরণ হিসাবে প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী যুগে ওয়াশিংটনে নির্মিত 'কমার্শিয়াল বিল্ডিং', 'সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিং', যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতি হিসাবে লণ্ডনের 'সেনোটাফ্ বিল্ডিং' প্রভৃতি চিরাচরিত শিল্পরীতি অনুসরণে নির্মিত হইয়াছিল। নিউ ইয়র্কের 'রিভার সাইড্ ব্যাপ্টিস্ট্ চার্চ' এবং লিভারপুলের 'এ্যাংলিকান ক্যাথিড্রেল' গথিক শিল্পরীতির অনুসরণে নির্মিত। তথাপি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্থাপত্য-রীতি ক্রমে অনুসরণ করা হইতে থাকে। প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিরাট বিরাট দালান লোহার কাঠামোর উপর তৈয়ার করা, অধিক মাত্রায় রি-ইনফোর্সড্ কংক্রীট্ অর্থাৎ সিমেণ্ট, লোহা, পাথরের টুকরা ও বালি মিশাইয়া ঢালাই করিয়া বিরাট বিরাট দালান নির্মাণ আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম যুদ্ধে বাড়ীঘরের গোলা-বারুদ, বোমা প্রতিহত করিবার অক্ষমতাও নূতন স্থাপত্য-রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই সকল পরিস্থিতিতে যাহাতে বাড়ীঘর রক্ষা পাইতে পারে, সেজন্য স্থাপত্য-শিল্পকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। বসবাস বা অফিস—যেভাবেই ব্যবহৃত হউক না কেন, বাড়ীঘর যাহাতে সর্বাধিক সুবিধাজনক হয় এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক হয়, তাহাও আধুনিক স্থাপত্য-রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে।

স্থাপত্য-শিল্প : চিরাচরিত শিল্পরীতি অনুসরণ

নূতন স্থাপত্য-শিল্প রীতি ও চিরাচরিত রীতি সংমিশ্রণ

উপযোগিতা-ভিত্তিক স্থাপত্য-রীতি

সৌন্দর্য অপেক্ষা উপযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপত্য-শিল্পরীতি অনুসরণে ফ্রাঙ্ক্ লয়েড্ রাইট-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেল উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাঁহার এক অভিনব কীর্তি। স্থাপত্য-শিল্পে অতি-আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয় জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ায়। আধুনিক স্থাপত্য-রীতি পৃথিবীর সকল দেশেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের মিশ্রণে নির্মাণ-রীতি সকল দেশেই পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক স্থাপত্য-রীতি পৃথিবীর সকল দেশে অনুসৃত

ভাস্কর্য-শিল্পে সেই যুগে 'আদিম রীতি' (Primitivism) অনুসৃত হয়। ফরাসী ভাস্কর এ্যারিস্টাইড্ মেইলল প্রাচীন কালের ভাস্কর্য-রীতি অনুসরণ করিয়া মূর্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলামূর্তি নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত অর্ধশায়িত 'খ্যাতি দেবী'র (Goddess of Fame) মূর্তি ভাস্কর্য-শিল্পের এক অমর কীর্তি। মোটামুটিভাবে এই যুগের ভাস্কর্য-শিল্প অনেকটা আদিম অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী বলা যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান শিল্পীদের মধ্যে জ্যাকব

ভাস্কর্য :

মেইলল, এপ্স্টাইন

এপস্টাইন ও আমাদিও মোদিগ্লিয়ানির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ও প্রাচীন ভাস্কর্য-রীতির মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় আইভান মেস্ট্রোভিক নামে জনৈক ক্রোয়েশিয়াবাসী ভাস্করের শিল্পকার্যে এবং ইংরেজ ভাস্কর এরিক্ জিলের শিল্প-কীর্তিতে।

মোদিগ্লিয়ানি, এরিক্ জিল

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আধুনিকতা বিভিন্ন দেশে আধুনিক সঙ্গীত স্কুলের স্থাপনে পরিলক্ষিত হয়। ইতালিতে 'রেসপিঘি স্কুল', ফ্রান্সে 'স্কুল অব্ দি সিক্স', অস্ট্রিয়ার 'স্কুল অব্ স্কনবার্গ', জার্মানির 'স্কুল অব্ হিণ্ডিমিথ্', রাশিয়ার 'স্কুল অব্ স্ট্রাভিন্স্কি' নূতন ধরনের সঙ্গীত চর্চার স্কুল হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই আমেরিকা চলিয়া যান। সেখানে সঙ্গীতের নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। এইসব কাজে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ আরন কোপল্যাণ্ড, রোজার সেশনস, জর্জ গারসউইন ও জন কার্পেণ্টারের নাম জড়িত ছিল।

আধুনিক সঙ্গীত স্কুল

নূতন সঙ্গীতের অভিনবত্ব সুর, তাল প্রভৃতি সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়। নূতন সঙ্গীতের অনুসরণকারীদের বক্তব্য ছিল যে, চিরাচরিত সুর সঙ্গীতকে দুর্বল, ভাবপ্রবণ করিয়া তোলে। আধুনিক কর্মচঞ্চল, যন্ত্রাশ্রয়ী সভ্যতার কালে সুর, তাল এগুলি পুরুষোচিত মনের প্রকাশের পক্ষে উপযোগী নহে। এই কারণেই 'জাজ্' সঙ্গীতের প্রসার দেখা যায়। বস্তুত যন্ত্রের (machine)-এর শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'জাজ্' পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা অনেকটা অসংযত, অমার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।

'জাজ্' সঙ্গীত

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দিকে পূর্বেকার কল্পনা-প্রবণতা (Romanticism), বিশেষভাবে ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়। স্কটিশ সাহিত্যিক রবার্ট লুই স্টিভেন্সন হইতে শুরু করিয়া জেম্স্ ব্যারী, কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং সকলের মধ্যেই রোমাণ্টিসিজমের প্রভাব ছিল। অনুরূপ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও রুশ সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কীর্তিতেও কল্পনা-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সাহিত্য-ধারা বিংশ শতকের অনেক কাল পর্যন্ত চালু থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে 'রিয়েলিজম্' (Realism) অর্থাৎ বাস্তববাদও অনুসৃত হইতে থাকে। এই নূতন বাস্তববাদী সাহিত্য মনস্তত্ত্ব এবং সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করিয়া, যেমন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, শ্রমিক শ্রেণী, স্ত্রী জাতির উন্নতি, সমাজ সংস্কার, যুদ্ধের অবসান, জাতীয় আয়ের সমবণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এই দুইয়ের প্রভাব এই নূতন ধরনের সাহিত্য-কীর্তিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে গাস্টাভ্ ফ্ল্যাম্বার্ট, আল্ফোন্সো ডডেট্, গাই দ্য মোপাসাঁ (Gustave Flambert,

রোমাণ্টিসিজম্ বা কল্পনা-প্রবণ সাহিত্য

বাস্তববাদ বা রিয়েলিজম্

বাস্তববাদী সাহিত্য
দৃষ্টিঃ আল্ফোন্সো ডডেট্, মোপাসাঁ, এমিল জোলা

Alfonso Daudet, Guy de Maupassant) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমিল জোলা (Emile Zola) বিংশ শতকের শুরুতেই মারা যান। তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি ঊনবিংশ শতকেই প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী সাহিত্যিক এবং সমাজের উপরই তাঁহার বাস্তব দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি নভেল রচনা, সাংবাদিকতা প্রভৃতিতেও তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

বাস্তববাদী সাহিত্যিক থিবো

বিংশ শতকের প্রথম দিকে ফরাসী সাহিত্যিক জেকুয়েস থিবো (Jaques Thibaut), যিনি আনাতোল ফ্রান্স নামে সমধিক পরিচিত, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার রচনায় বিদ্রূপ, নাস্তিকতা, রসিকতা প্রভৃতি নানা গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে অবশ্য তিনি রাজনীতি ও সমাজ-জীবন লইয়া রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে এবং বিংশ শতকের গোড়ার

ইংরেজ বাস্তববাদী সাহিত্যিক মেরিডিথ ও হার্ডি

দিকে ইংরেজ বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে জর্জ মেরিডিথ (George Meredith), টমাস হার্ডির (Thomas Hardy) নাম করা যায়। টমাস হার্ডির 'দি মেয়র অব্ ক্যাসারব্রিজ' ('The Mayor of Casterbridge'), 'টেস অব্ দি দ' আরবার-ভাইলস্ (Tess of the D' Urbervilles) মানুষের পশুপ্রবৃত্তি সম্পর্কেই আলোকপাত করিয়াছে।

বার্নার্ড শ', এইচ. জি. ওয়েলস্

জর্জ বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw) ছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তববাদী। তিনি প্রধানত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশী মনোযোগী ছিলেন। সমাজের নানাবিধ সমস্যা যথা, গণিকাবৃত্তি, সামরিক মনোবৃত্তি সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, এমন কি স্যালভেশন আর্মি প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন। এইচ. জি. ওয়েলস্ (H. G. Wells) সমসাময়িক কালের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে মানুষ যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ফলাফল লইয়া বিশেষভাবে আলোচনামুখর, সেই সময়ে তাঁহার 'দি টাইম মেশিন' (The Time Machine), 'দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লড্স্' (The War of the Worlds) 'শেপ অব্ থিংস্ টু কাম' (Shape of Things to Come) প্রভৃতি কল্পনাশ্রয়ী রচনাকে বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন। পরে সমাজতন্ত্রের দিকে তাঁহার

বৈজ্ঞানিক স্বপ্নলোক : সামাজিক স্বপ্নলোক

ঝোঁক বৃদ্ধি পাইলে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন জগতের (Scientific Utopia) স্থলে সামাজিক 'স্বপ্ন-জগৎ'' (Social Utopia)-র উপর রচনা শুরু করিলেন। এই সামাজিক স্বপ্ন জগতে মেশিনগুলি সব কাজ করিয়া যাইবে, আর মানুষ কেবল খেলাধুলা করিবে, এই সমাজে কোনপ্রকার কুসংস্কার থাকিবে না, এবং সেখানে অতি-মানবের আবির্ভাবের জন্য সকল রকম বাধা-বিপত্তি দূর করা হইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার 'এ মডার্ণ ইউটোপিয়া' (A Modern Utopia) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নরওয়ের সাহিত্যিক হেনরিক ইব্‌সেন (Henrik Ibsen) ছিলেন বাস্তববাদী লেখক। তাঁহার 'ব্রান্ড' (Brand) ও 'পিয়ার জিন্ট' (Pear Gynt) নরওয়ের সমাজ-জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কবিতা তাঁহার 'এ ডলস্‌ হাউস' (A Doll's House), 'গোস্ট' (Ghost), 'এ্যান এনিমি অব্‌ দি পিপ্‌ল' (An Enemy of the People) প্রভৃতি নাটক আধুনিক সমাজের নানাবিধ ত্রুটি বিশেষভাবে ভণ্ডামি সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছিল। ইব্‌সেনের প্রভাব বার্ণার্ড-শ' সহ সমসাময়িক ইওরোপীয় উদীয়মান সাহিত্যিকদের অনেকের উপরই পড়িয়াছিল।

ইব্‌সেন

রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) বাস্তববাদী সাহিত্যিক না হইয়াও সমাজ-সংস্কার, ভূমিদাসদের মুক্তি, সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির উপর রচনার দ্বারা রাশিয়ার বাহিরে সমগ্র ইওরোপের সাহিত্য-জগতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। তাঁহার 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' (War and Peace) সর্বত্র সমাদৃত হয়। অপর দুইজন রুশ সাহিত্যিক যাঁহারা সমগ্র ইওরোপে সাহিত্যিক হিসাবে যশ অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন আনটন্‌ চেকভ্‌ (Anton Chekov) ও ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky)। চেকভ্‌ ছিলেন মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত বাস্তববাদী। তিনি সমাজ-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই অধিক মাত্রায় তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। গোর্কি সমাজে উপেক্ষিত ভবঘুরেদের লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার নাটক ও উপন্যাসে রুশ জীবন, রুশ সমাজের সমস্যাসমূহ এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখা হইয়াছিল।

টলস্টয়

চেকভ্‌

গোর্কি

নূতন সাহিত্য-ধারায় বাস্তববাদ (Realism), ইম্‌প্রেশনিজম্‌ (Impressionism) বা বাস্তবরূপ-বাদ অর্থাৎ যেভাবে দেখা যায় ঠিক সেইভাবে রূপ দিবার রীতি, অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) এবং প্রতীকবাদ (Symbolism) প্রভৃতির অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়।

বাস্তববাদ, বাস্তবরূপ-বাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, প্রতীকবাদ

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে উপযোগ উৎপাদনের উন্নতি (Utilitarian advance during the latter part of the 19th and early 20th Century): ১৮৩০ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে উদ্ভূত শিল্প-বিপ্লব ইওরোপের এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। মূলধনী বা পুঁজিবাদী দেশে ত' বটেই, কমিউনিস্ট্‌ দেশ রাশিয়াও শিল্প-বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণে পশ্চাৎপদ ছিল না। ইওরোপীয় উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনগ্রসর তুরস্ক বা মেক্সিকো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্বসভ্যতায় রূপান্তরিত করিয়াছিল। ১৯১০ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ—এই কুড়ি

শিল্প-বিপ্লবের প্রসার

বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর লোহা ও কয়লার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। কয়লা ও লোহা এই দুইটি সামগ্রীই হইল আধুনিক শিল্পোৎপাদনের মূল উপাদান। ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা সর্বত্র এই দুইটি উপাদানের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমন কি, রাশিয়ার কয়লা ও লোহা উৎপাদন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেনের লোহা উৎপাদন হইতে অধিকতর হইয়া পড়ে।

কয়লা ও লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি

বস্ত্র-শিল্পেও অনুরূপ উন্নতি এই সময়ে ঘটিয়াছিল। সুতী-বস্ত্র উৎপাদন খুব বেশী না হইলেও সিল্ক ও রেয়ন বস্ত্রের উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। উলের উৎপাদনও ঐ সময়ে বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র-শিল্পোন্নয়নে মেশিনের ব্যবহার ব্যাপক হইয়া উঠে। ১৯১০ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা এবং ইওরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে বস্ত্র-শিল্প সম্পূর্ণভাবে মেশিনের সাহায্যে চালিত হয়।

বস্ত্র-শিল্প

বস্ত্র-শিল্প ভিন্ন চামড়া, চীনামাটির জিনিসপত্র, কাগজ, টাইপরাইটার, গোলা-বারুদ, ছুরি-কাটারি, রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প অত্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে।

অপরাপর শিল্প

রেলপথের উন্নতি কেবলমাত্র ইওরোপ ও আমেরিকা বা গ্রেট ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকায়ও রেলগাড়ীর এঞ্জিন প্রস্তুত হইতে থাকে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের লাইনেরও বিরাট বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর টেলিগ্রাফ লাইনের বিস্তৃতি ছিল ৭০ লক্ষ মাইল। অনুরূপ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও জাহাজের মাধ্যমে পরিবহনের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। জাহাজ, রেলপথ, মোটর গাড়ী এরোপ্লেন প্রভৃতি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের সহিত যোগাযোগ ও মালপত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক উন্নতি সাধিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার অনুরূপ যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করে।

রেলপথ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির বিস্তৃতি : জাহাজ, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি

মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহের জন্য পেট্রোলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। রবারের উৎপাদনও মোটরগাড়ী, ট্রাক, এরোপ্লেনের চাকার প্রয়োজন মিটাইবার চাপে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

পেট্রোল ও রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি

সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের আনন্দ, আমোদের সুযোগ যেমন বৃদ্ধি পায়, এই সকল শিল্পোৎপাদনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও অভাবনীয়ভাবে বাড়িয়া যায়। কৃষির ক্ষেত্রেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে।

অপরাপর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয় নাই। পৃথিবীর বাজারে যে-মন্দা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বেকারী ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। তাহার ফলে বেকারের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি অসংখ্য লোকের আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একক-অধিনায়কত্ব উদ্ভবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ইতালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদ, কমিউনিস্ট্ রাশিয়ায় সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ—এই অর্থনৈতিক দুর্বলতারই ফলশ্রুতি বলা যাইতে পারে।

দারিদ্র্য ও বেকারী বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে ফ্যাসিবাদ ও রুশ পার্টি ডিক্টেটর-শিপের শক্তি বৃদ্ধি

রোমান্টিসিজম্ (Romanticism): ভিক্টর হিউগো রোমান্টিসিজমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "সাহিত্যে উদারতাই হইল রোমান্টিসিজম্" (Romanticism is liberalism in literature)। রোমান্টিসিজম্ বা কল্পনাবাদ অবশ্য কেবল সাহিত্যেই প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, সঙ্গীত এমন কি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও রোমান্টিসিজম্-এর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। হেগেল এজন্য রোমান্টিসিজমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বহির্জগতের প্রভাব অপেক্ষা কল্পনাজগতের প্রাধান্যকে রোমান্টিসিজম্ বলিয়াছেন।

সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে রোমান্টিসিজমের প্রভাব

অষ্টাদশ শতকে রোমান্টিসিজম্ (Romanticism in the 18th Century): অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে যখন ক্ল্যাসিসিজম্ বা ধ্রুপদী প্রভাব (classicism) শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সব কিছুর উপর পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত সেই সময়েই রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে টম্সনের (Thomson) *Seasons* গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিনস্-এর *Odes*, ঐ একই বৎসর রিচার্ডসনের *Clarissa Harlowe*, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে'র *Elegy*, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রুশোর *Julie, Ou La Nouvalle Heloise*, পর বৎসর (১৭৬২) ম্যাকফার্সনের *Fingal*, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে *Castle of Otram-to*, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্সি'র *Reliques of Ancient English Poetry*, পর বৎসর (১৭৬৯) স্কটিশ ও জার্মান লোক সঙ্গীত, চ্যাটারটনের নকল সাহিত্য, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গেটের *Werther* প্রভৃতি সাহিত্য কীর্তি অষ্টাদশ শতকের রোমান্টিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য। বস্তুত সাহিত্যে কল্পনাবাদ অর্থাৎ রোমান্টি-

ক্ল্যাসিসিজমের শ্রেষ্ঠ বিকাশের যুগে রোমান্টিসিজমের প্রকাশ

সিজম্ প্রায় প্রতি যুগেই কতক কতক সাহিত্য কীর্তিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।*

ইহার পর ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইল তখন প্রাচীন তথা প্রচলিত সব কিছুর বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হইল। পুরাতন অর্থাৎ ধ্রুপদী সব কিছুই যেন পূর্বেকার মর্যাদা হারাইল। মানুষের চিন্তা, বক্তব্য, কার্যকলাপ সব কিছুর মধ্যেই এক বন্ধন-মুক্তির চেতনা দেখা দিল। কবিতা, সাহিত্য শিল্প, নাটক, কোন কিছুই আর চিরাচরিত-রীতি মানিতে চাহিল না। রোমান্টিসিজম্ এই অবস্থায় ব্যাপক প্রসার লাভ করিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে বন্ধন-মুক্তি

ঊনবিংশ শতকে রোমান্টিক আন্দোলন (Romantic Movement in the 19th Century) : ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক হইতে অষ্টম দশক পর্যন্ত ইওরোপীয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক যুগ বা পর্ব বলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শিল্প ও সাহিত্যে পূর্বেকার গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি শিল্প, সাহিত্য অনুরাগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে রোমান্টিসিজম্ বা কল্পনাপ্রবণতা দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরিয়া রোমান্টিসিজম্ উহার প্রভাব ও ক্ষেত্র প্রসারিত করে। চতুর্থ দশক হইতে অষ্টম দশক, আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ১৮৩০ হইতে ১৮৭৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে রোমান্টিসিজম্ প্রাচীন অর্থাৎ ক্ল্যাসিসিজম্‌কে সম্পূর্ণভাবে পশ্চাতে ফেলিয়া শিল্প, দর্শন, সাহিত্য সব ক্ষেত্রে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

রোমান্টিসিজম্ ক্ল্যাসিসিজমের প্রতিদ্বন্দ্বী

১৮৩০-১৮৭৮ রোমান্টিসিজম্ প্রসারের যুগ

রোমান্টিসিজম্-এর প্রভাব ছিল যেমন জটিল, উহার উপাদানও ছিল নানাবিধ। রোমান্টিসিজমের মূল দুইটি উপাদান হইল: (১) অনুভূতি ও আবেগ। উভয়ই 'সত্য'কে প্রভাবিত করিবে এবং 'সত্য'কে আগাইয়া লইয়া চলিবে; (২) প্রাচীন গ্রীক বা রোমান প্রতিমূর্তি ভিন্নও যে সৌন্দর্য আছে সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ রেনেসাঁস যুগে প্রাচীনত্ব বা ক্ল্যাসিসিজম্‌কে ভিত্তি করিয়া যে সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্যের ধারণা জন্মিয়াছিল, যে-ধারণা যুক্তিবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল উহা ত্যাগ করিয়া অন্যভাবে চিন্তা করা, কল্পনা করা, সৌন্দর্য উপলব্ধি করাই ছিল রোমান্টিসিজমের মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য রোমান্টিসিজমে বিশ্বাসীদের মধ্যেও নানা পথ, নানা মত, নানা তারতম্য ছিল।

রোমান্টিসিজমের মূল উপাদান

যুক্তিবাদের বিপরীত

শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক্যাল স্থাপত্য রীতি গোথিক স্থাপত্য রীতি পুনঃ আবির্ভাবের ফলে অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। গোথিক স্থাপত্য রীতির পুনঃ-

* "In truth there had been romantics in every age..." *The Age of Napoleon*, Will and Ariel Durant, p. 416.

প্রবর্তনের মূল স্থপতি ছিলেন ইংলন্ডের অগাস্টাস প্যুগিন। ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ ও পার্লামেন্ট ১৮৪০ এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে নির্মিত হইয়াছিল। স্যার চার্লস্ ব্যারি ছিলেন এই দুইটি নির্মাণ-কার্যেরই মূল স্থপতি। গোথিক শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ ও পার্লামেন্ট হাউস-এর উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অনুরূপ, ফ্রান্সে গোথিক স্থাপত্য রীতির অনুকরণে স্থপতি ভায়লেট-লে-ডাক-এর নির্মিত প্যারিসের 'নোটরডেম ক্যাথিড্রেল' উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন রোমান্টিসিজমের প্রভাবে বিভিন্ন প্রভাবের ও রীতির সংমিশ্রণে নূতন ধরনের স্থাপত্য কার্যাদি ইতালির বিভিন্ন স্থানে, ইংলন্ডে, জার্মানির মিউনিক, ড্রেসডেন প্রভৃতি স্থানে দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় গার্নিয়ার নামে জনৈক স্থপতি প্যারিসের এক অতি সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

স্থাপত্য শিল্প ও রোমান্টিসিজম্

বিভিন্ন রীতির মিশ্রণের ফলে নূতন স্থাপত্য রীতি

ভাস্কর্য ও রোমান্টিসিজমের প্রভাবমুক্ত ছিল না। অবশ্য প্রাচীন ভাস্কর্যের মূর্তি তখনও বিত্তশালী ব্যক্তিদের বাগানে—যেমন শ্বেত পাথরের পরী, গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীর মূর্তি তখনও তৈয়ার হইত, তথাপি রোমান্টিসিজমের প্রভাবে কুকুর, সিংহ, মেষ, ছোট ছেলে, মেয়ে, লোহা ঢালাই করিয়া নির্মিত হইতে লাগিল। রোমান্টিক যুগে ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অবশ্য ফ্রান্সেই দেখা দিয়াছিল। তথাপি ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, এবং আমেরিকায়ও রোমান্টিক প্রভাবে প্রভাবিত ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সিঁড়ির ও বারান্দার রেলিং, দালানের স্তম্ভের কার্নিশ প্রভৃতির নানা ধরনের কারুকার্য নূতন নূতন কল্পনার ফলশ্রুতি ছিল। এই সবই ছিল রোমান্টিসিজমের প্রভাবের ফল।

ভাস্কর্য

আলঙ্কারিক ভাস্কর্য

শিল্পের মধ্যে চিত্রশিল্পই রোমান্টিসিজমের প্রভাবে সর্বাধিক মাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছিল। ফরাসী চিত্রশিল্পী ডেলাক্রয়েক্স, ইংরেজ চিত্রশিল্পী কনস্টেবল্ ও টার্নার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ক্যাসিক্যাল প্রভাব মুক্ত হইয়া রোমান্টিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে ফরাসী রোমান্টিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কোরোট ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোরোট "বারবিজোন স্কুল" নামে একটি চিত্রশিল্প-গোষ্ঠী গড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জীন ফ্রাসোঁয়া মিলেট ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইংলন্ডের রোমান্টিক চিত্রশিল্প ফরাসী চিত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর রোমান্টিক ছিল। বার্নি জোনস্, রসেটি, এবং হলম্যান হান্ট্ ছিলেন এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭—১৮২৭) ধ্রুপদী চিত্রশিল্প হইতে রোমান্টিক চিত্রশিল্পে বিবর্তনের

চিত্রশিল্প

ফ্রান্স

ইংলন্ড

পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি যশুয়া রেনল্ডস্ (Jashua Reynolds)-এর ধ্রুপদী চিত্রাঙ্কন রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজস্ব কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া চিত্রাঙ্কন এবং মূর্তি খোদাই করিতে শুরু করেন। ব্লেক নিজে অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ইংলণ্ডের চিত্রকলায় রোমান্টিসিজম্ পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রোমান্টিক চিত্রকরগণ সমুদ্রের ঢেউ, আকাশের মেঘ, বাতাস, প্রভৃতির রূপ তাঁহাদের চিত্রাঙ্কনে দক্ষতার সহিত দিতে পারিয়াছিলেন। এই কল্পনাবাদ বা রোমান্টিসিজম্ ইংলণ্ডে উইলিয়াম ব্লেক ভিন্ন, জন হপ্‌নার, জন ক্রোম, সার টমাস লরেন্স, টার্নার কন্‌স্টেব্‌ল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীদের চিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

উইলিয়াম ব্লেক

হপনার, ক্রোম, লরেন্স, টার্নার, কন্‌স্টেব্‌ল

থিয়েটারও রোমান্টিসিজমের প্রভাবমুক্ত ছিল না। ক্যাসিক্যাল রীতি না মানিয়া এড্‌মাণ্ড কীন (Edmund Kean) থিয়েটারে নাটকের চরিত্র রূপায়ণে নিজস্ব কল্পনার নির্ভর করিয়া দর্শকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র চার্লস্ রোমান্টিক নাট্য শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং তাঁহাদের সময় হইতেই ইংলণ্ডে ধ্রুপদী অর্থাৎ ক্যাসিক্যাল নাট্যরীতির অবসান ঘটে।

থিয়েটারে রোমান্টিসিজম্

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে রোমান্টিক প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি সেই যুগের (১৮৩০-১৮৭৮) জাতীয় সাহিত্যের উপর। ঐ যুগে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, এক কথায় সমগ্র ইওরোপ এমন কি, ইতালি ও স্লাভ্ জাতি অধ্যুষিত দেশগুলিতেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব সাহিত্যের উপর দেখা যায়। ইংলণ্ডে এই যুগের পূর্বেই যে রোমান্টিক সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোলরীজ, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, সাউদি, বায়রণ, শেলী ও কীট্‌সের কাব্য সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৩০-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অন্তবর্তীকালে রোমান্টিক কবিদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউনিং, আলফ্রেড্ টেনিসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে লেক ডিস্ট্রিকট্-এ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, সাউদি, ডি. কুইন্সি, শেলী, বায়রণ, কীটস্ প্রভৃতি কেহ দীর্ঘকাল, কেহ অল্পকাল বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা "লেক কবি" Lake Poets নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্

ইংরেজী সাহিত্য ও রোমান্টিসিজম্ঃ কবিতা

ইংরেজী উপন্যাসে সার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস্ ডিকেন্স, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ্য। ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' 'টেল্ অব্ টু সিটিজ'-এ বাস্তবের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের এক অতি সুন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। অপরাপর রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে থেকারে, চার্লস্ রীড্, জর্জ এলিয়টের নাম করা যাইতে পারে।

উপন্যাস

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কল্পনাবাদের পরিচয় তাঁহার একাধিক কবিতায় পাওয়া যায়।

তাঁহার Ode to Immortality-তে তিনি মানুষের জন্ম এবং ইহজাগতিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতির এক অতি সুন্দর কাল্পনিক চিত্র রচনা করিয়াছেন। মানুষের আত্মার অমরত্বের ব্যাখ্যা এই কবিতায় এক অপূর্ব রূপ লাভ করিয়াছে।* ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ই কোলরীজকে Ancient Mariner কবিতার মত একটি নিছক কাল্পনিক (রোমাণ্টিক) কবিতা রচনার উৎসাহ একদিন সন্ধ্যায় তিনি নিজে, তাঁহার ভগ্নী ডরোমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরীজ বেড়াইবার কালে দিয়াছিলেন। কোলরীজের Rhime of the Ancient Mariner রোমাণ্টিক কবিতার অন্যতম বিশেষ উল্লেখ্য কবিতা। কোলরীজের কুব্‌লা খাঁ (Kubla Khan) এবং খ্রীষ্টাবেল (Christabel)—এই দুইটি কবিতায়ও রোমাণ্টিসিজমের চরম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ: Immortality Ode

কোলরীজের Rhime of the Ancient Mariner, Kubla Khan, Christabel

কীট্‌সের Ode to Nightingale রোমাণ্টিক কবিতা হিসাবে বিশেষ উল্লেখ্য। এই কবিতায় কল্পনার নেত্রে তিনি চাঁদের আলো, কল্পনায় নানা সুগন্ধি ফুলের মিশ্রিত সুগন্ধ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের গন্ধকে পৃথক পৃথকভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। ইহা এক অপূর্ব কল্পনাশক্তির অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই।

কীট্‌স

শেলী তাঁহার Ode to the West Wind কবিতায় পাশ্চমী বাতাস যেমন সব কিছু পুরাতনকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া নূতনের অভ্যুত্থানের পথ প্রস্তুত করে, তেমনি সর্বক্ষেত্রেই পতনের পরই উত্থান, অবলুপ্তির পরই নূতনের অভ্যুদয়, If winter comes, can spring be far behind? দুঃখের পর সুখ, প্রাকৃতিক নিয়মেই আসিবে। এই সুন্দর কল্পনা শেলীর কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। শেলীর Ode on a Grecian Urn কবিতায় প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্রের উপর অঙ্কিত চিত্রকে কল্পনায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়া চিত্রের প্রত্যেকটি অংশের উপর নিজের ব্যাখ্যা আরোপ করিয়াছেন।

শেলী

---

* **Our birth is but a sleep and a forgetting ;**
The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting,
and cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God who is our home ;
Heaven about us in our infancy !
Shades of prison house begin to close
Upon the growing boy" ***Immortality Ode*****, Wordsworth.**

রোমান্টিক কবিদের অপর একজন যিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারেন, ইনি ছিলেন বায়রণ। তাঁহার জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল এবং বে-পরওয়া ধরনের। কবি হিসাবে অবশ্য তিনি ইংরেজী সাহিত্যে নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার *Childe Harold's Pilgrimage* এক রোমান্টিক অথচ বিষাদপূর্ণ কবিতা, Don Juan, The Corsair, Mazappa প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য কবিতার কয়েকটি। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে এলিজাবেথ ব্রাউনিং, রবার্ট ব্রাউনিং, রসেটি প্রভৃতির নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বায়রণ

রোমান্টিক উপন্যাস : স্যর ওয়াল্টার স্কট্

উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্টিসিজমের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসে। ইহা ভিন্ন, ম্যারিয়ট, রীড্, থ্যাকারে ইঁহাদের নামও এই সূত্রে উল্লেখ্য।

ফ্রান্সে রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে ভিক্টর হিউগোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রোমান্টিক নাটক 'হারনানি (Hernani) সাহিত্য ক্ষেত্রে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভিক্টর হিউগোর খ্যাতি তাঁহার অমর কাব্য-গ্রন্থ 'নোটরডেম্ ডি প্যারিস' (Notre Dame De Paris), 'নাইনটি থ্রি' (Ninety three) ও 'লা মিজারেবল্‌স্' (La Miserables) এই তিনখানির জন্যই সমধিক। নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতে রোমান্টিক রচনার জন্য অপর ফরাসী সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার ডুমা'র (Alexander Dumas) নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। "থ্রি মাস্কেটিয়ার্স" (Three Masketeers) তাঁহার বিখ্যাত সাহিত্য-সৃষ্টি। হিউগো ও ডুমা ভিন্ন অপর একজন খ্যাতনামা রোমান্টিক ফরাসী সাহিত্যিক ছিলেন হোনোরি ডি ব্যালজাক। জর্জ স্যাঁণ্ড নামে একজন ফরাসী মহিলা রোমান্টিক ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ফরাসী রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে আলফ্রেড্ ডি মুসেট্ কতকটা ইংরেজ কবি বায়রণের মতই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল সাহিত্যসেবীরা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া কল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়া তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিসিজম

রুশ সাহিত্যেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গোগোল তাঁহার 'ডেড্ সোল' (Dead Soul) উপন্যাসে রোমান্টিক প্রভাবের সুন্দর প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোগোল ভিন্ন তুর্গেনিভ, দস্তোয়েভ্‌স্কি রোমান্টিক সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষ উল্লেখ্য। তুর্গেনিভের 'ফাদার্স এ্যাণ্ড চিল্ডরেন' (Fathers and Children), দস্তোয়েভ্‌স্কির 'পুয়োর পিপ্‌ল' (Poor People) ও 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' (Crime and Punishment) রুশ অমর সাহিত্য-কীর্তি।

রুশ সাহিত্য

রাশিয়ার অনুকরণে পোল্যাণ্ডেও রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু পোল্যাণ্ড কেন, সমগ্র স্লাভ্ ভাষায় রচিত সাহিত্যের উপরই রোমান্টিসিজমের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

সমগ্র স্লাভ সাহিত্যের উপর রোমান্টিক প্রভাব

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ভিন্ন জার্মান, ইতালীয়, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ান, চেক্, স্পেনিশ প্রভৃতি দেশীয় কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির উপর রোমান্টিসিজমের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইওরোপীয় সাহিত্যের উপর রোমান্টিক প্রভাব

রোমান্টিসিজম্ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই জার্মান সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশ লাভ করিতে থাকে এবং নেপোলিয়নের যুগে জার্মানির রোমান্টিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফিস্টি, শ্লেগেল, স্লায়েরমাকের, নোভালিস অ্যাডাম ম্যালের রোমান্টিক সাহিত্য-কীর্তিতে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য এ-বিষয়ে নোভালিস ও শ্লেগেলের অবদান ছিল সর্বাধিক।

জার্মানি : নেপোলিয়নীয় যুগে জার্মানির রোমান্টিকবাদের পরিপূর্ণতা

জার্মান রোমান্টিসিজম্ জার্মান জাতির জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। বিথোফেন (Beethoven), ওয়েবার (Weber), মেণ্ডেলসন (Mendelssohn) প্রভৃতি সঙ্গীতে, নভেলে হফ্ম্যান্ (Hoffmann) এবং টিয়েক (Tiek), দর্শনে ফিস্টি (Fichte). শেলিং (Schelling), রোমান্টিসিজমের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

জীবনের প্রতিস্তরে রোমান্টিসিজমের প্রভাব

নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানি অধিকৃত হইলে সেই পরাজয়ের গ্লানি হইতে জার্মানিতে রোমান্টিক ইতিহাস-চেতনারি সৃষ্টি হয়। জার্মান জাতির এক কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা জার্মান জাতির মধ্যে সমসাময়িককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার অবশ্য ফল ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক মুক্তি যুদ্ধের সূচনা।

জার্মানির ইতিহাস চর্চার রোমান্টিসিজম্

ফ্রান্সের নাট্য সাহিত্যেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্ল্যাসিক্যাল ন্যাট্যরীতির স্থলে নাটকের চরিত্র রূপায়ণে কুশীলবগণ নিজেদের কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভার বিকাশ দ্বারা নূতন যে রীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা রোমান্টিসিজমের ফলশ্রুতি। স্থান ও কালের ঐক্য—unity of place and time—ইত্যাদি ক্ল্যাসিক্যাল রীতি তখন পরিত্যক্ত হইয়া রোমান্টিক নাট্যকলার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ডুমা পিরি রোমান্টিক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

ফরাসী নাটকে রোমান্টিসিজম্

ফরাসী উপন্যাসের উপর রোমান্টিসিজমের প্রভাব ছিল অত্যধিক। আধুনিক ফরাসী উপন্যাস রচনায় রেমান্টিক উপন্যাসের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। হিউগো, ব্যালজাক্ স্টাধালে, জর্জ সাণ্ড, প্রভৃতি লেখক রোমান্টিক উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় ফ্রান্সে এক সুবর্ণযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রোমান্টিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, গিজো (Guizot), জুলে মিশেলেৎ (Jules Michelet) রোমান্টিকতা তাঁহাদের ঐতিহাসিক রচনায়ও ব্যবহার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ইতিহাস রচনায় এক

ফরাসী রোমান্টিক উপন্যাস

ইতিহাস ও সমালোচনা সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহা ভিন্ন, ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific method) অনুসৃত হইতে থাকে। সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক রচনা এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের আলোচনা সেই সময়ে প্রাধান্য লাভ করে।

আধুনিকতা ও বাস্তববাদিতা

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে এক নূতন প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতাকে 'আধুনিকতা' ও 'বাস্তববাদিতা'র প্রবণতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।